বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

হবিগঞ্জ

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

হবিগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মুহাম্মদ ইসমাইল তরফদার

সংগ্রাহক

আবু সালেহ আহমদ

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম

ফজলুর রহমান জুয়েল

মোঃ মহিউদ্দিন আহম্মদ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
হবিগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫০৫৮

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত সত্তর টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : Hobigonj (Present state of Folklore in Hobigonj District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. : 370 only. US$: 6.00

ISBN-984-07-5117-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান**।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, প্রকাশন অফিসার এস. এম. জাহাঙ্গীর কবীর এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে হবিগঞ্জকে সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction to the district) ২৩-৪৯

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠ
খ. সংক্ষিপ্ত পরিচয়
গ. জনবসতির পরিচয়
ঘ. নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর
ঙ. বনভূমি ও গাছপালা
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ছ. মুক্তিযুদ্ধ
জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য, সাধক ও লোকশিল্পী

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৫০-১৫০

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. কবিগান
ঘ. ভাট কবিতা
ঙ. লোককবিতা
চ. লোকছড়া
ছ. পাঁচালি
জ. পুথিসাহিত্য

গ্রাম/স্থান নাম (place name) ১৫১-১৫৭

১. মজলিশপুর, ২. কামালখানী, ৩. তোপখানা, ৪. তিরকর মহল্লা, ৫. চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া, ৬. ভাউয়ালীটুলা, ৭. সেন পাড়, ৮. ভট্টপাড়া, ৯. মিনাট, ১০. দাশ পাড়া, ১১. নৈর পাড়া, ১২. তকবাজখানী, ১৩. জামালপুর, ১৪. দেওয়ান দিঘির পাড়, ১৫. শরীফখানি, ১৬. মীর মহল্লা, ১৭. যাত্রাপাশা, ১৮. চৌধুরী পাড়া, ১৯. রূপরাজ খার পাড়া, ২০. বিদ্যাভূষণঁ পাড়া, ২১. চান্দের মহল্লা, ২২. ভবানন্দ খাঁর পাড়া, ২৩. খন্দকার মহল্লা, ২৪. গরিব হোসেন মহল্লা, ২৫. তাম্বুলী টুলা, ২৬. কাষ্টগড়, ২৭. নন্দী পাড়া, ২৮. শেখের মহল্লা, ২৯. ঠাকুরাইন দিঘির

www.pathagar.com

পাড়, ৩০. কাজী মহল্লা, ৩১. দোকানি টুলা, ৩২. সৈদারটুলা, ৩৩. আচার্যপাড়া, ৩৪. নাগের মহল্লা, ৩৫. হেঙ্গু মিয়ার পাড়া, ৩৬. মাতাপুর, ৩৭. পাঠানটুলা, ৩৮. তাতারী মহল্লা, ৩৯. দরগা মহল্লা, ৪০. জাতুকর্ণ পাড়া, ৪১. দেশমুখ্য পাড়া, ৪২. যাত্রা দিঘি, ৪৩. পাইকপাড়া, ৪৪. দেওয়ান বাগ, ৪৫. আদমখানী, ৪৬. তিলক তালক নায়েবের পাড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৫৮-১৬৮

লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প
২. নকশি কাঁথা
৩. হাতপাখা
৪. বাঁশ-বেত শিল্প
৫.শঙ্খশিল্প
৬. নকশি শিকা
৭. টাইল বা ডুলি
৮. আলপনা
৯. দেয়াল চিত্র
১০. নৌশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৬৯-১৭০

লোকসংগীত (folk song) ১৭১-২৭৮

১. মাজারের গান
২. উরি গান
৩. কর্ম সংগীত
৪. মেয়েলি গীত
৫. বিয়ের গীত
৬. আনুষ্ঠানিক গীত
৭. ঘাটু গান
৮. জারিগান
৯. বাউল গান
১০. বাইদ্যার গান
১১. বারমাসি গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৭৯-২৮০

ক. বাঁশিওয়ালা, খ. একতারা ,গ. বুগলি

www.pathagar.com

লোকউৎসব (folk festival) ২৮১-৩১৪

ক. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব
খ. নবান্ন
গ. ঈদ উৎসব
ঘ. শারদীয় দুর্গোৎসব
ঙ. বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা
চ. স্বাধীনতা দিবস
ছ. জন্মাষ্টমী
জ. মহরম
ঝ. শব-ই-বরাত
ঞ. রথউৎসব
ট. চড়কউৎসব
ঠ. গায়ে হলুদ
ড. বিয়ে
ঢ. রাখাল বন্ধুদের উৎসব ইত্যাদি

লোকমেলা (folk fair) ৩১৫-৩৩১

অষ্টমী স্নানের মেলা
রথমেলা
ওরস ও মেলা

লোকাচার (ritual) ৩৩২-৩৪৬

১. মানসিক (মানত)/শিরনি
২. সাধভক্ষণ
৩. অন্নপ্রাসন (মুখে ভাত)
৪. খৎনা বা মুসলমানি
৫. ষষ্ঠী
৬.আকিকা
৭. চেহলাম
৮. শ্রাদ্ধ
৯. পূর্জা-পার্বণ, ব্রত
১০. বৃষ্টির জন্য মোনাজাত ও ব্যাঙের বিয়ে

লোকখাদ্য (folk food) ৩৪৭-৩৫০

www.pathagar.com

লোকনাট্য (folk theatre) **ও লোকনৃত্য** (folk dance) ৩৫১-৩৬২

ক. যাত্রা
খ. লোক নৃত্য

লোকক্রীড়া (folk games) ৩৬৩-৩৭৫

১. নৌকা বাইচ
২. দাড়িয়াবান্ধা খেলা
৩. গোল্লাছুট খেলা
৪. বৌচি খেলা
৫. গুলি খেলা
৬. লাঠিম খেলা
৭. কানা মাছি
৮. কুতকুত খেলা
৯. কানামাছি খেলা
১০. লুকোচুরি খেলা
১১. পাঁচগুটি খেলা
১২. দারাগুটি
১৩. দাড়িয়াবান্দা খেলা
১৪. কাবাডি বা হা-ডু-ডু খেলা
১৫. লাঠি খেলা
১৬. তইতই খেলা
১৭. লাই লাই খেলা
১৮. ষাঁড়ের লড়াই

লোকপেশাজীবী দল (folk groups) ৩৭৬-৩৭৯

লোকচিকিৎসা (folk medicine) **ও তন্ত্রমন্ত্র** (chant) ৩৮০-৩৮৬

ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৩৮৭-৩৯১

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৯২-৪০০

লোকবিশ্বাস (folk belief) ৪০১-৪০৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৪০৫-৪০৬

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠ

একসময় হবিগঞ্জ সিলেট জেলার একটি মহকুমা ছিল। প্রশাসনিক কারণে সিলেটকে চারটি মহকুমায় ভাগ করা হয়েছিল–সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। এই জেলাগুলো নিয়েই বর্তমান সিলেট বিভাগ। সিলেট বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলার অবস্থান।

১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জ মহকুমা দীর্ঘ একশ ছয় বছর পর ১৯৮৪ সালের মার্চ পূর্ণাঙ্গ জেলায় উন্নীত হয়। এর আয়তন ২৬৩৭ বর্গকিলোমিটার।

ভৌগোলিক অবস্থান ও উপজেলাসমূহের পরিচিতি : বৈচিত্র্যময় এই জেলায় রয়েছে পাহাড়, টিলা, বনানী, অথৈ জলরাশি। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। হবিগঞ্জ জেলার উত্তরে সুনামগঞ্জ, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মৌলভীবাজার জেলা, পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ জেলা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে হবিগঞ্জ জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি উজান অঞ্চল এবং অপরটি হাওর অঞ্চল।

হবিগঞ্জের উজান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত চুনারুঘাট, বাহুবল, মাধবপুর ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলা। এ চার উপজেলায় সমতল ও পাহাড়ি এলাকা থাকায় একে উজান অঞ্চল বলা হয়ে থাকে।

আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই ও নবীগঞ্জ এই চারটি উপজেলা হাওর অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত। উপজেলাগুলো নদী-নালা, হাওর-বিলে বেষ্টিত বলে 'ভাটি অঞ্চল' নামে পরিচিত। প্রায় ছয় মাস এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান পানিতে ডুবে থাকে।

খ. সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হবিগঞ্জ জেলা ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত–১. হবিগঞ্জ, ২. নবীগঞ্জ, ৩. বানিয়াচং, ৪. আজমিরীগঞ্জ, ৫. লাখাই, ৬. মাধবপুর, ৭. চুনারুঘাট ও ৮. বাহুবল।

এই উপজেলাগুলো একসময় থানা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৮৪ সালে পর্যায়ক্রমে থানাগুলোর মান উন্নয়ন করে উপজেলা করা হয়। হবিগঞ্জ জেলায় মোট ৭৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। ইউনিয়নগুলো নির্বাচিত একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কমিটিকে 'ইউনিয়ন পরিষদ' বলে। এই পরিষদের প্রধান 'চেয়ারম্যান' ও সদস্যকে 'মেম্বার' বলে। তারা স্থানীয় সরকার হিসেবে কার্য পরিচালনা করেন।

হবিগঞ্জ জেলার লোকসংখ্যা ১৬,৪৬,৫২৫ জন। তার মধ্যে ৮,৯৩,০২০ জন পুরুষ এবং ৭, ৫৩, ৫০৫ জন মহিলা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে এই জেলায় খাসিয়া, টিপরা, মনিপুরি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ চা শ্রমিকের বসবাস রয়েছে।

www.pathagar.com

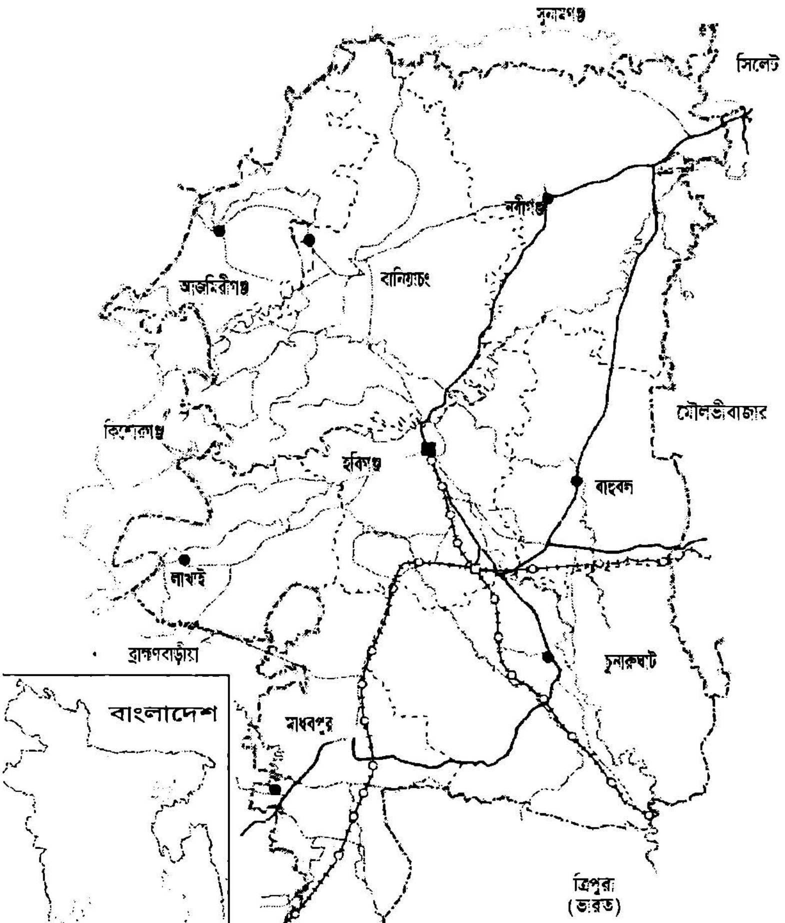

হবিগঞ্জ জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

হবিগঞ্জ সদর উপজেলা

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন ২৫৩.৭৪ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২,৭৫,০৭৪ জন। তার মধ্যে ১,৪০,৯৫১ জন পুরুষ এবং ১,৩৪,১২৩ জন নারী। ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে এই সদর উপজেলা গঠিত। ইউনিয়নগুলো হলো ১. লুকড়া, ২. রিচি, ৩. গোপায়া, ৪. পৈল, ৫. নিজামপুর, ৬. শায়েস্তাগঞ্জ, ৭. তেঘরিয়া, ৮. নূরপুর, ৯. রাজিউড়া ও ১০. লস্করপুর। এই উপজেলায় দুটি পৌরসভা রয়েছে–হবিগঞ্জ পৌরসভা (১৯১৩ সাল) ও শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা (১৯৯৯ সাল)।

নবীগঞ্জ উপজেলা

হবিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ দিকে ২৪ কিলোমিটার দূরে নবীগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। আয়তন ৪৩৯.৬২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৮৭,০২৫ জন। তার মধ্যে ১,৪৫,৪৮৫ জন পুরুষ এবং ১,৪১,৫৪০ জন নারী রয়েছে। পৌরসভা ১টি। ইউনিয়ন ১২টি। ইউনিয়নগুলো হলো ১. পূর্ব বড় ভাকৈর, ২. পশ্চিম বড় ভাকৈর, ৩. ইনাতগঞ্জ, ৪. দীঘলবাগ, ৫. আউশকান্দি, ৬. কুর্শী, ৭. করগাঁও, ৮. নবীগঞ্জ, ৯. বাউশা, ১০. দেবপাড়া, ১১. কালিয়ারভাঙ্গা ও ১২. পানি উমদা ।গ্রাম ৩৫০টি।

বানিয়াচং উপজেলা

হবিগঞ্জ শহর থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে বানিয়াচং উপজেলা। আয়তন ৪৮২.২৫ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২,৬৮,৯৯১ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১,৩৭,৯১২ জন ও নারী ১,৩০,৭৭৯ জন। বানিয়াচং প্রাচীনকালে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। বর্তমানে ১৫টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে বানিয়াচং উপজেলা গঠিত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে বানিয়াচং অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জনপদ। বানিয়াচঙের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম। ছায়াঘেরা গ্রামটি এক অনন্য শোভা ধারণ করে রয়েছে। বানিয়াচঙের ইউনিয়নগুলো হলো ১. বানিয়াচং উত্তরপূর্ব, ২. বানিয়াচং উত্তর পশ্চিম, ৩. বানিয়াচং দক্ষিণ পূর্ব, ৪. বানিয়াচং দক্ষিণ পশ্চিম, ৫. দৌলতপুর, ৬. কাগাপাশা, ৭. বড়ইউড়ি, ৮. খাগাউড়া, ৯. পুকড়া, ১০. সুবিদপুর, ১১. মক্রমপুর, ১২. সুজাতপুর, ১৩. মন্দরী, ১৪. মুরাদপুর ও ১৫. পৈলারকান্দি। গ্রাম ৩৩৭টি।

বাহুবল উপজেলা

হবিগঞ্জ শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে পূর্ব দিকে বাহুবল উপজেলা অবস্থিত। আয়তন ২৫০.৬৬ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩,৬৭,২৬৫ জন। তার মধ্যে ২৮,৫,৩৮৫ জন নারী ৮১,৮৮০ জন মহিলা। এই উপজেলা ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নগুলো হলো ১. বাহুবল, ২. ভাদেশ্বর, ৩. লামাতাসী, ৪. মীরপুর, ৫. পুটিজুরী, ৬. সাতকাপন ও ৭. স্নানঘাট ইউনিয়ন। গ্রাম ৩৩৭টি।

মাধবপুর উপজেলা

হবিগঞ্জ শহর থেকে ৫৯ কিলোমিটার দূরে মাধবপুর উপজেলার অবস্থান। আয়তন ২৯৪.২৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৭২,৫৭৮ জন। তন্মধ্যে ১,৩৮,০৪৩ জন

www.pathagar.com

পুরুষ ১,৩৪,৫৩৫ জন নারী। ইউনিয়নগুলো হলো ১. আদাঐর, ২. বাঘাসুরা, ৩. বুল্লা, ৪. বহরা, ৫. ছাতিয়াইন, ৬. চৌমুহনী, ৭. ধর্মঘর, ৮. জগদীশপুর, ৯. মাধবপুর, ১০. নয়াপাড়া ও ১১. শাহজাহানপুর। গ্রাম ২৬৮টি। ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে মাধবপুর উপজেলা গঠিত।

চুনারুঘাট উপজেলা

হবিগঞ্জ সদর থেকে দক্ষিণে ২৪ কিলোমিটার দূরে চুনারুঘাট উপজেলার অবস্থান। এর আয়তন ৪৯৫.৪৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২,৬৭,০৫৬ জন। তার মধ্যে ১,৩৪,৮৪০ জন পুরুষ ও ১,৩২,২১৬ জন নারী রয়েছে। পৌরসভা ১টি (চুনারুঘাট পৌরসভা)। ১০টি ইউনিয়ন। ইউনিয়নগুলো হলো ১. আহমদাবাদ, ২. চুনারুঘাট, ৩. দেওরগাছ, ৪. গাজীপুর, ৫. মিরাশী, ৬. পাইকপাড়া, ৭. রাণীগাঁও, ৮. শানখলা, ৯. সাটিয়াজুরী ও ১০. উবাহাটা। গ্রামের সংখ্যা ৩৮৬টি।

আজমিরীগঞ্জ উপজেলা

হবিগঞ্জ জেলার একটি পরিপূর্ণ ভাটি উপজেলা আজমিরীগঞ্জ। হবিগঞ্জ শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আয়তন ২২৩.৯৮ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৯৯, ২৯৪ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৫১,৩৮৩ জন ও নারী ৪৭,৯১১ জন। পৌরসভা ১টি। ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা গঠিত। ইউনিয়নগুলো হলো– ১. আজমিরীগঞ্জ, ২. জলসুখা, ৩. বদলপুর, ৪. কাকাইলছে ও ৫. শিবপাশা। গ্রামের সংখ্যা ৮৯টি।

লাখাই উপজেলা

হবিগঞ্জ শহরের পশ্চিম দিকে ১৪ কিলোমিটার দূরে লাখাই উপজেলা অবস্থিত। আয়তনের দিক দিয়ে সবচেয়ে ছোট উপজেলা। এর আয়তন ১৯৬.৫৬ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১,২০,৬৭৭ জন। তার মধ্যে ৫৯,০২১ জন পুরুষ এবং ৬১,৬৫৬ জন নারী। গ্রামের সংখ্যা ৬৩টি। ইউনিয়ন ৬টি– ১. লাখাই ২. মুড়াকড়ি ৩. মুড়িয়াউক ৪. বামৈ ৫. করাব ও ৬. বুল্লা।

গ. জনবসতির পরিচয়

হবিগঞ্জের উপজাতি : পরিবেশ ও মানবাধিকার

বন, পাহাড়, টিলা ও অরণ্যের সঙ্গে উপজাতিদের নাড়ির সম্পর্ক। শত শত বছর ধরে উপজাতিরা বন ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে বন ও পাহাড়কে রেখেছে সুস্থ, সুন্দর ও সজীব। তারা এ দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে। আর প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বন। আবার জীব-বৈচিত্রের মূল আধারও হল বন। এ দেশের জীব-বৈচিত্র্যের বিষয়টি উপজাতিদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সিলেট বিভাগ উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর বাসস্থান হিসেবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হবিগঞ্জও এর বাইরে নয়। খাসিয়া, মনিপুরি, টিপরা, সাঁওতাল ও মুণ্ডাসহ চা বাগানে কর্মরত একাধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থান এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমানে এ অঞ্চলে উপজাতি ও পরিবেশ বহুমাত্রিক হুমকির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠীর বর্তমান হালচিত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

টিপরা সম্প্রদায়

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি, কালেঙ্গা, বাল্লা সীমান্ত এবং বাহুবল উপজেলার কালিগজিয়ায় টিপরাদের বসবাস। তাদের আদি বাসস্থান হচ্ছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। টিপরাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তারা নিজেদের বোনা কাপড় ব্যবহার করে। পুরুষ শাসিত টিপরা পরিবারগুলো পাহাড়ে জুম চাষ করে। আনারস তাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বৈসু উৎসব, গড়াইয়া নৃত্য ইত্যাদি তাদের অন্যতম উৎসব। এ ছাড়াও বাঙালির নববর্ষ ১ বৈশাখ তারা পালন করে। বাহুবল উপজেলার কালিগজিয়ায় টিপরা পল্লি গড়ে উঠে আঠারশ সালে। তখন এই পল্লিতে ছিল ৩৫টি পরিবার। দুশ বছর পরও ৩৫টি পরিবারই রয়েছে। বন বিভাগের জমিতে হওয়ায় টিপরারা মূলত বনবিভাগের ভিলেজার। বন দেখাশোনার কাজ করতে হয় তাদের, কিন্তু এজন্য তারা কোনো পারিশ্রমিক পায় না। বনেই টিপরাদের বসবাস এবং চাষাবাদের জায়গা। বন দেখাশোনা করতে গিয়েই বার বার বিপদে পড়ে তারা। গাছচোরদের গাছ কাটায় অথবা বনবিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের ওপর নেমে আসে নানা রকম নির্যাতন।

উচ্ছেদের হুমকিসহ মামলা মোকদ্দমা করে হয়রানি করা হয়। জানা যায়, ১৯৪৩ সালে মৌলভীবাজার কোর্টে ভূমি অধিকারের মামলা হলে কোর্টের রায় টিপরারা পায়, কিন্তু ১৯৪৭ সালে রির্জাভ ফরেস্টে উন্নীত হলে বনবিভাগ কর্তৃপক্ষ সহজ সরল টিপরাদের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে যায়। সেই থেকে টিপরারা বন বিভাগের গোলাম হিসাবে (টিপরাদের ভাষায়) রয়েছে।

মনিপুরি সম্প্রদায়

চুনারুঘাট উপজেলার আসামপাড়া এলাকায় মনিপুরিদের বসবাস। এরা মঙ্গোলিয়ান মহাজাতির অর্ন্তভুক্ত। এদেশে প্রায় ৪০ হাজার মনিপুরি রয়েছে। তাদের মূল জীবিকা কৃষিকাজ হলেও কালের পরিক্রমায় নানাবিধ কারণে অনেকেই পাহাড় ও অরণ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য পেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এদের মধ্যে তৈরি হয়েছে জাতিসত্তার সংকট। মনিপুরিদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও কোনো বর্ণমালা নেই। জাতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তারা তিন ভাগে বিভক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ এবং মৈতৈ পাঙ্গান। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব রাস আর মৈতৈ পাঙ্গানরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

মনিপুরী নৃত্য

www.pathagar.com

উপজাতি

খাসিয়া : চুনারুঘাট উপজেলার বৈরাগী পুঞ্জিতে খাসিয়া উপজাতির বাস রয়েছে। সাটিয়াজুরী ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি অরণ্যে খাসিয়ারা পান, সুপারী, আনারস, লেবু সহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চাষ করে থাকে।

অন্যান্য জনবসতি

১৮৫৪ সালে মালনিছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে চা বাগানের পত্তন হয়। ৫৪টি চা বাগানের জন্য ভারতের নাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে ইংরেজরা নিয়ে আসে পৃথক জাতিসত্তার মানুষ, এখন তাদের পরিচয় শুধুই চা শ্রমিক। হবিগঞ্জ জেলার ২৫টি চা বাগানে যে সকল পৃথক জাতিসত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়– বাউরি, বাকতি, রিকমুন, সাঁওতাল, মাহাটী, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাধরী, আসামি ইত্যাদি। বাগানে ঝরনা ও ছড়াগুলোই একমাত্র পানির উৎস। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে শুষ্ক মৌসুমে এগুলো শুকিয়ে যায়।

চা শ্রমিক

এছাড়া গ্রামে মুসলমান-হিন্দু তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, গণক, মুচি ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, চৌধুরী, খান, খাঁ, মিয়া, বিশ্বাস, ঠাকুর, হাসান ইত্যাদি উপাধী ও বংশীয় লোক রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে ভট্টাচার্য, চ্যাটার্জী, মহারত্ন, বিশ্বাস, চৌধুরী, ঠাকুর, আচার্য, পাণ্ডে, ঘোষ, সেন, দাস, মিত্র, সিংহ, দেব, রায়, সূত্রধর, বণিক, নন্দী, দত্ত, হোম, কর, ধর, চন্দ, নমশুদ্র ইত্যাদি বংশীয় লোক। উপাধীপ্রাপ্ত উভয় সম্প্রদায়ের লোকরা ভিন্ন ভিন্ন পেশা থেকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন। গোষ্ঠী বা বংশীয়দের জন্য আলাদা পাড়া বা মহল্লা রয়েছে।

ঘ. নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর

নদ-নদী : হবিগঞ্জে ছোট-বড় অনেক নদী রয়েছে– খোয়াই, সুতাং, করাঙ্গি, জিংরি, কুশিয়ারা, শাখাবরাক, বিবিয়ানা, রত্না, শ্যনালী, কালনী ইত্যাদি।

'খোয়াই' নদী হবিগঞ্জ শহরের বুক চিরে বয়ে চলেছে। খরস্রোতা খোয়াই নদী ত্রিপুরা পাহাড়ে উৎপত্তি হয়ে আসামের কিনারা ছুঁয়ে চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা নামক স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাল্লা সীমান্তে নদীর এপাড় বাংলাদেশ, ওপাড় ভারত।

www.pathagar.com

বাল্লা থেকে হবিগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় সত্তর কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে খোয়াই নদী ভাটিতে মাদনা নামক স্থানে শাখা বরাক নদীর সঙ্গে এক হয়ে কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হবিগঞ্জ শহরের গা ঘেঁষে যাওয়া এই খোয়াই নদী 'হবিগঞ্জের দুঃখ' হিসাবে চিহ্নিত ছিল। নদীর জন্য হবিগঞ্জ শহর সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৮ সালে 'মাছুলিয়া-রামপুর প্রকল্প'-এর অধীন স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে শহরবাসীর দুঃখ ঘোচানো হলেও নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়। ফলে উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে সহজেই বন্যা দেখা দেয়। এতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খোয়াইর বন্যা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলে ফসল উৎপাদন বাড়বে।

ভাটি অঞ্চলে রয়েছে অনেক নদ-নদী-কুশিয়ারা, ভেরা মোহনা, মরা নদী, লোহাজোড়া নদী, উদালিয়া নদী, নলাই নদী, কালনী নদীসহ প্রায় ৪০টি খাল-বিল। এ অঞ্চলের বড় বড় মাছের প্রচুর চাহিদা ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে।

হাওর-বিল : হবিগঞ্জের হাওর অঞ্চলে ছোট বড় অনেক হাওর-বিল রয়েছে। তন্মধ্যে হাইল হাওর, ঘুঙ্গিয়াজুরী হাওর, মেদির হাওর প্রভৃতি হাওর উল্লেখযোগ্য।

বানিয়াচঙের চতুর্দিকে রয়েছে অনেক হাওর, বিল-ঝিল ও নদ-নদী হাওরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে কুশিয়ারা, নলাই, শুটকি, রত্না, ভেরামোহনা, শাখা বরাক, ঝিংরি, কাটারি নদী। এসব নদী, বিল, ডোবা থেকে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। রত্না, খোয়াই ও কোরাঙ্গী নদী কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিশেছে। কালনী কুশিয়ারা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে আজমিরী গঞ্জের কাকাইলছেউয়ের কাছে বছিরা নদী নাম ধারণ করে। বানিয়াচঙের ছিনাই ও ইয়ারা ভেরামুহনা নাম ধারণ করে মিশেছে রত্না নদীর সঙ্গে। শাখা কুশিয়ারা থেকে শুটকি নদী বানিয়াচং উত্তরের হাওরে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে রত্না নদীতে পড়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে শুটকি নদী রত্না নদীর সঙ্গে মিলেছে। শাখা কুশিয়ারা নবীগঞ্জ-শেরপুরের কাছ থেকে বানিয়াচং উত্তরের হাওর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আজমিরীগঞ্জের কাছে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে মিলিত হয়েছে। ঝিংরি রত্না নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে বাণিয়াং মন্দরি হয়ে বানিয়াচং প্রবেশ করে আজমিরীগঞ্জ নোয়াগরের কাছে শাখা কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়েছে। শাখা বরাক শাখা কুশিয়ারা হতে উৎপত্তি হয়ে বানিয়াচং পূর্ব হাওর দিয়ে শুটকি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ঐ সমস্ত নদী ও বিলসমূহ জমিদারের অধীনে ছিল এবং সন সন বন্দোবস্ত দিয়ে প্রচুর খাজনা আদায় করা হতো। জীবনযাপন করত বানিয়াঙের হাওর ও নদ-নদীতে ১৭৬ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত, বর্তমানে ৩২ প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্ত। ১৯৫৬ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে এ সব জলমহাল সরকারের অধীনে চলে যায়।

বানিয়াচং উপজেলায় ৭টি নদী রয়েছে। নদী ও নদীর শাখা-প্রশাখাও রয়েছে। উপজেলার মধ্য দিয়ে শুটকী নদী প্রবাহিত হয়ে বলাকীপুরের কাছে গিয়ে রত্না নাম ধারণ করে। ঐ নদীর শাখা হবিগঞ্জের খোয়াই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পুকুর : ৩ হাজার ৫শ ২০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০০টি পুকুর সরকারিভাবে প্রতি ৩ বছর পর পর ইজারা দেওয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ পুকুরই ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে পুনঃখনন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

গ্রামে দিঘি রয়েছে প্রায় ১১টি। সাগর দিঘি বা কমলা রাণীর দিঘি, যাত্রা দিঘি, দেওয়ান দিঘি, ঠাকুরানীর দিঘি, মজলিসপুরের দিঘি, জামালপুরের দিঘি, কেশবপুরের দিঘি, কামালখানীর দিঘিতে বর্তমানে মাছ চাষ করা হচ্ছে। অধিকাংশ দিঘি নিয়ে লোককাহিনি রয়েছে।

ঙ. বনভূমি ও গাছপালা

হবিগঞ্জ জেলার বনভূমির বিবরণ দিতে হলে মূল পাহাড় সম্পর্কে বলতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের সিলেট জেলা প্রশাসন সূত্রে ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তথ্য মতে : সিলেট অঞ্চলে পাহাড়ের সংখ্যা ১০। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো রঘুনন্দন পাহাড়। এটি প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ। গড় উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফিট। এটি ছোট ও মাঝারি আকৃতির বিস্তৃত টিলা। গাছপালা এবং জঙ্গলে পূর্ণ। এই রঘুনন্দন পাহাড়ের অবস্থান চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলার বিরাট অংশ জুড়ে। হাল আমলে চা এবং রাবার চাষের বিস্তার ঘটায় দেশের অন্যান্য বনভূমি বা পাহাড় এলাকার মতো রঘুনন্দনের সর্বত্র গড়ে উঠেছে চা ও রাবার বাগান। ফলে রঘুনন্দন তার নিজ নামে যতটা পরিচিত, তার চেয়েও বেশি লোকে জানে তার বিভিন্ন অংশের বাগানের নামে যেমন

বাগানের নাম	উপজেলাগত অবস্থান
আমু বাগান	চুনারুঘাট
চাঁনপুর বাগান	চুনারুঘাট
নালুয়া বাগান	চুনারুঘাট
লস্করপুর বাগান	চুনারুঘাট
চণ্ডীছড়া বাগান	চুনারুঘাট
চাকলাপুঞ্জি বাগান	চুনারুঘাট
রেমা বাগান	চুনারুঘাট
শ্রীবাড়ি বাগান	চুনারুঘাট
পারকুল বাগান	চুনারুঘাট
দারাগাঁও বাগান	চুনারুঘাট
লালচান বাগান	চুনারুঘাট
দেউন্দি বাগান	চুনারুঘাট
তেলিয়াপাড়া বাগান	মাধবপুর
সুরমা বাগান	মাধবপুর
নোয়াপাড়া বাগান	মাধবপুর
জগদীশপুর বাগান	মাধবপুর
বৈকুণ্ঠপুর বাগান	মাধবপুর

www.pathagar.com

রঘুনন্দন ছাড়াও সাতগাঁও পাহাড়ের কিছু অংশ রয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়। যার অবস্থান বাহুবল ও নবীগঞ্জ উপজেলায়। সাতগাঁও পাহাড়টি বিশগাও পাহাড় নামেও পরিচিত। রঘুনন্দন থেকে সাতগাঁওয়ের দূরত্ব ১৬ মাইল। এই পাহাড় উত্তর দক্ষিণে ৩৬ মাইল লম্বা। গড় উচ্চতা ৬০০ ফিট। এই পাহাড় নানা জাতীয় গাছপালা, জঙ্গল আর টিলায় পূর্ণ। সাতগাঁও পাহাড়ের বিরাট অংশ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত। হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এই পাহাড়ে বাগানসমূহের নাম :

বাগানের নাম	উপজেলাগত অবস্থান
ইমাম বাগান	নবীগঞ্জ
বাওয়ানী বাগান	নবীগঞ্জ
রশিদপুর বাগান	বাহুবল
মধুপুর বাগান	বাহুবল
বৃন্দাবন বাগান	বাহুবল

হবিগঞ্জ জেলার আওতাধীন বাগানসমূহে চা ও রাবার চাষ হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নানা জাতীয় কাঠের গাছ। বাগানসমূহের কোনো কোনো অংশে আনারস ও লেবু চাষ হয়। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ ছন, বাঁশ ইত্যাদি। পাহাড়ি ঝরনা ও নালা থেকে আহরিত হয় বিস্তর বালু ও সিলিকা। বালু ব্যবহৃত হয় নির্মাণকাজে আর সিলিকা ব্যবহৃত হয় কাচ তৈরির কাজে। হবিগঞ্জের বাগানসমূহে উৎপাদিত কাঠের মধ্যে নরম অনুন্নত কাঠ এবং বাঁশ সরবরাহ হয় কাগজ ও ম্যাচের কারখানায়। বন বিভাগের তথ্যমতে, হবিগঞ্জ জেলার বনভূমির পরিমাণ ৩২,৭৭,৬৯৭ একর। সর্বাধিক বনভূমি রয়েছে নবীগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলায়। বনবিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত বনভূমির পরিমাণ ৪,৫৮,৮৯৭ একর। জেলার সমস্ত বনভূমি মোট চার রেঞ্জে বিভক্ত :

রেঞ্জের নাম	বনভূমির পরিমাণ
১. হবিগঞ্জ রেঞ্চ-১ (শায়েস্তাগঞ্জ)	২৪০০ একর
২. হবিগঞ্জ রেঞ্চ-২ (কালেঙ্গা)	১৪৮৭৫ একর
৩. রঘুনন্দন রেঞ্চ	৭১৬০ একর
৪. সাতছড়ি রেঞ্চ	৩৭৫৩ একর

আইন ই আকবরীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, মুঘল আমলে এ অঞ্চল থেকে কাঠ সরবরাহ হতো হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে। সুদূর অতীত থেকেই সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো হবিগঞ্জ কাঠ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। হবিগঞ্জের বনভূমি ছাড়াও বিস্তৃর্ণ গ্রাম অঞ্চলে রয়েছে নানা জাতীয় গাছ যেমন আম, জাম, চাম, রাতা, পোংতা, শিমুল, জারুল, কদম, কাওয়াটুটি, সুন্ধি, গনাক, কাঁঠাল, গাম্বারী, শাল, সেগুন, শিরিশ, শিশু, নাগেশ্বর ইত্যাদি। এছাড়া হবিগঞ্জের সর্বত্র রয়েছে ফলদ, ঔষধি ও তৃণ জাতীয় গাছপালা। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সুতাং এলাকায় প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হয়। সুতাং নদীর তীরবর্তী সুতাং বাজার বাঁশ ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

www.pathagar.com

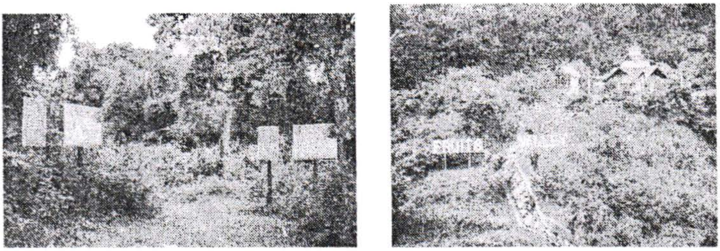

হবিগঞ্জ জেলার বনভূমি ও গাছপালা : পরিশিষ্ট

বনভূমির নানা প্রাণী : হবিগঞ্জ জেলার বনভূমির মধ্যে রঘুনন্দন পাহাড়ে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বন বিড়াল, খরগোশ, উল্লুক, লজ্জাবতী বানর, চিতাবাঘ, কাঠবিড়ালি, বিভিন্ন প্রজাতির বনমোরগসহ ময়না, টিয়া, শালিক ইত্যাদি। এছাড়া বাহুবল উপজেলাধীন বনভূমিতেও অনুরূপ নানা পশুপাখির আনাগোনা রয়েছে।

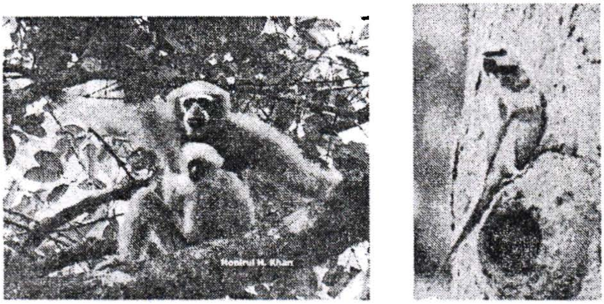

সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণী

অভয়ারণ্য : রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী চুনারুঘাট উপজেলায় অবস্থিত। রেমা চা বাগানের ছনবাড়ি এবং কালেঙ্গা ফরেস্ট বিটের সমন্বয়ে সংরক্ষিত বনের ১৭৯৫ হেক্টর বনভূমি ১৯৮১ সালে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বন্যপ্রাণী শিকার নিষিদ্ধ এই স্থানটিতে ৭ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১৮ প্রজাতির সরীসৃপ (সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি), ১৬৭টি প্রজাতির পাখি (ভিমরাজ, টিয়া, ময়না, ধনেশ, বনমোরগ, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি ইত্যাদি), ৭টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী (বানর, হনুমান, মুখপোড়া হনুমান, হরিণ, মেছো বাঘ, মেছো বিড়াল, বন কুকুর, কালো ও সাদা বন্য শুকর ইত্যাদি) রয়েছে। এছাড়া প্রায় ৭০০ প্রজাতির গাছপালা-তরুলতা ঘেরা জায়গাটি দৃষ্টিনন্দন।

রাবার চাষ : ১৯৭৮ সালে প্রথম হবিগঞ্জের রাবার উৎপাদন শুরু হয়। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার ১৯৭৮ সালে হবিগঞ্জের শাহজিবাজারে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। তবে ১৯৯০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাবার উৎপাদন শুরু হয়।

www.pathagar.com

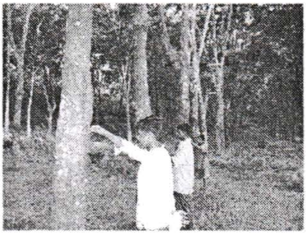

রাবার বাগান

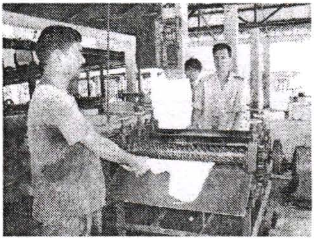

রাবার কারখানা

১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রূপাইছড়া রাবার বাগান'-এর রাবার চাষ প্রকল্পটি সিলেট বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রকল্প। বাংলাদেশ বনজশিল্প উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনাধীন এই প্রকল্পে প্রায় দুই হাজার একর ভূমিতে রাবার চাষ করা হচ্ছে। নিজস্ব ফ্যাক্টরির মাধ্যমে বছরে ৫৫০ টনেরও বেশি রাবার উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে।

চা বাগান : সারা দেশে চা বাগানের মোট সংখ্যা ১৫৩টি। এর মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় আছে ২২টি চা বাগান। এখানে প্রথম চা বাগান গড়ে উঠে ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। দেশে মোট উৎপাদিত চায়ের প্রায় ২৫ ভাগ সরবরাহ হয় হবিগঞ্জের বিভিন্ন চা বাগান থেকে। হবিগঞ্জ জেলার ২২টি চা বাগানের মধ্যে চুনারুঘাট উপজেলায় ১৩টি, মাধবপুর উপজেলায় ৫টি, বাহুবল উপজেলায় ৪টি চা বাগান অবস্থিত। বাগানগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ১,২৩,২২,২৬২ কেজি চা পাতা। চা রপ্তানি থেকে আমাদের দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হয়। পাহাড়ের টিলা ও উঁচু স্থানগুলোতে চায়ের গাছ রয়েছে। এ সমস্ত চা বাগানে অনেক শ্রমিক কাজ করে। চা বাগান এলাকাতেই তাঁদের বসবাস। আদিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এসব চা শ্রমিক সনাতন ধর্মের অনুসারী।

চুনারুঘাটের চা বাগান

বাহুবল উপজেলায় ফয়জাবাদ চা বাগান, বৃন্দাবন চা বাগান, মধুপুর চা বাগান ও রশিদপুর চা বাগান রয়েছে। এছাড়া তিনটি ফাঁড়ি বাগান রয়েছে। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত চা দেশের চাহিদা মেটাতে ও রপ্তানিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মাধবপুর উপজেলার পূর্বপ্রান্তে ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে ৫টি চা বাগান। এগুলো হলো: ১. বৈকুণ্ঠপুর, ২. জগদীশপুর, ৩. নোয়াপাড়া, ৪. সুরমা, ৫.

www.pathagar.com

তেলিয়াপাড়া। এসব বাগানের নিজস্ব কারখানায় উন্নতমানের চা উৎপাদন হয়। এই চা দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে।

চুনারুঘাটে রয়েছে–১. আমু চা বাগান, ২. নলুয়া চা বাগান, ৩. চাকলাপুঞ্জি চা বাগান, ৪. চন্ডিছড়া চা বাগান, ৫. চানপুর চা বাগান, ৬. রেমা চা বাগান, ৭. দারাড়াও চা বাগান, ৮. শ্রী বাড়ি চা বাগান ৯. দেউন্দি চা বাগান, ১০. লস্করপুর চা বাগান, ১১. সাতছড়ি চা বাগান, ১২. পারকুল চা বাগান ও ১৩. লালপুর চা বাগান।

এছাড়াও পাঁচটি ফাঁড়ি বাগান রয়েছে। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত এই চা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এ জেলায় মহাবিদ্যালয় রয়েছে ১৭টি (সরকারি ৩টি, বেসরকারি ১৪টি), ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও কলেজ ১টি, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১টি, পিটিআই ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০৫টি (সরকারি ৬টি), নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৪২টি (সরকারি ৭৩২টি), মাদ্রাসা ৫২টি (এবতেদায়ি ৯২০টি, কওমী ৫২টি)।

হবিগঞ্জ সদর : মহাবিদ্যালয় ৪টি– বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ ও কবির কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৩টি (সরকারি ২টি), প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪২টি (সরকারি ৯৩টি), মাদ্রাসা ৬টি।

নবীগঞ্জ : মহাবিদ্যালয় ২টি– নবীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ ও ইনাতগঞ্জ কলেজ। মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮২টি (সরকারি ১৪৮টি), মাদ্রাসা ১২টি।

বানিয়াচং : মহাবিদ্যালয় ৩টি– সৈয়দ সঈদ উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, শাহজালাল কলেজ, মনতলা ও ধর্মঘর কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২টি (সরকারি ১টি), প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪২টি (সরকারি ৯৭টি), মাদ্রাসা ৫টি।

বাহুবল : মহাবিদ্যালয় ২টি–আলিফ সোবহান চৌধুরী মহাবিদ্যালয় ও বাহুবল কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৩টি (সরকারি ৭৫টি), মাদ্রাসা ৬টি।

মাধবপুর : মহাবিদ্যালয় ৩টি– জনাব আলী ডিগ্রি কলেজ, শচীন্দ্র কলেজ ও সুফিয়া মতিন মহিলা কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮টি (সরকারি ২টি), প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬০টি (সরকারি ১১৪টি), মাদ্রাসা ৪টি।

চুনারুঘাট : মহাবিদ্যালয় ১টি– চুনারুঘাট সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯টি (সরকারি ১টি)। ১৮৬৭ সালে চুনারুঘাট উপজেলায় স্থাপিত হয় এই জেলার প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজারবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৮টি (সরকারি ১১০টি), মাদ্রাসা ১৭টি।

www.pathagar.com

আজমিরীগঞ্জ : মহাবিদ্যালয় ১টি– আজমিরীগঞ্জ কলেজ। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩টি (সরকারি ৪৪টি), মাদ্রাসা ১টি।

লাখাই : মহাবিদ্যালয় ১টি– মুক্তিযোদ্ধা কলেজ। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭১টি (সরকারি ৫১টি), মাদ্রাসা ৪টি।

হবিগঞ্জ পৌর পাঠাগার : ১৯৫৫ সালে মাত্র ৭৪৯টি বই নিয়ে হবিগঞ্জ পৌর পাঠাগার যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে এই পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা বিশ হাজারের বেশি। হবিগঞ্জ পৌরসভা পরিচালিত এই পাঠাগারে অনেক পুরাতন, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বইয়ের সমাহার থাকায় জ্ঞানপিপাসুদের চাহিদা পূরণে এটি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলছে।

বৃন্দাবন কলেজ : হবিগঞ্জ উচ্চশিক্ষার প্রধান বিদ্যাপীঠ। বানিয়াচং উপজেলার বিথঙ্গল গ্রামের ব্যবসায়ী শ্রী বৃন্দাবন দাসের নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সনে বিদ্যোৎসাহী কয়েকজন ব্যক্তি রাজনগরে মনোহরগঞ্জ বাজারে (বর্তমান কলেজ কোয়ার্টার, তার আগে ধোপাপট্টি ছিল) হবিগঞ্জ কলেজ নামে একটি কলেজ চালু করেন। বাঁশের তৈরি একটি ও আধা পাকা টিনের একটি ঘরে কলেজের কাজ শুরু হয়। কলেজটির স্বীকৃতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য দশ হাজার রুপির তহবিল প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কলেজ পরিচালনা কমিটি এ অর্থ সংগ্রহে প্রাণপন চেষ্টা চালান। অবশেষে বৃন্দাবন দাস তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেন। দশ হাজার রুপি দান করেন। কলেজটি এই দানশীল ব্যক্তি বৃন্দাবন দাসের নামে ১৯৩১ সাল থেকে 'বৃন্দাবন কলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এটি সরকারি বৃন্দাবন কলেজ। এতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স চালু হয়েছে।

ঐতিহাসিন স্থাপনা, নিদর্শন ও স্থান

লস্করপুর : ত্রিপুরা রাজের অধীন থেকে তরপ রাজ্য মুক্ত হয়ে লস্করপুরে তরপ রাজ্যের রাজধানী গঠিত হয়েছিল। কোর্ট-কাচারির কাজ এখানেই শুরু হয়েছিল।

শংকরপাশা মসজিদ : পুরাতন স্থাপত্যের মধ্যে উচাইল-শংকরপাশা মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার পালন করছেন। ঐতিহাসিক শংকরপাশা শাহী মসজিদটি রাজিউড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত উচাইল গ্রামে অবস্থিত। সুলতানি আমলের তৈরি মসজিদগুলোর মধ্যে মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত প্রাচীন একটি নিদর্শন। সম্পূর্ণ মসজিদটিরই ভেতর-বাহির অলংকরণে পূর্ণ। পিলারগুলোতে পাতা-লতা-ফুল আর পাপড়ির নকশা আঁকা। মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও দেয়ালের কারুকার্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বহন করে আছে। শুধু তাই নয়, বরং বাংলায় মুসলিম শাসনকালের নিদর্শনস্বরূপ সুলতানি আমলে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনও মসজিদটি বহন করে আসছে। মসজিদের পুষ্পময় অলংকরণ বিন্যাসে মন মুগ্ধ হয়।

www.pathagar.com

বানিয়াচং উপজেলায় অনেক প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। মসজিদগুলোর স্থাপত্য শতাধিক বছরের স্মৃতি বহন করে চলছে। বানিয়াচং গ্রামে প্রায় ২৫টি প্রাচীন পাকা মসজিদ রয়েছে। সেগুলো মধ্যে পুরান কালিকাপাড়া, পুরানবাগ ও বিবির দরগা মসজিদ সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭) রাজত্বকালে নির্মিত। মোগল স্থাপত্য কাঠামোর মসজিদগুলোতে তাই গঠনশৈলী ও অলংকরণে অনেক দুর্লভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মসজিদ ও মন্দির

উপজেলায় মুসলমানদের ধর্মীয় এবাদতখানা বা মসজিদ রয়েছে ২৩০টি, হিন্দুদের মন্দির রয়েছে ৭০টি, বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের আখড়া রয়েছে ১৩টি। সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে কালিকাপাড়া, পুরানবাগ, রাজবাড়ি, মিয়াখানি, শেখেরবাড়ি, চানপাড়া, বিবিরদরগা, তিন নম্বর রাজবাড়ি, পারুশেখের, সুজাত আলীখানের মসজিদ মোঘল যুগে ও তৎপরবর্তী সময়ে নির্মিত। ত্রি গম্বুজ বিশিষ্ট এসব মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ। প্রাচীন মসজিদগুলোর ইতিহাস নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জয়ন্ত সিংহ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এসব মসজিদের রয়েছে আলাদা আলাদা শিলালিপি। পাক মুঘল যুগের ইষ্টক নির্মিত ইমারতগুলো ছিল ভারী ধরনের। এগুলো অপ্রলিপ্ত বহির্গাত্র ছিল পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত; ছাদ ও কার্নিশ ছিল গ্রামীণ কুটিরের খড়ের চালের অনুকরণে বক্রাকৃতি; খিলানগুলো ছিল সূক্ষ্মাগ্র ও গম্বুজগুলো অনুচ্চ স্কন্ধযুক্ত অর্ধগোলাকৃতির (হাসান ১৯৯৩:৬১৫)। অল্প কয়েক বছর ছাড়া পুরো সতের শতকব্যাপী ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী থাকাকালে এখানে একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক মুঘল স্থাপত্য রীতি বিকাশ লাভ করে। মসজিদের দেয়ালগাত্রের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগে অন্তরের ব্যবহার; অষ্টকোণী পিপার ওপর কলস ফিনিয়েল সহযোগে নির্মিত গম্বুজ; চতুর্কেন্দ্রিক খিলান; দুই পার্শে অষ্টকোণী বুরুজসহযোগে সম্মুখভাগে অভিক্ষিপ্ত কেন্দ্রীয় প্রবেশদার; অষ্টকোণী পার্শ্ববুরুজ যা ছাদের উচ্চতা ছেড়ে কিছুটা ওপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর শীর্ষে স্থাপিত হয়েছে কলস ফিনিয়েল সম্বলিত নিরেট ছাত্রি; গম্বুজের অষ্টকোণী পিপা এবং অনুভূমিক ছাদ পাঁচিল বা রেলিংয়ে পত্রাকৃত নকশার অলঙ্করণ প্রভৃতিতে মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আলোচ্য মসজিদসমূহ বানিয়াচঙের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি বিস্তারের সাক্ষ্য দেয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় অনেক মন্দির বর্তমানে পরিচর্যা ও মেরামতের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সামাজিকভাবে কালীবাড়ি, শ্যাম বাউলের আখড়া, শিববাড়ি, বুড়াশিব বাড়ি, রামকৃষ্ণ মিশন, নগর আখড়া, বিথলঙ্গের আখড়াতে অধিকাংশ পূজাপার্বণ পালন করা হয়ে থাকে। হিন্দুদের জন্য কালীবাড়ি শ্রেষ্ঠ ভজনালয় দেবীর অর্চণায় বহুলোকের সমাগম হয়ে থাকে। পূজা পার্বণে বলি দেওয়া হয়। বাৎসরিক বারনি উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়। কালীবাড়ির ব্যয় নির্বাহে বহু সম্পত্তি দেবোত্তর নামে দানকৃত ছিল (বানিয়াচং দর্পণ)। বিথলঙ্গের আখড়াটি আনুমানিক ৪৫০ বছর আগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোসাই নির্মাণ করেছিলেন। এটা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান। প্রতি বছর মেলা গঙ্গাঁ স্নানরত যাত্রাসহ

www.pathagar.com

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জানা যায়, এই আখড়ায় স্থাপত্যশিল্প কারুকাজে খচিত। একশ বিশটি কোঠায় বা কক্ষে একশ বিশজন বৈষ্ণব একসঙ্গে বসবাস করতেন। তাদের স্নানের জন্য একশ বিশ হাত লম্বা একটি পুকুর ঘাটও নির্মাণ করা হয়। শ্যাম বাউলের আখড়াটি যাত্রাপাশার দক্ষিণে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভক্ত শ্যাম বাউল সন্ন্যাসী তার গুরুর নির্দেশে নির্মাণ করে তাঁর মতাদর্শে ধর্ম পালনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন বলে কথিত আছে। এছাড়াও উপজেলায় সুউচ্চ অনেক শ্মশান, মন্দির পুরাকীর্তি এখনও আছে। তবে ইতিমধ্যে অনেক শ্মশান, মন্দির বিলুপ্ত হয়েছে।

নিদর্শন

কামান : প্রাচীনকালে বানিয়াচঙে খনন কাজের সময় ম্যাটির নিচে পাওয়া যায় একটি যুদ্ধাস্ত্র কামান। এই কামানটি বর্তমানে সিলেট পুলিশ লাইনের প্রবেশদ্বারে রক্ষিত আছে। জানা যায়, মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খানের নেতৃত্বে বানিয়াচং মুগল শাসনাধীনে আসে। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা হাওর-নদী-খাল-বিল বেষ্টিত এই বানিয়াচঙে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। বানিয়াচঙের শাসক ও সমরকুশলী বীরযোদ্ধা হোসেন খাঁ কৌশলে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্রসহ সৈন্যদের বন্দি করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারনা, ঐ সময় কামানটি নৌকাসহ বিলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। যা পরবর্তীকালে মাটি খননকালে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন কামানটি বানিয়াচং থানায় রাখা ছিল। জেলা শহর সিলেটে স্থানান্তরিত হয়। কামানটি প্রাচীন বানিয়াচং রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি স্মারক।

প্রসিদ্ধ স্থান

সুলতানশী : 'নবীবংশ' প্রণেতা মধ্যযুগের মহাকবি সৈয়দ সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সুলতানশী। এ বংশেরই সৈয়দ হাবিবুল্লাহ খোয়াই নদীর তীরে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত বাজারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আজকের হবিগঞ্জ শহর।

শায়েস্তাগঞ্জ : শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে জংশনটি হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত। এই জংশনকে ঘিরেই এই স্থানটি শায়েস্তাগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত। শায়েস্তাগঞ্জকে ঘিরে চারমুখী রেললাইন রয়েছে শায়েস্তাগঞ্জ-ঢাকা, শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট, শায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা ও শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ।

চন্দ্রছড়ি : মিরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চন্দ্রছড়ি মুসলিম ঐতিহ্য সম্বলিত প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে অলৌকিক শক্তির অধিকারী সূফী দরবেশ সৈয়দ শাহ অছিউল্লাহ ওরফে শাহ ডুমন চিশ্তি (রহ.) এর মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ১০ পৌষ তারিখে অগণিত ভক্তের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে চন্দ্রছড়ি গ্রাম।

সচী অঙ্গন : বাহুবলের অন্তর্গত মিরপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয় ছিল। শ্রীচৈতন্যের মাতামহ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি আজো সেখানে

www.pathagar.com

বিদ্যমান। ঐ বাড়িতে সচী অঙ্গন নামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে। এখানে মাঘী সপ্তমীতে আয়োজিত উৎসবে বহু ভক্তের আগমন হয়।

সৈয়দ শাহ নূরের মাজার : গোপলার বাজারের জালালহাফ গ্রামে মরমি সাধক কবি সৈয়দ শাহ নূরের মাজার রয়েছে। সৈয়দ শাহ নূর একজন উচ্চ মার্গের কামেল দরবেশ ছিলেন। তাঁর বহু কেরামতির কথা লোকমুখে এখনও প্রচলিত আছে। তিনি স্বভাবকবিও ছিলেন। তিনি বহু মরমি গান রচনা করে গেছেন। এগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। ১৭৩০ সালে জন্ম নেওয়া এই দরবেশ ১৮৫৬ সালে ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁর সিলেটী নাগরী হরফে লেখা নূর নসিয়ত, রাগে নূর, সাত কন্যার বাখান– এসব গ্রন্থ আজ দুস্প্রাপ্য।

সাগরদিঘি : ঐতিহাসিক দিঘিটি নিয়ে কিংবদন্তি আছে। কমলা রাণীর দিঘি বলে কথিত। ৬৪ একর জমি নিয়ে দিঘি খনন করেন রাজা পদ্মনাভ। দিঘিটি পর্যটকদের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

বিথঙ্গল আখড়া : বিথঙ্গল আখড়া বানিয়াচং উপজেলার বিথঙ্গল গ্রামে অবস্থিত। প্রাচীন এ আখড়াটি জগন্মোহিনী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ অঞ্চলের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। এই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামী সতেরো শতকের দিকে আখড়াটি প্রতিষ্ঠা করেন। সিলেটের আখড়াগুলোর মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়াটি সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় পরিসরে এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মিত আখড়াটিতে ১২০টি কক্ষ রয়েছে। মন্দিরটির প্রাচীন ইমারতের ভেতরে ও বাইরে অনেক দর্শনীয় বস্তু ছিল। আজ সেগুলো নেই। তবে পঁচিশ মণ ওজনের শ্বেত মর্মরের মঞ্চ, পিতলের সিংহাসন এবং রূপার তৈরি রথ, পাখি ও মুকুট রয়েছে।

শাহ সোলায়মান ফতেহগাজী বোগদাদী (রহ) **:** আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ) এর অন্যতম সাথি তরপ রাজ্য বিজয়ে অংশগ্রহণকারী বারো আউলিয়ার অন্যতম শাহ সোলায়মান ফতেহ গাজী বোগদাদী (রহ) এর মাজার এ উপজেলার শাহজিবাজারেই অবস্থিত। অগণিত ভক্তবৃন্দ আউলিয়ার রূহানী ফয়েজ লাভের আশায় মাজার জিয়ারতে আসেন। পুণ্যস্থান হিসেবে এ স্থানটি অত্যন্ত সমাদৃত।

সৈয়দ নাসির উদ্দিন (রা) মাজার : হযরত শাহজালাল (রহ) এর অন্যতম সাথি যিনি সিলেট বিজয়ে প্রধান পালন করেন। ইতিহাসখ্যাত সেই সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন (রহ)-এর পশ্চিম-পূর্বমুখী মাজারটি চুনারুঘাটের মুড়ারবন্দে অবস্থিত। সারি সারি জামগাছের সুশীতল ছায়ায় 'কুতুবুল আউলিয়া' খ্যাত সৈয়দ শাহ ইলিয়াছ কুদ্দুস 'মুলক উল উলামা' খেতাবপ্রাপ্ত বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক সৈয়দ শাহ ইস্রাইলসহ ১২০জন কামেল ওলির মাজার এখানে থাকায় মুড়ারবন্দ দরগার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। ধর্মপ্রাণ মানুষ পরম শ্রদ্ধা ভরে এ স্থান পরিদর্শন ও জিয়ারত করে থাকেন।

এই উপজেলায় জন্মগ্রহণকারী অপর দুই আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীমৎ শান্তদাসজী (তারাকিশোর চৌধুরী) ও ঠাকুর দয়ানন্দ। বামৈ গ্রামের অধিবাসী শ্রীমন্ত দাস সংসার শ্রমে তাঁর নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। তিনি এমএ, বিএল। কলকাতা হাই কোর্টের

www.pathagar.com

অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি এক সময় কলকাতা আদালতের জজ হন। একটি বিচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সেই থেকে তিনি শান্তদাসজী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ঠাকুর দয়ানন্দের প্রকৃত নাম গুরুসদয় চৌধুরী। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারিতে বামৈ ইউনিয়নের কাটিহারা গ্রামে অমৃত মন্দির আশ্রমটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। চার শতক জমি নিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর দয়ানন্দের আশ্রমটি উপজেলা সদর থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আসামের শিলচর শহরের নিকটবর্তী অরুণাচল আশ্রমটিও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'বিশ্বে সুহৃদয় শান্তি স্থাপন'-এর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতি বছর আশ্রমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বিপুল ভক্তবৃন্দের সমাগম ঘটে। [উপজেলা প্রোফাইল : লাখাই, ০৬]

সূত্র : আমার হবিগঞ্জ, তরফদার মুহাম্মদ ইসমাঈল পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত)।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জেলা হবিগঞ্জ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে খনিজ সম্পদ গ্যাস হবিগঞ্জের মাটির নিচে রয়েছে সে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল মজুদ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র 'বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড' এ জেলায় অবস্থিত। এছাড়া রশীদপুর গ্যাস ফিল্ড ও হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড নামে আরো দুটি গ্যাস ফিল্ড এ জেলাতেই রয়েছে।

ভাদেশ্বর ইউনিয়নের রশিদপুর পাহাড়ি এলাকায় ১৯৪৬ সালে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে চারটি কূপ খনন করে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এই গ্যাসকেন্দ্রটির গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন পৃথকীকরণের জন্য একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবিয়ানা গ্যাস : দীঘলবাঁক ইউনিয়নের বিবিয়ানা নদীর পাড়ে বিয়িানা গ্যাস ফিল্ড অবস্থিত। ১৯৯৭ সালে এই গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। মার্কিন তৈল ও গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান 'অক্সিডেন্টাল' ৪০ একর ভূমির উপর ১৭টি কূপ খনন করে এখানে গ্যাস উত্তোলন কাজ শুরু করে। দৈনিক ২০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

শাহজিবাজার গ্যাস : রঘুনন্দন পাহাড়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ শাহজিবাজারে গ্যাস ফিল্ড ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। ১০টি কূপ খনন করে গ্যাসের সন্ধান চালিয়ে স্বল্প গভীরতায় যে একটি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। এই স্তর থেকে বর্তমানে গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে। সম্প্রতি হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান কমিটি 'বাপেক্সে'র অনুসন্ধানে ৩২ মিটার গভীরে নতুন দুটি কূপ আবিস্কৃত হয়েছে। হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে নতুন দুটি স্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী হবিগঞ্জ দেশের অনন্য একটি সম্পদশালী জেলা হিসেবে চিহ্নিত হলো। [সূত্র : প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর, ১ম পৃষ্ঠা]

www.pathagar.com

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশের তৃতীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এ জেলারই শাহজিবাজারে অবস্থিত। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা ১১০ মেগাওয়াট। জাতীয় গ্রিডে এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

এ উপজেলার রঘুনন্দন পাহাড় বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। নোয়াপাড়া, ছাতিয়াইন, শাহজিবাজার, সুরমা, তেলিয়াপাড়ায় রয়েছে উন্নতমানের সিলিকা বালুর প্রচুর মজুদ। নির্মাণকাজে, সাবান ও কাঁচ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে এই সিলিকা বালির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

বনজ সম্পদ : হবিগঞ্জ জেলার বনভূমির পরিমাণ ১১, ৬৪৪ হেক্টর। তার মধ্যে নবীগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ৯৪ হাজার একর বনভূমি রয়েছে। ফয়জাবাদ হিলস, পারকুল ফরেস্ট, তরফ হিলস, রশিদপুর হিলস, দিনারপুর হিলস, রঘুনন্দন হিলস, উচাইল হিলস ইত্যাদি নামে হিল রয়েছে। এতে নানান জাতের কাঠের গাছ রয়েছে। এসব বনভূমিতে উৎপন্ন সেগুন কাঠের মান খুবই উন্নত। নরম জাতের কাঠের গাছ ম্যাচ তৈরির কারখানা, বাঁশ ও কাগজ তৈরির শিল্প কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়। দেশের অর্থনীতিতে জোগান দেওয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ ও বনভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তাছাড়া, পাহাড় থেকে নেমে আসা ছড়াগুলোতে পাওয়া যায় ছড়ার বালি ও সিলিকা বালি যা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। যাবতীয় নির্মাণ কাজে ঐ ছড়ার বালি এবং কাঁচের কাঁচামাল হিসেবে সিলিকা বালি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ছ. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির ইস্পাত কঠিন একতা, তাদের সাহস আর দক্ষতার কারণে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে বাঙালি জাতির যে ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে তা কোনোদিন পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই পাকিস্তানিদের বিভিন্ন অন্যায়, অবিচার, বৈষম্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বানিয়াচঙেও প্রতিবাদ প্রতিরোধ মিছিল, মিটিং হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারিতে সারা দেশে যে হরতাল হয়েছিল সেখানে বানিয়াচং, এড়ালিয়া মাঠেও কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়। সেখানে প্রতিবাদ সভা করে, মিছিল নিয়ে থানা ও সার্কেল অফিস ঘেরাও করা হয়। তাদের প্রতিহত করার জন্য পাকবাহিনীর দোসরা সেদিন শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালানো ও বেত্রাঘাত করতে শুরু করে। এতে গুলি খেয়ে মারাত্মক আহত হন জয়নাল আবেদীন। তাকে আহত অবস্থায় সিলেটে নেওয়া হয়। শুরু হয় মিটিং, মিছিল, সভা ও সাংগঠনিক তৎপরতা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগে যোগদান করতে থাকেন। অন্যদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি থানা ও সার্কেল অফিস আক্রমণের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৯৬/৬৯ও ৯৭/৬৯ থানা আক্রমণ মামলায় যাঁদের নামে চার্জশীট দেওয়া হয়েছিল তারা হলেন– ১. হাফেজ সিদ্দিক আহমেদ, ২. হাফেজ

www.pathagar.com

আহমেদ আলী, ৩. হাজী আব্দুল ওয়াহেদ খান, ৪. সিদ্দিক হোসেন খান, ৫. প্রবোধ কুমার বিশ্বাস, ৬. মহিবুর রহমান, ৭. সুরাব উল্লা, ৮. মফিজ উল্লা, ৯. হাজী আবদুল লতীফ, ১০. তুরাব উল্লা, ১১. আলাউদ্দিন, ১২. কবির খান, ১৩. উমর আলী, ১৪. আবদুল কাদীর, ১৫. আঞ্জব আলী, ১৬. আবদুল গফুর বোছা, ১৭. খোরশেদ আলী, ১৮. আব্দুল আওয়াল, ১৯. মাতাব হোসেন, ২০. দরছ উল্লা, ২১. ঠান্ডু মিয়া, ২২. গেদা উল্লা, ২৩. আবদুল খালিক খান, ২৪. মনু উল্লা, ২৫. সালাম উল্লা প্রমুখ।

সার্কেল অফিস আক্রমণে যাঁদের নামে মামলা করা হয়েছিল তাঁরা হলেন হাফেজ আহমেদ আলী, হাফেজ সিদ্দিক আহমেদ, হাজী আবদুল ওয়াহেদ খান, সিদ্দিক হোসেন খান, প্রবোধ কুমার বিশ্বাস, মহিবুর রহমান, আজমল হোসেন খান টেনু, নাজমুল হোসেন খান লুকু, মনোরঞ্জন সরকার, আবদুল খালেক, হাজী আবদুল মালিক খান, আবদুল খালিক খান, জয়নাল আবেদীন, মরম আলী, আলী নেওয়াজ, আঞ্জব আলী, নিখিল রায়, আবদুল গফুর বোছা, আবদুল আলী, মাতাব হোসেন প্রমুখ।

রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার স্বার্থে ৬৯-এর ডিসেম্বর মাসে প্রবোধকুমার বিশ্বাস, রমেশ চন্দ্র পাণ্ডে, হাফেজ সিদ্দিক আহমেদ, আবদুস সালাম খান, গোলাম মওলা (ঠান্ডু মিয়া), তাহের মিয়া, মাজোম উল্লা, আমির হোসেন প্রমুখের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে প্রথমবারের মাতা গ্যানিগঞ্জ বাজারে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অবদান রেখেছিল তা সত্যিই প্রশংসানয়। কমিটির সদ্যসরা হচ্ছেন সভাপতি আবদুস সালাম খান, সহ সভাপতি তাজউদ্দিন চৌধুরী, সোলেমান সর্দার, হাতিম উল্লা, গোলাম মওলা ওরফে ঠান্ডু মিয়া, আলী আহমদ, সাধারণ সম্পাদক হাফেজ সিদ্দিক আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক রমেশ চন্দ্র পাণ্ডে, সহ সম্পাদক ইমরান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ডা. মনসুর চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক ষোড়শী শংকর ভট্টাচার্য, নুনু ভট, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রব, সদস্য মাজোম উল্লা, আছাব উদ্দিন খান, তৌফিক উদ্দিন খান, আবদুল লতিফ, রফিক উল্লা, মাহতাব হুসেন, হাশিম উল্লা। (সূত্র : মুক্তিযুদ্ধে বানিয়াচং, পৃ. ১১২)

'৭০ সালের নির্বাচনে বানিয়াচং থেকে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসেবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এম এ রব ও গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন জয়লাভ করেন। সারা দেশে আওয়ামী লীগের এ বিজয় দেখে পাকবাহিনী আঁতকে ওঠে। তারা বিভিন্ন কলা-কৌশলে নিরীহ বাঙালির ওপর নির্যাতন চালালে সারা দেশের মতো বানিয়াচঙেও চলতে থাকে আন্দোলন, সভা, মিছিল, মিটিং ও পিকেটিং এতে ছাত্রদের মধ্যে থেকে তখন যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন তাঁরা হলেন আমির হোসেন, আবদুল খালেক, আবদুল কাদির প্রমুখ। ১৯৭১ সালে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। অনেকেই তখন যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্বস্থানীয় অনেকেই অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বাচার জন্য গ্রামে গ্রামে লুকিয়ে দিনপার করেছেন। এসময় পাকসেনারা আওয়ামী লীগের সক্রিয়া কর্মীদের নামে নোটিশ পাঠিয়ে বন্দি করার তৎপরতা শুরু করে। কয়েকদিনের মধ্যে রাজাকারদের সহযোগিতায় ১১জনকে ধরে শ্রী মঙ্গল জেলে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন শুরু করে। সেই ১১জন হলেন আজিদ উল্লা, আহসান উল্লা, প্রবোধ কুমার বিশ্বাস, চান মিয়া, আবদুল মালেক, মাওলানা ইসমাইল হোসেন, মহিবুর রহমান,

www.pathagar.com

সামায়ুন রাজা, জহুর আলী, হাজী আব্দুল সাত্তার, মাজু উল্লা। শেখের মহল্লা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মওলানা ইসমাইল হোসেন, কমরেড আদম আলীর ছেলে জহুর আলী ও বাগের মহিবুর রহমানকে সেখানে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক মাস জেলে থাকার পর সৈয়দ কামরুল আহসানের (এম এন এ) সহায়তায় তাঁরা মুক্তি পান। একসময় পাকসেনারা হলদারপুর, কালানজুরা, কাগাপাশা, নজিরপুর, হারুনি সর্বশেষে মাকালকান্দি গ্রামে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে। পাকসেনারা লাইনে দাড় করিয়ে কোলের শিশু থেকে শুরু থেকে যুবক, যুবতী, আবাল বৃদ্ধসহ প্রায় ৮৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে বানিয়াচঙ

১৯৭১ সালে বানিয়াচঙ থানায় পাকসেনার সবচেয়ে বেশি বর্বরতা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা মাকালকান্দি গ্রামে। গ্রামের অসংখ্য নারী-পুরুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে। গ্রামটি বানিয়াচং সদর থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। গ্রামের চর্তুদিকে ফসলের মাঠ। বর্ষাকালে গ্রামকে দ্বীপের মতো মনে হয়। গ্রামের নামেই প্রায় ৫৫ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকা নিয়ে রয়েছে বিখ্যাত মাকালকান্দি হাওর। গ্রামে প্রাইমারি স্কুল থাকলেও হাইস্কুল এখনও নেই। ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, অ্যাডভোকেটসহ পেশার। গ্রামের শিক্ষার হার প্রায় ৩৫%।

দুর্গম হাওরের চারদিকে নদী বেষ্টিত গ্রামটি নিরাপদ আশ্রয় ভেবে একাত্তরে কেউ গ্রাম ছাড়েননি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল এ গ্রামে যেহেতু তৎকালীন এম.পি গোপাল কৃষ্ণ মহরত্নের পরিবারকে পাঠানো হয়েছে, সেহেতু তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বানিয়াচঙের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসেন মাকালকান্দি গ্রামে। পাকবাহিনির এ দেশীয় দোসররা গোপনে সভা করে মাকালকান্দি গ্রাম আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা তাজুল মোহাম্মদ এ সম্পর্কে লিখেছেন, '১৭ আগস্ট কাকডাকা ভোরে ৪০টি ছইআলা নৌকাযোগে রওয়ানা হয় পাকবাহিনীর মেজর দুররানি। পথে পুলিশ কর্মকর্তা জয়নাল আবেদিন ও ফজলুল হকসহ বেশ কয়েকজন দালাল। পাকসেনা ও তাদের পদলেহী রাজাকার-আলবদরদের সংখ্যাও অনেক। সকাল নয়টার মধ্যেই পৌঁছে যায় তারা গ্রামে। এর আগেই অধিকাংশ যুবক পালিয়েছিলেন গ্রাম ছেড়ে। নারী আর শিশুরাই মূলত থাকতেন সার্বক্ষণিকভাবে। মানস পূজার আয়োজন চলছে। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় শতাব্দীকাল আগে নির্মিত চণ্ডমণ্ডপে স্থাপিত পিতলের মূর্তিকে ধোয়া-মাজা করছেন তাঁরা। ফুলের তোড়া হাতে চণ্ডমণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছেন যুবতী আর বালক-বালিকারা। বৃদ্ধরা করছেন তদারকি। এমনি এক আনন্দঘন মুহূর্তে শব্দে চমকে উঠলেন নারী-পুরুষ সবাই। নৌকাও অগ্রসর হচ্ছে ঝড়ের বেগে।

তারা শিশু ও অসংখ্য নারী নির্যাতন করে। দেশীয় দোসরা নারীদেরকেও লাঞ্ছিত করে বিভিন্ন পন্থায়। একসময় লাইনে দাঁড় করানো প্রায় একশ জনের মতো লোককে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। শিশুদের ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। তারা অসংখ্য দুধের শিশুকেও এই বর্বর আক্রমণ হতে রেহাই দেয়নি। এরপর তারা

www.pathagar.com

লুটতরাজ চালায়, চণ্ড মন্দিরের রক্ষিত মূল্যবান মূর্তিগুলোও নিয়ে যায়। তারপর সমস্ত গ্রামে লাগিয়ে দেয় আগুন। পড়ে রইল লাশ আর লাশ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী মাকালকান্দি গ্রাম। লাশের সৎকার করা কিংবা আহতদের চিকিৎসার করার মতো কোন লোকই ছিল না গ্রামে। কে কোথায় গেল, কজনই বা মারা গেল হিসাব তখন মুখ্য ছিল না। ছিল লুট আর লুট। গ্রামে যারা ছিল ঐ দিনই তারা দল বেঁধে চলে গেল ভারতে। লটতরাজেরা এক টুকরো বাঁশের কঞ্চি কিংবা কাঠও তারা রেখে আসেনি। হায়রে নিষ্ঠুর বর্বরতা।'

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ

মাধবপুর উপজেলাকে সিলেট বিভাগের সিংহদ্বার বলা হয়। ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপজেলাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিও বটে। যোগাযোগ অবকাঠামোও এই জেলায় যথেষ্ট উন্নত। মুক্তিযুদ্ধে মাধবপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও এই উপজেলাটি অনন্য স্থান লাভ করেছে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সামরিক প্রতিরোধের ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার বৈঠক ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে এ উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের বাংলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক এ বৈঠকে ২৭জন সেনা অফিসারের উপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টরপ্রধানদের দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক এ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ।

জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য, সাধক ও লোকশিল্পী

বিশিষ্টসাধক

আব্বাস উল্লা

স্বভাবকবি আব্বাস উল্লা ১৯১১ সালের প্রথম দিকে কুতুবখানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ শতকের প্রথম দিকে কাব্যচর্চা করেছেন বলে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর লেখা গানগুলো সংগ্রহে না রাখার কারণে অনেক গানই হারিয়ে গেছে। লেখাপড়া তেমন না থাকলেও গান ও গাথা রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ফিরোজ আলী শাহ

ফিরোজ আলী শাহ বানিয়াচং ছিলাপাঞ্জা গ্রামে ১৯২০ সালের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ও ভক্ত রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তরা বাড়িতে মাজার তৈরি করে প্রতি বছর মাঘ মাসের দুই তারিখে ওরস উদযাপন করে থাকেন। লোকমুখে তার অনেক গান প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকশিল্পী

শাহ আবু মিয়া

শাহ আবু মিয়া বানিয়াচং দেওয়ানবাগ গ্রামে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মরমী ও বাউল গানের সাধক এবং লেখক। বাড়ি বাড়ি তিনি বাউল গানের আসর করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার অনেক শিষ্য রয়েছে। তিনি ১৯৮৮ সালের ২০ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

আ. গণি

বানিয়াচং হলিমপুর গ্রামে মরহুম আ. গণি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া না জানলেও অনেক আধ্যাত্মিক ও মরমী গান নিজে তৈরি করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতেন বলে জানা যায়। ২০0৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এলাহি বক্স

বানিয়াচং লামাপাড়া গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দে এলাহি বক্স জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি, মরমীসাধক ও সঙ্গিত পিপাসু। তাঁর অনেক গান মুখে মুখে রচিত, আর এখনও মুখে মুখেই বেঁচে আছে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার নূরপুর গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পার্বতীচরণ বিশ্বাস (১৮৬৮-১৯২৫)

১৮৬৮ সালে চৌধুরীপাড়া গ্রামে পার্বতীচরণ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক গান ও ভট্ট বা ভাট কবিতাবলির রচিয়তা। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত কমল নারায়ণ বিশ্বাস। তিনি ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে গ্রামে এসে টোল প্রথার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করেন। তাঁর অনেক গান এখনও লোকমুখে শোনা যায়। ১৯২৫ সালে নিজ বাড়িতে মারা যান।

মুনসুর বয়াতি

বানিয়াচং কসবায় আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুনসুর বয়াতি জন্মগ্রহণ করেন। একসময় বানিয়াঙের দেওয়ান বংশ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। এই পরিবারের অনেক কাহিনি নিয়ে মুনসুর বয়াতি, অমর গ্রন্থ দেওয়ানা মদিনার পালাকাব্য রচনা করেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় এই কাহিনি স্থান পেয়েছে। এই কাহিনি পড়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্, পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, মডলিন রোলা, ড. সিলভান লেভি, ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি প্রশংসা করেছেন। এ সম্পর্কে ফরাসি লেখক রমা রোলা লিখেছেন, এ রকমের কাব্য তিনি গ্রাম্য কৃষকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেননি। পল্লি কৃষক কীভাবে নিপুণ শিল্পীর মতো এক আশ্চর্য কীর্তির মঠ রচনা করেছেন; তা তার কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেশের বিখ্যাত আলাল-দুলালের কিচ্ছা তার রচনা।

www.pathagar.com

ফৈজু ফকির

ফৈজু ফকির বানিয়াচঙে সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়। তিনিও দেওয়ান বংশের জামাল খাঁকে নিয়ে রচনা করেন সুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী কাব্য। এই কাহিনি ময়মনসিংহ গীতিকায় স্থান পেয়েছে। লোকসাহিত্যের গবেষকগণ এই কাহিনিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফৈজু ফকির ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করেননি।

বিশিষ্টব্যক্তিত্ব

মোহন লাল সরকার

মোহন লাল সরকার ১৯৬৫ সালে বিক্রমপুর থেকে এসে বানিয়াচং দত্তপাড়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। গ্রামের মানুষ তাঁকে মনীন্দ্র সরকার নামেই চেনে। তিনি ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আতিকুল হাছান

আতিকুল হাছান বানিয়াচং কামালখানী গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত ফারসি ভাষার গ্রন্থ এরশাদে মোর্শেদ সেইসময়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগিয়েছিল।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬-১৯৪৫)

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ১৮৫৬ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি সাংগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৬ সালে ব্রহ্মতত্ত্ব নামে একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত, ভ্রম বিদ্যা ও ব্রহ্ম সাধনসহ ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অনেক অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত Childs own grammar বইটি সেইসময় আসামের এম ই হাই স্কুলে পাঠ্য ছিল। ১৯৪৫ সালের ২০ মার্চ এই পণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন।

অনাদিচরণ বিশ্বাস

১৮৬১ সালে চৌধুরীপাড়া গ্রামে পণ্ডিত অনাদিচরণ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের আর্থিক সাহায্যে সিলেট ইতিবৃত্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি ঐ গ্রন্থের ভুল ক্রটি সংশোধনের জন্য লেখক ও পদ্মনাথকে পরামর্শ দেন। অবশেষে তিনি বানিয়াচং অংশের অনেক তথ্য ও তথ্যগত ভুলের প্রতিবাদ করে রচনা করেন 'বানিয়াচং কাহিনি' নামে একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৯২৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণপাড়া গ্রামে ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত, দর্শন শাস্ত্রের সপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে সরকার তাঁকে বিদ্যাবিবোদ ও স্বরস্বতী উপাধি প্রদান করেন। তিনি লোকসাহিত্যের একজন সংগ্রাহকও বটে। তিনি মুরারী চাঁদ কলেজ ও গুহাটি কলেজের অধ্যাপক থাকাকালে সরকার বাহাদুর তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে তাঁকে মহামহোপাধ্যায় দানে সম্মানিত

www.pathagar.com

করেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ স্কুল ও কলেজে পাঠ্যভুক্ত ছিল। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রবন্ধাষ্টাক (১৩১৭ ব.), হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি (১৩১৭ সংস্কৃত ও বাংলা), হিন্দু বিবাহ সংস্কার (১৩২১), বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি বিলাশ (১৩২১), রামকুমার চরিত (১৩২৬), আলোচনা চতুষ্টয় (১৩৩১), Mr. Gaits haistory of Assam (১৩১৫), Translation of the penal code of the king of kachar। তাঁর কামরূপ শাসনাবলি বইটির গুরুত্ব ইতিহাসে অপরিসীম। ১৯৪৫ সালে এই বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

রামনাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৭)

রামনাথ বিশ্বাস ১৮৯৪ সালে বিদ্যাভূষণপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাইসাইকেলে এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় সবকটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণকাহিনি রচনা করেন। রামনাথ বিশ্বাসের মতো এত বিপুল সংখ্যক ভ্রমণকাহিনি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেননি বলে অনেক বিজ্ঞজনের অভিমত। তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনি- ১ মালয়েশিয়া ভ্রমণ, ২. সর্বস্বাধীনশ্যাম (থাইল্যান্ড ভ্রমণ কথা), ৩. ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর, ৪. মরণ বিজয়ী চীন, ৫. লাল চীন, ৬. কোরিয়া ভ্রমণ কথা, ৭. জুজুৎসু জাপান, ৮. প্রশান্ত মাহাসাগরে অশান্তি (ফিলিপিন, বার্লিন ও ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণকথা), ৯. আফগানিস্তান ভ্রমণ, ১০. বেদুইনের দেশে (ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ভ্রমণ), ১১. তরুণ তুর্কি, ১২. বিদ্রোহী বলকান (বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরি ভ্রমণ), ১৩. ব্রহ্মদেশে ছয় মাস, ১৪. জার্মানি ও মধ্য ইউরোপ ভ্রমণ, ১৫. পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ (ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম ভ্রমণ), ১৬. অন্ধকারে আফ্রিকা (তানজানিয়া ও ন্যাসায়ল্যান্ড), ১৭. নিগ্রো জাতির নতুন জীবন (উত্তর দক্ষিণ রোডোশিয়া ভ্রমণ কথা), ১৮. দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯. আজকের আমেরিকা, ২০. ফ্রান্স ভ্রমণ, ২১. ভবঘুরের বিলাত যাত্রা, ২২. ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ, ২৩. নাবিক, ২৪. পারস্য ভ্রমণ, ২৫. মুক্ত মহাচীন, ২৬. ভারত ভ্রমণ, ২৭. ভূপর্যটক রামনাথের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত)। রামনাথ ভবঘুরে গল্পের ঝুলি ও ভবঘুরের ভিনদেশি গল্প নামে গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উপন্যাস আগুনের আলো (মালয়দেশের পটভূমিতে), আমেরিকাতে নিগ্রো, হলিউডের আত্মকথা, সাগরেরপাড়ের ওপারে এবং ইংরেজি ভ্রমণকাহিনি- ১. China defies death, ২. Africa, ৩ Tour round the world without money। তিনি ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী গোলাম রহমান

১৯০৫ সালে তকবাজখানী মহল্লায় কাজী গোলাম রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। দীর্ঘদিন মুসলিম নিকাহ রেজিস্টার ছিলেন। 'বানিয়াচঙ দর্পণ' নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খান সাহেব হেলিম উল্লাহ

বিথলঙ্গ গ্রামে ১৯০৬ সালে খান সাহেব হেলিম উল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুম কানন' ও 'যুবক রঞ্জিনি'-এর সন্ধান পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সৈয়দ আমিরুল ইসলাম

১৯১০ সালে কামালখানী গ্রামে সৈয়দ আমিরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সনামধন্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বড়দের লেখাপড়া' বইয়ের জন্য তিনি ইউনেস্কো কর্তৃক সম্মানিত হন।

সাহিত্যসাধক

শ্রীধর বানিয়া

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীধর বানিয়া বানিয়াঙে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সোনাধনের গীত এবং কাঞ্চনবালার বারমাসি, লিলাইর বরমাসি গীতিকাব্য রচনা করেন। বিশিষ্ট লেখক দেওয়ান গোলাম মর্তুজা শ্রীধর বানিয়ার গীতকে এক অনবদ্য রচনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ফারজান আলী বেখুদ (১৭৮৫-১৮৬৫ খ্রি.)

তকবাজখানী মহল্লায় ভারত বিখ্যাত উর্দু কবি ফারজান আলী বেখুদ ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রচুর কবিতাজারি ও মর্সিয়া রচনা করেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি–আল্লাকেয়া তেরি শান হায়, জানওয়া গরিকা শরমিনদা হায়। 'দিওয়ানই বেখুদ' এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। তিনি ১৮৬৫ সালের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা যায়।

কমল নারায়ণ বিশ্বাস (১৮২৮-১৮৭৪)

কমল নারায়ণ বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিজ বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সখী সংবাদ, টপ্পা সংগীত এবং বৃষকেতু (কাব্য) গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতুকর্ণপাড়া গ্রামে ১৮৭৪ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নব নারায়ণ ভট্ট

মোহরেরপাড়া গ্রামে ১৮৬১ সালে নব নারায়ণ ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পৌরাণিক কবিতা-'শ্রীরাধিকার বস্ত্রহরণ' ও 'শ্রী হরির বাল্য লীলা' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তার অনেক ভট্ট কবিতা পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সংগ্রহ করে ভারতের যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালায় জমা দেন। এই অঞ্চলে আরো অনেক ভট্ট কবির সন্ধান পাওয়া যায়। কোলকাতা থেকে যতীন্দ্রমোহন ভট্টচার্যের সম্পাদনায় প্রায় ৩৭টি ভট্ট সংগীত নিয়ে যে বইটি প্রকাশিত হয় তাতে বানিয়াচঙের ভট্ট কবিদের কবিতাই রয়েছে প্রায় ত্রিশটি।

আনন্দময় ব্রহ্মচারী (১৮৬৩-১৯৪০)

যাত্রাপাশা গ্রামে আনন্দময় ব্রহ্মচারী ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শান্তি সোপান, উপাসনা পদ্ধতি, গুরুগীতা ও ক্রিয়াসার তত্ত্ব সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেহত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

সতীশ চন্দ্র শর্মা রায়

১২৮০ বঙ্গাব্দে যাত্রাপাশা গ্রামে সতীশ চন্দ্র শর্মা রায় জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। 'শ্যামা সঙ্গীতামৃত', 'সঙ্গীত জাগরনি', 'কীর্ত্তনামৃত' নামে তাঁর রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র শর্মা রায়

উনিশ শতকের প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র শর্মা রায় বানিয়াচং যাত্রাপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন লোককবি। 'শ্যামা সঙ্গীত' নামে তার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মান্দারকান্দি গ্রামে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। 'নিয়ত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' তাঁর রচিত পুথি।

সুদর্শন দাস

সুজাতপুর গ্রামে উনিশ দশকের প্রথম দিকে সুদর্শন দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বেশান্ত জীবনী' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়।

নরোত্তম বাউল

খাগাউড়া গ্রামে নরোত্তম বাউল উনিশ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। 'কৃষ্ণলীলা গীতি' নামে তাঁর একটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

চন্দ্র মোহন ভট্ট

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে চন্দ্র মোহন ভট্ট ভট্টপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'ভাওয়ালের কবিতা' এবং 'ময়মনসিংহের ডাকাতি।

মকবুল আহমদ খান

সাগরদিঘির পূর্ব পারে মকবুল আহমদ খান ১৯২৫ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ 'হে বিশ্ব আমার' (১৯৭৬)। তিনি প্রায় ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ আতাউর রহমান

তোপখানা বানিয়াচঙ জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ আতাউর রহমান একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিক। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সাহিত্য সাধনা করে আসছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে উল্লেখযোগ্য–সংগ্রামী কর্মী পুরুষ মৌলভী আবদুল্লাহ, বানিয়াচঙের ওলি আউলিয়া, ইসলামী আন্দোলন চিন্তার বিকাশ, আমার শৈশব স্মৃতি, জীবনের রূপায়নে সমাজ, ইসলামী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা, বানিয়াচঙ কাহিনি, হবিগঞ্জের কতিপয় কৃতীপুরুষ।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই

১৯৪৬ সালে বানিয়াচং আগোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'হাদীছে আরবাঈন' (অনুবাদ ও সংকলন), 'সিয়ামের তাৎপর্য' (১৯৭৯), 'ইয়ারমুকের লড়াই' (১৯৮০), 'চল্লিশ

www.pathagar.com

হাদীছ' (১৯৮০), 'একত্বের নবী' (১৯৭৮) এবং অনুবাদ 'জীবন গড়ার পথে' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জাকারিয়া চৌধুরী

পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, আইয়ূববিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন এই ব্যক্তি সুজাতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সত্য সুখের সন্ধানে' (১৯৯০) এবং 'বেদনা ও প্রার্থনা' (১৯৯২)।

সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ

সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ বানিয়াচঙের সাঙ্গর গ্রামে ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পাদনা : ব্রহ্মতত্ত্ব (ত্রৈমাসিক, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), রচিত গ্রন্থ : আত্মজীবনী, উপনিষৎ ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

মাহমুদ মিয়া চৌধুরী (১৮৯০-১৯৬০)

আগোয়া নিবাসী মরমী কবি। কথায় কথায়, মুখে মুখে তিনি কবিতা ও আধ্যাত্মিক গান রচনা করতেন। তার অনেক গান ভাটি অঞ্চলের লোকশিল্পীরা আজও গেয়ে থাকেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

পৈত্রিক নিবাস মীর মহল্লা, বানিয়াচং। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। তাঁর নন্দন তত্ত্ব পরিভাষা (১৯৮৫) ও নন্দন তত্ত্ব (১৯৮৬) গ্রন্থ দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ, গল্প লিখেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত।

এছাড়া বানিয়াচং থানার লোককবি বাউল উল্লাহ, এলাহি বক্স ওরফে বাউলা শাহ, কবীর দাস বৈষ্ণব, মকরন্দ ভট্ট, কবি ও সমাজ কসেবী জয়তুন বিশ্বাস, রাম মোহন ভট্ট, রামলোচন দাস এবং সংখ্য দর্শনের ভাষ্য রচয়িতা মহাদেব পঞ্চাননের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আজমিরীগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র রায় (আসাম শিক্ষা বিভাগের প্রথম বাঙালি ডিপিআই), জলসুখা, বিশিষ্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায়, জলসুখা, (তিনি ভারতবর্ষের প্রথম জাপান যাত্রী), বিশিষ্ট গবেষক, এমএ রাজ্জাক, ঘরদাইর, উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র

১. হবিগঞ্জ পরিক্রমা (১৯৯৪) ও বানিয়াচঙ্গ শতজন (২০০২)

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

সুরত জামালের কিসসা

আলাল খাঁ ও দুলাল খাঁ নামে বানিয়াচং রাজ্যে দুই দেওয়ান ছিলেন। তাঁরা সহোদর দুই ভাই। দেওয়ান আলাল খাঁ বড় আর দেওয়ান দুলাল খাঁ ছোট।

বড় ভাই দেওয়ান আলাল খাঁ একজন সাধু সজ্জন ধার্মিক লোক। আচার আচরণে, গুণে ধনে খুবই বড় মাপের ব্যক্তি। তাঁর বিবি ফাতেমা বেগমও রূপে গুণে অতিশয় সুন্দরী। সংসারধর্ম পালনে সমর্থ এই নারী, যেন হুরপরী।

বিবি একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, 'পুণ্‌নুমাসির চান যেন কোলেতে লইল'। অর্থাৎ শুক্লপক্ষের পঞ্চদশীর তিথিতে চাঁদ যেমনি পূর্ণতা পেয়ে রাতের আঁধারে উজ্জ্বল আলো ছড়ায়, তেমনি কোল আলো করা একটি ছেলে ফাতেমা বিবির কোল জুড়ে। এমনি একটি স্বপ্ন দেখলেন তিনি। এতে তাঁর মনে অজানা এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। স্বপ্নটি শুভ না অশুভ এই নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। এই রহস্যময় স্বপ্নের কথা ফাতেমা বিবি তাঁর স্বামীকে বললেন।

শুনিয়া আলাল কহিলা বিবিরে
অইব সুন্দর পুত্র তোমার উদরে।

দেওয়ান স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা করলেন। বিবি বললেন, স্বপ্ন যেন সত্য হয়। এই নিয়ে দেওয়ান-বিবি মহাখুশি।

আল্লাহর অশেষ কুদরতে ফাতেমা বিবি গর্ভবতী হলেন। দেওয়ান আনন্দে রাজ্যের নামকরা গণককে ডাকলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ প্রবীণ এক গণক গুনে বলল, 'ফাতেমা বিবির গর্ভে জন্মিবে এক ছাওয়াল, রূপেতে অইব পুত্র ছুরত জামাল'। এ সুসংবাদের জন্য দেওয়ান নগদ অর্থে পুরস্কৃত করে গণককে বললেন, দেখো তোমার কথা যেন সত্যি হয়। জবাবে গণক জানাল, কিন্তু আছে হুজুর। দেওয়ান বললেন - কিন্তু কী? গণক বলল কিন্তু রহস্য ঘেরা যে। দেওয়ান বললেন, কী রহস্যের বিষয় জলদি বলো। গণক বলল :

যদি কুড়ি বছরের মধ্যে দেখ পুত্রের মুখ
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড় শোক।

দেওয়ান শুনে হতবাক। গণক আরো বলল :

রাজ্যের যতেক লোক যদি দেখে তাহারে
তাহার কারণে তোমার পুত্র যাইবে মরে।

এ যে বজ্রপাত। বংশধরের জন্যই এ রাজ্য আর ধন সম্পদ। এই বলে দেওয়ান আলাল খাঁ কেঁদে জার জার। বিষয়টি নিয়ে ছোট ভাই দুলাল খাঁর সঙ্গে পরামর্শ

www.pathagar.com

করলেন। বংশধর রক্ষার জন্য তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গণকের পরামর্শ অনুযায়ী যা যা করা প্রয়োজন সব চেষ্টাই করে যাবেন। এ নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে দেওয়ান জনবিহীন এক নির্জন দুর্গম অরণ্য বেছে নিলেন। স্থানটি হাইলাবন। এই বনে গর্ত খুড়ে একটি পুরি তৈরি করে সেখানে সন্তান সম্ভাবা স্ত্রী ফাতেমা বিবিকে নির্জনে বসবাসের জন্য জায়গা করে দিলেন। যাতে করে নব জন্মা বংশধরকে কেউ দেখতে না পায়। লেংড়া কাবেলা বলে একজন অতি বিশ্বস্ত দক্ষ উজির ছিলেন। দেওয়ান আলাল খাঁ তাকে গোপনে হুকুম দিলেন :

জমিন খুদিয়া এক পুরী তৈয়ার কর
শানেতে বান্ধিয়া দিও যেমন পাথর।
একদিনের মধ্যে তুমি কাম করবা শেষ
বকশিস দিয়াম যত চাও অবশেষ ॥

বহু সংখ্যক মজুর লাগিয়ে লেংড়া কাবেলা সুন্দর ও টেকসই একটি ইন্দ্রপুরী তৈরি করল। আলাল খাঁ দেখে খুশি হলেন। বকশিস দিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে সকল শ্রমিককে বিদায় দিলেন। লেংড়া কাবেলা উজিরও বড় অংকের বকশিস বাগিয়ে নিল। এবার দেওয়ান হাইলাবনের এই ইন্দ্রপুরীতে বিবি ফাতেমাকে বসবাসের জন্য পাঠালেন। হিসেবে করে প্রয়োজনীয় খাবার ও ব্যবহার সামগ্রী সঙ্গে দিলেন।

কুড়ি বছরের খানা খোরাকি সঙ্গেতে দিয়া
এক বান্দি সঙ্গে বিবির রাখিলা আসিয়া।

হাইলাবনের ইন্দ্রপুরীতে ফাতেমা বিবি তার বিশেষ সাহায্যকারিনী ভৃত্যের সেবা যত্নে নির্বাসিত জীবন কাটাতে লাগলেন। সন্তানের আশায় নির্বাসিত জীবনের সমস্ত দুঃখকে সহ্য করে ইন্দ্রপুরীকে বিবি নিলেন শান্তিপুরী হিসেবে।

এদিকে বিবিকে বনপুরীতে নির্বাসনে পাঠিয়ে পত্নী বৎসল আলাল খাঁ চারদিক অন্ধকার দেখলেন। তিনি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছেন না। বিষয়-আশয়, এমনকী দেওয়ানগিরি পর্যন্ত তাঁর কাছে তিক্ত হয়ে উঠল। তাঁর উদাসীন মনে এক শুন্যতা বিরাজ করছে। তাই :

একদিন আলাল খাঁ দেওয়ান আশা লইয়া হাতে
আল্লার নামেতে তস্‌বি বান্ধি লইলা মাথে।

আল্লাহরভাবে ভাবুক ফকিরি বেশে দেওয়ান আলাল খাঁ বিষয়-আশয় ছেড়ে সুদূর মক্কায় চলে গেলেন।

এরই মধ্যে চলে গেল দশ মাস দশ দিন। ফাতেমা বিবির কোল জুড়ে জন্ম নিল ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান যেন, এক পূর্ণমাসীর চান্দ বিবির কোলে এল।

পুত্র পাইয়া বিবির মন হইল খুশি
ভুলিলা রাজ্যের কথা আর বান্দি দাসি।

সন্তান পেয়ে বিবি একাকী জীবনের দুঃখের কথা ভুললেন। ভুলে গেলেন রাজ্য ও ঐশ্বর্যের সুখের কথাও। দেওয়ানকে কীভাবে এ সুসংবাদ দেওয়া যায়–এ নিয়ে বিবি ভাবছেন। এই পুরীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। কেউ সন্তানকে যদি দেখে ফেলে তবে

www.pathagar.com

তো সন্তানের অমঙ্গল হবে। এই ভাবনায় কাউকে কিছু মুখ খুলে বলছেন না। কেবলি ভাবছেন :

আজ যদি দেওয়ান সাহেব এই কথা শুনিত
আফসোস মিটাইয়া কত ধন বিলাইত।

হ্যাঁ, কতই না খুশি হতেন দেওয়ান। খুশিমনে রাজ্যময় ধন-দৌলত, মিঠাই, মণ্ডা বিলিয়ে দিতেন। এসব মনে এনে বিবি নীরবে কাঁদছেন। এরই মধ্যে কেটে গেল কয়েকটি দিন। সন্তানের নাম রাখা প্রয়োজন। মনে পড়ে গেল বিবির গণকের সেই কথা। গণক বলেছিল :

রূপেতে হইব পুত্র সুরত জামাল
রাখিলেন ঠিকই নাম সুরত জামাল।

এখন আলাল খাঁর ছোট ভাই দুলাল খাঁ রাজ্যময় দেওয়ানগিরি করছেন। তিনি একদিন লোকলস্কর নিয়ে গহিন জঙ্গলে শিকারে আসলেন। সুরত জামাল বড় হয়ে নির্জন পুরী গুহা ছেড়ে জঙ্গলায় বেড়াচ্ছে। হঠাৎ করে তাদের দেখা হয়ে গেল। আলাল খাঁ বনেতে এই সুদর্শন ছেলে দেখে চিন্তায় পড়লেন। কে সেই ছেলে? নিশ্চয়ই কোনো বড় লোকের ছেলে হবে! অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ঠিকই চিনতে পারলেন সুরত জামালকে। তিনি নিশ্চিত হলেন :

বনেতে এমন পুত্র আর বা হবে কার?
চান্দের মতো এ শিশু, বিবি ফাতেমার।

শিশু সুরত জামালের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকাতেই দুলাল খাঁর মনে হল, এই শিশু একদিন বড় হয়ে দেওয়ানগিরির উত্তরাধিকারী হিসাবে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তাই যেভাবেই হোক পথের কাঁটাকে সরাতে হবে। দুষ্টবুদ্ধি এল দুলাল খাঁর মনে। তিনি কিছু দুষ্টলোকের সঙ্গে এ নিয়ে গোপনে শলা-পরামর্শ করে নিলেন। তারা দুলাল খাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল :

বুড়া হইয়া তোমার ভাই বৈদেশেতে গেছে
কী জানি এতেক কাল আছে কি মরিয়াছে।

কাজেই এখন তোমার বড় ভাই আলাল খাঁকে নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নাই। তারা আরো বলল :

সুখেতে দেওয়ানি করো বাচোঁ যতকাল
কাটিয়া উজাড় করো দুশমনিয়া শাল।

দুষ্টদের মিষ্টি কথা দুলাল খাঁ কানে দিলেন। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন সময়-সুযোগমতো যে কোনো কৌশলে সুরত জামালকে মেরে ফেলবেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি লেংড়া কেবলাকে ডেকে এনে অর্থের লোভ দেখানো হলো। সেসঙ্গে চল্লিশ পুতা লাখেরাজ জমিও দেবেন। লেংড়া কেবলা জানতে চাইল, কাজটা কী ছোট দেওয়ান? দেওয়ান দুলাল খাঁ চুপিচুপি বলল :

ফাতেমা বিবি যেথা বাইন্ধা দিলা ঘর
মাটি চাপা দিবা তার উপর।

www.pathagar.com

বাহির না হইতে পারে যেন কোনো পথ দিয়া
কবরের মধ্যে তারে আসিবা রাখিয়া।

বৃদ্ধ উজির লেংড়া কেবলা এ প্রস্তাব শুনে আঁতকে উঠল। এত বড় সর্বনাশ সে করতে পারবে না। ভেবে বলতে হবে এ অজুহাতে চলে এল। কিন্তু দুচোখের পানি সে আটকাতে পারল না। মনে মনে ভাবল যেমন করেই হোক সুরত জামালকে বাঁচাতে হবে। দেওয়ানের বংশ ধ্বংস হবে তা হতে দেওয়া যায় না। গোপনে ঘোড়ায় চড়ে হাইলাবনের জঙ্গলে এসে হাজির হলো। বিবি ফাতেমাকে বলল :

দুশমন দুলাল খাঁ দেখ কী কাম না করে
পুত্রের সহিত বিবি তোমারে চায় মারিবারে।

এই সংবাদ শুনে বিবি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রের জীবনের সুখ-শান্তির জন্য কত না কষ্ট সহ্য করে নির্বাসিত জীবন সহ্য করা হচ্ছে। তবুও জীবন কি শেষ রক্ষা পাবে না? এ ভেবে ফাতেমা বিবি অস্থির হয়ে কাঁদছেন আর গড়াগড়ি খাচ্ছেন। এমনি সময় সুরত জামাল এসে উপস্থিত। মায়ের কান্নার কারণ ও দুলাল খাঁর ষড়যন্ত্রের সমস্ত ঘটনা বৃদ্ধ নাজির লেংড়া কাবিলা খুলে বলল। ঘটনা শুনে সুরত জামাল বুঝে গেল এই নির্জন গুহাটি এখন আর নিরাপদ নয়। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

সুরত জামাল বলল, মা কোন দেশেতে যাই। মা বললেন, আল্লা বিনে আর গতি নাই। বৃদ্ধ উজির লেংড়া কেবলা সুরত জামালকে পরামর্শ দিয়ে বলল :

তোমার বাপের ছিল এক দোস্ত দক্ষিণবাগ শহরে
দুবরাজ নামেতে রাজা কহিয়া যাই তোমারে।

সে অভয় দিয়ে আরো বলল :

আজি রাত্রি মাঝে তোমরা যাও সেইখানে
হাঁটিয়া যাইবে দূরে সকাল বিয়ানে।

উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী বিলম্ব না করে মা-বেটা হাইলাবনের নির্জনপুরী থেকে বেরিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ উজির সাথি। সাত দিন পথ চলার পর দক্ষিণবাগ দুবরাজ রাজার দেশে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্মণ রাজা দুবরাজ উজিরের মুখে ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সুরত জামাল ও বিবি ফাতেমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাদের বসবাসের জন্য বারো দুয়ারি ঘর তৈরি করে দিলেন। মা-ছেলের সঙ্গে বৃদ্ধ উজিরও জায়গা করে নিল। সুখে শান্তিতে নিরাপদে বসবাস করলেও সুরত জামাল যেন মনে শান্তি পাচ্ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশপ্রেম জাগতে লাগল। তার পিতৃভূমি দেখতে চায়। জানতে চায় প্রজাকুলের কথা। নির্যাতন-উৎপীড়নের প্রতিবাদে প্রয়োজনে প্রজাদের স্বার্থে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে চায়। এসব চিন্তায় মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল। একদিন সে তার মাকে বলল :

বাপের রাজত্ব আমি আইমু চক্ষেতে দেখিয়া
বিদায় দেওয়াইন মা জননী হরষিত হইয়া।

জন্মের পর থেকে মা ছেলেকে কোথাও যেতে দেন না। বুকে আটকে ধরে লালন করেছেন। বড় হয়েছে এখন আর সন্তানের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। মা

www.pathagar.com

অতি কষ্টে চোখের পানি সংবরণ করে সুরত জামালকে বিদায় দিলেন।

সুরত জামাল বাপের রাজত্ব বানিয়াচং এল। এখানে কাউকে কিছু না বলে একাকী রাজ্যময় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের খোঁজ নিল। সে জানতে পারল, ছোট দেওয়ান দুলাল খাঁর অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমনকি দেওয়ানের উৎপীড়নে মুল্লুকের কোথাও কোথাও উজাড় হয়ে গেছে।

অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিষাদ মনে সুরত জামাল মায়ের কাছে ফিরে এল। সে দক্ষিণবাগের রাজা দুবরাজের কাছে নিজের মনের ইচ্ছা ও বানিয়াচঙের রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করল। সে লড়াইবিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছে প্রকাশ করে দুবরাজ রাজার ফৌজদারের কাছে লড়াই শিখতে শুরু করল। যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ হয়ে সুরত জামাল রাজফৌজ নিয়ে একদিন বানিয়াচঙের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

তবে তো চলিল জামাল বানিয়াচঙের দিকে
রাজ্যের যতেক প্রজা উবু হইয়া দেখে।

বিশাল ফৌজের বহর দেখে বানিয়াচং রাজ্যের প্রজারা বলাবলি করছে :

হাতি ঘোড়া কত এল নাই লেখাঝোকা
কোন পালোয়ান আইল করিবারে দেখা।

সুরত জামাল এসে নিজের পরিচয় দিয়ে অত্যাচারী রাজার পক্ষ ত্যাগ করে প্রজাকুলকে আহ্বান জানাল। আর অমনি বানিয়াচঙের প্রজাকুল দলে দলে দুলাল খাঁর পক্ষ ত্যাগ করে সুরত জামালের পক্ষে যোগ দিতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশেষে ছোট দেওয়ান দুলাল খাঁ ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

বাপের রাজত্ব সুরত জামাল দখল করে নিল। বৃদ্ধ উজির লেংড়া কেবলাকে দ্রুত সংবাদ পাঠাল ফাতেমা বিবিকে বানিয়াচঙে দ্রুত নিয়ে আসতে। সবাইকে নিয়ে খুশি মনে সুরত জামাল বানিয়াচঙে রাজত্ব করতে লাগল। এই শুভ সংবাদ দক্ষিণবাগের রাজা দুবরাজের কাছে পৌছল :

শুইন্যা দক্ষিণবাগ রাজা খুশি হল মনে
সুরত জামাল রাজত্ব করে অতি সাবধানে ॥

সোনামোতির কিসসা

প্রাচীন ইতিহাসে তরপ ও দিনারপুর নামে দুটি রাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। এই দিনারপুর রাজ্যে একদা এক রাজা ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী একমাত্র কন্যা সোনামোতি। রাজা-রানির অতি আদরের ধন।

সোনামোতিকে রাজা-রানি সবসময় চোখে চোখে রাখতেন এবং তাকে খুশিমতো চলতে দিতেন। সোনামোতির খুশিই তাদের খুশি। এ যেন নয়নের মণি।

রাজা যখন রাজ দরবারে বসতেন তখন পাশে কন্যা সোনামোতিকে বসাতেন। ছোটবেলা থেকেই রাজার সভা পরিচালনা ও বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করত সোনামোতি। কিশোরী সোনামোতি তার পিতার রাজসভা ও বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ না করলেও অনেক সময় বিচারকার্য পরিচালনা তার মনঃপূত না হলে সঙ্গত বিষয়াদি নিয়ে অন্দর মহলে

www.pathagar.com

এসে রাজাকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত। রাজা বুদ্ধিমতি কিশোরী সোনামোতীর যুক্তিসঙ্গত মতামত খুশিমনে গ্রহণ করতেন। কন্যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রাজা বেজায় খুশি ছিলেন। পুত্রসন্তান না থাকলেও রাজা তাঁর একমাত্র কন্যা সোনামোতিকেই যোগ্য উত্তরাধিকারী ভেবে গর্বিত ছিলেন।

সোনামোতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল, সেসাথে রাজা রানির ভাবনাও বেড়ে চলল। যাকে না দেখলে এক মুহূর্ত সময়ও সহ্য হয় না; সেই আদরের ধন সোনামোতিকে বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠিয়ে কীভাবে একাকী জীবন কাটাবেন!

আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্যে পালিত রাজদুলালী সোনামোতি ধীরে ধীরে পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করল। ধর্মপরায়ণ পিতা চিন্তা করলেন কন্যা উপযুক্ত হয়েছে, বিয়ে দেওয়া দায়িত্ব। রাজা রানির সঙ্গেও একান্তে পরামর্শ করে মনস্থির করলেন, আদরের দুলালী একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যাকে তারা চোখের আড়াল করবেন না। বিয়ে দিয়ে বর প্রাসাদে আনবেন অর্থাৎ ঘরজামাই রাখবেন। সে বর হাজার জন বেছে-দেখে মনোনীত করা হবে।

সোনামোতির পূর্ণ বিকশিত যৌবনের গৌরব দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হলো। রাজা তাঁর সুদর্শনা কুমারী কন্যার বিয়ের বার্তা ঘোষণা করলেন।

রাজা রানি মিল্‌লা এই ছল্‌লা করলা
দেশে দেশে মনঢোল পিঠাইয়া দিলা।
এক মিয়াই আমরার, ঘরজামাই দিমু বিয়া
যার যার ইচ্ছা আছে, দেখা কর আইয়া ॥

ঘোষণায় আশাতীত সাড়া পড়ল। দেশ ও দূর-দূরান্ত থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। এই ভেবে :

এক রাজার এক পুড়ি যদি করি বিয়া
দুইদিন পর যাইমু আমি তখতের বাদশা হইয়া।

সহায় সম্পত্তির লোভে, কল্পনার স্বপ্নে বিভোর যুবকরা বিয়েতে অতি উৎসাহী হয়ে ভিড় জমাল। এতে খান্দান-বেখান্দান, যোগ্য-অযোগ্য ভেদাভেদ থাকল না। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রস্তাব আসতে লাগল :

কেউ কেউ আইলা নিজে নিজে, কেউর বা বাপ ভাই
কেউর আইলা উজির নাজির, আউরার সীমা নাই।
অনেক আসল, অতিথিশালায় ঠাঁই নেই।

রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী আগন্তুকদের ভিড়ে রাজমহলের স্বাভাবিক কার্য পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে; আর বিলম্ব নয়। রাজা এর মধ্যে রানি ও সভাসদের সঙ্গে পরামর্শ সেরে নিলেন। রানি দাবি জানালেন, সবশেষে তিনি দেখে চূড়ান্ত মতো দেবেন।

শুরু হলো বর নির্বাচন, একে একে ডাকা হলো, বরপ্রার্থীরা নানা বেশে, নানান ঢঙে সেজেগুঁজে পরিপাটি হয়ে আসছে। সাক্ষাৎকালে তারা নানান কথায়-উপমায় নিজ নিজ গৌরব ও কৃতিত্বের কথা শোনাতে লাগল। কেউ কেউ নিজের পরিচয়ের চেয়ে তাঁর ইষ্টিগুষ্টির কথা সগৌরবে ব্যক্ত করল। এসব শুনে রাজা বিরক্ত বোধ করলেন। তিনি

www.pathagar.com

বললেন :

বাপ-দাদার নাম নাই হলনার দামান
আধা পয়সা দাম নাই আমারে অপমান।

এতে কিছুটা অপমান বোধ করে রাজা এক পর্যায়ে বর বাছাই বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে অন্দর মহলে গেলেন। ক্লান্ত, অবসন্ন রাজার ক্লান্তি কিছুটা দূর হওয়ার পর কাছে গিয়ে সোনামোতি রাজাকে বলল, সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দেওয়া সঠিক কাজ হল না পিতা। আপনি রাজ্যময় ঘোষণা দিয়ে তাদের ডেকে এনেছেন। আগন্তুকরা আপনার মেহমান। হঠাৎ করে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিয়ে আপনি তাদের অপমান করেছেন। এ সিদ্ধান্ত আপনার ঠিক হয়নি।

রাজা ভুল বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকার শুরু করলেন। এমনিভাবে অনেকদিন চলল বর যাচাই, সাক্ষাতকার। কিন্তু

আকলে অইলে চেরায় অয় না, চেরায় অইলে অয় না জাতে।
জাতে অইলে অয় না ভাতে, অয় না মিল কোনোমতে ॥

একজন সুদর্শন, বুদ্ধিমান, যোগ্যপাত্রের আশায় বহু সংখ্যক বরপ্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়েও সফলতা অর্জন করতে পারেননি। মনের মতো বর পাওয়া বড়োই কঠিন। তবু এরই মধ্যে যে দুএকজন প্রাথমিকভাবে মনঃপুত হয়েছিল, শেষ অবধি রানির পছন্দ না হওয়ায় চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

রাজার পছন্দ অইলে অয় না উজিরের,
উজিরের পছন্দ অইলে অয়না কট্টালের
রাজা উজির হক্কলে মিললা করলে পহন্দ,
আন্দর মহলের রানির উঠে না তো মন।

এভাবেই সিদ্ধান্তহীনতায় কয়েক বছর পার হলো :

চাইয়া-চিন্তা বাছাবাছিত কয়েকবছর গেল
অয় অয় করিয়া সোনামোতির বিয়া না অইল।

যোগ্য বরের সন্ধানে বিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে। এই জন্য সোনামোতি দুঃখিত। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে পারছে না। বাবা-মাকে সে অতি ভালোবাসে। ভালো বর সন্ধানে বিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে, তার মঙ্গলের জন্যই তাঁরা করছেন—এ তার জানা। তাই সে মনের প্রচণ্ড কষ্ট-আক্ষেপ নীরবে সহ্য করে নিচ্ছে আর এজন্য তার বুকে আছে জমাট ব্যথা। আর তাই অসহায়ত্ব অনুভব করে একাকী কেবলই অশ্রু ঝরাচ্ছে। মুখে কোনো কথা নেই। সে জানে কতই না কষ্ট সইতে হয়েছে বাবা-মাকে তার জন্য :

দশ মাস পেটে লইয়া বিশ মাস বাজুত,
কষ্ট পাইলা কত আতইয়া গু-মুত।
এক বাজু পঁচে মায়ের গুয়ে আর মুতে
আরেক বাজু পঁচে মায়ের মাঘ মাইয়া শীতে।

এ বিবেচনায় কোনোভাবেই বাবা-মাকে অভিযুক্ত করতে পারছে না সোনামোতি। বরং সন্তান হিসাবে বাবা-মায়ের কাছে সে ঋণী।

www.pathagar.com

কিন্তু জীবন-যৌবন বহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে। ধন-দৌলত হারানো গেলে যত্ন ও অধ্যবসায়ে ফেরত পাওয়া যায়, কিন্তু যৌবন গত হলে আর ফেরত আসে না। যৌবনবতী সোনামোতি তার সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুঠাম শরীর নিয়ে যথাসম্ভব পর্দা প্রথার মধ্যে চললেও সে লক্ষ করল মহলের সভাসদ এমন কী দাসদাসীও যেন বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায় :

কেউ চায় আইতে যাইতে কেউ চায় উবাইয়া
সোনামোতি সোনার যৌবন বিফলে যায় গইয়া।

এতে সোনামোতি লজ্জাবোধ করে। তার মনে হয় মানসিক সকল দুঃখ কষ্ট আর পুরুষের কুদৃষ্টি দূর করে শান্তি আবির্ভূত হতো 'বিবাহ' নামক বন্ধনটি সম্পন্ন হলে। এ ভেবে দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা যথাযথ না হওয়ায় সোনামোতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হচ্ছে। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়ে বিষণ্নতায় দিন দিন অসহায়ত্ব অনুভব করে ও অবলা নারীর মতো নীরব-নিভৃতে অশ্রু ঝরাচ্ছে। এমনি এক করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করল সোনামোতির নিত্য সাথি দাইমা। অতি সঙ্গোপনে আঁচল দিয়ে অশ্রুধারা মুছে ফেললেও দাইমা ঠিকই বুঝে নিতে পারল সোনামোতির মনোকষ্টের কারণ :

আপন মনে কান্দে সোনা কেউ না বোধ পায়
এক জানে তখতের আল্লা আর জানে দাইমায়।

দাইমা সোনামোতিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সে বোঝাল বিয়ের ফুল না ফোটা পর্যন্ত নারীকে অপেক্ষা করতেই হয়। এ সত্য সে জানে। কিন্তু তার বাবা-মায়ের বর পছন্দের পদ্ধতিকে সোনামোতি সমালোচনা করে বলল :

বাপ মায় বিয়া দিতা দিতা কইরা পাতাইছইন বাজার
কোনোদিন কোনোখানে দেখছনি এমন আদিলখা আচার।

এ অদ্ভুত পদ্ধতিই বর পছন্দকে বিলম্বিত করছে। আর তাই বিয়ে এ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বিয়ের নামে এ প্রহসন তাকে ভাবিয়ে তুলল।

এদিকে রাজা-রানির মনেও ভীষণ কষ্ট। এমন বুদ্ধিমতী সুন্দরী যুবতী রাজকন্যার বর নির্বাচন করতে পারছেন না–এ তাদেরই ব্যর্থতা। এ গ্লানিতে মুখ তাদের মলিন। আনন্দ-খুশি যেন হারিয়ে গেছে। রাজা সারাদিন মাথা খাটিয়ে রাজ্যসভা পরিচালনা করে মহলে এসে এক দণ্ড স্বস্তি পাচ্ছেন না। বরং স্নায়ুচাপ বেড়েই চলেছে।

স্ত্রী-কন্যার মলিন চেহারা ও নিরানন্দ মন যেন মহলকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। তাই রাজা মনের অজান্তে বলে বসলেন :

সারাদিন কাউছালী কইরা ফিরা আইলাম ঘর
আইয়া দেখি আন্ধার মুখ কোনোদিন দেখমু ফর।

এভাবে কিছুদিন গেল। কারো মনে শান্তি নেই। সোনামোতি শেষে তার অন্তরঙ্গ সাথি দাইমাকে ডেকে বলল, মা-বাবা আমার জন্য যোগ্যপাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। সুদর্শন, তেজস্বী ও বুদ্ধিমান বর খুঁজে তারা পেরেশান। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমি আমার বর পছন্দ করব। এই কথা :

www.pathagar.com

দাইমা হুইন্যা কইল ভালা করছ মাই
নিজের ভালা নিজে করায় বদবু গিল্লা নাই।

সোনামোতি দাইমাকে সঙ্গে নিয়ে মাকে তার নতুন প্রস্তাব শুনিয়ে বলল, আমি যে কোনো নির্বোধকে স্বামী রূপে মেনে নেব, যদি সে মন মাতানো তিনটি মিথ্যে কথা শোনাতে পারে।

রানিমা এ প্রস্তাব শুনে হতবাক; তিনি রাজাকে জানালেন। হঠাৎ কন্যার মাথায় এ বুদ্ধি উদয় হওয়ায় রাজা রানি নির্বাক, প্রতিবাদী না হলেও অন্তর্জ্বালায় তারা জ্বলতে লাগলেন। তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই সোনামোতি আজ এমন উদ্ভট প্রস্তাব পেশ করেছে। বিরোধিতা না করে ঠান্ডা মাথায় সোনামোতিকে বুঝিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলেন রাজা রানি। সেসাথে দাইমাকেও দায়িত্ব দিলেন। দাইমা সময়-সুযোগে সোনামোতিকে সাধ্যমতো বোঝাতে লাগল। কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়। সোনামোতি বলল :

যাও দাইমাগো কও মা-বাপেরে বুঝাইয়া,
মিছা তিনকথা আমারে যে দিব হুনাইয়া
তারে আমি করমু বিয়া হে হোক যে জাতের
জাতের ভাতের কাম নাই, কাম আমার মামলতের।

অবশেষে দাইমা রাজা রানিকে সোনামোতির সিদ্ধান্ত জানায়। রাজা এবার সোনামোতি মুখে তার সিদ্ধান্তের কথা শুনতে চান। রাজা এসে বললেন, সোনা তুমি আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। কেন তুমি এমন সিদ্ধান্ত নিলে? এখনও সময় আছে তোমার জীবন সুন্দর ও বিকশিত করার। হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার আগে তুমি চিন্তা কর সিদ্ধান্ত নিও। সোনামোতি মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভেবে বলল :

হুন, তুমি বাবা কই আমি, হুন খেয়াল কইরা,
কী কলে আক্কেলবান আনিবায় বিছরাইয়া।
হাছা তো হাছাই, দুনিয়ার হক্কলে চিনে,
মিছা কতা বানাইয়া কওয়ন, কজনে জানে।

তাই সোনামোতি সিদ্ধান্ত নিল, যে যুবক মিথ্যা কিস্‌সা শোনায়ে তাকে খুশি করবে তারগলায় শুভ বরমাল্য পরিয়ে দিতে তার আপত্তি থাকবে না। রাজা মেয়ের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না। তবুও এ অস্বস্তিকর পরিবেশ উত্তরণের জন্য মনঃপুত না হওয়া সত্ত্বেও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্তানের স্নেহের কাছে বাবার আমিত্ব পরাজিত হলো। অবশেষে রাজা রাজি হলেন। রাজা হুকুম দিলেন :

ঠাঠা মিছা আজব কতা যে পারিবো হুনাইতে,
শাদি করব আমার পুরি নইলে সাজা অইবো সইতে।

রাজার নির্দেশ মতো রাজ্যময় ঘোষণা করা হলো। অনেক বুদ্ধিমান কবিয়াল, কল্পনাবিলাসী, ভাববিলাসী, কবিত্বসম্পন্ন যুবক ভিড় জমাল। তারা আবেগ আর বেদনার সমন্বয়ে উপস্থাপন করতে লাগল রসবিচারক, পৌরাণিক, সমকালীন বিষয়ক নানান বানোয়াট মিথ্যা কিসসা :

www.pathagar.com

কেউ কইলা এক কথা, কেউ কইলা দুই,
কেউ কইলা আধাখান, ধান নাই কেবল ভুঁই।

কিন্তু এতো সোনামোতি একটু বিরক্ত বা মনক্ষুণ্ন হলো না বরং সে তার মা-বাবাকে উল্লেখ করে বলল :

এক গাছ বরই পাকলে দশ জনে ইটায়
যার বাট বরাতে থাকে, হেই জনেই পায়।

বুদ্ধিমান সোনামোতি সুন্দর সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কথা ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বর্ণনা দিয়ে বাবা-মাকে বোঝালেও শেষ পর্যন্ত সে অত্যন্ত দুঃখিত। তার অপ্রসন্ন ললাট যেন তাকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করেছে। নিজ চেষ্টায়ও বর পছন্দ হলো না।

আওয়া যাওয়া বন্ধ হইলো হক্কলেরই অপমান
বাতে বাতে রাজা-রানি-বেটি অইলা অপমান ॥

এ অপমানে নিজের উপরই ধিক্কার জন্মাল। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে চিরকুমার-ই থেকে যেতে হবে। এমনি চিন্তায় মগ্ন সোনামোতি, এমন সময় এক যুবক উপস্থিত হয়ে সে নিজেকে একজন যোগ্য প্রার্থী বলে জানাল। সে বলল :

মিছা আজগবি কতা কইমু আমি সত্যি সত্যি তিন সত্যি
সোনামোতিরে তো করমু বিয়া, সাথেনি পাইমু রাজত্বি?

এই কথা শুনে সবাই হতবাক। যুবক বলে কী! শুনে উজির নাজির সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারা বলল :

কত কত রাজা বাদশা আইয়া গেছইন তল
তুমি আইছো হাবা বেটা দেখতায় কত জল।

যুবকটির বক্তব্যে সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে সোনামোতি খুশি হলো। এগিয়ে এসে বলল–বেশ আমি এই যুবকের কথা শুনব। উপায়ান্তর না বুঝে রাজা অনুমতি দিলেন।

সাহস করে যুবক দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমার একটি গাভি ছিল। গাভি বাচ্চা দেওয়ার চৌদ্দ দিন পর দুধ দোহাতে গিয়ে বাছুর যখন দুধের বাটে মুখ দিল তখন :

বাছুরে টান দিতে দুধের নাল ছুটল
ল'মার মাঝে আধ'মণি নাইন বইয়া ভরিল।

অল্পের মধ্যেই বড় বড় পাত্র দুধে ভরে গেল। এ আশ্চর্য সংবাদ এলাকায় মুখে মুখে রটে গেল। এলাকাবাসী ছুটে এল দুধ সংগ্রহের জন্য। তারা ইচ্ছামতো দুধ সংগ্রহ করল।

কেউ নিলা কাছলী ভরি যার মনে যে বোধ
তেউতো না বন্ধ অইল গাই'র বানের দুধ।
তবুও দুধে কমতি নেই।
তাজ্জব লাগে কইন সকলে একি সমাচার
চৌদ্দ সিঁড়িতে না দেখছি এমন কারবার।

আশ্চর্য সবাই। এমন সংবাদ কেউ কখনো শুনে নাই। পর্যাপ্ত দুধে সবার চাহিদা মিটে গেল। এখন কেউ আর দুধ নিতে আসে না। গাভীর দুধের নহর পড়তে পড়তে একটি

www.pathagar.com

নালা তৈরি হয়ে গেল। যেমন :

বানের দুধ হুরুমুরু গাং থাইক্যা ভালা
দুধ পড়তে পড়তে অইল এক নালা।

দেখতে দেখতে ছোট একটি নদীর মতো হয়ে গেল। নদীর জল যেমনি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তেমনি দুধের নদীও সমুদ্রে পড়েছে। তবু দুধ বন্ধ হচ্ছে না। এদিকে সমুদ্রে থাকা কুমির দল দুধের নদী বয়ে উজান চলে আসছে গাভীর কাছে।

কুমিরের পাল আইয়া খেমটাইয়া ছিমটাইয়া
আমার গাইটারে তারায় ফালাইছে খাইয়া।

অবশেষে গাভীটি মারা যায়, আর সেইসঙ্গে দুধের নদী বন্ধ হয়ে গেল। এই অলৌকিক ও আশ্চর্য গল্প শুনে বাদশা উজির নাজির সবাই হতবাক। সোনামোতি হাসিতে আত্মহারা। রাজা বুঝতে পারলেন যে কিস্সাটি সোনামতির মনঃপুত হয়েছে। তখন :

রাজা কহিলা উজির লিখি রাখ হক্
এ কথা যে মিছা কথা নাহি ঠক ঝক্।

যুবক একদিনের ছুটি চাইল। পরদিন বাকি মিথ্যা দুটি বলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়িতে চলে গেল। বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। কাছারিতে সভা ভঙ্গের সময় হয়ে এল। তড়িঘড়ি যুবক এসে হাজির। সভাসদ যুবককে বলল :

কী বেটা তোমার অত কেন দিরং
রাজা রাজুরার লগে করছ বুঝি ঢং!

যুবক হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি সময় মতো এখানে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছি বাদশা হুজুর। ঠিক এই সময় আকাশ কালো করে মেঘ এল। মেঘ তুফান আসতে না আসতেই ঘুড়ুৎ করে একটি বজ্রপাত হলো। আর সে সঙ্গে আমার বাড়িতে একটি অঘটন ঘটল। কী সে অঘটন? সভাসদ জানতে চাইল। উত্তরে যুবক বলল :

দাদার কাইল্যা হউল মাছ চাঙ্গে আছলা জিয়াইল
ঘুড়ুৎ ডাকে ফালদি পড়লা দিয়া লেঙ্গুর পাইল।

দাদার কালের শোল মাছ মাচায় জিয়ানো ছিল, ঝড়-তুফানে বজ্রপাতের শব্দে লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল। তখন বাড়িসুদ্ধ লোক মাছটিকে ধরার জন্য লম্ফঝম্ফ কতই দিল ধরতে পারল না। তখন বুড়ি মা আমাকে পিছু ডাক দিলেন। ডাক শুনে বাড়িতে ফিরে গিয়ে শোল মাছটিকে ধরলাম। এই দেরি হলো।

এ কথা শুনে সভাসদ সকলে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, দাদার কালের শোল মাছ কি মাচায় জিয়ানো থাকে? এমন মিথ্যা কথা বলার সাহস হলো কেমনে? রাজা শুনে বললেন :

ওখান লইয়া দু খান অইলো লেখো উজির
আরো একখান বাকি, কোনোদিন কইবো জানো নাজির।

যুবক আরো একদিনের সময় প্রার্থনা করে প্রাসাদ ত্যাগ করল। রাজা সভা পরিষদ সবাই চিন্তায় মগ্ন এই ভেবে যে শেষ কিসসাটি না বলতে পারলেই তারা অন্তত বেঁচে যান।

www.pathagar.com

এদিকে যুবক বাড়িতে এসে গ্রামের অন্যান্য যুবকের সহযোগিতায় অনেক বড় করে বাঁশ ও বেতের একটি 'টাইল' (ধান রাখার আধার বিশেষ) তৈরি করল। সবাই ধরাধরি করে রাজবাড়ি দিঘির পাড়ে টাইলটি এনে রাখল। এই বিরাট আকারের টাইল দেখে সবাই হতবাক। এটি রাজবাড়িতে স্থাপনের কারণ কী? সবার মুখে একী জিজ্ঞাসা। যুবক রাজার অনুমতি নিয়ে বলতে লাগল, রাজা সাহেব আমার দাদা আপনার দাদার সমবয়সী ছিলেন। একদা আমার দাদার কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ নিয়েছিলেন তিনি। রাজা শুনে গর্জে উঠে বললেন, তা এখন কেন? সে তো পুরনো কথা। দীর্ঘদিনের ব্যাপার। যুবক বলল :

আমাসামার তামাদি তিন বছর গেলে
রাজা বাদশার তামাদি তিন সিঁড়ি গইলে।

কাজেই দাদা থেকে এই আমি, এখন তিন সিঁড়ি চলে। তাই আপনার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করে টাকা নিতে এসেছি। রাজা বললেন, এই সংবাদ তোকে কে দিল? যুবক বলল :

আমার দাদা কইয়া গেছলা আমার বাপের ঠাঁই
আমার বাপে কইছে কথা আমি অভাগার ঠাঁই।

এই জন্য এই টাইল নিয়ে এসেছি। সুদে আসলে অনেক টাকা হয়েছে তো। তাই এই টাইল পরিমাণ টাকা আপনি দিলেই পরিশোধ হয়ে যাবে।

যুবকের কথা শুনে রাজার মাথায় পড়ল বাজ।
এত টাকা ধার হোজা কি সহজ কাজ?

সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। নীরবতা কাটিয়ে কন্যা সোনামোতি বলে উঠল :

বাপ দাদা কারো মুখে এমন কথা শুনিনি তো আমি
জিতা এক মিছা কতা যুবক শুনাইলা তুমি।

সঙ্গে সঙ্গে যুবক বলে উঠল, এই কথা মিছা যদি হইল, একে একে তিন কথা পুরা হইয়া গেল। এই তিন কথার কিসসা বলাতে সোনামোতি এই বালককে বুদ্ধিমান বিবেচনায় তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিল।

সোনামোতির কিসসা শেষ সবারে সালাম
ভুল টুক যত হইলো ক্ষেমা চাইলাম ॥

বি.দ্র. [কিসসাটি সিলেট গীতিকা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা বদিউজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮। এই গীতিকা পালাটি মাধবপুর থানার শাহাজাহানপুর নিবাসী আবু শামার কাছ থেকে মরহুম চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ সাহেব সংগ্রহ করেছিলেন। জনাব আবু শামা এটি এক ভিখারির কাছ থেকে শুনেছিলেন।]

সোনাবিবির কিসসা

একই এলাকার ছিল মামুদ ও সোনা। বয়সের দিক থেকে মামুদ সোনার কিছুটা বড় হলেও ছোটকাল থেকেই ওরা খেলার সাথি। সেই কানামাছি খেলা থেকে কিশোর বয়সে

www.pathagar.com

দুরন্ত দুপুরে মাঠে যখন মামুদ ঘুড়ি উড়াত, ঘুড়িটি উকিয়ে দিত সোনা। যেন দুই বন্ধু। এমনিভাবে হেসেখেলে পাশাপাশি বাড়িতে ওরা বড় হয়েছে।

এখন আর খেলার বন্ধু নয়। অন্তরে অন্তরে ভাব বন্ধন হয়েছে ওদের। এখন একে অন্যকে ভালোবাসে। প্রেমিক-প্রেমিকা। বয়স বাড়ায় পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ ওদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে। এখন ঘনিষ্টভাবে মেশার অবকাশ নেই।

মামুদ তাই সারাক্ষণ সুলেমানের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় সোনাকে এক নজর দেখার জন্য। সোনাকে সে ভালোবাসে। জীবনসাথি হিসাবে পাওয়ার এক অদ্যম স্পৃহায় দিন কাটায় মামুদ।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও এসে গেছে, তাই এখন সে সোনাকে চোখে চোখেই রাখে সারাবেলা।

এদিকে প্রেমাসক্ত মামুদ তার ভালোবাসার কথা সোনাকে বলে যেমনি, তেমনি সুলেমানকেও জানিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়ের প্রচণ্ড অনুরাগের কথা। সোনা ছাড়া মূল্যহীন জীবন তার।

সোনার জন্য মামুদের এই উন্মাদ অবস্থা সুলেমানকে ভাবিয়ে তুলল। লক্ষ করল সে সোনার কাজে কর্মে অন্যমনস্কতা। এ স্বস্তিহীনতার অবসান চায় সে। শেষাবধি সোনাকে মামুদের নিকট বিয়ে দিতে সুলেমান রাজি হল।

বিয়ে করে মামুদ তার স্বপ্নের প্রিয়া সোনাকে ঘরে তুলল। মামুদ এবার আহলাদে আটখানা। তাই :

সকল কাম ছাড়িয়া মামুদ ঘরেতে বসিল
সোনার লাগিয়া মামুদ পাগল হইল।

বউ পাগল মামুদ সোনা বিবির ঘুমের কালে সারারাত জেগে হাত পাখা দিয়ে গায়ে বাতাস করে। তার ধারণা :

কি জানি সোনার যদি ঘুম নাহি আসে
আবের পাঙ্খা লইয়া মামুদ জুড়ায় বাতাসে।

শুধু কি তাই :

ঝিলিমিলি মশারী টাঙ্গা তবু মনে ভয়
মশার কামড়ে যদি ঘুম নাহি হয়।

এইরুপ ভয় আর ভাবনার শেষ নেই মামুদের। ঘরের কাছে থাকা বাশঝাঁড়ের শনশন স্পন্দন, ভ্রমরের গুঞ্জন আর গাছে থাকা কোকিল-দোয়েলসহ নানা পাখিরা রাত বিরাতে যদি ডেকে উঠে এই সংশয় থেকে মামুদ কোকিলকে বলে :

ডাইককো না রে সোনার কোকিল,
বাইচ্চা দেওরে উম
তোমার ডাকে ভাইঙ্গা যাইব
আমার সোনার ঘুম।

www.pathagar.com

এবার দইয়েল পাখিকে উদ্দেশ্য করে মামুদ বলে :

শোন শোন বনের দইয়ল দিওনারে শীষ
কাঁচা ঘুমে জাগলে, সোনার মাথায় হইব বিষ।

এদিকে সোনা বিবি গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু মামুদের চোখে ঘুম নেই। সে যেন রাত জাগা এক পাখি। পলকহীন ভাবে তাকিয়ে আছে সোনা বিবির মুখ মণ্ডলের দিকে। কী সুন্দর! মুখ নয়, যেন মুখ কমল। ইচ্ছে হয় জড়িয়ে ধরে আদর করতে। কিন্তু তার ভয়। 'কি জানি ছুইতে গেলে যদি কাঁচা ঘুম' ভেঙ্গে যায়। তাই :

দুই আঁখি মেলিয়া মামুদ তিরাসে তাকায়
(অন্যদিকে) দুই আঁখি মুদিয়া কন্যা বিভোলে ঘুমায়।

এইভাবে রাত কেটে ভোর হয়। ভোরের মৃদু শীতল বাতাসে সোনার ঘুম ভাঙে। এপাশ ওপাশ হেলেদুলে সোনা বিছানা থেকে জেগে উঠে। এ দৃশ্য মামুদের চোখে :

ধীরে ধীরে পুষ্পের কলি ফুইট্টা যেন উঠে
দুই নয়ন জুড়াইয়া ঘুম আস্তে আস্তে ঠুকে।

ধীরে ধীরে সোনাবিবি বিছানা থেকে জেগে ওঠে। তারপর :

আউলা কেশ তুইল্যা কন্যা ঝাইরা বাঁধে চুল
মুখখানি যেন সোনার, ভোরের পদ্ম ফুল।

এইসব উপমার সঙ্গে তুলনা করছে মামুদ তার মানসী সোনাবিবিকে। এক সময় আবেগে আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরে স্ত্রী সোনাবিবিকে :

মুখে চুমা দিয়া মামুদ ঘরের বাহির হইল
দুয়ারেতে মা জননী দেখে লজ্জা পাইল।

নির্বোধের মতো অতিরিক্ত খুশিতে আত্মহারা হওয়া কারো পছন্দ নয়। তবু বেকুব ছেলের এসব বেলেল্লাপনা নীরবে মেনে নিচ্ছেন মা।

মামুদ সোনাকে নিয়ে এতই পাগল হলো যে, সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত সোনাবিবির সুখের চিন্তায় বিভোর থাকে। তার একমাত্র চিন্তাই কিভাবে সোনাবিবিকে খুশি করা যায়। সোনার পিছু পিছু ছায়ার মতন থেকে ভালোমন্দের নজর রাখছে। সোনা যখন :

হাইট্টা যায় সোনাবিবি কলসি কাঁখে লইয়া
চাইয়া থাকে মামুদ মিয়া হাতের কাজ থুইয়া।

আবার :

যখন নাকি সোনাবিবি রান্দিবারে যায়
মামুদ ভাবে অঙ্গ মলিন হইবে ধোমায়।

কোনোভাবেই সোনাকে মামুদ চোখের আড়াল করতে পারছে না। বরং এত দেখেও দেখার তৃষ্ণা মিটছে না। সোনাই যেন তার সর্বস্ব।

সোনা ধ্যান, সোনা জ্ঞান, সোনা চিন্তামণি।
এক নজর না দেখিলে পাগল পরানি।

www.pathagar.com

সোনাবিবি মামুদের এইসব আদিখ্যেতা দেখে বেজায় খুশি। এমনি স্ত্রীভক্ত স্বামী কামনা থাকলেও মামুদের অকারণে আতিশয্য কথাবার্তা শুনে সোনাবিবির মাঝে মাঝে মৃদু হাসি পায়। তখন :

আড় নয়নে হাসে কন্যা আড় নয়নে চায়
এই দেইখ্যা মামুদ মিয়া পাগল হইয়া যায়।

মামুদের ঘনিষ্ট বন্ধু মোমিন। সে মামুদের স্ত্রী বশ দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হলো। সে মামুদের বাড়িতে এসে তাকে বোঝালো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। স্ত্রী বশীভূত হওয়া এমন স্বামী আর কখনো দেখিনি। তাই :

আসিয়া মুমিন কয় দোস্ত এ কাম কর কী?
তোমারে পাগল কইরাছে সুলেমানের ঝি!

বন্ধু মোমিন বলল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় মহব্বত অবশ্যই থাকতে হবে। তাই বলে স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকাটা অলক্ষণের ব্যাপার। জানতো, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। আর তুমি এভাবে চললে অচিরেই সম্বলহীন হয়ে যাবে। এভাবে অনেক কথা বুঝিয়ে মামুদকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যে যাবার জন্য জোর বরদস্তি করতে লাগল মোমিন। কিন্তু মামুদ অসুখের ভান করে ঘরে ঘুমিয়ে রইল। মোমিন দমবার পত্র নয়। সে নানা উপমায় বন্ধু মোমিনকে আবার বোঝাতে লাগল–

সোনাতো চিনি মণ্ডা নয় রে দোস্ত, পিঁপড়ায় খাইবে লইয়া
কর্পুল নয় রে দোস্ত, হাওয়ায় যাইব উড়িয়া।
বনের পঙ্খি নয় রে সোনা, উড়িবে পাখায়
ঘরের বাতি নয় রে সোনা, ফুঁ দিয়ে নিবায়।
দৌলত নয় রে তোর বিবি, লোকে করব চুরি
ঘরে ঘরে এর মতো আছে কত নারী।

কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। বউকে ফেলে বিদেশে বাণিজ্যে যাবার ভয়ে মোমিন হাল বলদ কিনল চাষাবাদ মনোযোগ করতে কিন্তু ঋতু চক্রে কখন কোন মাস আসে যায়, কখন কীসের চাষ করতে হয়, সেদিকে নজর নেই। হাল চাষে সে মনোযোগী নয়। সারাক্ষণ সোনার প্রেমে বিভোর :

শাওন মাসেতে আসমান ডাকে গুরুম গুরুম
সোনারে লইয়া মামুদ পড়রা দিল ঘুম।

এভাবে আলস্যে ফসল নষ্ট হলো। অযত্নে অবহেলায় বলদ জোড়াও মারা গেল। নিষ্কর্মা মামুদের জীবনে অন্ধকার নেমে এল। ইতোমধ্যে বসন্ত রোগে মামুদের মা মারা গেলেন। আর এক নিশি রাতে আগুনে তার বাড়িঘর জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

বড়োই করুণ অবস্থা। মাথা গোঁজায় ঠাঁই নেই। বড় কষ্টে খড়কুটো সংগ্রহে যে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করেছিল, মামুদ তার শখের ধন সোনাবিবিকে নিয়ে পোড়া ভিটায় একটি মাদুর পেতে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে লাগল। এতে করে :

উপাস কাপাসে সোনার শুকায় চান্দ মুখ
এই দেইখ্যা মামুদের ফাইট্টা যায় বুক।

www.pathagar.com

ক্রমেই দুঃখ অসহ্য হলো। বন্ধু মোমিনের কথা তখন মনে পড়ল। অলসের মতো বসে না খেয়ে সে এবার বাণিজ্যে যেতে চায়। যোগাযোগ করল বন্ধুর সঙ্গে। মোমিন মামুদের কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে উঠল। বাণিজ্যের জন্য তার নৌকাটি মামুদকে দিতে রাজি হলো। মামুদ বহু কষ্টে তার মনকে শক্ত করে স্থির করল, প্রাণপ্রিয় জীবন সাথি সোনাবিবিকে তার মামা সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে বাণিজ্যে যাবে। অনেক কান্নাকাটি বিলাপ করে মামুদ তার সোনাবিবিকে মামার আশ্রয়ে রেখে স্থানীয় বাজার থেকে কিছু লাউ, কুমড়া, কচু ইত্যাদি তরকারি কিনে দূর দূরান্তের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে নৌকা ছাড়ল।

বৈঠার টানে নৌকা এগুচ্ছে ঠিকই, তবু যেন সোনাবিবির হৃদয়ের টানে নৌকা এগুচ্ছে না। একই জায়গায় স্থির হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। মামুদের মনে এরূপ ধারণা। সে সঙ্গে অঝোর নয়নে ঝরা অশ্রুবিন্দুগুলো ভেড়া মোহনা নদীতে পড়ে বুঁদবুঁদের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো শনশন দমকা বাতাসে ঝড় বইছে। ঢেউয়ে নৌকা দুলছে, এই বুঝি ডুবে গেল-ডুবে গেল। মামুদের এদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ শুরু হলো আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। আর নিমিষেই ঝড়ের গতি বেড়ে গেল। এবার মামুদের টনক নড়ল। তড়িঘড়ি করে নৌকা কূলে ভিড়িয়ে শক্ত করে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে নিল। কিন্তু ঝড়ের বেগে নৌকার রশি ছিঁড়ে অবশেষে নৌকাটি ডুবেই গেল। মামুদ জলে ভাসতে ভাসতে আধমরা অবস্থায় এক অরণ্যের কিনারায় এসে ভিড়ল। এই জঙ্গলে এক বিষধর সাপ তাকে দংশন করল। তার নিথর দেহ জঙ্গলে পড়ে রইল। আকস্মাৎ এক ওঝা সাপের সন্ধানে ঐ জঙ্গলে এলে মামুদকে দেখতে পেয়ে মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামিয়ে তাকে প্রাণে রক্ষা করল। এবার মামুদ সোনার জন্য আধা পাগল। সারাক্ষণই সোনাকে মনে পড়ছে তার। সোনার জন্য সে ব্যাকুল :

পাখা যদি থাকত রে বিধি, যাইতাম উড়ি
পরের ঘরে কেমনে আছে আমার সোনাবিবি।

এদিকে সোনা মামার বাড়িতে সুখেই আছে। পরকীয়া প্রেমে মজে সোনা মামাতো ভাইকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে। একে একে চার বছর হলো মামুদের কোনো খোঁজ খবর নেই। সোনা মা হলো। স্বামী-সন্তান নিয়ে সোনার সংসার সুখেই চলতে লাগল।

আধা পাগলা মামুদ বহুদিন পর অতি কষ্টে সেই জঙ্গল থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে এল। 'সোনা সোনা-সোনাবিবি' হাঁক দিল হতভাগ্য প্রেম পাগল মামুদ। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিচ্ছে না। ভিটে বাড়ি দেখে বাড়ি পরিচয়ের সুযোগ নেই। সোনাকে বিয়ে করার পর লোভী মামাতো ভাই ভিটে বাড়ি দখল করে সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সবই এখন অপরিচিত, এ দেখে মামুদ নিজেকে প্রশ্ন করল তবে কি আমি ভুল করে এখানে সোনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি? নাকি :

পরে নিল বাড়ি ঘর, বাপের বসতি,
বপের ভিটা নাই, কই দিমু বাতি।

www.pathagar.com

অবশেষে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হলো বন্ধু মোমিনের বাড়ি। মোমিন প্রেমবিহ্বল মামুদকে দেখে হতভম্ব। কোনো কথা যেন বলতে পারছে না। এতে মামুদ বুঝতে পারল, সোনা হয়তো তার বিচ্ছেদে মারা গিয়েছে। তাই বলল, আমার সোনা কোথায়? আমার বিরহে নিশ্চয় সে মারা গেছে! দোস্ত তার কবরটা দেখিয়ে দাও :

সেই কবরের মাটি আমি, মাইক্যা নিমু গায়
পাগল হইয়া যামু আমি চক্ষু যেদিকে যায়।
ও দোস্ত কবর দেখাইয়া দেও না আমায়।

এই বলে মামুদ বন্ধু মোমিনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মোমিন বন্ধুকে কিছুক্ষণ শান্ত করে মামুদকে নিষ্ঠুর সত্য কথা শোনাল। বলল :

কেশেতে বান্ধিয়া রাখ, কর গলার মালা
নারীরে বিশ্বাস নেই, চোখে দিবো ধূলা।
অজ্ঞান পুরুষ জাতি, নারী পুষতে চায়
সাপ ধরা বাইদ্যা যেন কালসাপ লইয়া খেলায়।

কথা শুনে মামুদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ দুঃখে ক্ষোভে নিস্তব্ধ হয়ে মাটিতে বসে রইল। বুক ফাটা দুঃখ গুমরে মরছে। মামুদ তবু ভালবাসে সোনাকে। দূর থেকে এক নজর দেখে সে তৃপ্ত হতে চায়। চোখে তার তৃষ্ণা, মনে আকাঙ্ক্ষা। তাই :

মোমিনের ঘরে মামুদ গোপনে থাকিয়া
সোনামুখের হাসি মামুদ আসিল দেখিয়া।

মামুদ ভালোবাসে সোনাকে। এ ভালোবাসা যেন খাদবিহীন খাঁটি সোনা। মামুদ সেই ভালোবাসার সিদ্ধ পুরুষ, প্রেমরাজ্যের এক তপস্বী। মামুদ সোনার ভালো চায়, সুখ-শান্তি চায়। দু হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মামুদ সোনাবিবির জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করে বলল :

সুখের ঘরের কোনায় যেন দুঃখে নাহি ঢুকে
ছাওয়াল সন্তান লইয়া সোনায় থাকুক মনের সুখে।

প্রার্থনা শেষে মামুদ মনোযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। উদাসীনতা, বিষণ্ন যেন জীবনকে ঘিরে ফেলছে তার। অতীত অস্পষ্টতা ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন :

ছেঁড়া কাথা বাইন্ধ্যা মামুদ দোস্তের বিদায় লয়
দেশ ছাড়িয়া জন্মের মতো বৈদেশি যে হয় ॥

কমলাবতীর কিসসা

বানিয়াচং একটি রাজ্য। একদা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন পদ্মনাভ মিত্র। তাঁর ডাকনাম ছিল মনাই রাজা। ধর্মপরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এ রাজ্যের প্রজা সভাসদ সবাই অত্যন্ত সুখে দিন কাটাতে পারছে বলে রাজাও অত্যন্ত খুশি ছিলেন। এ যেন এক সুখের রাজ্য।

সংসারে রাজার একমাত্র ছোট বোন কেউকা ছাড়া আর কেই বেঁচে নেই। বোনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন রাজা। সব সময় বোনের মন বুঝে চলার চেষ্টা করে নানা আবদার

www.pathagar.com

এমনকি অনেক সময় প্রজাদের প্রতি বোনের দুরন্তপনা দুরাচার হাসিমুখে সহ্য করতেন। বাবা-মা হারা একমাত্র বোনটিকে জবরদস্তি না করে ভালোমন্দ বুঝিয়ে চালাচ্ছিলেন রাজা।

মনাই রাজা কেউকা বোন এঁরা দুই জন,
মনের সুখে রাজ্য চালায় হইয়া আপন।

কেউকা খুবই দাম্ভিক ও হিংসুটে মেয়ে। সে নিজেকে সম্রাজ্ঞী হিসাবে রাজ্য পরিচালনায় যোগ্যই মনে করত। সে রাজ্যের নানা বিষয়ে রাজাকে মন্দ বুদ্ধি দিতে সচেষ্ট থাকত। রাজার অনেক ভালো জনকল্যাণকর সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করত। এ নিয়ে রাজা মনোমালিন্যে না গিয়ে কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। বোনের সঙ্গে ক্লেশে জড়াতেন না।

রাজা মনস্থির করলেন বোন কেউকাকে দূর রাজ্যে বিয়ে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবেন। এ অভিপ্রায় নিয়ে রাজা বোনের জন্য রাজপুত্র খুঁজতে পয়গাম পাঠালেন ভিন দেশে।

সাড়া পড়ল, বেশ কিছু প্রস্তাব এল। কেউকা তার সুদর্শন যোগ্য হবু বর নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতায় অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করলেও শেষাবধি সে 'মনের মানুষ' খুঁজে পাচ্ছে না এ অজুহাত তুলে মিথ্যা অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। রাজা কেউকার এ মতলব না বুঝলেও তার এ আচরণে দুঃখিত হলেন। কাঙ্ক্ষিত আশা ভঙ্গ হলো। রাজা চিন্তায় পড়লেন।

রাজার ধারণা ছিল, সংসারী হলে প্রজা পালনে অবহেলা হতে পারে। তাই বিয়ে না করে প্রজাকুলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন। কিন্তু এরই মধ্যে রাজ্যে রাজা ও রাজকুমারীর অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে প্রজাকুলে কানাঘুষা চলতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে রাজা মনস্থির করলেন কেউকার কুমারী জীবনের অবসান করতে না পারলে তিনি বিয়ে করে সংসারী হবেন এবং প্রজাকুলের চুপিচুপি উপহাস ও নিন্দা বলা বন্ধ করবেন।

একদিন রাজা তরফ রাজ্যের রঘুনন্দন পাহাড়ে হরিণ শিকারে এলেন। এ পাহাড়েই শিকারী কমলাবতীর সঙ্গে তার দেখা হলো। রাজা কুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। আলাপ-আলোচনায় তরপ রাজ আচক নারায়ণের সুদর্শন ভগ্নি কমলাবতীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হলো। রাজার বিয়ের সংবাদে রাজ্যময় আনন্দের বান বইছে। এক শুভক্ষণে মহা ধুমধামে আনন্দমুখর উৎসব পরিবেশে সকল আনুষ্ঠানিকতায় বিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রজাকুল সভাসদ সবাই আনন্দিত। কিন্তু খুশি হলো না কেবল রাজার বোন কেউকা। সে কমলাবতীর রূপ গুণে প্রতিহিংসায় দিন দিন জ্বলেপুড়ে উঠতে লাগল। সে ভাবল কমলাবতীর আগমনে রাজদণ্ড পরিচালনায় অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেল।

অবশেষে রাজা করলা বিয়া, সুন্দরী এক কমলাবতী
ননদিনী কাল হইলো, হামেশা করে রাজার ক্ষতি।

ধূর্ত কেউকা তার কেতাদুরস্ত আচরণে রানি কমলাবতীর প্রতি বাহ্যিকভাবে

www.pathagar.com

অসহযোগিতা প্রকাশ করল না। বরং সহযোগিতার ভান করে সকল কাজে এগিয়ে এল। এতে রাজা রানি আপাতত খুশি।

এদিকে পরমাসুন্দরী সতী সাধ্বী স্ত্রী প্রজাবৎসল ধর্মপ্রাণ প্রিয়ভাষিণী রাজমহিষী কমলাবতীর গুণকীর্তন অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। রাজা দম্পতির শুভ কামনায় রাজ অন্তঃপুরের সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গুণবতী রানি পেয়ে রাজাও বেজায় খুশি।

খুশি রাজা, খুশি প্রজা, পাইয়া কমলাবতী কন্যা
রাজ্যময় বইছে যেন আনন্দেরই বন্যা।

বিড়াল তপস্বী কেউকা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল এবং ক্রমে তার বৌদি রানির প্রতি বিদ্বেষবাদ বাড়িয়ে তুলল। পক্ষান্তরে রানি কমলাবতী তাঁর অনবদ্য আচরণে ননদীকে ততই আপন করে নিতে চেষ্টা করছেন। রানি তার স্বভাবসুলভ সহনশীল আচরণে কেউকার সহনাতীত যন্ত্রণাকে 'ননদের আহ্লাদী' বলে গণ্য করে রাজাকে সহাস্যে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন এভাবে বুঝিয়ে মন রক্ষা করে চলতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ননদী কাল ননদীর রূপ ধারণ করল।

কেউকা দেশ-বিদেশের জাদুকরদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করে রাজা রানিকে বশ করার চেষ্টা চালাল। এমনকী দেবদেবীদের প্রতি পূজা অর্চনা করে দৈব শক্তির সহযোগিতায় রাজ্যে যে কোনো আকস্মিক উৎপাত ঘটানোর চেষ্টায় মত্ত থাকল, যাতে করে রাজ্যে অমঙ্গলকর কিছু ঘটানো যায়। যার ফলে প্রজাকুলে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। এরূপ অশুভ কামনায় কেউকা দিন রাত চেষ্টা করতে লাগল। বৌদি রানি কমলাবতীকে সে মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

এরই মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত সারা রাজ্যের খাল বিল পুকুর শুকিয়ে গেল। রৌদ্রের প্রখর তাপে মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির। পানীয়জলের অভাবে চারদিকে হাহাকার পড়ল। প্রজাকুল ভীষণ অসন্তুষ্ট।

কাকতালীয়ভাবে এ দৈবঘটনায় সৃষ্ট জলের অভাবকে কেউকা তার জাদুবিদ্যার ও পূজা-অর্চনার ফল গণ্য করে ভীষণ খুশি। এ সুযোগে সে রাজ্যময় রানি কমলাবতীকে 'অপয়া-অলক্ষুণে নারী' বলে গুজব রটাতে লাগল। প্রজাদের কেউ কেউ এ অপবাদকে বিশ্বাস করল। রাজা রানি ভীষণ চিন্তিত। তাদের মনে সুখ নেই। রাজপুরীতে বিষাদের ছায়া।

ইতোমধ্যে দুঃখের অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে আলোর প্লাবন নিয়ে রানি কমলাবতীর কোলে এল এক অপূর্ব সুন্দর রাজপুত্র, যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

দিনে দিনে দিন পুরাইল, বছর হইল গত,
জন্মিলা এক রাজপুত, ঠিক চান্দের মতো।

রাজপুরীতে খুশির সুবাতাস বইলেও পানীয়জলের অভাবে কারো মনে আনন্দ নেই। তবে রাজপুত্রের জন্মগ্রহণ রাজ্যের জন্য এক জনকল্যাণকর সংবাদ বিবেচনায় প্রজাদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করল। তারা ভাবল, হয়তো এবার জল সংকটের নিরসন হবে। কিন্তু সে আশায় গুঁড়েবালি। ছয় মাস কেটে গেল কিছুতে কিছু হলো না। প্রজাকুল ভীষণ অসন্তুষ্ট হলো।

www.pathagar.com

রাজাও ভীষণ চিন্তিত হলেন। পুত্রের জন্মের আনন্দ মলিন রাজার কাছে, এ জল সংকটের কারণে প্রজাদের অনেক কটুকথা রাজাকে শুনতে হচ্ছে। রাজার দুভার্বনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। রাজ্যের সকল দেব মন্দিরে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

প্রজাদের দুঃখ কষ্টের ভাবতে ভাবতে এক রাতে রাজা গভীর ঘুমে অচেতন। এক নিশীথে রাজা স্বপ্নে দেখলেন দেবরাজ ইন্দ্র রাজাকে প্রজাদের জল সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নতুন দিঘি খনন করতে বলছেন।

একদিন নিশীথে রাজা ঘুমে দেখিলা স্বপন
প্রজার সুখের লাগিয়া দিঘি করিতে হইব খনন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত ভাবনায় পায়চারি করে কাটিয়ে ভোরে রানি কমলাবতীকে সর্বাগ্রে স্বপ্নের কথা শোনালেন।

স্বপন দেখিয়া রাজা ডাকিলা উজির নাজির
দিঘি কাটিতে হইবে, ধন জন কর হাজির।

দরবার ডেকে পাত্র-মিত্র সভাসদের কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন রাজা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত হলো নতুন একটি দিঘি খনন করার, কেউকা রাজার স্বপ্নের কথা মন দিয়ে শুনল। দিঘি খননের সংবাদে সে পুনরায় দেবশত্রুদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে পূজা-পার্বণ শুরু করে দিল।

রাজা নতুন দিঘি খননের দায়িত্বভার দিলেন বিশ্বস্ত গণ্ডমালীকে। প্রিয়ভাজন গণ্ডমালী রাজার আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করল। রাজ্যময় ঢোল মহরত করে ঘোষণা দিয়ে দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করা হল। এরই মধ্যে জাদুটোনায় বিশ্বাসী কেউকা অত্যন্ত গোপনে সুকৌশলে গণ্ডমালীকে অন্দর মহলে ডেকে নিয়ে নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে রানির ক্ষতি করার জন্য দিঘি খনন কালে কোদালের প্রথম কোপটি রানি কমলাবতীর নামে দিতে বলল। গণ্ডমালী অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু কেউকা তার বশে থাকা জাদু জ্বিন-দেবশত্রুদের দ্বারা তার বংশ নির্বংশ করে দেবে, এরূপ ভয়-ভীতি দেখিয়ে অবশেষে গণ্ডমালীকে রাজি করাল।

গণ্ডমালী কেউকার অশুভ তৎপরতার খবর গোপনে রাজাকে জানিয়ে দিল। কিন্তু রাজা এতে কান দিলেন না। ভগ্নি কেউকা সেটা ষড়যন্ত্র করবে রাজা এ বিশ্বাস করেননি। কেউকা গোপনে রাজজ্যোতিষীকেও হাত করে দিঘি খননের একটি অশুভ সময় নির্ধারণের জন্য বলল :

চতুর ভগ্নি কেউকা জাদু মন্ত্রে কুবুদ্ধি আটিল
কমলাকে প্রথম কোপটি দিতে কহিল।

দিঘি খননের সকল প্রস্তুতি শেষ। এবার রাজজ্যোতিষীকে ডেকে রাজা একটি শুভ সময় নির্ধারণের জন্য বললেন। রাজজ্যোতিষী মন্ত্র তন্ত্র জপ করে রাশি পুস্তিকা ইত্যাদি দেখে দিন ক্ষণ ঠিক করল। নির্ধারিত সময়ে রাজা সভাসদ পুরোহিত ও উৎসুক শত শত প্রজার উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে দিঘি খনন কাজ শুরু হলো। কেউকার পরামর্শ অনুযায়ী গণ্ডমালীর নির্দেশে খনকদের সর্দার কমলাবতীর নামে প্রথম কোপটি বসাল।

www.pathagar.com

রাজমহলের অন্তঃপুরীতে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বসে থাকা কমলাবতী তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলেন। মাছশিকারী জলের মধ্যে যেমন শিকারের জন্য কুচাঘাত করে তেমনি একটি ঘাই। সঙ্গে সঙ্গে শিশু পুত্র মায়ের কোলে চিৎকার করে উঠল। এক অজানা অশুভ আতঙ্কে রানির মন কেঁপে উঠল। এতে রানি আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস পেলেও দিঘি খননের শুভ কামনায় কষ্ট করে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিলেন।

এদিকে কেউকা অন্তরালে থেকে রানির দিকে নজর রাখছিল। রানির এ অবস্থা দেখে তার জাদুমন্ত্রের ক্রিয়া শুরু হয়েছে মনে করে সে আনন্দিত।

খনন কাজ চলছে। এক সময় রাজা প্রাসাদে এসে দেখতে পান রানি ও পুত্র সন্তানের মুখে বিষাদের কালোছায়া। রাজা কারণ জানতে চাইলেন। রানি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে স্বভাবসুলভভাবে মৃদু হেসে জবাব এড়িয়ে গেলেন। রানি ভাবলেন, দিঘি খননের এই শুভ সময়ে রাজার মনকে ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়। বরং দিঘি খননের সফলতা এবং এর নিরাভরণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করলেন।

বেশ কয়েকদিনে দিঘি খনন শেষ হলো। বেশ গভীর দিঘি। কিন্তু একি! দিঘিতে জল উঠছে না? সমগ্র দিঘির তলদেশ জুড়ে চড়ুই পাখি খেলা করছে। এ কী হলো! কেন এমন হলো? জল কোথায়...

চারদিকে একই ধ্বনি। জল নাই! জল নাই! দিঘি কেটে জল নাই। অলক্ষুণে রাজা, মনাই রাজার দেশান্তর চাই।

বানাইলা রাজায় দিঘি করিয়া কত সুন্দর,
পানি নাই পানি নাই এ কোন হুন্দর।

এ সুযোগে কেউকা রাজ্যময় রাজা ও রানির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে এবং রাজ্য পরিলানায় ব্যর্থ বলে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

দেশ-দেশান্তরে রাজার অপবাদ ছড়িয়ে পড়ল। প্রজাদের অশোভন উক্তি ও আচরণে রাজা বিচলিত বোধ করলেন। রাজার মুখে হাসি নেই। কথা নেই। রাজার মান সম্মান সব ধুলোয় মিশে গেল। কী করে প্রজাদের মুখ দেখাবেন। রাজা যেন দুঃখের সাগরে ডুবে আছেন। দুশ্চিন্তা ও দুভার্বনায় রাজা পাগলপ্রায়। রাতের ঘুম হারিয়ে গেল।

মহাচিন্তায় পড়লেন রাজা আহার নিদ্রা ছাড়ি
পানি ছাড়া দিঘি হইলো উপায় কী যে করি।

এক রাতে রাজা বিছানা ছেড়ে বাগানবাড়ির ফুল বাগিচায় পাগলের মতো ঘুরাফেরা করতে করতে এক সময় তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটি বাগিচার হেলান বেঞ্চে বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুমে অচেতন রাজা। এবার স্বপ্ন দেখলেন, দেবরাজ ইন্দ্র রাজাকে এসে বলছেন রানি কমলাবতীকে দিঘিতে বির্সজন দিলে জল উঠবে। নইলে নয়।

একদিন শোনেন রাজা এক দুঃখের দৈব বাণী
দিঘিতে নামিলে কমলা আপনি উঠবে পানি।

এমনি রাজার ঘুম ভেঙে গেল। এদিকে রানি রাজাকে প্রাসাদে না পেয়ে বাগানে এসে বেঞ্চে শায়িত দেখে স্বামী সোহাগী রানি রাজাকে জড়িয়ে ধরে মহলে নিয়ে অতি আদরে

www.pathagar.com

বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বিছানা পেয়েও ঘুম আসছে না। বারবার মনে পড়ছে দেবরাজ ইন্দ্রের বাণী। আর ভয়ে শরীর শিউরে উঠছে। দুচোখে অশ্রু ছলছল করছে। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

রানি নানাভাবে রাজাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা চালালেন। বললেন, এ একটি দৈব বিড়ম্বনা। কপালের লিখন ছিল তাই হচ্ছে। নইলে এত সুন্দর দিঘি খননের পরেও জলশূন্য হবে কেন? স্রষ্টা এ অলৌকিক ঘটনায় আমাদের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় ফেলেছেন। যেভাবে হোক স্রষ্টাই এ থেকে রক্ষা করবেন। এই বলে কমলাবতী প্রাসাদে পূজাগৃহে স্থাপিত দেবী মূর্তিতে ভক্তি জানালেন।

রাজা মনে মনে ভাবলেন স্বপ্নে প্রাপ্ত দৈব বাণীটি কমলাবতীকে বলবেনই। কিন্তু পত্নী বৎসল রাজা কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারছেন না। জিহ্বা যেন নাড়তে পারছেন না। এ নিষ্ঠুর আদেশ কীভাবে বলবেন, এ অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে তার মন প্রতিনিয়ত। দুর্বিষহ হয়ে উঠছে তার জীবন।

রাজা অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে স্বপ্নপ্রাপ্ত দেবরাজ ইন্দ্রের স্বপ্নাদেশ রানিকে বললেন। রানি কথাটি শোনামাত্রই উত্তম প্রস্তাব বলে রাজি হয়ে গেলেন। স্বামী সোহাগী রানি কমলাবতী রাজাকে বললেন, আমি তো আপনার সাথি, সমদুঃখী। নিরীহ প্রজাকুলের দুঃখ লাঘবের জন্য রাজ্যের মঙ্গলার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের এ আদেশ পালন করা যে আমার কর্তব্য রাজা। রাজা রাজি নন, বরং তিনি দিঘি ভরাট করে ফেলতে প্রস্তুত হলেন।

এ কথা শুনে কমলা করিলা আপত্তি
পানির লাগি নামতে রাজি প্রাণ যায়ও যদি।

রানি কমলাবতী কিছুতেই দিঘিতে মাটি ভরাট করতে দেবেন না। তিনি সময় নষ্ট না করে আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রস্তুতি নিলেন। রাজপুরোহিত ডেকে রানি বিসর্জনের দিন ক্ষণ ঠিক করলেন ও রাজ্যময় তা প্রচারের ব্যবস্থা নিলেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই দিঘির পাড়ে জড়ো হলো। অলৌকিক দৈববাণী চির দুর্লভ, এ ঘটনা দেখতে উৎসুক জনতার বিপুল সমাবেশ ঘটল।

রানি কমলাবতী তাঁর ছয় মাসের ছেলেকে শেষবারের মতো দুধ পান করিয়ে অন্দর মহলের ধাত্রী রেণুকার কাছে তার লালন পালনের দায়িত্ব দিয়ে সখী দাসী বেষ্টিত হয়ে হাসিমুখে হেঁটে হেঁটে দিঘির পাড়ে এলেন। প্রজাকুল গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে, মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে রানিকে স্বাগত জানায়।

পুরোহিতের কাছে রাজা অপেক্ষমান। হাতে তার একটি লাল জবা ফুলের মালা। পুজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্বামীকে শেষ প্রণাম জানাতে রানি এগিয়ে এলে রাজা জবা ফুলের মালাটি রানির গলায় পরিয়ে দেন। বেদনাবিধুর বিদায় ক্ষণটি যেন চৈত্রের দুপুরের মতো স্তব্ধ। দিঘির চারপাড়ে এত লোক সমাগম ঘটেছে তবু কোলাহল নেই। নীরব, নিস্তব্ধ চারদিক। সবার অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি রানি আর দিঘির দিকে।

ধীর পায়ে রানি এগিয়ে যাচ্ছেন দিঘির ঘাটে। এবার বেজে উঠল শঙ্খ ও কাসাধ্বনি। উপস্থিত পুরনারীদের কণ্ঠ থেকে উলধ্বনি ঝংকৃত হতে লাগল।

www.pathagar.com

ছয় মাসের শিশুপুত্র মহলে রাখিয়া
দিঘিতে কমলাবতী গেল যে নামিয়া।

রানি পা রাখলেন প্রথম সিঁড়িতে। আর অমনি দিঘির তলদেশ হু হু করে জল উঠতে লাগল।

একেক সিঁড়ি নামে কমলা পিছন ফিরে চায়
খলখলাইয়া উঠে পানি উৎলাইয়া যে আয়।

সেইসঙ্গে মহলে লুকিয়ে থাকা কেউকার শরীরে জ্বালা ধরল। রানি যতই সিঁড়ি বেয়ে নিচে পা বাড়াতে লাগলেন, জল ততই বেড়ে উঠছে। এভাবে রানি কমলাবতীর পা-হাঁটু-কোমর-বুক ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত জলে ভরপুর হয়ে উঠল।

এক সিঁড়ি দুই সিঁড়ি তিন সিঁড়ি নামে
পা হাঁটু গলা তার পানিতে ভিজে।

রানি মধ্য দিঘিতে গিয়ে তাকিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলেন রাজা রাজ্য ও তার প্রজাকুলকে। দুহাত ওপরে তুলে অভিবাদন জানাতে জানাতে এক সময় হাত দুটি জলে ডুবে গেল। আর রানিকে দেখা গেল না।

ডুবিল ডুবিল কমলা দেখা নাহি যায়
ভরিল দিঘির জল কানায় কানায়।

দিঘির কানায় কানায় জলে থৈ থৈ করছে। সেইসঙ্গে রাজমহলে লুকিয়ে থাকা কেউকা জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

টীকা : এই কাহিনিটির শেষটা বিভিন্নভাবে বর্ণনা দিয়ে বিভিন্ন লেখক ইতি টেনেছেন। যেমন :

ক. রানি কমলাবতী দিঘির জলে ডুবে যাওয়ার কিছুদিন পর রাজা পুনরায় স্বপ্ন দেখলেন রানি তাকে বলছেন, 'রাজকুমারকে দুধ খাওয়ানোর জন্য প্রতি রাতে দিঘির পাড়ে এসো, কিন্তু কোনোক্রমেই আমাকে স্পর্শ কোরো না। তাহলে আমাকে চিরদিনের জন্য হারাবে। আর দেখতে পাবে না। কথামতো রাজা শিশুপুত্র কোলে নিয়ে প্রতি রাতেই দিঘির ঘাটে এসে রানির দেখা পেয়ে শিশুকে দুধ খাইয়ে নিয়ে যেতেন। একদিন হঠাৎ রাজা রানির প্রতি স্নেহ কাতর হয়ে রানিকে জড়িয়ে ধরে আটকানোর চেষ্টা করেন। সেই থেকেই রানি চিরতরে হারিয়ে গেলেন। কমলাবতীর দিঘি এলাকাবাসীর কাছে 'কমলারানির দিঘি' বা 'সাগরদিঘি' নামে পরিচিত। বানিয়াচং গ্রামে আজো দিঘিটি বর্তমান।

খ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত গুরু সদয় দত্ত ও ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত 'শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত' গ্রন্থে ৪১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, কমলাবতীর দিঘির কাহিনি সত্য ছিল। এখন আর সেটি শোনা যায় না এবং এর সংগ্রহ বিলুপ্ত। তবে এলাকাবাসী মনে কমলাবতীর দিঘির ঘটনাটি সত্য বলেই বিশ্বাস।

গ. বানিয়াচং নিবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক অ্যাডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল ও বিশিষ্ট লেখক অ্যাডভোকেট শাহজাহান বিশ্বাস কমলাবতীর কিসসা নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় কাহিনী প্রচার করেছেন।

ঘ. গ্রন্থের লেখক কাহিনিটি এর কাছ থেকে শুনে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পর্যালোচনা করে কাহিনি বিন্যাস করেন। কাহিনির পদ্যাংশগুলো লেখক কর্তৃক প্রণীত।

www.pathagar.com

আলাল দুলালের কিসসা

প্রাচীন বানিয়াচং রাজ্যে সোনাফর আলী দেওয়ান নামে একজন জমিদার ছিলেন। স্ত্রী ও আলাল, দুলাল– দুই শিশুপুত্র নিয়ে সোনাফর দেওয়ান বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে সুখে শান্তিতে বাস করছিলেন। পর্যাপ্ত ধন-দৌলত ও গোলা ভরা ধানে এ রাজ্যে তার সমতুল্য কেউ ছিল না। তাঁর কথায় :

বাইন্যচুংগের দেওয়ান আমি নাহি মোর সমান
অদুন্যাই ধন দৌলত গোলা ভরা ধান ॥

কিন্তু এই ধন দৌলত তাকে বেশিদিন সুখ দিতে পারল না। অসুস্থ হয়ে স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে শিশুসন্তান দুটি মা হারা হয়ে গেল। দেওয়ান ভীষণ অসুবিধায় পড়লেন।

দুইনা ছেউরা ছাওয়ালে বুকেতে ধরিয়া
সোনাফর মিয়া কান্দে মাথা থাপাইয়া ॥

আলাল দুলাল মা মা বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, তারা আহার নিদ্রা ছেড়ে দিনরাত কেবল কান্না কাটি করছে।

কান্দিয়া কান্দিয়া তারা মাটিতে লুটায়
দানা পানি ছাইড়া কেবল করে হায় হায় ॥

স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে সোনাফর দেওয়ানের মাথায় হঠাৎ করে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তার ভাবনা, স্ত্রী শুধু মরেই যায়নি, মেরেও গেছে। স্বামী-সন্তানসহ তিনটি জীবন নষ্ট করে গেছে।

মইরা না গেছে আওরাত গিয়াছ মরিয়া
তিন্‌লা পরানি মইরা গেছ পলাইয়া ॥

এসব চিন্তায় সোনাফর এত বেশি অভিভূত যে, সংসারজীবন তাঁর কাছে অসাড় মনে হচ্ছিল। বিপুল বিষয়-সম্পত্তি কিছুই তাঁকে সুখ দিতে পারছে না। তাঁর মনে প্রশ্ন, মনে শান্তি না থাকলে কীসের এই দেওয়ানগিরি?

কী করিব ধন-দৌলতে আর কী ছার দেওয়ানি
দিলের দুঃখেতে যদি চক্ষে ঝরে পানি ॥

দুঃখে-চিন্তায় দিন দিন ভেঙে পড়ছেন দেওয়ান। তার মানসিক বিষণ্নতা বেড়ে চলেছে, সন্তান দুটির জীবন বাঁচানোই তার মূল চিন্তা। কেননা :

মা মা বইল্যা যখন আলাল দুলাল কান্দে
বুকেতে আমার হায় রে ছেল যেমন বিন্ধে ॥

সন্তানের প্রতি পিতার এই মমতা ও দায়িত্ব বোধই সোনাফর বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তার জীবনে যে শুন্যতা, বিষণ্নতা এসেছে, তার বুকে যে এক অজানা কষ্ট অনুভব হচ্ছে, এ যন্ত্রণা ভুলেছেন কেবল সন্তানদের মুখের দিকে চেয়েই। আর তাই তিনি নিঃসঙ্গ থাকার সিদ্ধান্ত নেন। নইলে :

তোমার পিছ লইতাম আমি এই আছিল মনে
দুধের বাচ্চা রাইখ্যা গিয়া ফালাইল্যা বে-নালে ॥

www.pathagar.com

এই বে-নালে পড়েই আজ দেওয়ানের সংসার-বিষয়-আশয় দিন দিন ছারখার হতে বসেছে। কোনো কাজেই মন নেই, দিবানিশি মনে দুঃখের আগুন জ্বলছে।

দেওয়ানের এই অবস্থা দেখে উজির নাজির, পাড়াপড়শি মুখ খুললেন। তারা দেওয়ানকে বোঝাতে লাগলেন। বললেন, এই সুন্দর সাজানো গোছানো সোনার সংসার আজ নষ্ট করে দিচ্ছেন। মানুষ মরণশীল, মৃত্যুকে রুখবার কারো শক্তি নেই। তাই বলে স্ত্রীর মৃত্যুতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, এ ঠিক নয়। এমনি অনেক কিছু বুঝিয়ে অবশেষে তারা পরামর্শ দিলেন :

আর এক সংসার কইর‌্যা রাখ্যয়াইন দেওয়ানি বজায়
একজনের লাইগা কেন সগল জলে যায়।

আত্মীয়স্বজনের এই প্রস্তাব শুনে দেওয়ান কেঁদে অস্থির। দেওয়ান শিশু আলাল দুলালের কথা তুলে বললেন :

তারার দুঃখ দেইখ্যা আমার ফাইট্টা যায় বুক
শাদি করলে অইবো দুঃখের উপর দুঃখ।

কাজেই দেওয়ান বিয়ে করে সংসারে সৎ মা এনে সন্তানের দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাইলেন না। উপরন্তু মনে পড়ে গেল মৃত্যু পথযাত্রী স্ত্রীর কথাগুলো :

সত্য কর প্রাণপতি, শক্ত কর হিয়া
আমি নারী মইরা গেলে, আর না করিবো বিয়া ॥

শয্যাশায়ী মা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সময়েও সন্তানের সুখ-দুঃখকে ভোলেননি। তাঁর প্রতিনিয়ত সন্তানের কথাই মনে পড়েছে। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তায় মৃত্যুপথযাত্রী মা প্রিয়তমা স্বামীকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে বুঝিয়ে বলেছিলেন :

সোনার কলি আলাল-দুলাল, তারার দিকে চাইয়া
আমার মাথা খাও পিয়া, আর নাই যে কর বিয়া ॥

মা জানেন, দেওয়ান আবার যদি বিয়ে করে সংসারে সৎ মা আনেন, তাহলে আলাল দুলালের মার অনাদর ও লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। জননীর এ আশংকা অমূলক নয়। যেহেতু :

মায়ে জানে পুতের বেদন, অন্য জানবো কী?
মায়ের বুকে লউ হইল পুত আর ঝি ॥

মাতা আর বিমাতা এক নয়। তাই মা শত কষ্টের মধ্যেও তাঁর স্বামীকে সতিনের একটি করুণ কাহিনি শুনিয়ে চন্দ্র-সূর্য, কোরআন-কিতাবকে সাক্ষী রেখে অন্তিমকালে অনুরোধ করে গেলেন, তার মৃত্যু পর স্বামী যেন আর বিয়ে না করেন। তিনি কসম দিয়ে বলেছিলেন :

রাখ মোর কথা পিয়া, আরে মোর মাথা খাও
ছেউরা পুতেরার পানে আঁখি মেইল্যা চাও ॥

দেওয়ান মৃত স্ত্রীর কথা রাখবেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে রাজি না হওয়ার ইচ্ছাই পুনর্ব্যক্ত করে বললেন :

www.pathagar.com

আলাল দুলালেরে বিবি আমায় সঁইপ্যা দিয়া
শাদী না করতে গেল মানা যে করিয়া ॥

এই কথা শুনে উজির নাজির, আত্মীয়স্বজন পুনরায় বোঝাতে লাগল যে, সকল সৎ মা সংসারে এক রকম হয় না। কেউ কেউ সত্যই পুত্রদের প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে। আদর যত্নে ভরে তোলে সংসার। আর যদি অগত্যা বিমাতা বাস্তবিকই বিরূপ হয়ে সংসার সন্তানের ক্ষতির চিন্তা করে, তাহলে তাঁরাতো আছেন। তাঁরা বেঁচে থাকতে আলাল দুলালের অযত্ন বা ক্ষতি হতে দেবেন না। তাঁরা দেওয়ানকে আরো বললেন :

দিলের দুঃখ দুর করিয়া, করখাইন এক বিয়া
সোনার সংসার পালখাইন যতন করিয়া ॥

এসব যুক্তির কথা শুনে দেওয়ান চিন্তায় পড়লেন। অনেক ওজর-আপত্তির পর আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীদের পরামর্শে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন :

মনস্থির কইর‍্যা দেওয়ান অইল্যা সম্মত
শাদি হইয়া গেল পরে যেমন বিহিত ॥

পুনরায় বিবাহ করে নতুন বিবি ঘরে আনলেন, কিন্তু দেওয়ান আলাল দুলালকে বিমাতার কাছে যেতে দিলেন না।

সতাইয়ের কাছে তারারে না দেয় যাইতে
আলগা রাখিয়া পুতে পলে সুবিহিতে ॥

নিজের কাছে রেখে আগের মতো আদর-যত্নে সন্তানদের প্রতিপালন করতে লাগলেন। বাবার তত্ত্বাবধানে ছেলেদের লালনপালন করাকে নতুন বউ ভালো চোখে দেখলেন না। স্বামীর এই অতিরিক্ত পুত্র সোহাগ দেখে বিবির মনে হিংসা জাগল। বিবি ভাবলেন, দেওয়ান ছেলেদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকছেন। তাঁর দিকে নজর নেই। তাহলে তাঁর সন্তান জন্ম নিলে অনাদর পাবে এবং বিষয়-সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব হবে। তাই যে কৌশলেই হোক পথের কাঁটা দুর করতে হবে। মনে মনে এ সিদ্ধান্ত নিলেন বিবি।

যতদিন না পারি এ কাঁটা দুর করিতে
ততদিন সুখ নাই মোর নছিবে ॥

এই ভেবে বিবি নতুন কৌশল আঁটলেন। এক রাতে হঠাৎ কান্না শুরু করলেন। শেষাবধি বিলাপ জুড়ে দিয়েছেন। দেওয়ান বিচলিত হয়ে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। বিবি চোখের পানি মুছে কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন :

আলাল দুলাল মোর সতিন পুত বলিয়া
আমার নজর ছাড়া রাইখ্যাছ করিয়া ॥

বিবি আলাল-দুলালকে দেখতে পারছেন না, তাদের সেবা-যত্ন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিজের সন্তান হয়েও তিনি যে, আলাল-দুলালের মুখ দেখে সন্তানের দুঃখ ভুলে থাকতে চান। তাদের কাছ থেকে মা মা ডাক শুনতে চান। ছেলে দুটিকে তার চোখের অগোচরে রাখা হয়েছে বলে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, তার বদনাম রটছে ইত্যাদি বলে বিবি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং স্বামীর পায়ে মাথা কুটতে লাগলেন :

পায়েতে ধরিয়া বিবি জুড়িল কান্দন
পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন ॥

www.pathagar.com

এ ছলনা-কান্না, এ যে অভিনয় দেওয়ান বুঝতে পারলেন না। সরল বিশ্বাস করলেন। এতে তার মন গলে গেল। বিবির চোখের পানি মুছে দিয়ে দেওয়ান বললেন, 'দুই ছাওয়াল আইন্যা দিবাম কালুকা সকালে।' কথামতো পরদিন ভোরে আলাল দুলালকে তাদের বিমাতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিমাতা সন্তানদের আদরে গ্রহণ করলেন এবং আদর-যত্নে লালন করতে লাগলেন। তাঁর এ ভালো ব্যবহার যে ভণিতা তা কেউ বুঝতে পারল না। বরং সবাই সন্তুষ্ট। দেওয়ানও ভীষণ খুশি। খুশিতে সংসার চলতে লাগল। আর বকধার্মিক সৎমা বুদ্ধি খুঁজতে লাগল কীভাবে পথের কাঁটা এই শিশুদের সংসার থেকে বিদায় করা যায়।

দুশমান সতিন পুতে খেদাই কেমনে
দিবানিশি তার কেবল এই চিন্তা মনে ॥

এল শ্রাবণ মাস। বর্ষার পানিতে নদী-নালা মাঠ-ঘাট ভরপুর। জলে একাকার হয়ে আছে ভাটি অঞ্চলের হাওর বিল আর নদ-নদী। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা সৎমা এবার ফন্দি করলেন, সন্তানদের মনোরঞ্জনের জন্য নৌকাবাইচ দেখানোর ছলনা করে হঠাৎ একদিন একটি সাজানো ময়ূরপঙ্খি নায়ে আলাল দুলালকে তুলে দিলেন। নৌকার কাণ্ডারি এক জল্লাদ। গোপনে তার সঙ্গে সৎমা মোটা অঙ্কের বখশিসের লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছেন, এক গহিন নির্জন হাওরে আলাল-দুলালকে হত্যা করার জন্য।

সাইজাইয়া কুমাররে নায়ে দিল তুলি
জল্লাদ অইলো সেই নায়ের কাড়ালি ॥

নৌকা এগিয়ে চলল। খাদ্যসামগ্রী মজুদ রয়েছে, মনোরম আরাম বিছানা। তবু যেন অজানা এক ভয়, কেউ কাউকে কিছু বলছে না। এক ভাই অন্য ভাইকে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। দাঁড় বাইতে বাইতে নৌকা এক দরিয়ায় পড়ল। চারদিক নির্জন, কেবল পানি আর পানি। যত দূর চোখ যায়, গাঁও-গেরামের কোনো চিহ্ন নেই। এমনি এক স্থানে নৌকা পৌছলে :

তখন জল্লাদ কয় কুমার দুইয়ে জনে
ইয়াদ করো আল্লার নাম মরণের আগে ॥

নৌকার কাড়ালির (জল্লাদ) মুখে এ কথা শুনে আলাল-দুলালের শিশু মন আঁতকে ওঠে। চেয়ে দেখে জল্লাদের দু চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে। তার ভয়ংকর রূপ দেখে তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। জল্লাদ এবার বলল :

তোমরার ঝম আমি সম্মুখেতে খাড়া
আমার হাতেই দুইজন যাইবা যে মারা ॥

এই বলে জল্লাদ একটি রামদাও উঁচু করে ধরল। আলাল দুলাল ভয়ে কম্পমান। তারা বুঝতে পারল এ সৎমায়েরই ফন্দি। এখন নিরুপায়। জীবন তাদের দিতেই হবে। কে আগে প্রাণ দেবে এ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেল।

আলাল কান্দিয়া কয়, জল্লাদের পায়ে ধরি
আমারে মারিয়া দেও, দুলালেরে ছাড়ি ॥

www.pathagar.com

শুনে :

দুলাল কয় শুনো জল্লাদ, রাখো মোর কথা
ভাইয়ের না মাইর, আমারে মার দিয়া ব্যথা ॥

এই বলে আলাল দুলাল জল্লাদের পায়ে ধরে অনুরোধ করতে থাকে। তাদের চোখের জলে জল্লাদের পা ভিজে গেল। জল্লাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল :

জল্লাদ কুদিয়া কয়, একি যন্ত্রণা
দুইজনেরই মারবাম, না শুনিবাম মন্ত্রণা ॥

দুই ভাই জল্লাদের পা ছাড়ছে না। আগে আমাকে মারো-আগে আমাকে, এই বলে। তারা কেঁদে জরজর। জল্লাদের ধারালো অস্ত্র রামদা হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল। দুই ভাইয়ের কান্নায় জল্লাদের পাথরের মন গলতে শুরু করল। তার মনে মায়া জাগল। সে ভাবল, 'বিনা দোষে মাইরা ফেলে, যাই পাপ করতে।' প্রাণে না মেরে আলাল-দুলালকে বহুদূরে কোথাও নির্বাসিত করার মনস্থ করল।

এক ব্যাপারী ধান কিনতে এ পথে উজান বেয়ে নৌকায় যাচ্ছিল। জল্লাদ তাকে ডেকে বলল সন্তানদের গোপন কাহিনি। ব্যাপারী কাহিনি শুনে আদর করে দুই ভাইকে তার নৌকায় তুলে নিল।

আলাল দুলালে সাধু তুইল্যা ভাসায় নায়
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চইল্যা যায় ॥

এ ব্যাপারী এই দুইশিশুকে নিয়ে ইয়াদর আলী ব্যাপারীর বাড়িতে উপস্থিত হলো। ধনুয়া নদীর তীরে কাজলকান্দা গ্রামের বড় গৃহস্থ তিনি। গৃহস্থ তাঁর গোলা থেকে এক শত পুঁড়া ধান দিয়ে আলাল-দুলালকে ব্যাপারীর কাছ থেকে কিনে নিল। দুভাই তখন থেকে এই গৃহস্থের বাড়িতে রাখালের কাজ করে যেতে লাগল।

আলাল দুলাল থাকে সেই না বাড়িতে
দেওয়ান পুত হইয়া কত কষ্ট কপালেতে।

এত কষ্ট আলাল সহ্য করতে পারল না। একদিন সে মনের দুঃখে সুযোগমতো পালিয়ে গেল।

সেকান্দর দেওয়ান নামে একজন জমিদারের বাড়ি ছিল ধনুয়া নদীর অন্য পাড়ে। তার ছিল বনমহাল ও জলভূমি। পাখি শিকারের শখ ছিল তার। বনে শিকার করতে এসে সেকান্দর দেখতে পেলেন আলাল একটি গাছের নিচে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। রাজপুত্রের মতো চেহারা দেখে সহৃদয় দেওয়ান তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। দেওয়ান আলালকে ছেলের মতোই স্নেহ করতে লাগলেন, সেও সাধ্যমতো দেওয়ানের সেবায় নিয়োজিত থেকে দিনযাপন করতে লাগল। মাসিক বেতন দিতে চাইলে আলাল বলল :

একদিন চাইবাম মায়না, রাখবাইন মনেতে
সেই দিন পাই যেন, আমার হাতে ॥

সেকান্দর দেওয়ানের দুটি মেয়ে– মুমিনা ও আমিনা। দেওয়ান ভাবলেন এক মেয়ে সঙ্গে আলালের বিয়ে দেবেন। এই ভেবে বংশ পরিচয় জানতে চাইলে আলাল বলল, সে এক গৃহস্থের ছেলে। দেওয়ানের বিশ্বাস হলো না।

www.pathagar.com

এমন বেটা অইল কোন গিরস্থের ঘরে
বিশ্বাস না করে দেওয়ান কেবল চিন্তা করে ॥

দেওয়ান চিন্তায় পড়লেন। শেষে কুল পরিচয় বিহীন ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করা থেকে তিনি বিরত থাকলেন। তবে বিশ্বাসভাজন হিসাবে তাকে দেওয়ান দিয়াড়া মহালের দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আলাল প্রভুর স্বার্থ রক্ষায় দায়িত্ব বারোটি বছর অতিক্রম করল।

একদিন আলাল সেকান্দর দেওয়ানের কাছে তার বারো বছর চাকরির বেতন এক সঙ্গে দিতে বলল। উত্তরে :

দেওয়ান খুইচ করে আলাল কিবা মায়না নিবা
দিবাম তোমারে–তুমি যেবা চাহিবা ॥

সেকান্দর জিজ্ঞেসা করলেন, আলাল তুমি কত বেতন চাও? যা চাইবে তাই দেব। উত্তরে সে অর্থ কড়ি চাইল না। বানিয়াচং শহর সংলগ্ন একটি বাড়ি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আর সেটি বানিয়াচঙের দেওয়ান সোনাফরের সঙ্গে লড়াই করে জায়গা দখল করতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত ফৌজ ও প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহের দাবি জানাল।

এতে দেওয়ান সাহেব অইয়া সম্মত
আলালের মনের বাঞ্ছা করিলা পূর্ণত ॥

দেওয়ান তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন।

এদিকে সোনাফর দেওয়ান আলাল-দুলালকে হারিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান জন্ম নিলেও বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীর হাতে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে দেওয়ান একদিন মারা গেলেন।

লোক-লস্করসহ আলাল বানিয়াচং এল। তার সৎভাই বানিয়াচঙের বর্তমান দেওয়ান বাধা দিতে এলে অতি সহজেই তাকে পরাজিত করে আলাল দেওয়ানি অধিকার করল।

দখল করিয়া পরে সেই বানিয়াচং শহর
আলাল হইলো দেওয়ান, বাড়িতে বাপর ॥

আলালের বানিয়াচং দখলের খবর পেয়ে সিকান্দর দেওয়ান বানিয়াচং এসে আলালের কাছে তাঁর এক মেয়ের বিয়ে প্রস্তাব করল :

শুইন্যা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে
আমার আরেক ভাই দুনিয়াতে আছে ॥

ভাইয়ের খোঁজ যদি পাই, তবে দুভাই আপনার দুই মেয়েকে বিয়ে করব। আমি ভাইয়ের খোঁজে যাচ্ছি। আপনি এ রাজ্যে দেখে রাখবেন। আলাল-দুলালের খোঁজে বের হলো।

বহু খোঁজ খবর করার পর এক গ্রামে এসে আলাল দুলালের খোঁজ পেল। একটি গৃহস্থ বাড়িতে সে বসবাস করছে :

গিরস্তের বাড়িতে আলাল দুলালে দেখিলো
সামনাসামনি করে তারার পরিচয় অইলো ॥

www.pathagar.com

দেখা-সাক্ষাতের পর আলাল বলল, 'শোন পরানের ভাই, দেওয়ানগিরি ছাড়ি দিয়া গিয়া চল বাড়ি যাই।' দুলাল সংকটে পড়ল। সে ইতিমধ্যে মদিনা নামে এক গৃহস্থ কন্যাকে বিয়ে করে এখানে বসবাস করছে। সুরত জামাল নামে তার একটি ছেলে রয়েছে। গৃহস্থ তাকে কিছু জমিজমাও দিয়ে গেছেন। এখন কীভাবে বউ-ছেলে ছেড়ে যাবে। এতে যে অধর্ম হবে।

শুইন্যা আলাল কয় শুন দুলাল ভাই
তালাকনামা লিইখ্যা গেলে অধর্ম কিছু নাই।

স্ত্রীকে তালাক দিতে অধর্ম নেই। আর বিয়ের জন্য ভেবো না। আমরা দুভাই এক দেওয়ানের দুকন্যাকে বিয়ে করব। এ বাড়ি ছেড়ে এখনি চল। দেওয়ান-পুত্র হয়ে এভাবে চাষার ঘরে, চাষা হয়ে থাকবে! ইজ্জত যদি না থাকে তবে কীসের জীবন সংসার, বেঁচে কী লাভ! ইত্যাদি বলে আলাল বোঝাতে লাগল। মানসিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও ভাইয়ের কথায় অবশেষে দুলাল মদিনার ভাইকে কাছে ডেকে এনে কথাগুলো বলল এবং তালাকনামা লিখে মদিনাকে দিতে তার হাতে তুলে দিল।

মদিনার সাথে আর দেখা না করিয়া,
আলালের সঙ্গে দুলাল গেল যে চলিয়া ॥

আলাল দুলাল বানিয়াচং চলে এল এবং কথামতো সেকান্দর দেওয়ানের দুকন্যাকে এক শুভ লগ্নে মহা ধুমধামে দুভাই বিয়ে করল।

মুমিনারে আলাল, আর দুলাল আমিনারে,
শরা মতে বিয়ে কইরা আইলো নিজ ঘরে ॥

এদিকে ছোটভাইয়ের কাছে থেকে মদিনা তালাকনামা পেল। মদিনা তালাকনামা বিশ্বাস করল না। তার স্থির বিশ্বাস স্বামী তাকে কখনোই ছেড়ে যেতে পারে না, বরং তালাকনামা দিয়ে সে চালাকি করে মদিনার ভালোবাসার গভীরতা যাচাই করছে। মদিনা হাসি তামাশা করে তালাকনামা উড়িয়ে দিল। সহসাই ফিরে আসবে স্বামী– এ আশায় সে দিন গুনতে লাগল :

আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত পোয়াইয়া ॥

বহুদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর দুলাল ফিরে না আসায় মদিনা, তার ভাই ও ছেলে সুরত জামালকে বানিয়াচং পাঠাল। বানিয়াচং এসে তারা দুলালের সাক্ষাৎ পেল। কিন্তু দুলাল তাদেরকে খুশিমনে গ্রহণ করল না, বরং দুঃখিত হলো। তাদের পরিচয় এখানেই জানাজানি হলে তাঁর আভিজাত্যের হানি হবে; সমাজে তার মাথা হেঁট হবে–এই ভেবে দুলাল তাদেরকে বাড়িতে গিয়ে খেতখামারে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বলল :

জলদি চইল্যা যাও মোর পানে চাইয়া,
শরম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া ॥

অপমানিত হয়ে মনে দারুণ দুঃখ নিয়ে বাড়ি ফিরল তারা। মদিনা তার ছেলে ও ভাইয়ের মুখে দুলালের এই নির্দয় আচরণের কথা শুনে নিদারুণ দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কাতর স্বরে বিলাপ করতে লাগল মদিনা। তার এত ভালোবাসা, এত সোহাগ

www.pathagar.com

আজ সবই মিথ্যা! বনের পাখিকে সোনার পিঞ্জিরায় রেখে সে যেন এতদিন পুষেছিল। এত দুধ কলা সবই বিফল। আবার বনের পাখি হঠাৎ উড়ে বনে চলে গেছে :

মদিনা কান্দে আল্লাহ কী লেখছো কপালে,
বনের পঙ্খি অইয়া উইড়া গেল চইলে ॥

মদিনা একটি মুহূর্তের জন্য স্বামী দুলালকে ভুলতে পারছে না। এই দরিদ্রের সংসারে কতই না দুঃখ ভাগাভাগি করে নীরবে সহ্য করে কাটিয়ে দিয়েছে তারা। তাদের পরস্পরের অটল বিশ্বাস আর ভালোবাসাই ছিল ধৈর্যের মূল। এ ভালোবাসা দিয়েই জয় করেছে দুঃখকে। কিন্তু এ বিচ্ছেদের দুঃখ সে আজ আর সইতে পারছে না। প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গ প্রতিনিয়ত তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে আসছে। আর স্মৃতিগুলো শেলের মতো বুকে বিঁধে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে অন্তর :

সেই তো সুখের কথা যখন হয় মনে,
মদিনার বয় পানি অঝর ঝর নয়নে ॥

স্বামী শোকে মদিনা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কেবল কান্নাই সার। প্রিয়ের বিরহ জ্বালায় ধীরে ধীরে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। মদিনা হয়ে পড়ল পাগলিনী।

তারপরে না চিন্তায়, শেষে হইল পাগল,
যাই না মুখে লয়, তাই সে বকেরে কেবল ॥

পাগলিনী মদিনা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। আহার, নিদ্রা ছেড়ে সোনার শরীর আজ কংকাল সম, অমনি করে হঠাৎ একদিন সবকিছুর ইতি টেনে অভাগিনী মদিনা মারা গেল।

পাড়া-পড়শি মিল্যা সবে কয়বর খুঁদিয়া,
মাটি দিলা ফতোয়া মতন জানাজা পড়িয়া ॥

এদিকে নতুন স্ত্রী পেয়েও দুলালের মনে সুখ নেই। প্রতিনিয়ত অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলছিল। স্বামী সোহাগী স্ত্রী মদিনা ও প্রিয় পুত্র সুরত জামালকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসা তার ঠিক হয়নি। মদিনারা তাকে আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ-মায়া দিয়ে বড় করেছিলেন। মদিনা সেই ছোটবেলা থেকেই পাশাপাশি বড় হয়েছে। হাত ধরে পাড়াময় বেড়িয়েছে। ভালোবেসে বিয়ে করছে। মদিনার বাবা জমি বাড়ি দিয়েছেন। সুদীর্ঘ বিশ বছরের জানাশোনা এবং ভালোবাসার সম্পর্কের পরিণতি এমনটি হতে পারে না। শৈশব-কৈশোর-যৈবন কালের ঘটনাগুলো মনে হওয়ায় তার অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলে উঠল। সে ভাবে :

সেই না মদিনারে মনে দিলাম বড় দাগা,
মরিলে দোজখে হায় রে অইবো আমার জাগা ॥

অনুতপ্ত দুলাল তাঁর স্ত্রী আমিনা ও দুলালকে কিছু না বলে একদিন বানিয়াচং ছেড়ে মদিনার খোঁজে রওয়ানা হলো। একাকী পথ চলায় নানা অলক্ষণ দেখে উৎকণ্ঠার মধ্যে পথ চলতে চলতে মদিনার বাড়িতে এসে সে দেখতে পায় :

মানুষের গন্ধ নাই বাড়ির ভিতরে,
কাউয়ায় করে কা-কা চালের উপরে ॥

www.pathagar.com

নীরব নিস্তব্ধ লোকশূন্য বাড়ি। যেন বিরানভূমি। কোনো সাড়া নেই। এ দৃশ্য দেখে দুলালের প্রাণ ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। মদিনা কোথায়! মদিনা কোথায়! আমার প্রাণের মদিনা কোথায়? ডাক দিল।

সুরত জামাল তার মায়ের কবরের কাছে বসে কাঁদছিল। ডাক শুনে সে কাছে এল।

দুলাল জিগায় সুরত মদিনা কোথায়?
চোখে হাত দিয়ে সুরত কয়বর দেখায়।

এক হাত দিয়ে সুরত চোখের পানি ঢেকে অন্য হাত দিয়ে বাবাকে মার কবর দেখাল। কবর দেখে দুলাল আর স্থির থাকতে পারল না। সে এক দৌড়ে কবরের ওপর পড়ল। বাবা-ছেলের কান্না এলাকার বাতাস ভারী হয়ে উঠল। দুলাল কাঁদছে আর বলছে :

নিজ হাতে বধ করলাম মদিনার প্রাণ,
এই দুনিয়ায় আর নাই মোর খান ॥

মদিনার মৃত্যুর জন্য দুলাল নিজেকেই দায়ী করল। কারণ বর্ণনা করে সে বিলাপ শুরু করল :

তালাকনামা নাই যে দিতাম, না করিতাম বিয়া,
তবে তো আমার মদিনা না যাইত মোরে ছাড়িয়া ॥

দুলাল বুক থাপড়িয়ে কাঁদে। শুধু কাঁদে আর কাঁদে :

দুলাল পড়িয়া কান্দে কয়বরের উপরে,
হায় গো আল্লাজী পড়লাম কী পাপের ফেরে ॥

অন্যায়ভাবে তালাকের কারণে শোকে দুঃখে স্ত্রী মদিনার মৃত্যু– এ তো পাপই বটে। এ অনুশোচনায় মনে শান্তি নেই। অন্তর্জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে সে। তাই সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় :

আর না যাইবাম আমি বাইন্যাচং সরে,
এইখান থাকবাম আমি পইড়া কয়বরে ॥

বাস্তবিকই দুলাল আর দেশে ফিরে গেল না। দেওয়ানগিরি ছেড়ে কবরের পাশে ছোট একটি কুড়েঘর বেঁধে ফকিরের বেশে থাকতে লাগল :

আর নাই সে গেল দুলাল বাইন্যাচং সরে,
আখের গনিয়া দেখে কয়বর উপরে ॥

আয়না বিবির কিসসা

ভাটি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ নদী বন্দর হিসেবে আজমিরীগঞ্জ খ্যাত। কুশিয়ারা, ভেড়ামোহনা, কালনী, কোদালিয়া, লোহাজুরা, জিংড়ি প্রভৃতি নদ-নদী বেষ্টিত আজমিরীগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ।

কুশিয়ারা ও ভেড়ামোহনা প্রসিদ্ধ এই দুই নদী দিয়ে যাতায়াত করত অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌযান। দেশি-বিদেশি বণিক-সওদাগরদের নৌবহর নোঙ্গর করত এখানেই।

ভেড়ামোহনা নদীর কিনারা ঘেষা একটি ছোট্ট জনপদ নাড়াইনখলা গ্রাম। বাড়িগুলো বর্ষাকালে জলে ভাসা, যেন রাজহংস জলে ভেসে থাকে, তখন মনে হয় কেউ

www.pathagar.com

কেউ এই গ্রামের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশাল আকাশে ভেসে ওঠা পূর্ণিমার একটি চাঁদের সঙ্গে উপমা দিয়ে গ্রামটিকে 'চান্দের ভিটা' বলে থাকেন। এ নিয়ে কিংবদন্তি রয়েছে।

এই গ্রামে বাস করত উজ্জ্বল সদাগর নামে এক যুবক। সুখের সংসার বলতে বাড়ি-ঘর জায়গা-জমি যা যা বোঝায় পিতার জীবিতকালে তাদের সবই ছিল। কিন্তু হায় :

এই সব রাইখ্যা বাপে সংসার ছাড়িল
সোনার জমির বাড়ি পুড়া যে রইলো।

কারণ :

শিশু থুইয়া বাপ মরে
মায় পাইল্যা বড় করে।

তবুও দুঃখিনী মার সান্ত্বনা :

এই পুত্র বড় হইলে, সুখের দিন আইবো ফিরিয়া
যতন না করিয়া মায়ে পালিতে লাগিলা।

এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে দুঃখিনী মায়ের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। জায়গা-জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে। আয়-রোজগারের লোকজন নেই। দুঃখের সংসারে মা নিমজ্জিত। ভরসা একমাত্র ছেলে উজ্জ্বল, সে বড় হলে এই দুঃখের সাগরের কিনারা পাবে। এভাবে দুঃখে কষ্টে এক দুই তিন করে ষোলো বছর হলো উজ্জ্বলের।

ষোলো বছরের কালে আশা হইল মনে
হালের বলদ সাধু লইলো কিনে।

এবার সে সংসারের হাল ধরায় মনোযোগী হলো। পতিত জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু করল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষিকাজ করছে। তাই দেখে মা :

আহারে পরানের পুত্র এমন হইলা
কেচেরা বয়সকালে সংসারে মজিলা।

গৃহস্থালি চাষাবাদ সকল কাজেই উজ্জ্বল বেশ মনোযোগী। তার পরিশ্রম নিষ্ঠা ও আগ্রহের ফলে সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা এল। এবার উজ্জ্বল চিন্তা করল ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করবে। তার পূর্ব পুরুষরা এমনি করে বাণিজ্য করে ধনবান হয়েছিলেন। এসব চিন্তায় সে মায়ের কাছে গিয়ে বাণিজ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন মা বললেন :

বাণিজ্যেতে কার্য নাই-রে, ঘরে বইস্যা খাও
তোমারে বৈদেশে দিয়া পরান কেমনে ধরবো মাও।

কিন্তু উজ্জ্বল তার সিদ্ধান্তে অটল :

যত যত বুঝায় পুত্রে পরবোধ না মানে
বাণিজ্যে যাইবে উজ্জ্বল কালুকা বিয়ানে।

মা তাড়াতাড়ি করে :

পীরের শিন্নি মান্য মায় আগে পীররে সালাম জানায়
পীরের কদরে পুত্র ফিইরা যেন পায় মায়।

www.pathagar.com

উজ্জ্বল বাণিজ্যে রওয়ানা দিল। বহু কষ্টে মা বুক বেঁধে বিদায় দিলেন বটে। কিন্তু তার :

আষাঢ়িয়া মেঘের দ্বারা চক্ষে বয়ে পানি
জমিনে পড়িয়া কান্দে অভাগী জননী।

পুত্র ছাড়া একাকী মা সংসারে এভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। নিদ্রাহীন কর্মহীন মায়ের একমাত্র ভাবনা :

এই বুঝি আইলো পুত্র পালের নাও বাইয়া
উজান চইল্যা যায় নাও, মা থাকে যে চাইয়া।

এমনিভাবে পুত্রের আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ছয় মাস পার হলো।

এহি মতে কান্দিয়ারে মায়ের ছয় মাস যায়
কোন বা দেশে গেল পুত্র খবর না পায়।

এদিকে উজ্জ্বলের নৌকা :

ভেড়া মোহনা বাইয়া সাধু উত্তরে চলিল
শিবার বাঁক হাতের ডাইনে পড়িয়া রইল।

তখন তার বাণিজ্যের এক অংশীদার বলল :

বেবান বান্ধের মাঝে যাওয়ার কার্য নাই
এই গেরামের বাঁকে আজ থাইক্যা যাই।

রাত হয়েছে। সামনে জনমানবের ভিড়। দীর্ঘ নদীর কুল। উজ্জ্বল এখানেই নৌকা বাধল। নৌকায় সন্ধ্যাবাতি জ্বালানোর জন্য কুপি বাতি হাতে আগুন সংগ্রহে উজ্জ্বল গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ল।

কিছু দূরে গিয়া সাধূ দেখে ডোপরা একখানি
বৈস্যা আছে বুড়া মানুষ এক চক্ষে তার পানি।

এই গ্রামের বাসিন্দা এক বৃদ্ধ। জাত-বুনিয়াদে বড়ই ছিল। আজ বার্ধক্য হেতু অকমর্ণ্য। কেবল একমাত্র মেয়ে আয়না ছাড়া দুনিয়ায় তিন কুলে আর কেউ নেই। কামাই-রুজি করে আনার কেউ না থাকায় জমি-বিছরা বিক্রি করে চলতে গিয়ে আজ বৃদ্ধের এ গরিবানা হাল। দারিদ্র্য চিন্তায় দুর্বল না হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসেবে দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধ দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। প্রাণচাঞ্চল্য যেন শিথিল হয়ে আসছে। উজ্জ্বলকে দেখে বৃদ্ধ কাছে ডেকে এনে নিজেরই হালচাল বলতে লাগল। উজ্জ্বলের পরিচয় জানতে পেরে বুড়ো খুবই খুশি হলো। বয়সকালে উজ্জ্বলের বাবা এই বৃদ্ধের বন্ধু ছিলেন। বন্ধুটি আজ আর বেঁচে নেই। কালের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন তিনিই শুধু। তাঁর একমাত্র ভাবনা শুধু আয়না। কেমন করে তাকে বিয়ে দেবেন।

বিয়ার হইলো বছর কেমনে দিবাম বিয়া
এই দুঃখেতে যাইবো আমার কয়বর কাটিয়া।

এই বলে বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগল। এমনি সময় নদীর ঘাট থেকে আয় কলসি কাখে পানি নিয়ে দ্রুত ঘরে ফিরছিল, ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতে হবে। উঠানে ভিনদেশি এক পুরুষ দেখে থমকে দাঁড়ায় আয়না। তার :

www.pathagar.com

রাজরাঙ্গা হইলো মুখ টাইন্যা ঘুরে গা
চলিতে চাহিলে কন্যার নাই সে উঠে পা।

উজ্জ্বল আয়নাকে দেখে নিল। এমন সুন্দরী মেয়ে সে আগে কখনো দেখেনি। নজরকাড়া দেহ বল্লরী আর তার ঘনকালো চুল দেখে সে নিজেকে বোঝায় :

দুই নয়নে দেখিয়া উজ্জ্বল নয়নে বুঝায়
ও তার মাথার কেশ উপোত হইয়া পড়িয়াছে পায়।

এবার উজ্জ্বল বৃদ্ধকে কুপিতে আগুন দিতে বলল :

এই কথা কহিয়া উজ্জ্বল আগুন মাগিল
ভেউরায় করিয়া কন্যা আগুন আনিয়া দিল।

ঘরের ভেতর থেকে আলো জ্বালানো কুপি হাতে নিয়ে এল আয়না। হাতে থাকা কুপির আগুনের রশ্মিতে আয়নার মুখমণ্ডল আলোকিত হয়ে ভেসে উঠল। উজ্জ্বল চেয়ে দেখল এ যেন অপরূপ রূপের ঝলক। সে ভাবল :

দেশে আছে চম্পা ফুল, ফুইট্যা আছে গাছে
সেই চম্পা মলিন হইবো এই কন্যার কাছে।

ভিনদেশি পুরুষ দেখে কুপিবাতিটি বারান্দায় রেখে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল আয়না বিবি। জ্বলন্ত কুপি থেকে উজ্জ্বল তার কুপিতে আগুন ধরিয়ে বুড়োকে বলল, বাবা আমি এখন আসি। উজ্জ্বলের হাতে থাকা কুপিবাতির আলোতে ভেসে উঠল তরুণ সওদাগরের সুদর্শন মুখ। আয়না তখন উজ্জ্বলকেও এক নজর দেখে নিল, চোখে চোখ পড়ল। কোনো কথা হলো না। কিন্তু চোখে চোখে কী যে কথা হলো তা হৃদয়ের অন্তর্যামীই জানলেন।

চারি চক্ষে চাওয়াচাওয়ি মন বান্ধা থুইয়া
পুব দেশে চলে সাধু নাও ভাসাইয়া।

চার চোখের প্রথম দেখায় মুগ্ধ হলো দুজনই। প্রেমমুগ্ধ তরুণ সওদাগর নাও ভাসিয়ে বাণিজ্যে না গিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

এদিকে আয়নার চোখে উজ্জ্বলের মুখ বারবার ভেসে উঠছে। গৃহকাজে মন বসছে না। তরুণ সওদাগর কুপিতে আগুন নিতে এসে আয়নার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এরূপ চিন্তায় আয়না কাহিল হয়ে পড়ল। পাশের বাড়ির বান্ধবী এই অবস্থা দেখে আয়নাকে চিন্তা করতে বারণ করল। কিন্তু আয়না বলে :

ঋণ চিন্তা, রোগ চিন্তা, সংসার চিন্তা ধর,
যৌবনকালের পিরিত চিন্তা, সকল চিন্তার বড়।

এদিকে বাড়িতে গিয়ে উজ্জ্বলের মনও বসছে না কোনো কাজে। কোনোকিছুতে তার মনে শান্তি নেই। অবশেষে বাণিজ্যের ছলে আবার যাত্রা করল উজ্জ্বল সওদাগর। এ বাণিজ্যে সে টাকা-পয়সা, আয়-উপার্জন খুঁজছে না। সে খুঁজছে তার মনের মানুষকে। চোখ বুজলেই যার ছবি ভেসে ওঠে আর দেখতে পায় সেই দৃশ্যটি– কুপি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো আয়না বিবি।

www.pathagar.com

আয়না বিবির সঙ্গে দু কথা বলার সুযোগ না পেলেও এক নজর দেখা যাবে। কথা না বললে ক্ষতি নেই, চোখ যে মনের কথা বলে। চোখে চোখে কথা হলেই সে খুশি। এ আশায় মাঝি-মাল্লাকে দ্রুত নাও বাইতে নির্দেশ দিল উজ্জ্বল। মাঝি দ্রুত নৌকা বেয়ে আয়নার গাঁয়ে নাও ভেড়াল। নৌকা থেকে :

চরেতে উঠিল উজ্জ্বল আয়নাকে দেখিতে
শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে না পায় দেখিতে।

আয়নার বাড়িতে এসে দেখতে পায় আয়না বাড়িতে নেই। ইতোমধ্যে আয়নার বাবা মারা যাওয়ায় আয়না কোথায় গিয়েছে কেউ তার হদিস দিতে পারছে না। পাড়া-প্রতিবেশী যাকেই সামনে পায় তাকেই সে জিজ্ঞেস করে। এমনিভাবে খোঁজাখুঁজি করলে লোকে বলে :

কেউ জানে কেউ না জানে কেউ বা বলে মন্দ
আর দিন গেল তার না ঘুচিল সন্দ।

আয়নার কী হলো। নানা রকম সন্দেহ তার মনে বাসা বেঁধেছে। সে খুঁজছে আয়নাকে। আয়না কোথায় আছে? কোথায় গেলে দেখা হবে? এই ভাবনায় উজ্জ্বল সওদাগর পাগল প্রায়! বহুলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও উজ্জ্বল আয়নার খোঁজখবর পাচ্ছে না। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে গ্রামে গ্রামে আয়নাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখনো ভিক্ষুকের মতো চেয়েচিন্তে খায়, না পেলে উপোস যায়। এভাবে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এমনিভাবে ফকিরের মতো চলতে চলতে এক সন্ধ্যায় যখন :

উইড়া আইছে কাউয়া কুলী, আপন বাসায়
হাঞ্জার আন্ধাইরে গাঁউর পথ না দেখায়।

এমনি সময় উজ্জ্বল দূরে একটি বাড়িতে কুপিবাতির আলো দেখতে পায়। চোখে তার সেইদিনকার কুপিবাতির দৃশ্য। স্মরণে জেগে উঠলে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল পথে। কাছে এসে লক্ষ্য করল রান্নাঘরে বেড়া দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এতে তার বিশ্বাস আরো স্পষ্ট হলো, আয়না বিবি বউ হয়ে এ বাড়িতেই গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বাড়ির উঠোনে এসে ভিক্ষার জন্য ফকির হাঁক দিল। বারান্দায় বসে থাকা গৃহকর্তা বুড়ি হাঁক শুনে তাকাল ফকিরের দিকে, কিন্তু ফকির বা মুসাফির বলে মনে হলো না। তবুও তর্কে না গিয়ে মেয়েকে ডেকে ভিক্ষা দিতে বলে ঘরের ভেতর চলে গেল। ভিক্ষা দিতে নবীন কন্যা এল।

ভিক্ষার ডালা লইয়া কন্যা ভিক্ষা দিতে আইলো
ফকিররে দেখিয়া হাতের ডালা ভূমিতে পড়ল।

ভিক্ষুককে দেখেই তার ভিক্ষা দেবার পাত্রটি হাত থেকে খসে পড়ে গেল। ভিক্ষুক নয়, এ যে সওদাগর!

ভিক্ষুকও আয়নাকে ঠিকই চিনে ফেলল। আবার চার চোখ এক হলো। দেখে নিল একে অন্যকে। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি বারবার দেখে, দেখে হাজারবার। তবু যেন দেখার তৃষ্ণা মেটে না। উভয়ে উভয়ের জন্য চির পিপাসিত।

আর নীরবতা নয়। সওদাগর বলল, ভিক্ষার ছলে আমি তোমাকে দেশে দেশে

www.pathagar.com

খুঁজে বেড়াচ্ছি। আয়না বলল :

মামুর বাড়িতে আসি রে বন্ধু বাপ গেছে মারা
ছয় মাস ধইরা আমার কান্নাকাটি সারা।

তাঁরা মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন।

সেই থেকে পরের মা-বাবারে ডাইক্যাছি বাপ ও মা-ও
যে দেশেতে যাইবা আমারে তুমি সঙ্গে লইয়া যাও।

উজ্জ্বল সওদাগর আয়নাকে আর হারাতে চায় না। সুযোগ করে আয়নাকে এ রাতের আঁধারে পালিয়ে নিয়ে এল উজ্জ্বল সওদাগর। বাড়িতে এসে ধুমধামে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হলো।

বেশ সুখেই তাদের সংসার চলতে লাগল। আয়না গৃহস্থালি কাজে বেশ মনোযোগী। উজ্জ্বল ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উৎসাহী। এতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবারের শোভা-গৌরব বৃদ্ধি পেল। উজ্জ্বলের মা-বোন বেজায় খুশি। সওদাগর হাট বাজারে গেলে প্রিয়তমার জন্য একটা কিছু কিনে আনবেই। আভের চিরুনি, আকাশতারা শাড়ি, সুগন্ধি তেল, নাকের বলাক ইত্যাদি।

উজ্জ্বল সাধু হাট যায় কিইন্যা আনব কী
আয়নার লাগি কিইন্যা আনে আভের চিরুণি।
উজ্জ্বল সাধু হাটে যায় কোনাকুনি পথ
আয়নার লাগি কিইন্যা আনে সোনার নাক-বলাক-নথ।

গয়না-শাড়ি, প্রসাধনী পেয়ে ভারি খুশি। আয়না সাজ-সজ্জায় নিজের সৌন্দর্য প্রকাশে অত্যন্ত সচেতন একজন নারী। সে জানে স্বামীর মন খুশি রাখাই স্ত্রীর প্রধান কাজ।

ঋতুচক্রে আবার এল বর্ষাকাল। ভিনদেশের সওদাগররা নানা রঙের পাল তুলে তরী বেয়ে বাণিজ্যে যায়। উজ্জ্বলও এবার দূরান্তে বাণিজ্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। ডিঙা সাজিয়ে আয়নার কাছে বিদায় নিতে গেল। আয়না নিষেধ করল :

না যাইও না যাইও দূর দেশান্তরে
অভাগী আয়না নিয়া থাকো আপন ঘরে।

সে চায় না উজ্জ্বল দূর দূরান্তে বাণিজ্যে যাক। কাছাকাছি থেকে সুখে দুখে জীবন কাটাতে চায় আয়না। কিন্তু উজ্জ্বল বাণিজ্যে যেতে প্রস্তুত। সে বাধা মানল না। স্বামীর অমঙ্গল হবে তাই গোপনে চোখের পানি মুছে নিয়ে অবশেষে বিদায় দিল এবং কান্না ভেজা কণ্ঠে :

অভাগিনী কন্যা কয় শোন পরানের পতি,
দেউয়া ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে বাইন্ধো নায়ের কাছি।

আরো বলে :

অভাগিনী আয়না কান্দে, আমার মাথা খাও,
রাইত নিশিতে বন্ধু তুমি না বাহিও নাও।

www.pathagar.com

উজ্জ্বল সওদাগর রঙিন পাল তুলে নৌকা নিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করল। আয়না বিবি। অতিকষ্টে অন্তরের জ্বালা আর চোখের জল চেপে রেখে রঙিন পাল যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

এবারও উজ্জ্বল সওদাগরের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটল। নৌকাডুবি হলো। সংবাদ রটল, উজ্জ্বল সওদাগর মারা গিয়েছে। এ সংবাদ শুনে আয়না কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক সময় কাউকে কিছু না বলে পাগলিনীর মতো বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে পড়ল।

স্বামী সোহাগী সতী-সাধ্বী আয়না বিবি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার স্বামীকে। তার মন সায় দিচ্ছে না যে সওদাগর মারা গেছে। তার স্থির বিশ্বাস উজ্জ্বল বেঁচে আছে। খাওদা-খাওয়া ছেড়ে ভিখারিনীর বেশে উজ্জ্বলকে পাহাড়-জঙ্গল-নদীর কিনারাসহ বিভিন্ন জনপদে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেকদিন পর অবশেষে আয়না উজ্জ্বলের সন্ধান পেল।

এক গৃহস্থ উজ্জ্বলকে নদীর চরে পড়ে থাকতে দেখে বাড়ি নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। সেই থেকে ছয় মাস হলো সে এ বাড়িতেই আছে।

স্বামীকে নিয়ে আয়না বাড়িতে এল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অধার্মিক ভণ্ড, মতলববাজ কিছু লোক দুর্নাম রটিয়ে দিল যে, আয়না বিবি দীর্ঘ ছয় মাস একাকী গ্রামে গ্রামে নির্লজ্জ-বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। পরবাসী হয়ে ধর্মনাশ করেছে, তাই আয়না অসতী। এমন নারী নিয়ে উজ্জ্বল সওদাগর ঘর-সংসার করতে পারে না। অবশেষে গ্রাম পঞ্চায়েত সভা ডেকে এ রায় উজ্জ্বলকে শুনিয়ে দিল।

এলাকাময় কুৎসাকারীদের রটনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আদেশে বাধ্য হয়ে উজ্জ্বল আয়নাকে ত্যাগ করে নতুন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

উজ্জ্বল তার এ সিদ্ধান্ত গোপন রেখে আয়নাকে বলল, এবার তোমাকে নিয়ে বাণিজ্যে যাব। একা থাকতে পারবে না ভেবে আয়না রাজি হলো। আয়নাকে নিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করল উজ্জ্বল। এক জঙ্গলের পাশে নদীর কিনারায় ছল করে আয়নাকে নামিয়ে সে দ্রুত চলে এল।

নির্জন জঙ্গলে নির্বাসিত আয়না একাকী কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল। সন্ধ্যা নেমে এল। অমনি সময় একটি বেদের দল নৌকা বহর নিয়ে এই নদীপথে যাচ্ছিল। তারা এক জাতি :

বার মাস তের পাতি জল হাওরে ভাসে
নায় থাকে নায় ভাসা ফিরে ফিরে দেশে।

তারা আয়নাকে অসহায় অবস্থায় দেখে নৌকায় তুলে নিল। আয়না তাদের জানাল :

মাও নাই, বাপও নাই নাই রে সোদ্দর ভাই
পানির মুখে শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়াই।

এই বলে কাঁদতে শুরু করল। আয়নার এই অসহায় অবস্থায় তাদের মনে মায়া জাগল। দলপতি নারী অভয় দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আয়নাকে বলল :

www.pathagar.com

না না কাইন্দো কইন্যা গো তুমি ধর্মের ঝি
সঙ্গে তো থাকিবা কন্যা হইয়া মোর ঝি।

সেই থেকে আয়না বিবি বেদের দলের একজন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দিন ঘুরে ঘুরে 'পোক খোয়াই', 'বাত সারাই', 'সিংগা লাগাই' বলে দাঁতের পোকা খোলার কাজে সাথিদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকে। বেদেরা জীবিকার টানে নাওয়ের ছইয়ার নিচে সংসার পাতে, বেসাতি নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে বেড়িয়ে দুই বছর পর স্বামীর গ্রাম চান্দের ভিটায় বেদের নৌকা নোঙর করল। আয়নার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আজো জাগ্রত। স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও স্বামীর মঙ্গল কামনা করে আয়নাবিবি। সে দূর থেকে দেখে নিতে চায় স্বামীর নতুন সংসার। এই আশায় আয়না বিবি নিজেকে গোপন করার জন্য :

পরভাত কালেতে আয়না কোন কাম করিল
কুরুঞ্জিয়া নারীর বেশ অঙ্গেতে ধরিল।

বেদেনির ব্যবসার ছালা কাপড়ের বিড়া বেঁধে মাথায় তুলে নিল। আর :

গলায় পরিল আয়না নয়া গুঞ্জির মালা
মাথায় তুলিয়া লইল কন্যা বেসাতির ছালা।

চান্দের ভিটার গ্রামের মেঠো পথ বেয়ে ধীর পদে স্বামী বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। যতই এগুচ্ছে বেদেনীর পাঁ থরথর করে কাঁপছে। এ তাঁর অনেক চেনা পথ। এই সেই গাছ, তরুলতা সেই ভিটা। এ ঘরে আয়না উজ্জ্বলকে নিয়ে কত না সোহাগে দিন কাটিয়েছে। এই সেই মেহেন্দি গাছ, যা নিজ হাতে বছর তিনেক আগে চারাটি রোপন করেছিল। তার স্মৃতিপটে একে একে সব ভেসে উঠতে লাগল। এই তো নতুন বউ। যে আয়নার স্থান দখল করে আছে। আর :

বিয়া কইরা উজ্জ্বল সুখে বইসা খায়
অভাগী দুশমন আয়না কান্দিয়া বেড়ায়।

সতিনের কোলে চাঁদের মতো একটি ছেলে। এরই মধ্যে উজ্জ্বল ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে বেদেনির কাছ ঘেষে বাইরে চলে গেল। বেদেনি দেখে নিল তার মনের মানুষটিকে। ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ডাক দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু মনে পড়ে গেল আজ সে তার স্বামীর আর কেউ নয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের কথা, বুকের ব্যথা চেপে রাখছে ঠিকই, কিন্তু চোখের পানি সে আটকাতে পারল না। অশ্রু অঝোরে ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে বেদেনিকে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, উজ্জ্বলের মা এগিয়ে এসে বেদেনির পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন :

কার কন্যা কার ঝি কে বা বাপ ও মাও
মাথা খাও কন্যা আমার পরিচয় দাও।

উত্তরে আয়না বলল :

মাও আমার নাই বাপও আমার নাই
দারুণ কপালের লেখা ঘুইরা বেড়াই।

www.pathagar.com

তবে তুমি এমন করে কাঁদছ কেন? মাকে বুঝি মনে পড়ছে। আয়না বলল :

কাঁদিলে অভাগী মাগো আইতো ধাইয়া
পায়েতে লাগিলে ধুলা আঞ্চাইলে দিত ঝাইরা।

আমি সেই মায়ের জন্য কাঁদছি। সে মা দেখতে ঠিক তোমারই মতো। এ জন্যই কাঁদছি মা। কণ্ঠস্বরে মা আয়নাকে ঠিকই চিনে ফেলল। দুখানা হাত চেপে ধরে বলল :

আয়না যদি হইয়া থাকো কন্যা আমার মাথা খাও
অভাগীরে থুইয়া আর ভিন দেশে না যাও।

এই বলে শাশুড়ি বেদেনিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। তখন বেদেনি পোষাক খুলে ফেলে মাকে বলল :

আশা গেল বাসা গেল কিসের লাগ্যা সুখে বাঁচি
আপন বন্ধু পর অইলো, কোন বা সুখে থাকি।

এদিকে আয়নার আগমন বার্তা গ্রামময় জানাজানি হয়ে গেল। উৎসুক নর-নারী ছুটে আসতে লাগল বাড়িতে। আয়না ভাবল এতে করে উজ্জ্বলের সামাজিক অসুবিধা হতে পারে। তাই সরে যাওয়া দরকার। তখন স্বামী উজ্জ্বলকে উদ্দেশ্য করে আপনমনে আয়না বলল :

সুখে থাকো রে বন্ধু সতিন বুকে লইয়া
দেখলাম তোমার চান্দমুখ জন্মের লাগিয়া।
এই আসা শেষ আসা আর আসা নাই
সুখে থাকো প্রাণবন্ধু আর কিছু না চাই।

তারপর আয়না দ্রুত বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এদিকে বেদের দল নৌকায় আয়নার অপেক্ষা করছে। আর বলছে আয়না আসছে না কেন? তবে কি সে তার বাড়ি খুঁজে পেয়েছে? তাহলে তো ভালোই হলো। এ ভেবে কিছুক্ষণ পর নৌকা ভাসিয়ে বেদেরা অন্যত্র যাত্রা করল। বাইরে থেকে বাড়িতে এসে উজ্জ্বল শুনতে পায় আয়নার আগমন বার্তা। আয়না এসেছিল! আয়না এসেছিল! সবার মুখে একই কথা :

বাতাস কয় কানে কানে আসমানে কয় রৈয়া
আইলো দুঃখিনী আয়না তোমাকে খুঁজিয়া।

সংবাদ শুনে উজ্জ্বল আর ঠিক থাকতে পারল না। আয়নার খোঁজে বাড়ি থেকে তখুনি বেরিয়ে পড়ল।

আয়না তালাশে সাধু গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে
ফকির হইয়া সাধু দেশে দেশে ফিরে।

বেদের নৌকা উজান বেয়ে চলছে। হঠাৎ দেখে নদীর জলে আয়নার লাশ ভাসছে।

আষাঢ়িয়া তোড়ের নদী ঢেউয়ে ভাইস্যা যায়
আয়নাবিবির সোনার তনু হায় রে জলেতে ভাসায়।

আত্মবিসর্জন দেওয়ার পর মৃতদেহ স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। আয়না বিবির এই করুণ পরিণতি বেদে দলকে অশ্রু সজল করল।

www.pathagar.com

অন্যদিকে উজ্জ্বল আয়না বিবির খোঁজে পাগলের মতো দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে আয়না বিবির জন্য দেশান্তরী হয়ে গেল।

তারা হইলো ঝিলিমিলি ফুল হইলো বাসি।
জন্মের লাইগ্যা মায়ের পুত হইলো বৈদেশী ॥

শব্দার্থ : দেউয়া ডাকে > দেয়া ডাকে = মেঘ গর্জন করে। কুরঙ্গিয়া = বেদে সম্প্রদায়ে যে নারীর তন্ত্র-মন্ত্র নিপুণ। লয়া গুঞ্জার মালা = পুষ্পগুচ্ছ। সাধু = নবীন সওদাগর। ধাইয়া = দৌড়াইয়া। আঞ্চাইলে = আঁচলে।

অধুয়া সুন্দরীর কিসসা

দক্ষিণবাগের রাজা দুবরাজ। তিনি সুরত জামাল ও তার মা ফাতেমা বিবি তাদেরকে বিপদের দিনে নিরাপদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই রাজার একমাত্র সোমত্ত কন্যা অধুয়া সুন্দরী। অধুয়া সুন্দরী এতই রূপবতী যে :

আসমানের দিকে কন্যা যদি চক্ষু মেল্যা চায়
শরমে সুরুজ গিয়া আবেতে লুকায়।

এমন সুন্দরী কন্যা দক্ষিণবাগে আর দ্বিতীয়টি নেই। সাত ভাইয়ের এক বোন অধুয়া সুন্দরীকে তার সাত ভাবি রূপচর্চায় সহযোগিতা করে আবের কাঁকই দিয়ে তার ঘনকালো চুলে যখন নোটন খোঁপা বেঁধে দেয় তখন তার কাজল কালো দুচোখের চাউনী ও রূপ উপভোগে প্রকৃতিও যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। আর তাই :

আসমানের কালো মেঘ, দরিয়ার কালো পানি
যেই দেখে ভোলে না, সেই কন্যার চাউনি।

এই পরমা সুন্দরী অধুয়া একদিন বাগানবাড়িতে ফুল তুলতে গেলে পথে জামাল খাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তখন সে :

জামালের রূপ কন্যা চোখেতে দেখিয়া
মনে মনে করে চিন্তা পাগল হইয়া।

অধুয়া সুন্দরী চিন্তা করল। এত সুদর্শন যুবক আর তো নজরে পড়ে নাই! জামাল খাঁর রূপ যৌবন আর তেজোদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ দর্শন করে অধুয়া ভাবে :

কিবা রূপ অপরূপ, আহা মরি মরি
না দেখি এমন রূপ ত্রিভুবন জুড়ি।

পথ চলতে যতদূর দৃষ্টি, অধুয়া দাঁড়িয়ে জামাল খাঁকে দেখে নেয়। তার চোখের পলকে যেন জামাল খাঁর রূপ মিশে আছে। এক নিমিষের জন্যও সে ভুলতে পারছে না। নিরন্তর শুধু একই ভাবনা। জামালের প্রেমে বিভোর অধুয়া। এরই মধ্যে অনেকদিন পার হলো জামালের আর দেখা নেই। বিস্ময়কর এক কল্পনা জাগল মনে। বিশেষ এক তাগিদ অনুভব করে তাঁর বিরহ কাতর মন। তাই এবার আগ্রহ ভরে জামাল খাঁকে অধুয়া চিঠি লিখে :

একবার তুমি এসো দক্ষিণবাগ শহরে
পরান ভরিয়া আমি দেখিব তোমারে।

www.pathagar.com

জামাল খাঁ চিঠি পেল। একটি ভাউলিয়া ডিঙায় চড়ে জামাল খাঁ আসছে। দূর থেকেই জামাল দেখতে পায় নদীর ঘাটে অপেক্ষমান অধুয়াকে :

ভাউলিয়া হইতে জামাল অধুয়াকে দেখে
দেখিয়া কন্যার রূপ তাক লাগি থাকে।

নদীর ঘাটে জামাল ও অধুয়ার দেখা হলো। চার চোখের মিলন হলো, হলো হৃদয়ের ভাব-বিনিময়। একে অন্যকে ভালোবাসল। এরই মধ্যে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। বাসায় ফিরতে হবে কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল নেই। অধুয়াকে দেখে জামাল অধীর হয়ে উঠল। ইত্যবসরে মাঝি মাল্লা তাগিদ দিল হাওর পাড়ি দিতে হবে। বিলম্ব করা যাবে না। অন্তরে অন্তরে ভাব বন্ধন হলো। আর এখনি সে বন্ধন ছিন্ন করে যেতে হবে। এ চিন্তা মনে নিয়ে জামাল খাঁ ভাবে :

চারি চক্ষু এক হলো যাইবার কালে
ভ্রমরা উড়িয়া যায় ছাইড়া যেন ফুলে।

বৈঠার টানে জামাল খাঁর ডিঙি গহিন গাঙে ভেসে চলল। প্রেয়সী অধুয়া প্রেমাশ্রু মুছতে মুছতে দক্ষিণবাগে ফিরে গেল। প্রেমপাগল জামাল খাঁর মনে শান্তি নেই। চোখে ঘুম নেই। অধুয়া সুন্দরীকে তাঁর চাইই। সারাক্ষণ শুধু একই ভাবনা। জামাল খাঁ উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ের পয়গাম পাঠাল। পয়গাম নিয়ে উজির দক্ষিণবাগ পৌঁছে :

আতর মাখাইয়া পত্র রাজার স্থানে
কন্যার বিয়ের কথা কইলা এই ক্ষণে।

পয়গাম পেয়ে রাজা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। মুসলমান ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যা অধুয়ার বিয়ে! না অসম্ভব! গর্জে উঠলেন রাজা। এ পয়গাম পাওয়াকে রাজা অপমানবোধ করে অগ্নি মূর্তি ধারণ করে বলল :

এতেক বামুন রাজা শুনিয়া জ্বলিল
জ্বলন্ত আগুনি যেন ফুলকিয়া উঠিল।

রাজার এই রূঢ় আচরণে উজির অপমানিত হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে চলে এল। জালাল খাঁ উজিরের মুখে সব শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই নিয়ে অনেক চিন্তার পর কিছু সৈন্য নিয়ে দক্ষিণবাগ আক্রমণের উদ্দেশ্যে জামাল খাঁ যাত্রা করল।

ঘোড়ার উপরে জামাল সওয়ার হইলো
পাছেতে লস্কর যত কুঁদিয়া চলিলো।

এদিকে পবিত্র মক্কা নগরীতে একদিন দুভাইয়ের দেখা হয়ে যায়। দুলাল খাঁ তার ভাতিজা সুরত জামাল সম্পর্কে মিথ্যা নানান অভিযোগ দায়ের করল। ছেলের এত সব বদনাম ভাইয়ের মুখে শুনে আলাল খাঁ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কালক্ষেপণ না করে দুলাল খাঁকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণবাগ শহরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানেও তিনি বন্ধু দুবরাজের মুখে ছেলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনতে পেলেন। ফলে দুলাল খাঁ ও রাজা দুবরাজের মিথ্যা অভিযোগে সাক্ষী উপস্থাপন ও প্ররোচনায় ছেলে সুরত জামালের ওপর বাবা আলাল খাঁর মন বিষিয়ে উঠল। ছেলেকে শাসন করার উদ্দেশ্যে আলাল খাঁ লোক লস্কর নিয়ে বানিয়াচং শহরের দিকে রওয়ানা দিলেন। বাবার আগমন বার্তা সুরত

www.pathagar.com

জামাল জানতে পেয়ে বিনা অস্ত্রে রওয়ানা দিলেন বাবাকে এগিয়ে আনতে। একটি উন্মুক্ত ময়দানে তাদের দেখা হলো। আলাল খাঁ তাঁর ছেলে সুরত জামালকে দেখামাত্রই দুঃখে ক্ষোভে গর্জে উঠলেন। যেন :

শুকনা ডালেতে যেমন আগুন ধরিল
কুমারে বান্ধিতে আলাল হুকুম করিল।

মিথ্যা প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে সুরত জামালকে বন্দি করে বানিয়াচং শহরে এনে কারাগারে পাঠালেন। সাত দিন পর এর বিচার শুরু হবে। এরই মধ্যে দিল্লির বাদশার একটি জরুরি পরোয়ানা এল যে, সাতদিনের মধ্যে আলাল খাঁকে দশ হাজার ফৌজ দিল্লিতে পাঠাতেই হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাঠাতে না পারলে আলাল খাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে তার গর্দানও যেতে পারে। সময় মাত্র সাত দিন।

দেওয়ান আলাল খাঁ চিন্তায় পড়লেন। তখন রাজা দুবরাজ পরামর্শ দিয়ে বন্ধু আলাল খাঁকে বললেন, 'সুরত জামাল রণদক্ষ। তাকেই দিল্লিতে সৈন্যসহ পাঠিয়ে দাও।' বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী দশ হাজার ফৌজ সঙ্গে দিয়ে সুরত জামালকে দিল্লিতে পাঠালেন আলাল খাঁ। মা চোখের পানিতে ছেলেকে বিদায় দিলেন।

প্রেয়সী অধুয়া সুন্দরীকে কীভাবে দিল্লি যাবার সংবাদটুকু জানানো যায় এ নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে একটি চিঠি লিখল জামাল খাঁ। চিঠির শেষে বিদায় নিতে গিয়ে সুরত জামাল লিখল :

যাইবার কালে দেখা না হইল আর
আর না হইবো দেখা সঙ্গেতে তোমার।
তবে যদি ফিরিয়া আসি আল্লাহর ফজলে
তবে তো চিনিয়া মোরে লইবায় কোলে।

তার হাতের একটি আংটিসহ চিঠিটি বিশ্বস্ত একজন বাহক দিয়ে অধুয়ার কাছে পাঠিয়ে দিল।

পিতার আদেশ শিরোধার্য। সুরত জামাল দিল্লি রওয়ানা হলো। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস গেল। সুরত জামালের কোনো সংবাদ নেই। দিল্লিতেও পৌঁছার সংবাদ নেই। বরং হঠাৎ একদিন দিল্লির বাদশার কাছে সুরত জামালের মৃত্যুর সংবাদ এল। বাদশা সংবাদটি বানিয়াচং আলাল খাঁর কাছে পাঠালেন। ছেলে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে :

কাত্যানির বানে যেমন কলাগাছ পড়ে
বিছাইয়া পড়িল দেওয়ান জমির উপরে।

পুত্রশোকে হাবিব খাঁ বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। এ সংবাদে বানিয়াচং শহরে হাহাকার পড়ে গেল। কী হলো! কী হলো! এদিকে :

হাউলীর মধ্যতে যখন খবর পৌঁছিল
শুনিয়া ফাতেমা বিবি অজ্ঞান হইলো।
কাছে ছিল দাসীবান্দি মুখে দেয় পানি
তিনদিন পর বিবি ত্যাজিল পরানী।

www.pathagar.com

ফাতেমা বিবি পুত্রশোকে মারা গেলেন। দেওয়ান আলাল খাঁ স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে হতভম্ব। সুযোগমতো ধীরে ধীরে বৃদ্ধ উজির ল্যাংড়া কাবেলা আগে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা আলাল খাঁর কাছে খুলে বলল। দুলাল খাঁর অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন, তাঁর দুশমনি, সুরত জামাল ও ফাতেমা বিবিকে হত্যার ষড়যন্ত্র, রাজা দুবরাজের সন্ধি, জামাল খাঁর দেওয়ানি লাভে দুলাল খাঁর প্রতিহিংসা, দুবরাজ কন্যা জামাল খাঁর প্রতি আসক্তি, সর্বোপরি দুবরাজের কাছে জামাল খাঁর বিয়ের পয়গাম নিয়ে উজিরকে অপমান এবং রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি বর্ণনা দিয়ে উজির আরো বলল :

তাই দুশমন হইয়া রাজা দুবরাজ করে এ অপমান
সেই তো দোষেতে মোর কাইট্টা নিল কান।

আর বিয়ের প্রস্তাবের কারণে সুরত জামালকে দুশমন গণ্য করে রাজা দুবরাজ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল :

সেই তো কারণে রাজা গোস্বা যে হইয়া
জামালেরে পাঠায় যে বনে সল্লা করিয়া।

কিন্তু দেওয়ান তাঁর বন্ধু দুবরাজকে বিশ্বাস করলেন, তাঁর পরামর্শক্রমে একমাত্র ছেলে সুরত জামালকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আসলে দোস্ত ও দুশমন কাউকেই চিনতে পারলেন না। এই বলে বৃদ্ধ উজির ডুকরে কাঁদতে শুরু করল।

এইসব কথা শুনে আলাল খাঁর বুকে পুত্রশোকের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। চোখের পানি শুকিয়ে গিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল। এবার বজ্রকণ্ঠে–

হুকুম করিলা দেওয়ান লোকজন ডাকিয়া
রাত্রির মধ্যে দুবরাজকে আনিবে বান্ধিয়া।

তিনি আরো বললেন :

দক্ষিণবাগ শহর জুড়্যা আগুন লাগাও
গর্দান কাটিয়া তারে সায়রে ভাসাও।

এদিকে অধুয়া সুন্দরী যথাসময়েই সুরত জামালের পাঠানো প্রেমপত্র ও প্রীতি উপহার আংটি পেয়ে খুবই খুশি হলো। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য যুদ্ধে প্রিয়তমের দিল্লি যাওয়ায় অন্তরে দুঃখ পেল। প্রেমাসক্ত অধুয়া তার প্রেমিক সুরত জামালের মঙ্গল কামনায় মন্দিরে যেয়ে স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা জানাল। এমনি এক দিনে দেওয়ানের ফৌজ অধুয়াকে গ্রেফতার করে রাজমহলে নিয়ে আসল। দেওয়ানের অপর ফৌজ দল দুবরাজকে প্রাসাদে আটক করে। গোপনে প্রাসাদ থেকে অধুয়া একটি বিষের কৌটা সঙ্গে নিল। তাঁর ধারণা ফৌজ দল কর্তৃক যেহেতু সে আটক হয়েছে, কোনরূপ অপমানী হওয়ার পূর্বে মৃত্যুই তার শ্রেয়। যুদ্ধের সৈন্যদের পৈশাচিকতা সর্বত্রই নজিরবিহীন, এ তাঁর জানা ছিল।

দেওয়ানের ফৌজ দল রাতের মধ্যেই রাজা দুবরাজকে বন্দি করে ঘোড়ায় চড়ে এবং কন্যা অধুয়াকে পালকিতে করে বানিয়াচং শহরের দিকে নিয়ে চলে। দেওয়ান আলাল খাঁ চিন্তা করলেন অধুয়ার বিয়ের প্রস্তাবের জন্যই তাঁর পিতা রাজা দুবরাজ

www.pathagar.com

অসন্তুষ্ট হয়ে কুটবুদ্ধি দিয়ে সুরত জামালকে হত্যা করিয়েছে। তাই এই সুন্দরী অধুয়াকে তাঁর ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাঁর মনোপীড়া দূর করবেন।

বন্দিদের বানিয়াচং শহরে নিয়ে আসতেই রাত্রি ভোর হয়ে গেল। সুরত জামাল ও ফাতেমা বিবির অকাল মৃত্যুতে বানিয়াচং এর প্রজাকুল আজো কাঁদছে। গ্রামে গ্রামে কান্নার রোল শুনা যাচ্ছে। তাই অধুয়া :

বানিয়াচং শহরে শুইন্যা প্রজার কান্দন
মনে মনে করে কন্যা পতির চিন্তন।

অধুয়া জানতে পেল তাঁর প্রাণের ধন প্রিয়তম সুরত জামালের মৃত্যু সংবাদ। সে জামালকে পতি বলে জেনেই মনপ্রাণ সঁপিয়েছে। জামাল ব্যতিত অন্য কাউকে জীবনের সাথী হিসাবে কল্পনা করতে পারছে না। তাই প্রেম বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে :

জামালের মৃত্যু কন্যা যখন শুনিল
কেশে বান্ধা বিষের কৌটা খুলিয়া লইল।

প্রেম-বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে অধুয়া পালকিতে বসেই বিষ পান করল আর তার নিথর দেহ পালকিতে পড়ে রইল।

দেওয়ান হুকুম দিলেন দুবরাজকে দরবারে হাজির করতে, সেইসঙ্গে অধুয়াকেও। বন্দী দুবরাজকে ফৌজরা বেঁধে নিয়ে এল। অধুয়ার পালকি দরবারে উপস্থিত করলে দেওয়ান বললেন :

অধুয়ারে বিয়া দিতাম কেরামুল্লার সহিতে
আমার মনের দুঃখ খণ্ডিবে তাহাতে।

পালকি থেকে অধুয়াকে নামতে বললে কোনো সাড়া না পেয়ে হিংসায় ফৌজরা পালকি থেকে অধুয়াকে টেনে হিচঁড়ে নামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু অধুয়া সহজে বের হচ্ছে না। পরে :

কেশে ধর্‌য়া অধুয়াকে বাহির করিল
বিষেতে অবশ অঙ্গ সকলে দেখিল।

অধুয়ার নিস্তেজ দেহ ও মরণোন্মুখ অবস্থা দেখে সবাই বিচলিত হয়ে উঠল। ডাক্তার কবিরাজ বৈদ্য খুঁজে আনা হলো। প্রাণপণ চেষ্টা চলল কীভাবে অধুয়াকে বাঁচানো যায়। কিন্তু তাকে আর বাঁচানো গেল না। বিষক্রিয়ায় অধুয়ার মৃত্যু হলো। লাশ পড়ে আছে উঠোনে। দেখতে যেন :

দিঘল চাঁচর কেশ পড়িছে জমিনে
পূর্ণিমার চান্দ যেন ছাড়িয়া আসমানে।

এ লাশ দেখে আলাল খাঁর পুত্রশোকের আগুন আবার জ্বলে উঠল। অধুয়ার কালো দীর্ঘ চুলে বাঁধা রয়েছে ছেলে জামাল খাঁর চিঠি। আর হাতের আঙ্গুলে জামাল খাঁর হীরার আংটি। তাই দেখে আলাল খাঁর হৃদয় ভেঙে চুরে গেল। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বন্দী দুবরাজও তাঁর কন্যার মৃতদেহ দেখে বারাবার মূর্ছা যেতে লাগলো। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রজা-সভাসদ সবাই শোকাহত।

www.pathagar.com

পুত্রহারা আলাল খাঁ ও কন্যাহারা দুবরাজ এখন আর দোস্ত-দুশমন নয়। তারা হিংসা-অভিযোগ-প্রতিশোধ ভুলে দুই বন্ধু গলাগলি করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। যেন :

পুত্র-কন্যার শোকে দুইই পাগল হইল
দুলালরে ডাকিয়া আলাল কহিতে লাগিল।
সুখেতে বসিয়া ভাই দেওয়ানিগিরি কর
আবার যাইবো আমি হইয়া ফকির।

ফকির সেজে দেওয়ান আলাল খাঁ আবার মক্কায় চলে গেলেন। দুবরাজ মুসলমান হয়ে দেওয়ানের সঙ্গে বানিয়াচং ত্যাগ করল।

রাজা জয়সিংহের কিসসা

বানিয়াচং ও জগন্নাথপুর রাজ্যের রাজা ছিলেন যথাক্রমে গোবিন্দ সিংহ ও বিজয় সিংহ। তাঁরা উপাধিতে ছিলেন সিংহ এবং একই জাতি-গোত্রেরও।

একসময় খাসিয়া উপজাতিদের আক্রমণে জগন্নাথপুর রাজ্য তাদের দখলে চলে যায়। ফলে কিছুদিনের জন্য জগন্নাথপুরের রাজধানী বানিয়াচংয়ে স্থানান্তরিত হয়।

বিজয় সিংহের প্রজাদের উপর দখলদার খাসিয়ারা অত্যাচার শুরু করলে, প্রজাগণ এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বানিয়াচঙের রাজার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

রাজা গোবিন্দ সিংহ তাদেরকে আশ্রয় দান করেন এবং সংকটজনক অবস্থা থেকে জগন্নাথপুরবাসীকে মুক্তির জন্য কালবিলম্ব না করে সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে খাসিয়াদের দখল থেকে জগন্নাথপুরকে মুক্ত করেন। খাসিয়ারা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। শত্রুমুক্ত জগন্নাথপুরে রাজধানী পুনঃস্থাপন হয়।

তখন মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। দিল্লির সম্রাট আকবর এই বীরত্বের জন্য গোবিন্দ সিংহকে 'খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গোবিন্দ খাঁ খাসিয়াদের বিতাড়িত করে রাজ্যের ভূসম্পদে এজমালিত্ব দাবি করে অংশীদারিত্ব নিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকালে বিজয় সিংহের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। গোবিন্দ খাঁর আধিপত্য বিজয় সিংহের কাছে অসহ্য ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে দাঁড়ানার সাহস বিজয় সিংহের ছিল না। তাই :

গোবিন্দের অনিষ্টেতে করি দৃঢ় পণ
চলিলা যে হৃষ্ট মনে নবাব ভবন।

বিজয় সিংহ বুদ্ধি করে মোঘল রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সম্রাট আকবরের কাছে নালিশ করে সুবিচার প্রার্থনা করেন।

গোবিন্দ ছিলেন শুধু জোরে বলবান
বিজয় সিংহ বিদ্যা বুদ্ধি উভয়ে প্রধান।

এই নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট আকবর দূত মারফত গোবিন্দ খাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। দূত অনুরোধ ছাড়া পীড়াপীড়ি শুরু করল, 'আধা পয়সার বেটা না, কথা

www.pathagar.com

মাতে ধুমার থাইক্যা উঁচা'। দূতের কথা সহ্য হলো না। গোবিন্দ খাঁ উত্তেজিত হয়ে দূতকে এক পর্যায়ে লাথি মারলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত, বলিষ্ঠ দেহী, বলবান গোবিন্দ খাঁর লাথি দূত বেচারা সহ্য করতে না পেরে বারবার মূর্ছা যেতে লাগল। উপস্থিত প্রজাবৃন্দ ডাক্তার কবিরাজ ডাকতে শুরু করল এই বলে :

অইছে কামের ওষুধ নাই
যে বলা হোক বাঁচান চাই।

কিন্তু :

পদাঘাতে রোগাজীর্ণ দূত অজ্ঞান হইলা
দাওয়াই পথ্য দেওয়ার পূর্বেই মইরা গেলা।

অবশেষে দূত মারা গেল। এই সংবাদ শুনে সম্রাট আকবর গোবিন্দ খাঁকে বন্দী করে নেবার জন্য বানিয়াচঙে সৈন্য পাঠালেন। আগত সৈন্যদলের সঙ্গে গোবিন্দ খাঁর যুদ্ধ বেধে গেল। সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ খাঁর সাহস, বুদ্ধি, রণকৌশল ও বিক্রমের পরিচয় পেয়ে তাঁকে কখনোই জীবিত অবস্থায় বন্দী করে, দিল্লিতে নিতে সমর্থ হবেন না নিশ্চিত ভেবে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর গোবিন্দ খাকে জীবিত চান। সৈনাধ্যক্ষ উপায়ান্তর না দেখে কৌশল করে হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত করেন এবং তিনি এক মণি-মাণিক্য বিক্রেতার ছদ্মবেশ ধারণ করে আজমিরীগঞ্জে নৌকা নিয়ে আসেন। গোবিন্দ খাঁ ঐ ব্যবসায়ীর আহ্বানে মণি বিলতে নৌকায় উঠলেন। এ অবস্থায় তাকে বন্দি করা হলো।

বন্দী গোবিন্দ খাঁকে দিল্লি পৌছানো হলো। দরবারে দূত হত্যা ও ফরমানাদেশ অমান্য করার দায়ে গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত গোবিন্দ খাঁ দিল্লির কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীর নাম জিজ্ঞেস করলে তাঁর অপর নাম (নিজ নাম) জয় সিংহ বলেন :

গোবিন্দ সিংহের দুই নাম ছিল প্রকাশিত
জয় সিংহ বলিয়া তাকে অনেকে জানিত।

কারাগারে জয় সিংহ নামে অপর এক বন্দী ছিল। দণ্ডের নির্ধারিত তারিখে কারা প্রহরীরা ভুলবশত গোবিন্দ খাঁর নামান্তরে জয় সিংহের পরিবর্তে অপর বন্দী জয় সিংহকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়। জয় সিংহ ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ হারান।

গোবিন্দ খাঁর ললাট লিখন আমরণ রাজত্ব করা। তাই বিধিচক্রে বেঁচে গিয়ে তিনি সম্রাট আকবরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান। কারারক্ষীদের দ্বারা বন্দীর এই নাম বিভ্রাটকে খোদার ইচ্ছাবশত গণ্য করে সম্রাট আকবর প্রাণদণ্ড থেকে গোবিন্দ খাঁকে অব্যাহতি দেন।

একের তরে যব গিয়াছে আরেক প্রাণ
অনুচিত বধ করা আরেক জান। ·
অতএব গোবিন্দ খাঁকে প্রাণে না মারিয়া
জাতি নাশ কর তারে গোশত খাওয়াইয়া।

প্রাণে বেঁচে গিয়ে গোবিন্দ খাঁ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'হাবিব খাঁ' নামধারণ করলেন।

www.pathagar.com

নবাব বলিয়া যব এমন বচন
গোবিন্দের জাতি নাশ হইল তখন।
জাতিচ্যুত হইলেন গোবিন্দ যখন
হাবিব খাঁ নাম তার হইল তখন।

নিজ রাজ্য বানিয়াচঙে রওয়ানা হলে প্রজারা আনন্দে তাঁকে স্বাগত জানাল এবং সমস্বরে বলে উঠল :

রাখে আল্লা মারে কে
মারে আল্লা রাখে কে।

মজলিশ আলম ও সুন্দরী ভবানীর কিসসা

বানিয়াচঙের রাজা গোবিন্দ সিংহ নামান্তরে গোবিন্দ খাঁ মুসলমান হয়ে হাবিব খাঁ নাম ধারণ করে দিল্লী থেকে দেশে খুশিমনে ফিরে আসেন। কিন্তু পূর্বশত্রুতা হেতু জগন্নাথপুরের রাজা বিজয় সিংহের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ রয়ে যায়। সুযোগে থাকা এই রাজা এক সময় জগন্নাথপুরের ভূ-সম্পত্তির দাবি উত্থাপন করলে এ নিয়ে উভয় রাজার মধ্যে পুনঃবিবাদ বেধে ওঠে। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে তুলনামূলক কম সৈন্যবলের অধিকারী বিজয় সিংহ যুদ্ধ এড়িয়ে দিল্লির সম্রাটের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে প্রতিকার চাইতে দিল্লিতে যান। এর মধ্যে বিনা বাধায় জগন্নাথপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়ে :

হাবিব খাঁ আরম্ভিলা করিতে শাসন
বিজয়কে অধিকার না দিলা তখন।

বিজয় সিংহ দিল্লির সম্রাটের দস্তিদার ও খ্যাত কবি বল্লভ রায়ের সহায়তা কামনা করে হাবিব খাঁর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ সম্রাটের গোচরে নিতে সহায়তা চান।

হাবিব খাঁ এ সংবাদ জানতে পেরে কিছুটা নমনীয় হন। কবি বল্লভ রায় অভিযোগ সম্রাটের নজরে না নিয়ে নিজ প্রভাব কাটিয়ে বিরোধ আপস মীমাংসার উদ্যোগ নেন। তিনি উভয় রাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে দশপন অংশ ও ছয়পন অংশ হিসাব নির্ধারণ করে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ফলে উভয় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশপনে বানিয়াচুঙ্গি, ছয়পনে জগন্নাথপুরী
ষোল পনের হিস্যার হিসাব হইল জারি।

কিন্তু এতেও পরস্পরের মনোমালিন্য একেবারে দূর হলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই :

ছাইর আগুন যেমন ফালদি উঠে
উচিল্লা কইরা তেমনি যাইত্যা ধরে।

হাবিব খাঁ ঠুনকো অজুহাতে পুনরায় জগন্নাথপুর দখলের হুমকি দেন। অহেতুক অভাবনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবার চিরস্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে রাজা বিজয় সিংহ রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি ভাবেন, রাজ্য সীমানা কম পেয়েও

www.pathagar.com

যদি শান্তিতে রাজ্য পরিচালনা করা যায়, বিজয় সিংহ সীমানা চিহ্নিত করার প্রস্তাব দিলেন। বানিয়াচঙের রাজা হাবিব খাঁ খুশিমনে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

স্থির হলো, একদিন ভোরে দুজন রাজা নিজ নিজ রাজধানী থেকে পালকি চড়ে একে অন্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবেন। অল্প সংখ্যক অনুচর সাথি হয়ে রাজার সঙ্গে পদব্রজে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। পথ চলতে চলতে যে স্থানে একে অন্যের দেখা হবে, সে স্থানেই সম্মিলিতভাবে নিজ নিজ রাজ্য সীমানা নির্ধারণ করবেন।

পালকি চলিলা রাজা, আট বেয়ারা বায়
যত যায় দূরে, জায়গা তত পায়।

এক কাকডাকাভোরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনুচরবর্গ নিয়ে দুই রাজা নিজ নিজ পালকি চড়ে যাত্রা করলে পালকিবাহী বেয়ারা দ্রুত পা ফেলল। আট বেহারার পালকি বেহারা বদল করে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু :

খুঁচি দৌড়ে যায় বেয়ারা, পথ না ফুরায়
পাও হাঁটু ভাইঙ্গা আনে, কোমর গুড়ায়।

ক্ষীণ শক্তিসম্পন্ন বেয়ারাদের স্থূলদেহী রাজা হাবিব খাঁকে বহন করতে কষ্ট হচ্ছিল। তারা রাজার পালকি বহন করে বেশি পথ এগুতে পারেনি। পক্ষান্তরে জগন্নাথপুরের ক্ষীণদেহী রাজার পালকি, বেয়ারারা দ্রুত হেঁটে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে বানিয়াচঙে সীমান্তে প্রবেশ করে।

এক সময় দুই রাজার দেখা হলো। অঙ্গীকারানুযায়ী সীমানা চিহ্নিত হলে হাবিব খাঁর অনেক জায়গা হাতছাড়া হয়ে যায়। হাবিব খাঁ তখন নানা অজুহাত দেখিয়ে অঙ্গীকারনামা অস্বীকার করেন। তিনি এক পর্যায়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে রাগান্বিত হয়ে বিজয় সিংহের পালকি ভেঙে দিলেন।

গোসা করি রাজা, ভাংলা পালকি
লণ্ডভণ্ড হইলো চুক্তি, আর সব চালাকি।

হাবিব খাঁর এ আচরণে বিজয় সিংহ মর্মাহত হলেন। তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন। সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ বিফলে গেল। ঝগড়া-বিবাদ আরো গভীরে গড়াল। হাবিব খাঁ যতই উত্তেজিত, বিজয় সিংহ ততই বিনয়ী, নম্র। ধৈর্যশীল রাজা হিসেবে স্বভাবজাত পরিচিতি স্থাপনের চেষ্টা করছেন বিজয় সিংহ। প্রতিটি গর্জন, আস্ফালন ও উত্তেজনার বিপরীতে সরলতা প্রকাশ যেন বীরপুরুষদের এক লক্ষণ।

এদিকে হাবিব খাঁ বিজয় সিংহকে বেকায়দায় ফেলার এক নতুন কৌশল আটলেন। তিনি তাঁর ছেলে মজলিশ আলমকে বিজয় সিংহের একমাত্র মেয়ো ভবানীর সঙ্গে বিয়ে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর এ ইচ্ছা নিয়ে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রতিভাধর কবি বল্লভ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কবি বল্লভ রায় প্রস্তাবটি বিবেচনায় নিলেন এই ভেবে যে, হাবিব খাঁর পুত্র মজলিশ আলমের সঙ্গে বিজয় সিংহের কুমারী কন্যার বিয়ে হলে তাদের পরস্পরের সঙ্গে আবার নতুন করে আত্মীয়তার বন্ধন হবে। এতে করে বানিয়াচং ও জগন্নাথপুরের রাজ্য সীমানা বিরোধসহ সকল বিরোধের নিরসন হতে পারে।

www.pathagar.com

কবি বল্লভ রায় প্রস্তাবটিকে উত্তম গণ্য করে জগন্নাথপুর সফরে এসে প্রস্তাবটি পেশ করলেন। বিজয় সিংহ, জাতিভ্রষ্ট করার হীন কৌশল হিসেবে প্রস্তাবটিকে গণ্য করে অপমানবোধে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লভ রায় বললেন কথায় আছে :

গোবিন্দ শুধু জোরে বলবান
বিজয় সিংহ বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রধান।

এই বলে তাঁকে ধৈর্য ধারণ করে স্থির মস্তিষ্কে আরো চিন্তা করার পরামর্শ দিলেন।

অবশেষে বুদ্ধিমান বিজয় সিংহ কূট কৌশল অবলম্বন করে চালাকির জাল বিস্তার করে কবির প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং বললেন, হবু জামাতাকে জগন্নাথপুর সফরে আসতে হবে। রাজকুমারীর পছন্দ হলেই বিয়ে হবে, নতুবা নয়।

যথা প্রস্তাবে সম্মতি হলো। এরই মধ্যে বিজয় সিংহ তাঁর কৌশলগত সহজ সরল ব্যবহার ও মৌখিক ভালোবাসা প্রদর্শনে হাবিব খাঁকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হলেন। কারণ তিনি জানেন :

রাগের মাথা বুদ্ধি হারায়
ঠান্ডা মাথা বুদ্ধি জাগায়।

বিজয় সিংহের ঠান্ডা মাথার কুটিলতা হাবিব খাঁ বুঝে উঠতে পারলেন না। বিজয় সিংহ তার শত্রুকে চিরতরে দমন করার উদ্দেশ্যে এ সুযোগটি ব্যবহার করতে চান। মজলিশ আলমকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র আটলেন। এইভাবে হত্যার বিষয়ে গোপনে অন্দর মহলে রাজা-রানির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন। রাজকুমারী ভবানী কথাগুলো শুনে ফেলল। হত্যার কথা শুনে তার গা শিউরে উঠল। সে মনে মনে পণ করল :

এ বড় অন্যায়, প্রাণও যায় যদি
যেকোনো ছন্দরে বাঁচাবো অতিথি।

নিরপরাধী অতিথির জীবন বাঁচানোর চিন্তা তার মনে জাগল। বিশ্বস্ত দাসীদের ডেকে বলল, বানিয়াচঙের রাজকুমার অতিথি হয়ে এলে তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে। পুষ্প বর্ষণের মাধ্যমে স্বাগত জানাবে। গোপনে গোপনে বাপ-বেটির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে রাজকুমার মজলিশ আলম জগন্নাথপুরে এলে রাজা বিজয় সিংহ রাজকীয় সংবর্ধনায় তাকে বরণ করে নিলেন। রাজ্যময় আনন্দের ঢেউ বইছে। রাজা-প্রজা সবার আন্তরিক ভালোবাসার উষ্ণ পরশ ও আপ্যায়নে বড়ই তৃপ্ত হলেন কুমার মজলিশ আলম।

রাত এল। এ রাতেই বিজয় সিংহ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইচ্ছুক। মজলিশ আলমকে অন্দর মহলে নিয়ে আসা হলো। মহলের একটি সুসজ্জিত কামরায় রাত্রি যাপন করবেন অতিথি। এর পাশের কামরাটি নাচ মহল। রাজ্যের খ্যাতনামা বাইজি এনে লাল নীল ঝাড়বাতির ঝলসানো আলোতে নেচে-গেয়ে অতিথির মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন হলো।

অতিথি অন্দর মহলের দিকে আসতেই দাসীরা পুষ্প বর্ষণ করে অভ্যর্থনা জানাল। রাজকুমারী ভবানী একটি ফুলের তোড়া রাজকুমার মজলিশ আলমের হাতে তুলে দিল।

www.pathagar.com

প্রীতি উপহার সাদরে গ্রহণের মাধ্যমে একে অন্যকে দেখে নিল। ভবানীর নজরকাড়া রূপ আর অপূর্ব দেহ বল্লরী দেখে মজলিশ আলম। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল–

ভবানীও মজলিশ আলমের নজরকাড়া রূপ লাবণ্য ও পৌরুষ দেখে অভিভূত। একে অন্যকে পছন্দ করল, ভালোবাসল।

রাজ অতিথি মজলিশ আলম অতিথিশালায় অবস্থান করছে, রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে। সময় যত গড়াচ্ছে ভবানীর চিন্তা ততই বাড়ছে। নাচ মহলে জলসায় অতিথিকে বিষপানে করিয়ে হত্যা করা হবে। পিতা বিজয় সিংহের এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা বারবার মনে পড়ছে আর উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছে ভবানী। অতিথিকে কীভাবে সংবাদটি জানানো যায়, কীভাবে বাঁচানো যায়–এই চিন্তায় আহার-নিদ্রা ছেড়ে মহলে পায়চারি করছে ভবানী। অবশেষে দাসীদের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান সৌদামণিকে ডেকে গোপনে বিষয়টি খুলে বলল।

কিছুক্ষণ পর সৌদামণি নানান ফলের একটি ডালি সাজিয়ে অতিথিকে পরিবেশনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসে ভবানীকে বলল 'রাজকুমারী, ছোট করে একটি চিঠি লিখে এই ফলটির ভিতরে ঢুকিয়ে দিন।' কথামতো সঙ্গে সঙ্গে :

প্রিয় মাথা মোর খাও
নাচ মহলে না যাও।

এই লিখে চিরকুটটি একটি বড় আপেলের ভেতর ভবানী ঢুকিয়ে দিল। সৌদামণি ফলের ডালি নিয়ে অতিথিশালায় উপস্থিত হয়ে রাজকুমারকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বলল, রাজকুমার মহাশয় এ উপহার গ্রহণ করুন। রাজকুমারী নিজ হাতে এই বড় আপেলটি কেটে ফালি করেছেন, আপনি সাদরে গ্রহণ করুন। রাজকুমার মজলিশ আলম ডালি থেকে সর্বাগ্রে ঐ ফালিটি আলাদা করতেই চিরকুটটি তার নজরে পড়ল। চিরকুট পাঠ করে রাজকুমার সৌদামণিকে কিছু বলতে উদ্যত হলে আঙুলের ইশারায় চুপ থাকার ইঙ্গিত দিয়ে সৌদামণি দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করল।

মজলিশ আলম মনে মনে কয়েক বার চিরকুটটি পড়ে নিল। চিরকুটের অর্থ এবং সৌদামণির চুপ থাকার ইঙ্গিতের এর মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে এক অজানা ভাবনায় নিমজ্জিত হলো তার মন। 'প্রিয় মাথা মোর খাও নাচ মহলে না যাও' এ যে দিব্বি। নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গলের ইঙ্গিত রয়েছে এতে।

এদিকে রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ মহলে বাইজি-যন্ত্রী সবাই প্রস্তুত। আহ্বান এল নাচ মহলে আনন্দ উপভোগের জন্য। মজলিশ আলম অসুস্থতার অজুহাত তুলে নাচ মহলে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

অতিথি অসুস্থ। রাজা বিজয় সিংহের কাছে সংবাদ পৌঁছামাত্র ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হলো। রাজকুমারী ভবানী রাজপুত্রের সেবা-আহার্যের খোঁজ-খবর নিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে সৌদামণিকে পাঠিয়ে আগত চিকিৎসকদের বোঝাতে চেষ্টা করল, রাজকুমারের বিশ্রামের প্রয়োজন। কুমার নিদ্রায় আছেন। এখন জাগানো ঠিক নয়। কাল সকাল থেকে চিকিৎসা চললে ভালো হয়। ঘুমে অচেতন রোগী দেখে চিকিৎসকরা রাজকুমারীর পরামর্শ অনুযায়ী মহল ত্যাগ করল।

www.pathagar.com

পথ্য দেবার উপলক্ষ করে সৌদামণি সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অসুখের ভাণ করা রাজকুমারকে এ রাতেই মহল ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ জানাল। রাজকুমার রাজি হলো, কিন্তু ভবানীকে ছেড়ে সে যেতে চাইল না। সে বলল :

ভবানী বিহনে মরলেও সুখ
মিটিব মরণে সকল দুখ।

সৌদামণি ফিরে গিয়ে রাজকুমারের মনের কথা জানাল রাজকুমারীকে। রাজকুমারের প্রেমে বিভোর ভবানী সৌদামণির কথা শুনেই গোপনে নৌকার দাড়ি পাইক ঠিক করে নিল। রাতেই মহল ত্যাগ করে কুমার মজলিশ আলম তার প্রেয়সী ভবানীকে নিয়ে বানিয়াচং রাজ্যে প্রবেশ করল।

রাজা হাবিব খাঁ এভাবে পুত্রবধুকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একমাত্র পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। এমনিভাবে একাকী চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজকুমার মজলিশ আলম বিজয় সিংহের ষড়যন্ত্রের কাহিনি হাবিব খাঁকে খুলে বলল। ছেলের মুখে বিজয় সিংহের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সাহসী ও বুদ্ধিমতী ভবানীর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। তিনি একজন মৌলভী সাহেবকে ডেকে এনে ভবানীকে ধর্মান্তর করে নাম রাখলেন লতিফা বেগম। মহাধুমধামে পুত্র মজলিশ আলমের সঙ্গে নও মুসলিম লতিফা বেগমের বিবাহ সম্পন্ন হলো।

রাজ্য চালায় রাজা, রাজারে চালায় রানি,
কিসসার ইতি আলম আর সুন্দরী ভবানী ॥

বিজয় সিংহের বিশ্বাসঘাতকার ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হাবিব খাঁর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে লাগল। সুযোগ সন্ধানে থাকা এই রাজা একদা গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেলেন যে বিজয় সিংহ হরিণ শিকারে বনে অবস্থান করছেন। হাবিব খাঁর সৈন্যরা সেই বনে বিজয় সিংহকে হত্যা করে। পরবর্তীসময়ে জগন্নাথপুরের পতন হয়।

ভবানির প্রেমকাহিনি

এক পর্যায়ে ইটা রাজ্যের কবি বল্লব খাঁ নামক অমাত্য প্রস্তাব নিয়ে আসেন বানিয়াচং রাজ দরবারে। বানিয়াচং রাজা বললেন "আমার প্রস্তাবে রাজি হলে যুদ্ধ আর বাধবে না বলুন,

রাজ মহাশয়া আমি কি প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারি।

রাজা বললেন, আমার একমাত্র পুত্র মজলিস আলমের সাথে বিজয় সিংহের রাজ কুমারিকে বিয়ে দিতে হবে। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলে আর গণ্ডগোল হবে না মধ্যস্থকারি জগন্নাথপুরের রাজাকে গিয়ে বললেন সমস্ত ঘটনা। প্রস্তাব শুনে রাজা বিজয় সিংহ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। পরে আমাত্তের অনেক কথাবার্তার পর বিজয় সিংহ প্রস্তাবে রাজি হলেন। রাজা বললেন যাও এতে আমার আপত্তি নেই। তবে রাজ পুত্রকে আমার দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে। যদি আমার মেয়ে রাজ পুত্রকে পছন্দ করে তবেই এই বিয়ে হবে। আমাত্য বানিয়াচং এসে খবর দিলে এতে রাজা হাবিব খাঁ খুশি হলেন। এবং তার পুত্রকে জগন্নাথপুরে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে বিজয় সিংহ ফন্দি করলেন,

www.pathagar.com

বানিয়াচং রাজপুত্র বাড়িতে এলে তাকে মেরে ফেলতে হবে। রানির সাথে এ সলা-পরামর্শ করার সময় মেয়ে ভবানি লুকিয়ে লুকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। বানিয়াচং রাজপুত্র রাজপ্রসাদে যাওয়ার সাথে সাথে দাসিরা তাকে ফুল ছিটিয়ে সম্ভাসন জানাল। রানি ভবানি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল রাজপুত্রকে। এত রুপ লাবন্য চেহারার মানুষ সে তার জীবনে কখনো দেখেনি।

দাসিরা ফুল ছিটিয়ে দৌড়ে গেল ভবানির কাছে। বলল দেখ, দেখ সখি যেন স্বর্গের দেবতা। একটু আস না চোখ বন্ধ করলে কেন। ভবানি একটু এগিয়ে সামনের দিকে তাকায় আরে এ যেন হুর। বলেই মাটিতে পরে যায়। দাসিরা দৌড়ে যায় রাজা ও রানিমার কাছে। রাজা ও রানি এসে দেখলেন ভবানির করুন অবস্থা। রাজা নির্দেশ দিলেন যাও রাজপুত্রকে বন্দি সেলে নিয়ে যাও। তাটকিরা হল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রানি ভবানি সুস্থ্ হয়ে উঠালেন। রাজ পরিবারের বিশ্বস্ত কর্মচারিরা রানির অনুরোধে রাজপুত্রকে একটি বিশেষ কামরায় নিয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করল। বিশ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। দাসি কাঞ্চন বালা এসে হাজির। রাজপুত্র বলল আমাকে খেদমত করার প্রয়োজন নেই, ওগো রাজকন্যার সখী রাজকন্যাকে আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থ্া কর। রাজপুত্রের তলব পেয়েই রাজকন্যার প্রধান সখী সৌদামণি হাজির হয়ে সালাম দিয়ে বলল আমি রাজকন্যার সখী, আমায় ডেকেছেন বলুন কি খেদমত করতে পারি।

রাজপুত্র বলল রাজকন্যার অবস্থা জানতে তোমাকে এখানে ডেকেছি। সৌদামণি বলল রাজকন্যা এখন নিদ্রায় আছেন। কখন ঘুম ভাঙবে কখন কি প্রয়োজন হয় তার কাছেই বসে ছিলাম। আপনার তলব পেয়ে এসেছি। বলুন আমাকে কি করতে হবে। দেখ সৌদামণি, আমি না আসলে রানি মূর্ছা যেত না। সারা বাড়ির মানুষকেও এত কষ্ট করতে হত না। আমার মনে হয় তার এ বিয়েতে মতো নেই। হয়ত এ কারণেই তিনি মূর্ছা গেছেন। শাহজাদার মতো এত রুপলাবণ্য দেখে কারই বা হুঁশ থাকে। শোন, আমার রুপলাবন্য দেখেই যদি তিনি জ্ঞান হারিয়ে থাকেন তাহলে আমি কি তোমার সাথে আসতে পারিনা, তাকে দেখার জন্য। না, শাহজাদা এখন এত রাতে এ ঝামেলা করে লাভ নেই। ঘুম থেকে উঠলে আপনাকে নিয়ে যাব। সেও আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবে। এখন গিয়ে দেখি সখি কি করে। সৌদামণি ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে রাজকন্যার কাছে গিয়ে বসল। রাজপুত্রের রুপ, গুণ, কথাবার্তা শুনে নিজেকে ধন্য মনে করল। সারা রাত যেমন ঘুম হয়নি রাজ পুত্রের, তেমনি ঘুম হয়নি রাজকন্যারও। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনার পর রাজকন্যা ও সৌদামণি শাহজাদার কক্ষে প্রবেশ করল। শাহজাদাকে ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার পর শাহজাদার সন্নিকটে বসলেন রাজকন্যা। কিছুক্ষণ পর দাসি সিন্দুরবালা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য এনে সামনে রাখল। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সবাই এক সাথে মিষ্টি খেল। এর পর সৌদামণি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। শাহজাদা বলল, গতকল্য তোমার এ অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মনে হয় তোমার এই বিয়েতে দ্বিমত থাকায় তুমি মূর্ছা গেছ। দেখ, রানি, আমার তোমার জন্য দুরাজ্যের এত যুদ্ধ। এত রক্তক্ষয়, মৃত্যু, হানাহানি, তোমার বুদ্ধিমত্তা, রূপ এবং গুণের কথা শুনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসেছি আত্মীয়তার বন্ধনের

www.pathagar.com

জন্য। এ সম্পর্কে আপত্তি করবে না আশা করি। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে গেলে প্রয়োজনে আমি তোমাকে আমার রাজ্যখানী দিতে কুণ্ঠিত হব না।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর শাহজাদী বলল, আমার মতো নগণ্য দাসি আপনার জন্য মানাবে কি? এমন রূপ দেখলে কেনা মূর্ছা যায়? আপনাকে হাতের কাছে পাওয়া আমর পরম সৌভাগ্য। আপনাকে পেয়ে আমি ধন্য হতে চাই। শাহজাদা আলম রাজকন্যার কাছ থেকে এমন প্রতিউত্তর পাবে বিশ্বাস করতে পারল না। দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল রাজপুত্র। মনে মনে ভাবল হয়ত বা কোনো প্রতারণা।

পরক্ষণে আবার ভাবল, রাজকন্যাকে নিয়ে সুখের স্বপ্নের নীড়। সত্যিই কি ভবানি আমাকে দেখে খুশি হয়েছে। ভবানিকে বলল, দেখ রানি রাতে তোমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এত সুন্দর মানুষ হতে পারে বিশ্বাস ছিল না। সত্যিই আল্লাহ তোমাকে আমার জন্য বানিয়েছেন। তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমি তোমার মিষ্টি কথাবর্তায়, সুন্দর চাহনি, লাবন্যমাখা মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমাকে না পেলে তোমার রাজ্য থেকে যাব না। বোঝেছো শেষে অবস্থা কি হবে। যদি বল, আমি কালই বাড়ি গিয়ে আব্বা হুজুরকে পাঠিয়ে দিব বিয়ের পয়গাম দিয়ে। না ভাই শাহজাদা, একটু অপেক্ষা কর। আমি আপনার কলিজার টুকরো হয়ে থাকতে চাই হৃদয়ে। সৃষ্টিকর্তা যেন আপনার পদতলে সেবা করার সুযোগ দেন, এ দোয়াই কর। আমার উপর বিশ্বাস রাখ। গলায় দড়ি দিব তবুও অন্য কাউকে গায়ে হাত দিতে দিব না। এ দেহ মন শুধু আপনাকে সঁপে দিলাম। শাহজদা বলল, তোমার কথা শুনে আমার বুক ভরে গেল রাজকন্যা, তুমিও আমার কলিজার টুকরো হয়ে থাকবে সারাজীবন, তুমি হবে শুধু আমার। বুক ভরা আশা নিয়ে এসেছিলাম, যে ভালবাসা তুমি আমায় দিয়েছ, এটা আমার পরম পাওয়া। এর চেয়ে বেশি কি আর আশা করা যায়। সত্যিই আমি যে সুভাগ্যবান। আচ্ছা রাজকন্যা তুমি যুদ্ধ করতে জান? দেখ রাজকন্যা, তোমার বাঁকা চোখের চাহনি আমাকে বান মেরেছে। সারা দেহে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তোমার রূপ, যৌবন মিষ্টি ভাষা কেড়ে নিয়েছে আমার মন। দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই, আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ আলাদা করতে পারে। আমি যুদ্ধ করতে জানি। প্রয়োজনে দুজন মিলে যুদ্ধ করে বিজয়ী বেশে চলে যাব আমার রাজ্যে। সৌদামণিকে আসতে দেখে ভবানি বলল, এখন চলে যাব। রাত এক প্রহরে আসব কিন্তু।

সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে এক জলসভার আয়োজন করা হল রাজকর্মচারী আমাত্য ছাড়াও আশেপাশের এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ আসল আসরে।

মন্ত্রী প্রভাকর দত্তের এক সখি একটি আঞ্চলিক গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করল। গানটি ছিল এ রকম, ভালবাসা দিয়ে বন্ধু ভালবাসা কিন, হোক না সে পরদেশী চিন বা না চিন,

দ্বিতীয় গানটি হল

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক আর সোনারে
যেই জনে চিনিয়া কিনে লাভ হয় তিন দোনারে।

www.pathagar.com

কমলা নামের আর এক তরুণী গাইল :

'আমি মরলে পোরাইও না সই,
আমি বন্ধুর আগুনে পোড়া,
তোমরা কেন পোড়াবে সই।'

গান শেষ হতে না হতেই শ্রোতাদের অনুরোধে শ্রীমতি নামে আরেক তরুণী পরিবেশন করল :

আমার গলার হার খুলে নেয় গো ললিতে
হার পরে আর কি ফল হবে
প্রাণ বন্ধু নাই ঘরেতে।
গলার হারে কি আর শোভা আছে।

অনুষ্ঠান শেষে শুরু হল ভুজসভা। ভজসভায় রাজ্যের আমন্ত্রিতগণ অংশগ্রহণ করল। শাহজাদার সাথে মন্ত্রী, উজিরসহ আমন্ত্রিতদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। এরপর শুরু হল পরিচয় পর্ব। পরিচয় পর্ব শেষে শাহজাদা প্রত্যাবর্তন করলেন মহলে। আমন্ত্রিত মেহমানগণ শাহজাদার রূপ, গঠন ও ব্যবহারে তার সাথে রাজকন্যার বিবাহের জন্য মতামত ব্যক্ত করলেন। এরপর একসময় ধীরে ধীরে সবাই রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন। গভীর রাতে শাহজাদি তার সখিকে নিয়ে শাহজাদার কক্ষে প্রবেশ করে শাহজাদাকে শায়িত অবস্থায় দেখে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে শাহজাদাকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করে। শাহজাদা ঘুমে অচেতন। রাজকন্যা শিয়রে বসে কপালে হাত দিতেই তিনি টের পেয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। শাহজাদা বললেন কখন এসেছো রানি? শাহাজাদি বলল আপনি খুবই ক্লান্ত। তাই সেবা করার জন্য ছুটে এসেছি। বেশ করেছ, কোমল হাতের পরশ কে না আশা করে। আচ্ছা রানি, তোমার মা-বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

আপনি চিন্তা করবেন না শাহজাদা। দেখা যাক মা বাবা কাল কী বলেন। তারা যদি রাজি নাও হন স্বসম্মানে কার্য সম্পন্ন হবে। অন্যথায় আমি যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ব করেছি প্রকাশ্য ময়দানে আপনার পক্ষ অবলম্বন করে বিদায় নিব এ রাজ্য থেকে। কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমাকে। আপনার চরণ ছুয়ে শপথ নিচ্ছি, আমি আপনার।

শাহজাদা বললেন, আমিও তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলছি, আমি আমার কথায় অটুট থাকব রানি। প্রয়োজনে আমার সিংহাসনটা লিখে দিব তোমার নামে। অনেক রাত হয়ে গেল, এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। রাজকন্যা অন্দর মহলে চলে আসল। এরপর দেখতে দেখতে কথা মালার ফুলঝুড়ি দিয়ে শাহজাদা কাটিয়ে দিলেন দুতিন দিন। শাহজাদী ভবানী খুবই খুশি। প্রতিরাতেই বিভিন্ন প্রকারের খবর নিয়ে দেখা করেন,এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সিন্দুর মালা এসে বলল, "রানি মা সর্বনাশ হয়েছে। কিরে?

আজ খাবার সময় ছোট রানি আব্বা হুজুরকে বললেন, মুসলমান ছেলের কাছে আপনাকে বিয়ে দিতে তার মতো নেই। আব্বা হুজুর তখন কি বললেন?

রানি মাকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন, তাদের অনেক আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল শাহজাদাকে আজই রাতে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়া হবে।

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে প্রয়োগ করবে শাহাজাদের গায়ে। তখন কেউ জানতে পারবে না আসল খুনি কে? শাহজাদার মৃত্যুর খবর শুনে তার বাবা আসবে। এরপর আপনার বাবাহুজুর বানিয়াচং রাজাকে বন্দি করবেন। তখন আপনার আব্বা হুজুর বানিয়াচং রাজার বশ্যতা শিকার না করে রাজ্য চালাবেন।

তাই নাকি? ঠিক আছে দাসি মা, তুমি কাউকে এসব কথা বলোনা।

এদিকে রাজকন্যা তার সখি সৌদামণির কাছে ছোট মার সব ষড়যন্ত্রের ঘটনা খুলে বলল। সৌদামণি বলল, চিন্তা করিস না। আমি কালই তোকে শাহজাদার সঙ্গে বানিয়াচং পাঠিয়ে দিব। সত্যিই বলছ সখি? তাহলে তুমি সব জান? দেখ সখি, আমি তাকে না পেলে বাচব না। রাতে এসে দুসখির মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হয় এবং কিভাবে বানিয়াচং রাজ্যে সহজে পৌছা যায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

এদিকে আলমের কক্ষে এসে সম্পূর্ণ বিষয় খুলে বলে ভবানি। ভবানির কথা মতো আলম শরীর খারাপ এই ভাণ ধরে সারাদিন শুয়ে থাকে। পরদিন রাজা আলমের অসুস্থতার খবর পেয়ে রাজা ও রানিসহ অনেকেই আসল তাকে দেখার জন্য। সারাদিন শাহজাদা একটুও নড়াচড়া করল না।

গভীর রাতে সৌদামণি ঘরে প্রবেশ করে বলল, সই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এরপর রাজকন্যা ও সখী শাহাজাদার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। পরিকল্পনা অনুযায়ী একসময় রাজবাড়ির গোপন পথ দিয়ে বের হয়ে নদীতে রাখা নৌকায় উঠলেন শাহাজাদ ও রানি ভবানি। নৌকায় বৈঠা হাতে পাইকরা বসা ছিল। তারা সৌদামণির আদেশ পেয়েই নৌকা ছাড়ল।

রাজকন্যা অঝোরে কাঁদতে লাগল, শাহজাদা সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু না, চোখের পানি ঝরতেই থাকল। শাহাজাদা বলল কি রানি? তুমি এত কাঁদছ যে। আমি কি তোমার মনমন্দিরে স্থান করে নিতে পারিনি? রাজকন্যা বলল, আমি তো এজন্য কাঁদছিনা। আমি কাঁদছি আমার সখির জন্য। আমার জন্য সখিকে গর্দন দেওয়া হবে। আমার আব্বা হুজুর আমার সখীকে প্রাণে মেরে ফেলবেন, আর আমি একটুও কি কাঁদব না?

এদিকে পাইকরা দ্রুত নৌকা বেয়ে বানিয়াচং রাজ্যে প্রবেশ করল। বানিয়াচং রাজ্যের ভেতরে এসে নৌকার বৈঠা ভেঙে যায়। যেখানে বৈঠা ভেঙে গিয়েছিল সেই স্থানের নাম আজও বৈঠাখালি নামে পরিচিত। এরপর পাইকদের কষ্টের বিনিময়ে যথাসময়ে ভবানিকে রাজবাড়িতে পৌছে দেওয়া হল। রাজবাড়িতে পৌছতেই রাজা ও রানিসহ আত্মীয় স্বজন সবাই দৌড়ে এল। সবাই মহাআনন্দে আনন্দিত। শাহজাদা নিজ হাতে ভবানিকে পৌছে দেন রাজকুঠিরে। বাড়ির লোকজন স্বসম্মানে রাজকন্যাকে বরণ করে নিল। রাজা বিস্তারিত ঘটনা শুনে এবং ভবানিকে দেখে প্রীত হলেন। বাড়িতে শুরু হল ধুমধাম। রাজার আদেশে মোল্লাজীকে ডেকে আনা হল, কলেমা পড়ানো হল। বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ করে রাতে ভবানিকে পাঠিয়ে দেয়া হল বাসর ঘরে।

আলাল দুলালের কিসসা

এমন নির্দয় খসম কেমনে অইলা।
তোমার বিরহে কান্দি বসে একেলা ॥

www.pathagar.com

আমার মতো নাইরে আর অভাগিনী।
ভরা ক্ষেতের মধ্য বাঁকে আমার কে দিল আগুনি।

বানিয়াচং এর নারীপুরুষ আজো এই পালা গান গেয়ে থাকেন সকরুণ সুরে। এই গানের সঙে জড়িয়ে রয়েছে এক হতভাগী নারীর প্রেম কাহিনী। কেমন করে সেই হতভাগী প্রেমিকার স্বামী তার প্রতি নির্দয় হয়েছিল এবং বিরহে কেঁদে কেঁদে এক সময় সেই নারীর প্রাণ পাখিও উড়ে গিয়েছিল। মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিল তার কায়াখানা। সে এক সকরুন গাথা। বানিয়াচং রাজপরিবার এই কাহিনী ময়মনসিংহ গীতিকায় সংকলিত হয়েছে। সারা বিশ্বে এ কাহিনি খুবই জনপ্রিয় ও প্রশংসা লাভ করেছে।

প্রথম থেকেই শুরু করা যাক।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বানিয়াচঙের দেওয়ান সোনাফরকে তার স্ত্রী বললেন, জাঁহাপনা, আমি তো চললাম। আমার মৃত্যুর পর আপনি আর দ্বিতীয় বার শাদি করবেন না। তাহলে আমার দুই সন্তান আলাল–দুলালের কষ্ট হবে। গীতিকায় উল্লেখ রয়েছে এভাবে :

শুন শুন ওহেগো পতি-পতি বলিযে তোমারে।
কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্যা যাই ঘরে ॥
শুন শুন ওহেগো দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি।
দুধের বাচ্ছা দুই না পুতে সঁপলাম অভাগিনী ॥

দেওয়ান সোনাফর বিহ্বল কণ্ঠে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন, দ্বিতীয় বার শাদির প্রশ্নই আসে না। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার বেগম। শান্তিতে চক্ষু মুছে ছিলেন দেওয়ান সোনাফরের স্ত্রী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেকদিন সোনাফরের মানসিক শান্তি ছিল না মনে। স্ত্রীকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তার অবর্তমানে পৃথিবীটা দেওয়ানের কাছে অর্থহীন মনে হল। তিনি মনস্থির করলেন, দেওয়ানী ছেড়ে, ফকির হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন। তুচ্ছ এই সংসার, সমাজ, সবকিছু। কিন্তু আলাল দুলালের কথা ভেবে মহা চিন্তায় পড়লেন তিনি। তাঁর মানষিক অবস্থা চিন্তা করে আত্মীয়স্বজন জোর করে তাকে পুণরায় শাদি করিয়ে দেন। কোনো বাধাই খাটলো না তার। এই দ্বিতীয় শাদিই হলো তার কাল। মুখের বাক্যে অমৃত, পেটে বিষ।

আলাল-দুলালের প্রতি সোনাফরের গভীর স্নেহ লক্ষ করে ভেতরে ভেতরে দ্বিতীয় বেগম হিংসায় জ্বলতে লাগলেন, বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। গোপনে জল্লাদের সঙ্গে যুক্তি করে প্রচুর বখশিসের লোভ দেখিয়ে আলাল দুলালাকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেয়ার বন্দোবস্ত করে ফেললেন। লিখেছেন–

আত্তরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর।
আলাল দুলাল কাইন্দা অইল জর জর ॥

এক অমবশ্যার রাতে অবুঝ কোমল হীরের টুকরোর মতো বালক দুটিকে নৌকায় নিয়ে হাওরের দিকে চলল জল্লাদ। উদ্দেশ্য, নৌকাতেই হত্যা করে হাওরের গভীর পানিতে ফেলে দেয়া। কিন্তু বালক দুজন কান্না জুড়ে দিলেন আকুলভাবে। পাষাণ হৃদয় জল্লাদের চোখেও অশ্রু দেখা দিল সেই কান্নায়।

www.pathagar.com

মৈমনসিংহ গীতিকায় কবি লিখেছেন এভাবে :

ময়ূরপঙ্খী নাও পরে ঘাঠেতে আসিল।
জল্লাদ আইল সেই নায়ের কাড়ালী ॥

দয়া হলো জল্লাদের। আলাল-দুলালকে হত্যা না করে অন্য নৌকায় অবস্থানরত এক সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেয়। সওদাগর আবার দুই বালককে বিক্রি করেন কাজলকান্দা গাঁয়ের হীরাধন নামক অবস্থাপন্ন এক গৃহস্থের কাছে। হীরাধনের বাড়িতে ওরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকল। গোচারণ ছিল তাদের কাজ। একদিন গোচারণে গিয়ে আলাল হঠাৎ মনের দুঃখে পালিয়ে গেল। একা কেঁদে কেঁদে ফিরে এল দুলাল।

এদিকে পুত্রশোক সোনাফর রাতদিন অস্থির হলেন। মনস্থির করলেন তিনি সংসার বৈরাগী হয়ে দেশ ত্যাগ করবেন। কিন্তু না, এ বিবির ঘরেই জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান। সোনাফর সারাদেশে জুড়ে দুই পুত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

দুলাল এখন আর বালক নয়; নবীন যুবক। চমৎকার দেহ সৌষ্টব। সবচাইতে বড় গুণ হল, দুলাল সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান। দুলালের রূপ ও গুণে বিমুগ্ধ সবাই। হীরাধন বৃদ্ধ হয়েছেন। বড় পুত্র সন্তান নেই তার। প্রথম সন্তান মেয়ে মদিনা, দ্বিতীয় সন্তান পুত্র খুব ছোট। অগ্যতা দুলালই হীরাধনের জ্যৈষ্ঠা সন্তান। সংসারে সব কাজকর্ম দেখাশুনা করে।

তোমাকে দেখতে শাহজাদার মতো লাগে। বুদ্ধিও তোমার তীক্ষ্ণ, অথচ তুমি তোমার পরিচয় সারাজীবন গোপন করেই যাচ্ছ, একদিন বলল কিশোরী মদিনা।

আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনা যে, আমি তোমার কেনা গোলাম। পূর্ব পরিচয়ের বিড়াম্বনা জ্বালায় আমি জ্বলতে চাই না। আর তার প্রয়োজনই বা কি? একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুলাল। সত্যিকারের পরিচয় গোপনই করে যায় সে। দুলাল নিজেকে খুবই অপরাধী মনে করে। কি চিন্তা করনা ! তুমি আমাকে মিথ্যে বলছ দুলাল। তুমি যদি অভিজাত বংশের সন্তান না হতে, তোমার চোখে, হাসি, সর্বোপরি রুচিজ্ঞান এমনভাবে আকর্ষণ করত না আমায়। আমি যে তোমার পদতলে আমার আজন্মের সব সাধনা বিসর্জন দিয়ে বসে আছি। ছলো ছলো দুটি নয়ন মদিনার, গোলামকে গোলামের মতোই থাকতে দাও। এত প্রলোভন দিয়ো না মদিনা। লোভ বেড়ে যায়। লোভে পড়ে মনিব হীরাধনের নিকট নেমকহারামি করতে পারব না। আমায় মাফ করো, কেঁদে উঠে যুবক দুলাল। ন্যায় অন্যায় কিছুই বুঝিনে আমি। আমি শুধু আমার হৃদয়ের বাসনাকে বুঝি। আমায় কৃপা কর দুলাল। কিশোরী মদিনার আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ঝড়ে পরে। মদিনার ইচ্ছে অনুযায়ী দুলালের অনিচ্ছা সত্বেও হীরাধর দুলালের সঙ্গে মদিনার শাদি দিলেন। পরস্পরের তীক্ষ্ণ ভালোবাসা মিলনের আনন্দে কুল হারিয়ে গেল এবং ক্রমে ফুলে ফলে জীবন ভরিয়ে তুলল। আনন্দ আল্লাদের মধ্য দিয়ে একদিন এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। তার নাম সুরত জামাল। কিন্তু না, সুখ দীর্ঘ হলো না মদিনার কপালে। অনেক দিন আগের কথা, বানিয়াচঙের মানুষ আজো এই কাহিনি নিয়ে বিনিয়ে গেয়ে যান। দুলাল ও মদিনার জীবনে সুখ সইল না। বিধাতা তাদের প্রতি বাম হলেন। নিদারুন আভিজাত্যের গর্বই অবশেষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিণামে মদিনা ধীরে ধীরে আত্মবিনাশের পথ বেছে নিয়েছিল। একদিন আলাল সেকেন্দার বাদশার কাছে তার

www.pathagar.com

ভাইয়ের কথা ও বানিয়াচং শহরে তার বাবার রাজত্যের কথা সবই খুলে বলল। আলাল কি জানত যে পরিণতি ঠিক এমনি হবে। জদি জানত তা হলে কিছুতেই অনুজ দুলালকে জোর করে নিয়ে আসত না, কাজলকান্দ গাঁয়ের সুখের নীড় থেকে। আর দুলাল ও কি এমন নির্মম পরিণতি কল্পনা করেছিল। যদি কল্পনাই করতে পারত এমন ভুল করত না। কিছুতেই আসত না যখন উপলব্ধি করল তখন তার সব শেষ। একটা অন্তহীন বিরহের পথ শূন্যতায় শুধু হাহাকার করছে। গোচাড়নে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আলাল। এক গহিন অরণ্যে ঢুকে কাঁদতে লাগল সে। ধনু নদীর তীরেরজমিদার দেওয়ান সিকান্দার শাহ শিকারে গিয়েছিলেন সেই বনে। দেখতে পেলেন অপরূপ সুন্দর অসহায় আলালকে। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন প্রাসাদে।

সিকান্দর সাহেব না এই কথা শুনিয়া।
এক কইন্যা তার কাছে দিতে চায় বিয়া ॥

চাকরি দিলেন নিজের মহলে একে একে দ্বাদশ বর্ষ শেষ হলো। এখন আলাল যুবক। সিকান্দার শাহকে সে বলল, জাঁহাপনা, এবার আমার দ্বাদশ বর্ষের চাকরির বেতন দিন। শুধু বেতন কেন? তুমি যা চাইবে,তাই পাবে। সিকান্দার শাহ জবাব দিলেন। তখন আলাল বলল, জাহাপনা! বানিয়াচং নামে এক জায়গা আছে। সে জায়গার দেওয়ান বড়োই অত্যাচারী। নাম সোনাফর, আপনার সাহায্য পেলে আমি তার দেওয়ানী দখল করতে পারি। উত্তম প্রস্তাব, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছি। সৈনিক, হাতী, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, যা যা প্রয়োজন। তুমি যুদ্ধ যাত্রা করো। সিকান্দার শাহ উৎসাহ দিলেন আলালকে। অবশ্যই ততদিনে দেওয়ান সোনাফর আর বেঁচে নেই। আলাল দুলালের শোকে তিনি মারা গেছেন। আলালের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তখন বানিয়াচঙের শাসক। তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ট। সিকান্দার শাহের সাহায্যে এই সুযোগে আলাল বানিয়াচং দখল করল। এক পর্যায়ে সিকান্দার শাহের কন্যার সঙ্গে আলালের শাদি হয়। বানিয়াচঙে তখন খুশির উৎসব। প্রজারা ঋষিতুল্য দেওয়ান সোনাফরের প্রথম পুত্র অর্থাৎ তার দেওয়ানীর ন্যায্য উত্তরাধীকারিকে পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। এমনি সুখের দিনে দেওয়ান আলাল ভাই দুলালের সন্ধানে লোক পাঠাল কাজলকান্দায়। পরস্পর শুনতে পেয়েছিল দেওয়ান আলাল, অনুজ দুলাল অখ্যাত গৃহস্থ হীরাধন তনয়া মদিনাকে শাদি করে দেওয়ান সোনাফরের সব আভিজাত্য বিসর্জন দিয়েছে। ভুলে গেল দেওয়ান আলাল দুঃখময় অতীতকে। ভুলে গেল হীরাধরের সব উপকার। দেওয়ান আলালের লোক কাজলকান্দা থেকে দুলালকে এনে হাজির করল বানিয়াচঙে। তার আগেই সব ব্যবস্থা টিক করে রেখেছিল দেওয়ান আলাল। দুলাল এলেই সঙে সঙে আলাল নিজের শ্যালিকা অর্থাৎ ধনু নদীর তীরের দেওয়ান সিকান্দার শাহের দ্বিতীয় কন্যার সঙে তার শাদির কাজ সম্পন্ন করে ফেলল মুহূর্তেই কি ঘটে গেল দুলাল বুঝতেই পারল না। ততক্ষণে কাজালকান্দা গ্রামে মদিনার তালাকনামাও পৌছে গেছে।

তালকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি ॥

আলালের প্ররোচনায় দুলাল প্রেমকে আভিজাত্যের নিচেই স্থান দিল। ভুলে গেল সব পুরনো কথা। অথচ একদিন পিতার কেনা গোলাম সেই কোমল প্রাণ মদিনা ভলোবেসে

www.pathagar.com

শাদি করে প্রেম ও মানবিকতাকে আভিজাত্যের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল। মদিনা এখনো ভাবে :

আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত পোয়ইয়া ॥
আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বান্ধা দৈ ॥

মদিনা বিশ্বাসই করতে পারলনা, এ কি করে সম্ভব। পুত্র সুরত জামালও আপন অনুজকে বিষয়টার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে বানিয়াচং পাঠাল। দুলাল এখন অতীতের সবকিছু ভুলে নববধূকে নিয়ে খোশ মহলে দিন কাটাচ্ছে। পুত্র সরত জামালও শ্যালক কে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। পুত্রকে বলল, তুমি এক্ষুণি বানিয়াচঙের দেওয়ানী প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও। তোমাকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দিতেও আমার লজ্জা করে। ভুলে যেও না, আমি দেওয়ান সোনাফরের পুত্র। কবে, কখন,কোথাকার এক গৃহস্থ কন্যাকে শাদি করেছিলাম-সে কথা মনে রাখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

আর তাতে দেওয়ানী চলে না। প্রথমে কোনো জবাবই দিতে পারল না বালক পুত্র সুরত জামাল। এতটুকু বালকের মুখ অপমানে লাল হয়ে গেল। মায়ের অপমান শেল হয়ে বিধল তার হৃদয়ে। বাবা দুলালকে শুধু বলেছিল, আমিও দেওয়ান সোনাফরের পৌত্র। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। অনেকদিন আগের ঘঠনা বানিয়াচঙের মানুষ বলে, সুরত জামালের মা পূণ্যময়ী। মদিনার আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিল। অসার মনে হল তমাম দুনিয়া। প্রথম যৌবনের সুখময় ছবিগুলো তার হৃদয়ে ভেসে উঠেছিল তাকে বারে বারে পীড়া দিল। সারাক্ষণ পাগলের মতো বিলাপ করতো সে। গ্রাম্য গায়েনরা তার বিলাপকে গীতের মধ্যে ধরে রেখেছেন এভাবে :

কেন পরানের বন্ধু গেলারে ছাড়িয়া
মন পাখি মোর উইড়া গেছে
পইড়া রইছে কায়া

অবশেষে একদিন চিরদিনের জন্য বিদায় নিল হতভাগী প্রেমিকা মদিনা। একদা আভিজাত্যের মোহ ভঙ্গ হলো দুলালের। প্রেমিকা মদিনার স্মৃতি তার মনে উথরে উঠল। ঘরে আর টিকতে পারল না সে। মদিনার প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পাগল প্রায় দুলাল অশ্বে চড়ে কাজলকান্দার দিকে ছুঠল। কাজলকান্দায় যখন সে পৌছল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তার পূর্ব দিনই মদিনা বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীর মায়া ছিন্নকরে চিরসত্য মৃত্যুর ভুবনে পাড়ি দিয়েছে।

তোমার মা কোথায়? অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে পুত্র সুরতকে প্রশ্ন করল দুলাল। ছলো ছলো চোখে ইশারায় মার কবর দেখিয়ে দিল সুরত জামাল। মাথা ঘুরে যেন পড়ে যাবে দুলাল।

এইমতে কান্দ্যা মিঞা কোন কাম করে।
বান্ধিল ডেগুরা এক কয়বর উপরে ॥
এইরূপে থাকে মিঞা দাওনা অইয়া।

www.pathagar.com

ফকির সাজিল দুলাল দেওয়ানগিরি থইয়া ॥
জালাল গাইনে গায় গীত দুঃখের কাইনি ॥
আর নাই সে গেল মিঞা বান্যাচঙ্গের।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে অতঃপর ঢলে পড়ল সে মদিনার কবরের উপর। কাঁদতে লাগল অঝোর ধারায়। মোহযুক্ত দুলালের কান্নার কথা গীতের সুরে বানিয়াচঙে মানুষেরা গেয়ে যান :

আর নাই যাইমু মদিনা বানিয়াচং শহরে
চিরকাল থাকমু পইড়া তোমারই কবরে।

দুলাল আর গেল না ফিরে বানিয়াচং। মদিনার কবরের কাছেই কুঠির বেঁধে বাস করতে লাগল। সে নিত্য ফুল দিত পরম প্রিয়া মদিনার কবরে।

দেওয়ান পুত্র সুরত জামাল এই ঘটনায় খুবই ব্যথা পেয়েছিল। অবশেষে দুলাল মারা গেলে তাকেও মদিনার কবরের পাশে কবর দেয়া হয়।

খ. কিংবদন্তি

গোবিন্দ সিংহের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

কেশব মিশ্রের বংশধর জনৈক রামনাথের তিন ছেলে মধ্যে প্রথম ছেলে লাউড়, দ্বিতীয় ছেলে জগন্নাথপুর, তৃতীয় ছেলে বানিয়াচং ছিলেন। জগন্নাথপুরের শাসক দরবার সিংহ বানাম দরবার খানের মৃত্যুর পর বানিয়াচঙের গোবিন্দ সিংহ লাউড় ও জগন্নাথপুরকে বানিয়াচঙের সঙ্গে একত্রিত করলে, জগন্নাথপুরের রাজা বিজয় সিংহের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে হয় তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে বিজয় সিংহ পরাজিত হয়ে দিল্লির সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থী হন। গোবিন্দ সিংহকে রাজদরবারে নেয়ার জন্য দূত পাঠানো হয়। গোবিন্দ সিংহ দূতের কথা অগ্রাহ্য করেন ও তাকে পদাঘাত করেন। পরবর্তীসময়ে দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলার নবাবের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য পাঠান। গোবিন্দ সিংহ যখন জানলেন তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি রাজধানী বানিয়াচং সংরক্ষণের জন্য চারদিকে গড়খাই খনন করেন।

দিল্লির রাজ দরবার থেকে অবসর যখন সৈন্য পাঠানো হয়, তখন সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ সিংহের বীর বিক্রম দর্শনে তাকে জীবিত অবস্থায় ধরা সম্ভব হবে না বিবেচনায় চালাকি করে মণি বিক্রেতা হিসেবে উপস্থিত হন। মণি ব্যবসায়ীর আহ্বানে গোবিন্দ সিংহ নৌকায় উঠলে সেখান থেকে তাকে ধৃত করে দিল্লির দরবারে নেওয়া হয়। দূত হত্যা ও আদেশ অমান্যের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় তার। এই সংবাদে গোবিন্দ সিংহের পণ্ডিত জাতুকর্ণ পাড়া গোত্রীয় মুরারী বিশারদ নিজ পাণ্ডিত্যের গুণে হিন্দু মন্ত্রী ও রাজ কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করে গোবিন্দ সিংহের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা করলেন।

অন্যদিকে বিচারটি ধর্মীয় মতে আবার করার জন্য আবেদন করেন। পণ্ডিত ইতিমধ্যেই গোবিন্দ সিংহকে মুসলমান হয়ে প্রাণভিক্ষা করার কথা বললেন। গোবিন্দ সিংহ মুসলমান হয়ে গেলেন। সম্রাট আলমগীর তখন হেসে বললেন, 'বিনায়ে জঙ্গ আস্ত

www.pathagar.com

আজা আয় হাবিবে মন' 'ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত রাজা গোবিন্দ সিংহ হাবিব খাঁ' নাম গ্রহণ করে শাহী দরবার থেকে রাজ্যের সনদসহ শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, তীরন্দাজ, জ্ঞানী, গুণীসহ প্রায় তিনশ পরিবার নিয়ে বানিয়াচং প্রত্যাবর্তন করেন আনুমানিক ১৫৫৬ সালে (জালালাবাদ)।

সাগরদিঘির উপাখ্যান

সাগরদিঘি নাম শুনেছেন অনেকেই, ঘটনাও শুনেছেন খণ্ড খণ্ডভাবে। দিঘি নিয়ে জড়িয়ে আছে অনেক কিচ্ছা আর কিংবদন্তি। এ দিঘি দেখতে দেশ-বিদেশের অনেক পর্যটক প্রতিদিনই আসেন। এর আয়তন প্রায় ৬৫ একর। আগে দিঘিটি শরৎকালে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেও কমলারানি যে স্থানে ডুব দিয়েছিলেন সে স্থানে পানি থেকে যেত। বর্ষার সময় সারা দিঘি কচুরিপানায় ভরে গেলেও দিঘির মধ্যস্থলে বিশেষ স্থানটিতে দেখা যেত অজস্র শাপলা ফুলের সমারোহ। রানি ডুবে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল নাকি গভীর রাতে সোনার নৌকা, রূপার বৈঠা হাতে তাকে দিঘির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। স্বামী সোহাগি ও সন্তান স্নেহময়ী রানি কমলাবতীর অতৃপ্ত আত্মার চাপা দীর্ঘশ্বাস আজো দিঘির চাপাশে গুমরে ফেরে বলে জনশ্রুতি আছে। এ দিঘি দেখতে এসে পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন দিঘির পাড়ে বসে কবিতা লিখেছিলেন বলে জানা যায়। কমলাবতীর নামানুসারে এই দিঘির নামকরণ করা হয়েছিল 'কমলাবতীর দিঘি'।

জানা যায়, এই দিঘি খনন করিয়েছিলেন বানিয়াচং রাজবংশের অধঃস্তন পুরুষ রাজা পদ্মনাভ। দিঘি খননের জন্য দিল্লির রাজদরবার থেকে তিনি কর্ণখা উপাধি পেয়েছিলেন। রাজার পরবর্তী উত্তরাধিকারী রাজাগণ বানিয়াচংয়ে আরোও ৮টি দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এ দিঘিগুলো যুগ যুগ ধরে জনসাধারণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে আসছে। জনশ্রুতি আছে যে, এ দিঘির পাড়ে দুই রাজা পরস্পর দুই ভাই মিলে তারা পাথরের তৈরি দাবাগুটি দিয়ে খেলা করতেন। এখনও দিঘির পশ্চিম পাড়ে পুরানো রাজবাড়িতে দুটি বিরাট বড় পাথরের চিহ্ন পাওয়া যায়। দিঘির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এল আর হাই স্কুল। এই স্কুলটি লোকনাথ ও রমণ বিহারী নামে দুই ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিঘির পূর্ব পাড়ে রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধক হায়দার শাহের মাজার। উত্তর পাড়ে রয়েছে বানিয়াচং সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। দক্ষিণপাড়ে রয়েছে প্রখ্যাত শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব মরহুম জনাব আলীর প্রতিষ্ঠিত 'জনাব আলী কলেজ'। এছাড়াও চারপাড়ে আরো ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই দিঘিকে পর্যটনের আওতায় নিয়ে পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রেখেছে এলাকাবাসি।

কয়েক বছর আগে সরকারি উদ্যোগে সাবেক মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খানের প্রচেষ্টায় দিঘিটি পুনঃখনন করা হয়। ফলে দিঘির আয়তন অনেক ছোট হয়ে যায়। আগে দিঘির চারপারের অনেক বাসিন্দা জমিতে ধান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। দিঘিটি খনন করার পর থেকে সরকার মৎস্য চাষের পরিকল্পনা গ্রহণসহ ইজারার বন্দোবস্ত করে আসছেন।

এই দিঘির রূপকথা লোকমুখে শোনা যায় এভাবে :

www.pathagar.com

অনেক অনেক দিন আগের কথা। বানিয়াচঙের মনাই রাজা তরফ অঞ্চল থেকে রাজকুমারী কমলাবতীকে বধূ করে প্রাসাদে তুলে আনেন। সতী-সাধ্বী হিসেবে কমলাবতীর সুখ্যাতি ছিল। সর্বগুণে গুণান্বিত রানির ব্যবহারে রাজা ছিলেন খুশি। রানির প্রশংসায় প্রজারাও ছিল পঞ্চমুখ। সাত ভাইয়ের একমাত্র আদরের বোন ছিল কমলাবতী। স্বামীর ঘরেও রানির দিনগুলো সুখেই কাটছিল। যথাসময়ে রানির কোল আলো করে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান। রাজা ও রানির আনন্দ যেন আর ধরে না। কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। রাজা একদিন স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে একটি বড় দিঘি খনন করতে বলছে। পর পর তিন রাত্রি একই স্বপ্ন দেখে অমঙ্গল চিন্তায় রাজা দিঘি খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। গণ্ডামালকে দায়িত্ব দেওয়া হলো দিঘি খননের। গণ্ডামালী সঙ্গি-সাথি নিয়ে অনেক মজুর সংগ্রহ করে একসময় দিঘি খনন করতে রওয়ানা হন। এ সময় রাজার ছোট বোন কেউকা গণ্ডামালীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে দিঘি খননের প্রথম কোপের মাটি রানি কমলাবতীর নামে ওঠাতে রাজি করায়। রাজার এ বোনটি ছিল খুবই হিংসুটে স্বভাবের। রানি কমলাবতীকে প্রকাশ্যে আদর-যত্ন করলেও ভেতরে ভেতরে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না। দিঘি খননের প্রথম কোপ কমলাবতীর নামে দেওয়া মাত্রই মহলে বসে রানি নিজে বিপদের কথা বুঝতে পারলেন। প্রায় বছর খানেক শত শত দিন-মজুর ক্রমান্বয়ে মাটি কেটে খনন কাজ শেষ করে। কিন্তু দিঘিতে পানি ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। রাজা মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। রাতে আবার স্বপ্নে দেখলেন রানি কমলাবতী যদি এ দিঘিতে আত্মদান করে, তবেই দিঘিতে পানি উঠবে। রাজা স্বপ্নে কথা প্রকাশ করলে কেউই এ রায় মেনে নিতে রাজি হলো না।

কিন্তু দিঘিতে পানি উঠলে প্রজাদের মঙ্গল হবে। এ চিন্তা করে রানি আত্মহুতি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কবুতরের মাধ্যমে ভাইদের কাছে খবর পাঠালেন তাকে দেখে যেতে অতঃপর একদিন রানি সমস্ত গহনা পরে ও লাল বেনারশি শাড়ি পরিধান করে শেষবারের মতো ছেলেকে আদর করে উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাজনা-বাদ্যের শোরগোলের মধ্য দিয়ে রানি যতই দিঘির মধ্যে অগ্রসর হতে থাকেন ততই পানি বাড়তে থাকে। এমনি করে হাঁটু, কোমর, বুক, গলা ও অবশেষে দিঘির মধ্যখানে যাওয়ার পর চুলও ডুবে গেল। সেই সময় রানির সাত ভাই ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু আদরের বোনটিকে খুঁজে পেলেন না তারা। রানি কমলাবতী চিরদিনের জন্য সাগরদিঘির কালো পানিতে হারিয়ে গেলেন।

এরপর কিছুদিন রাজা আবার স্বপ্ন দেখেন, রানি বলছেন আমি প্রতিদিন আসব আমার রাজপুত্রকে দুধ খাওয়ানোর জন্য; কিন্তু কোনোক্রমেই আমাকে স্পর্শ করবেন না। অন্যথায় আর কোনোদিন দেখা পাবেন না। কথামতো রাজা রাজকুমারকে দিঘির পাড়ে নিয়ে গেলেন। সত্যিই তিনি দেখলেন রানি তাঁর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরপর থেকে রানি প্রতিদিন আসেন শিশুকে দুধ খাওয়াতে। এভাবে রাজা প্রতি রাতে রাজকুমারকে নিয়ে রানির সঙ্গে দেখা করতেন এবং দুধ খাওয়াতেন। হঠাৎ করে একদিন উত্তেজনার বশে রাজা রানিকে বললেন, আহ আজ তোমাকে আমি আর যেতে দেব না, রানির হাত ধরে ফেললেন। রানি বললেন, আমি আপনার জন্য পর হয়ে

www.pathagar.com

গেছি। পাতালপুরী রাজার কাছে আমাকে আপনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন। রানি কমলাবতী এই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না।

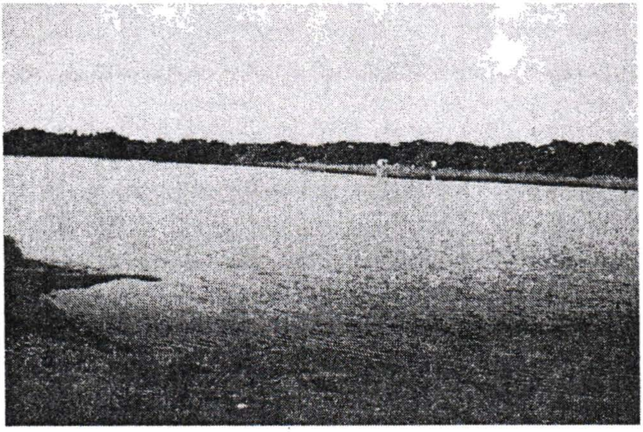

সাগরদিঘি

রামনাথ বিশ্বাসের ব্যতিক্রমধর্মী সভা

রামনাথ বিশ্বাস চীন, আফ্রিকা, কোরিয়া, জাপান, জার্মান, আমেরিকা ও ফ্রান্সসহ এশিয়ার প্রায় সব কটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং প্রতিটি দেশের ভ্রমণকাহিনি পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করেন। রামনাথ বিশ্বাসের মতো এত বিপুল সংখ্যক ভ্রমণকাহিনি বাংলা সাহিত্যে কমই লেখা হয়েছে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এসে প্রায় এক বছর বিশ্রাম করেন। বাড়িতে থাকার সময়ে বানিয়াচঙের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য এড়ালিয়ার মাঠে ১৯৪৯ সালে এক জনসভার আয়োজন করেন। ঐ জনসভায় তিনি প্রায় তিন ঘণ্টাধরে তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, 'একদিন এক চায়ের দোকানে চা পানের জন্য বসি; তখন চাওয়ালা ফুটন্ত জলের কেটলি, চা, দুধ, চিনি টেবিলে রাখে। সেইদেশে নিয়মও এই রকম। আমি নিজ হাতে চা তৈরি শুরু করি। চায়ের পেয়ালাতে ফুটন্ত জল ঢেলে এক চামচ চিনি দেওয়ার পর আরেক চামচ দিতেই চা ওয়ালা বলে উঠল, 'আওর নেহী সাহেব এক ছিপ ছে জিয়াদা লেনা হামারা সুলতানা মে মানা হায়।' আমি তার কথা রক্ষা করে ভাবতে লাগলাম প্রথমবার ভ্রমণে দেখলাম একটা নোংরা দেশ, বাড়ি-ঘর নোংরা। এবার দেখলাম এর বিপরীত। সেই স্থান প্রাসাদে পরিপূর্ণ। আচার-আচরণ ভিন্ন। এর কারণ রাষ্ট্রের মিতব্যয়িতা।

লাকী ধান

একসময় বানিয়াচঙের রাজাদের অধীনে ২৮টি পরগণা ছিল। দিল্লির দরবারে বানিয়াচঙের অধিপতিগণ ভূমি খাজনার পরিবর্তে সাত কোষা নৌকা বা ষোলকোষা নৌকা উপহার দিতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এক সময় বানিয়াচং

www.pathagar.com

থেকে পরগণার বার্ষিক সাত লাখ টাকার আয়কর দেওয়া সম্ভব হতো বলে বানিয়াচঙের পরগণাকে 'সাতলাখী পরগণা' বলা হয়। সাতলাখী পরগণার নামানুসারে বানিয়াচং আমন ধানকে লাখী ধান বলে অভিহিত করা হতো। যা হবিগঞ্জ ও সিলেটের বিভিন্ন স্থানে আমন ধানের নাম ক্রমবিবর্তনে লাকী ধান নাম ধারণ করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

গড়ের খাল

জগন্নাথপুরের শাসক বিজয় সিংহের সঙ্গে বানিয়াচঙের রাজা গোবিন্দ সিংহের প্রায়ই যুদ্ধ হতো। এক পর্যায়ে বিজয় সিংহ দিল্লির দরবারে নালিশ করলে তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী দিল্লির দরবার থেকে গোবিন্দ সিংহকে ধরে নেওয়ার জন্য বার বার দূত পাঠানো হতো। বানিয়াচঙের রাজা দূতকে অগ্রাহ্য করেন এবং তাকে পদাঘাত করেন। দিল্লির দরবার থেকে বানিয়াচং রাজধানী যাতে আক্রমণ না করা হয়, সেজন্য গোবিন্দ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে সুপ্রশস্ত খাল খনন করেন যা এখনও গড়েরখাল নামে পরিচিত।

অধ্যাপক আফজাল চৌধুরী লিখেছেন, 'বানিয়াচং একটা গড় বা দুর্গ এবং চারপাশে শক্ত দেয়াল মণ্ডিত। অত্যন্ত সুনাব্য ছোট বড় খাল সমগ্র বানিয়াচঙের এর ভেতর দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে গেছে। এই সুনাব্য খাল সমৃদ্ধ লক্ষ জনতার ছায়া সুনিবিড় বসত ভূমিকে বর্ষাকালে যদি কেউ ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে বিস্ময়ের কী আছে?

বলা যায় ক্ষীণাঙ্গী নদীর মতো গড়ের খাল সমগ্র গ্রামটিকে আপন মমতা দিয়ে তার চারপাশে যেন বাহু বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে। বর্তমানে গড়েরখাল অনেকটাই ভরাট হয়ে গেছে। কেউ কেউ বাঁধ দিয়ে পুকুর পর্যন্ত তৈরি করেছেন।

বৈঠাখালী

রাজা মজলিশ আলম খাঁ রাজকন্যা ভবানিকে ভালোবেসে জগন্নাথপুর থেকে কৌশলে নৌকাযোগে বানিয়াচঙ আনার সময় নৌকার বৈঠা একস্থানে এসে ভেঙে যায়। বানিয়াচং রাজ্যের ভেতর প্রবেশ করলে দেখা যায় পাইকদের অনেকেরই বৈঠা ভেঙে গেছে। যে স্থানে এসে বৈঠা ভেঙে গিয়েছিল ঐ স্থানের নামকরণ করা হয় বৈঠাখালী। যা আজও ঐ নামেই পরিচিতি লাভ করেছে।

খাসিয়া আক্রমণ ও লাউড় ধ্বংস

হাবিব খাঁর পুত্র মজলিশ আলম খাঁর সময় এক আকস্মিক উৎপাতে লাউড় নগর বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হয়। খাসিয়া পর্বতের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি একসঙ্গে মিলে লাউড় আক্রমণ করেন। তখন বানিয়াচঙের রাজধানী ছিল লাউড়। কিছুদিনের মধ্যেই খাসিয়া সৈন্যবাহিনি আনা হলো। এরপর আকস্মিক বন্যা দেখা দিল। তাতে লাউয়ের বিরাট ক্ষতি হয়। তখন যে যেখানে পারে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে যায়। এভাবে একসময় লাউড় ধ্বংস হয়ে, অল্পকালের মধ্যে জঙ্গলাবৃত হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

সাগরদিঘির পাড়ে পল্লি কবি জসীম উদ্‌দীন

জার্মান-ইটালির অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচারণার জন্য পলিকবি জসীম উদ্‌দীনের নেতৃত্বে একদল গায়ক বানিয়াচঙ আসেন ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে। সিরাজুল হোসেন খাঁন লেখেন, 'আমাদের হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পর পর দুই দিন সন্ধ্যায় গানের আসর হলো। দ্বিতীয় দিন সকালে জসীম উদ্‌দীন সাহেব ও আমি আমাদের বাড়ি থেকে সাগর দিঘির পশ্চিম পাশ দিয়ে হাইস্কুল যাচ্ছি। কিছুদূর যাওয়ার পর দিঘির পাড়ে একটি পুকুরের কাছে যেতেই তিনি কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, একটি বসার চেয়ার-টেবিল পাওয়া যাবে? পাশের বাড়ি থেকে বসার একটি চেয়ার ও ছোট একটি টেবিল এনে দিলাম। চেয়ারে বসে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দিঘি নিয়ে একটি কবিতা লিখলেন। সেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কমলা রানির দিঘি' যাকে ভিত্তি করে পরবর্তীসময়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল।

পালকি ভাঙার হাওর

রাজ্য সীমানা নিয়ে বানিয়াচঙের রাজা ও জগন্নাথপুরের রাজার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের তৃতীয় পর্যায়ে সাব্যস্ত হয় যে, উভয় রাজা যার যার রাজধানী থেকে পালকিযোগে একে অন্যের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হবেন। পথে যেখানে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হবে সেখানেই হবে উভয়ের রাজ্যের সীমানা। কথামতো একদিন তাই করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে উভয় রাজা পালকিযোগে রওনা হলো একে অন্যের রাজধানী অভিমুখে। জগন্নাথপুরের বাহিনী দ্রুত হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে বানিয়াচং রাজ্যের অনেক ভেতরে চলে আসে। তখন বানিয়াচং রাজ্যের বিপুল পরিমাণ জায়গা রাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে দেখে রাজা নানা অজুহাত দেখিয়ে ঐ সন্ধি ভঙ্গ করলে উভয়ের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে শুরু হয় মারামারি। বানিয়াচঙের রাজার সঙ্গীরা জগন্নাথপুরের রাজার পালকি ভেঙে দেয়। যেখানে পালকি ভেঙে যায় সে জায়গা নাম 'পালকি ভাঙার হাওর' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

মৌলবি উবেদুল হাসানের অজানা কথা

মৌলবি উবেদুল হাসান কলকাতা থেকে আরবি ফার্সি অধ্যায়নে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে চারদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সংবাদে তদানীন্তন কলকাতার কাউন্সিলর মার্টিন লুথার ভাষা শিক্ষার জন্য মৌলবি উবেদুল হাসানকে নিজের প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মার্টিন লুথার মুর্শিদাবাদে নবাবের এজেন্ট নিযুক্ত হলে শিক্ষক উবেদুল হাসানকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান তাঁর জ্ঞান প্রতিভার খবর পেয়ে মুগ্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর জ্ঞান প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দি খাঁ তাঁর ভাতিজি নবাব সিরাজউদদৌলার ফুফু নবাব ইজদানী বেগমকে বিয়ে দিয়ে নিজ পরিবারভুক্ত করে নেন। হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুরের দুই ছেলের তিনি ছিলেন গৃহশিক্ষক। নিজাম বাহাদুরের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তখন পরিবারের সবাই মিলে মীর মুনশি মৌলবি উবেদুল হাসানকে সালিস নিযুক্ত করেন। তার ন্যায় পরায়ণতার সালিসীতে শেষ পর্যন্ত বড় ভাই নিজাম পদে নিযুক্ত হন। এসময় বড় ভাই

www.pathagar.com

সালিসীতে সন্তুষ্ট হয়ে পারিতোষিক স্বরূপ নবাবকে রাজকোষ দুই ঘন্টার জন্য খুলে দেন এবং তাঁর প্রতি আদেশ করেন যে, এই সময়ের মধ্যে রাজকোষ থেকে যা খুশি নির্ভয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু উবেদুল হাসান অনেক মূল্যবান কিতাবাদি সংগ্রহ করতে লাগলেন। সামান্য সময় থাকতে তাঁর রাজকর্মচারীর ইশারায় তাঁর মোহের পরিবর্তন ঘটে। শেষে তিনি দুর্লভ কিতাবাদির সঙ্গে মণি-মুক্তা-আশরফি বানিয়াচঙে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

বানিয়াচং হাবিলি

লাউড় রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর ঐতিহাসিক বানিয়াচং হাবিলি নামের দুটি ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই হাবিলি প্রায় ৫০টি কক্ষ বিশিষ্ট ছিল। আনুমানিক ৫০০ জন সৈন্য এখানে বসবাস করতে পারত। দুর্গটি প্রহরার জন্য জায়গা জায়গা উঁচু চৌকি ছিল। রাজ্যের উত্তরাংশে খাসিয়া অত্যাচার নিবারণকল্পে আনোয়ার খাঁ লাউড়ে আরো বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গের বিশেষ কারুকার্য এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি সেখানে গিয়েও মাঝে মাঝে থাকতেন। ভূমিকম্পে দুর্গের অনেক জায়গা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হবিব খাঁ বানিয়াচঙ রাজধানী স্থানান্তর করার পর মাঝে মধ্যে দুর্গে গিয়ে অবস্থান করলেও আনোয়ার খাঁ বানিয়াচঙে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

খালিসা মোজরাই

আনোয়ার খাঁ যখন বানিয়াচং রাজ্যের অধিকারপ্রাপ্ত হন সে সময় পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর নামানুসারে প্রাচীন মাহমুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন। তিনি ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্যের এক নতুন হিসাব তৈরি করেন। তৎকালীন বানিয়াচঙের অধিপতি স্বাধীন লাউড় রাজ্যর ও অষ্টাবিংশতীর পরগণায় তাদের অধিকারের নিদর্শন স্থাপন করেন। কিন্তু অনুসন্ধানকালে এই অষ্টাবিংশতী পরগণাভুক্তরূপে আরো অতিরিক্ত ভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত ভূমির জন্য কর নির্ধারিত হয়। কিন্তু বানিয়াচং অধিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি কর দিয়ে সেই ভূমি গ্রহণ না করায় অন্য লোকের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বন্দোবস্তকৃত এই ভূমি খালিশা বলে পরিগণিত এবং যে ভূমি পূর্বাবধি বানিয়াচং অধিপতির অধিকারে ছিল সেটাই মোজরাই। এর আগে বানিয়াচং অধিপতির অধীনে প্রায় ২৮টি পরগণা ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

রাজা কর্তৃক শেয়ালকে কাপড় দেওয়া

ঘটনাটি ঘটেছিল বানিয়াচঙের দেওয়ান আবিদুর রাজার সময়ে। রাজা একদিন বাড়ির কর্মচারীদের ডেকে বললেন, প্রতিদিন রাতে শিয়ালগুলো এইভাবে কাঁদে কেন? প্রধান সেনাপতি বললেন, হুজুর, ঘটনাটি বুঝে আমরা আগামীকাল আপনাকে জানাব। পরদিন কর্মচারীরা পরামর্শ করে সহজ, সরল রাজাকে গিয়ে বলল, হুজুর আমরা জেনেছি শেয়ালগুলো শীতের যন্ত্রণায় এভাবে প্রতিদিন চিৎকার দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

রাজা কর্মচারীদের বললেন, 'এখন কী করতে হবে?' প্রধান সেনাপতি বললেন, তাদেরকে শীতের কাপড় দিতে হবে। রাজা বললেন, 'যাও, যত টাকা লাগে নিয়ে যাও, আজই কাপড় কিনে বিতরণ করে দাও'। রাতেই রাজকর্মচারীরা রাজাকে গিয়ে বলল, 'রাজামহাশয়! কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।' রাজা মহাখুশি। পরদিন রাতে শেয়ালগুলো আবার চিৎকার শুরু করে দিলে রাজা সবাইকে রাজদরবারে আসতে বললেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে কি? উপস্থিত সবাই বললেন, 'জি হুজুর'। রাজা বললেন, 'আজ আবার চিৎকার দিচ্ছে কেন?' হুজুর, তাদের ভাষায় তারা আপনাকে দোয়া দিচ্ছে। রাজা ঘটনাটি ঠিকই বুঝলেন, কাউকে কিছু না বলে পরদিন তিন রাজকর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।

হেমসেনের কাণ্ড

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উপমহাদেশে বাঙালিদের অবদান ছিল দীপ্তিমান। এই আন্দোলনে বানিয়াচঙের সেন পরিবারের দুই সহোদর সাহসী তরুণ যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বানিয়াচঙের হেমসেনের পরিবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখার কারণে তাদেরকে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল। হেমসেনের একটি ঘটনা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে বানিয়াচঙে চাঙ্গা করার জন্য হেমসেন তাঁর বাড়িতে একদিন নেতৃস্থানীয়দের দাওয়াত করলেন। ইংরেজদের রোষানলে নির্যাতিত অতিষ্ট এই পরিবারের লোকজনকে দেখার জন্য মানুষ দলবেঁধে এল। হেমসেন উপস্থিত লোকদের তাঁর তৈরি অস্ত্রের মধ্যে বাঁশের বন্দুক, বাঁশের কেল্লা, তীর ধনুক, বল্লম এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম কীভাবে তৈরি ও লুকিয়ে রাখা যায় তার কলাকৌশল অবগত করেন। এরপর তিনি আরো বললেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তাঁর পরিবারকে জড়িয়ে যে অত্যাচার করা হয়েছে তার নিষ্ঠুর কাহিনি। হেমসেন বললেন, ভারতবর্ষের প্রায় একশ জন বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মী আমার দলে রয়েছে। বড়লাটের রাজকীয় মিছিলে বোমা হামলার নেতৃত্ব ও সুরাটে কংগ্রেসের সভা পণ্ড করার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এখন বলুন, আমার গ্রামে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করার জন্য আপনারা কীভাবে আন্দোলন করবেন? উপস্থিত সকলেই সভা, মিছিল, হরতাল করার সিদ্ধান্ত নিল। হেমসেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আপনারা বসেন, আমি আসছি।

৮/১০মিনিট পর বিরাট একটি কামান নিয়ে মুখে মুখোশ লাগিয়ে সৈনিকের পোশাক পরে দরজার কাছাকাছি এসে হুংকার দিয়ে বললেন, তোমরা কে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে বোমার একটি আওয়াজও হলো। আবার হুংকার এল তোমাদের ছাড়ব না। কে কাকে ধরে? উপস্থিত সবাই দরজা, জানালা ভেঙে দিল দৌড়। কান্নাকাটি শুরু হলো। ২/৪জন এদিক সেদিক লুকিয়ে রইল। মুহূর্তেই সৈনিকের পোশাক খুলে ফেললেন হেমসেন। আবার ডাকাডাকি শুরু করলেন, কেউ আসল ক্ষিপ্ত হয়ে, কেউ আসল গালিগালাজ করার জন্য, কেউ এল সৈনিক ধরা পড়েছে দেখার জন্য। মানুষ জড়ো হতে না হতেই হেমসেন হাতজোড় করে বললেন, ভায়েরা আমায় ক্ষমা করবেন।

www.pathagar.com

আমি কিছুক্ষণ আগে যে অন্যায় করেছি, তা আমাদের আন্দোলনের স্বার্থে করেছি। আপনাদের আর আন্দোলন করতে হবে না। বানিয়াচঙে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। আমার জন্য শুধু দোয়া করবেন। আমার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। হেমসেনের ছোটভাই সুশীল কুমার সেনও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

পাথরের দাড়াগুটি

রাজা পদ্মনাভ সাগর দিঘি খনন করেছিলেন। তার বসত বাড়ি ছিল ঐ দিঘির পশ্চিম পাড়ে। বর্তমানে যেখানে বহুল আলোচিত দাড়াগুটির অবস্থান। এল. আর হাইস্কুলের দক্ষিণে নবাব উল্লার বাড়িতে প্রাচীন দালানের ধ্বংসাবশেষ ও পাথরের মসৃণ পিলারটি আজো আছে। মাটিতে পড়ে রয়েছে আরেকটি পিলার ও বিরাট বড় পাথর। পাথরের কাছে রয়েছে কবরস্থান। জনগণ ঐগুলোকে হব্যা ও গোমার দাড়াগুটি বলে আখ্যায়িত করে। জনশ্রুতি আছে, হব্যা ও গোমা নামে দুই ভাই দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ঐগুলো দিয়ে খেলা করত। আসলে ঐগুলো দালানের পিলার এবং হব্যা ও গোমা একই ব্যক্তি বলে অনুমেয়। আগেই বলা হয়েছে গোবিন্দ সিংহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তার নাম দেওয়া হয় হাবিব খাঁ। যে কোনো কারণেই হোক এই রাজবাড়িটি পরিত্যক্ত হয়। গোবিন্দ সিংহ হিন্দু থাকাকালে যেমন প্রভাবশালী ছিলেন, মুসলমান হওয়ার পরও তার চেয়ে কম ছিলেন না। কারণ একই ব্যক্তি গোবিন্দ সিংহ ও হাবিব খাঁ এই দুই নামেই এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। বাড়িটি পরিত্যক্ত হলেও কেউ কেউ বাড়িটিকে গোবিন্দের বাড়ি বলে চিহ্নিত করতেন। আবার কেউ কেউ বলতেন, হাবিব খাঁর বাড়ি; হব্যা ও গোমা হবিব খাঁ ও গোবিন্দ সিংহ নাম দুটির বিকৃত রূপ বলে ধারণা করা হয়। দাড়াটি প্রায় ৪ হাত লম্বা এবং গুটি দেড় হাত প্রস্থ। প্রায় গোলাকার ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় গোবিন্দ সিংহ যিনি, তিনিই হাবিব খাঁ নাম ধারণ করে দিল্লির দরবার থেকে মুসলমান হন। ধারণা করা যায় হাবিব খাঁ ও গোবিন্দ সিংহের অপভ্রংশই হইব্যা ও গুমা।

শিবচন্দ্র ন্যায় পঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি

শিবচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন অত্যন্ত স্মৃতিশক্তিধর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। একবার তিনি যা শুনতেন তা অবিকল বলতে কিংবা লিখতে পারতেন। শোনা যায়, একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনো মোকদ্দমার রায়ের নকল আনতে আদালতে যান। রায় ছিল বড়, তাই কর্মচারী তার নকল নিতে অনেক টাকা লাগবে বললে দরিদ্র ব্রাহ্মণ একজন কর্মচারীকে একবার তাঁকে রায় পড়ে শুনাতে অনুরোধ করলেন। পঠিত রায় শুনে তিনি বাড়ি এসে অবিকল তা লিখে ফেলেন। এই ঘটনা তখন আদালতপাড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শিবচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন জাতুকর্ণ পাড়ায় ১২২৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাহিত্য, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, অংক বিষয়ে তার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সামাজিক আচার-বিচার যা কেউ সহজে শেষ করতে পারত না, তাঁর কাছে এলে সু-উপদেশ পাওয়া যেত ও সহজেই মীমাংসা হতো।

www.pathagar.com

দৈব খেলা ভালো নয়

রাজা কর্ণ খাঁর সময় উৎসব উপলক্ষে একবার দেশের সমস্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হলো। বানিয়াচঙের ন্যায় পঞ্চানন রাজপণ্ডিত ছিলেন জগদ্বিখ্যাত, তিনি এই নিমন্ত্রণে যেতে পারেননি। তিনি তাঁর অসুবিধার কথা জানানোর জন্য নয় বছর বয়সী ছেলেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা শিশুপুত্রকে দেখে তাঁকে সমালোচনা করলে বালক লজ্জিত হয়। বাবাকে অপমান করা হয়, কথা বলার এক পর্যায়ে বালক পুত্র তর্কে জড়িয়ে গেল। শেষ পর্যায়ে তখন পণ্ডিতগণ বালকের কাছে হার মানলেন এবং বুঝলেন উপহাস করা মূর্খতার কাজ। তখন পণ্ডিতগণ বালককে তর্কভূষণ উপাধি দিলেন। বাড়ি আসার পর বাবা যখন শুনলেন ছেলের কাছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরাজিত হয়েছেন, তিনি বললেন, এটা দৈব খেলা মাত্র। এটা ভালো নয়। ছেলে, তুমি যে আস্পর্ধা দেখিয়েছে–তোমার সপ্তম পুরুষ পণ্ডিত হলে কোনো ব্যক্তিকে জয় করলে জীবিত থাকবে না।

পাণ্ডিত্যের মন্ত্র

বানিয়াচঙের গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহাদেব পঞ্চানন ছিলেন অন্যতম। তাঁর পুত্র মেঘ নারায়ণ তৎপুত্র সর্বনন্দকে একবার শিষ্যদের অনুরোধে মহেশ্বরীতে যেতে হলো। পথে তাঁর নৌকা ডাকাত আক্রমণ করলে তিনি তখন মাঝি-মাল্লাদের ডেকে নৌকার ভেতরে নিয়ে যান। ডাকাত নৌকায় উঠলে তিনি সামনে যেতেই সাত ডাকাত কাঁপতে কাঁপতে মৃগীরোগীর মতো সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে। অন্য ডাকাতরা দেখে সাথিদের নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বললেন, ডাকতদের কবল থেকে বাঁচার জন্যই এটা করা হয়েছে। এটা মন্ত্রের কারসাজি।

শ্যামবাউলের লাঠি

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যপদ লাভ করে শ্যাম বাউল তাঁর বাড়ি যাত্রাপাশা গ্রামে আসার পর তাঁর কিছু লাঠি দিয়ে বিভিন্ন দৈব শক্তির মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধনে সচেষ্ট হন বলে জানা যায়। কথাটি একসময় বানিয়াচঙের রাজার কানে গেলে তিনি কিছু গো-মাংস মিষ্টির হাঁড়িতে পাঠিয়ে বললেন আপনার জন্য মিষ্টি এতে রয়েছে। শ্যামবাউল দূতকে বললেন–আপনিও এখানে বসন, দেবার সঙ্গে আপনিও মিষ্টি খেয়ে যান। মিষ্টির প্যাকেট খুলে তিনি যখন সবাইকে মিষ্টি পরিবেশন করলেন দূত তা দেখে রাজার কাছে স্ববিস্তারে বর্ণনা করল। অন্য আরেকদিনের ঘটনা–এক কৃষক এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বলল, আমার হালের বড় গরুটি অসুস্থ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েছে। রামকৃষ্ণ গোস্বামী লাঠি দিয়ে বাড়ি দিতেই গরুটি দৌড়ে চলে যায়। বিগত কয়েক বছর আগেও শ্যাম বাউলের আখড়াতে একটি বিষাক্ত সাপ আশ্রয় নেয়। সাপটি কখনো কখনো সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত আবার কখনো কখনো মন্দিরের কাছে গাছের ডালে উঠে বসে থাকত। দুধ-কলা দিলে তা খেয়ে যেত কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি করত না। সাপটি দেখার জন্য প্রতিদিন শত শত মানুষের ভিড় সামলাতে হতো। শ্যাম বাউল জগন্মোহনী বৈষ্ণব ধর্মানুসারী ছিলেন। এই ধর্মের লোকেরা কোনো মূর্তি পূজা করে না, জাতি ভেদ বিশ্বাস করে না। তিনি তাঁর বাড়ির সামনে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর স্মরণে এই আখড়াটি প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ এই আখড়াটিকে শ্যামবাউলের আখড়া বলে। প্রতি

www.pathagar.com

বছর এই আখড়ায় গঙ্গা স্নান, বারুনি ও আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং প্রচুর লোকের সমাগম হয়। শ্যামবাউলের হাজার হাজার ভক্ত রয়েছে। [বাসুদেব গোস্বামী (৪৫) যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।]

আনোয়ার খাঁর কামান

আনোয়ার খাঁ ছিলেন বীর যোদ্ধা, যিনি বানিয়াচঙের রাজধানী সুরক্ষিত করেন। তিনি ছিলেন জমিদারের প্রধান। মুসা খাঁ মসনদে আলার চেয়ে কোনো অংশেই কম শক্তিশালী ছিলেন না। তিনি বানিয়াচঙের রাজ বংশের তৃতীয় পুরুষ। বাংলার বারো ভূঁইয়াগণ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও আনোয়ার খাঁ তা করেননি। তিনি যে কামান দিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন সেই কামানটি মতো জাতীয় জাদুঘরে ইশা খাঁর কামান নামে আরেকটি কামান রক্ষিত আছে। জানা যায়, আনোয়ার খাঁর কামানটির মতো দীর্ঘদিন বানিয়াচঙ থানায় অযত্নে অবহেলায় পড়েছিল। সিলেট জেলা পুলিশ সুপার বানিয়াচং থানা পরির্দশনে এসে কামানটি সিলেট পুলিশ লাইনে নিয়ে যান। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ১৯৩৬ সালে কামানটির বিবরণ জার্নাল অব আসাম রিচার্স সোসাইটিতে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি কামানটির বর্ণনা দেন এভাবে– এটি তিন হাত লম্বা, পরিধির মাপ এক ফুট এবং মুখের গর্তের মাপ দুই ইঞ্চি। পেছনের সরু অংশটিকে তিনি কামানের লেজ বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, তা আনুমানিক এক ফুট লম্বা।

কিংবদন্তি আছে যে, কামানটি যখন গর্জে উঠত তখন সাধারণ সৈনিকরা অত্যন্ত ভয় পেত। একবার নাকি তিনি একাই আফগান ও মুঘল প্রায় ১০০ জন যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। 'বাহারী স্থান-ই গায়েবী গ্রন্থ' থেকে জানা যায়, বঙ্গের নবাব ইসলাম খাঁ আনোয়ার খাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। অন্যান্য জমিদার ও পরিবারের মতো আনোয়ার খাঁকে জাহাঙ্গীরনগরে আটক করা হয়নি। ইসলাম কুলী খাঁর অধীনে থেকে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলে তিনি অপমানিত বোধ করেন, খাজা উসমান ছিলেন বাংলার স্বাধীন ভূঁইয়া। সকল ভূঁইয়া মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও খাজা উসমান সুলতানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই সংবাদে ইসলাম খাঁ রাজা মানসিংহকে বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে খাজা উসমানকে দমন ও বশীভূত করার জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

অন্যদিকে লাউর ও বানিয়াচঙের রাজা আনোয়ার খাঁর বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ পেয়ে ইসলাম খাঁ তাকে শায়েস্তা করার জন্য মুবারিজ খাঁ ও রাজা শুত্রাজিতকে প্রেরণ করেন। রণকৌশলী আনোয়ার খাঁ রাজা রায় ও ইসলাম কুলী খাঁকে ধরে বানিয়াচং এনে বন্দী করে রাখেন এবং মোঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে রণতরী সুসজ্জিত করলেন দু-তিন জায়গায় খণ্ড নৌযুদ্ধের পর সেনানায়ক মুবারিজ খাঁ সুত্রাজিত মিলে আনোয়ার খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবর্তীণ হলে এক সময় উসমান খাঁর সঙ্গে বোকাই নগরের যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্যে আনোয়ার খাঁ যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি মাহমুদ খাঁকে লিখে পাঠান, সমস্ত শাহী ফৌজ এই অভিযানে নিয়োজিত। অবশিষ্ট সৈন্য আমার সঙ্গে আছে। আপনি জমিদারদের নিয়ে ভেতর থেকে শাহী ফৌজে আক্রমণ করুন। উসমানের আগমন পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখুন। তিনি এসে এদের হত্যা করবেন এবং বন্দী করবেন। আর আমি ঐ সৈন্যবাহিনির সমস্ত সর্দারকে বন্দী করে বানিয়াচং নিয়ে আসব। আমি ইসলাম খাঁকে ঢাকায় জীবিত বন্দী করব। মুসা খাঁ ও তাঁর পরিবার-পরিজন সকলকে মুক্ত করব। এভাবে সারা ভাটি অঞ্চল (পূর্ব বাংলা) মুক্ত হবে এবং তা আবার জমিদারের অধীনে আসবে।

আনোয়ার খাঁ যখন জানতে পারলেন, খাজা উসমান খাঁ বোকাই নগর ছেড়ে সিলেটের দিকে চলে গিয়েছে এবং তাঁর ভাই হোসেন খাঁ বন্দী হয়েছে– তিনি ভেঙ্গে পড়েন এবং আত্মসমর্পণই শ্রেয় মনে করেন। আত্মসমর্পণে সময় ইসলাম খাঁ আনোয়ার খাঁকে বলেন, আপনি রাজবাহাদুরের গোলাম ইসলাম কুলীকে বিনা অপরাধে ছিনিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই আপনার উদ্দেশ্য। তাই আপনি আপনার মেয়ে কিংবা আপনার ভাই হোসেন খাঁর মেয়েকে ইসলাম কুলীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং পান বিতরণ করেন। এই প্রস্তাবে আনোয়ার খাঁ রাজি না হলে তাঁকে রোটার্স দুর্গে প্রেরণ করা হয়।

হোসেন খাঁর অভিনব কৌশল

আনোয়ার খাঁর ভাই হোসেন খাঁ তখন ঢাকার দুর্গে বন্দী হোসেন খাঁ বন্দীদশা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ধুতরা মেশানো মিষ্টি এবং রুটি তৈরি করে জেল রক্ষী ও প্রহরীদের খাওয়া হয়। তারা অজ্ঞান হয়ে পড়লে রাত এক প্রহরে তিনি জাহাঙ্গীরনগর দুর্গ থেকে বেরিয়ে তার জনবল নিয়ে চাঁদনী ঘাটে রক্ষিত একটি খেলনা নৌকায় চড়ে নিজ রাজ্যে পালিয়ে আসেন। বানিয়াচং এসে তিনি তাঁর নিজের এবং ভাইয়ের স্ত্রী কন্যা সকলকে হত্যা করেন। এভাবেই চিন্তামুক্ত হয়ে তিনি তার নৌবহর এবং গোলন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত করেন। সকালবেলা যখন হোসেন খাঁর পালানোর সংবাদ ইসলাম খাঁর কাছে পৌঁছল, তিনি ৩৫ জন প্রহরী এবং দুর্গরক্ষীকে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করে শাস্তি দেন। তারপর তিনি শাহজাদপুর জমিদার রায়ের অধীনে দুশ রণতরীর এক বাহিনী হোসেন খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জমিদার রায় যথাসময়ে সৈন্য ও রণতরীসহ বানিয়াচং পৌঁছলে হোসেন খাঁ রাজা রায়কে বাধা দেওয়ার জন্য ২২ খানা কোষা নৌকা সুসজ্জিত করে আফগান সৈন্যবাহিনির ওপর বিশৃংখলভাবে অগ্রসর হতে থাকলে হোসেন খাঁও অগ্রসর হয়ে মোঘল বাহিনিকে প্রচণ্ড হামলা চালালেন। রাজা রায় কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পলিয়ে যান।

সাত লড়ুয়ার কাহিনি

রাজা কেশব মিশ্রের বংশধর এক ব্যক্তির সাত পুত্র। প্রত্যেকেই ছিল বিখ্যাত যোদ্ধা। বঙ্গের রাজার সঙ্গে প্রায়ই তাদের যুদ্ধবিগ্রহ হতো– একদিন বানিয়াচঙের রাজার পক্ষ থেকে বলা হলো, আমাদের কোনো বীর একটি খুঁটি গেড়ে দিলে তোমাদের কেউ যদি এই খুঁটি তুলতে পারে তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোনো যুদ্ধ হবে না। অনেক চেষ্টার পরও বঙ্গের কোনো বীর এই খুঁটি তুলতে পারেনি। এই খুটি সাত লড়ুয়ার জঙ্গলে বর্তমান বোরুজপাড়ায় বয়োবৃদ্ধ অনেকেই দেখেছেন। রাজার সাত পুত্র বা বীর যেখানে বাস করতেন, এখনো সেখানকার নাম সাত লাইড়্যা হিসাবে খ্যাতি রয়েছে। আগে

www.pathagar.com

বিরাট জঙ্গলের মধ্যে দুটি পুকুর ছিল। মাটি খননের পর এখানে ইট ও মাটির তৈরি জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। সিলেটের জামতলা নিবাসী সুপ্রিমকোর্ট অ্যাডভোকেট অরুণ ভূষণ দাস এক চিঠিতে লিখেছেন, 'সাত লড়ুয়ার কাহিনি তাঁরই পূর্ব পুরুষের কাহিনি'।

ঠাকুরাইন দিঘি

রাজা গোবিন্দ সিংহ দিল্লির দরবার থেকে মুসলমান হয়ে নববধুসহ প্রায় ২৮টি সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে বানিয়াচঙ আসার পর তার হিন্দু স্ত্রী তাঁর কাছে থাকতে রাজি হলেন না এবং মুসলমান হতেও অস্বীকৃতি জানালে রাজারানির ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়ি (স্বতন্ত্র) তৈরি ও দিঘি খনন করে দেন, যা আজও ঠাকুরাইন দিঘি নামে অবহিত। দিঘির পাড়ে জনবসতি গড়ে উঠলে বর্তমানে পাড়া বা মহল্লায় রূপ নিয়েছে।

বানিয়াচঙ রাজারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে পানি ও আবাসিক স্বার্থে বানিয়াচং গ্রামে আরো অনেক দিঘি খনন করেন। তার মধ্যে মজলিশপুরের দিঘি, যাত্রা দিঘি, কামালখানী দিঘি, জামালপুরের দিঘি, দেওয়ান দিঘি অন্যতম।

একটি ঐতিহাসিক রায়

দেওয়ান জামাল রাজার আমলে ব্রিটিশ সরকার মালিকানাবিহীন পুকুর বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেন। এই আহ্বান সাড়া দিয়ে বানিয়াচং গ্রামের ৫১৭জন ব্যক্তি দরখাস্তসহ খাজনা পরিশোধ করেন। এর মধ্যে একজন সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা আদালতে মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলার আরজিতে বলেন, এক সময় বানিয়াচং পুটিয়ার বিল ছিল, কালক্রমে এটা বিরাট হয়ে সমতল হয়। আমরা এই সমতল স্থানে বসবাস করার জন্য মাটি কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করেছি ও পুকুর খনন করেছি। আমরা গরীব বলে খাজনা দিয়ে আমাদের পক্ষে পুকুর বন্দোবস্ত আনা সম্ভব নয়। অবশেষে বিজ্ঞ আদালত জন সাধারণের পক্ষে এই রায়টি প্রদান করেন। এর পর থেকে ঐ পুকুরগুলো আর বন্দোবস্ত না দেওয়ার কারণে এখনো বানিয়াচঙের গ্রামের অধিকাংশ পুকুর খাস হিসাবে অন্তভুক্ত রয়েছে। বন্দোবস্তের জন্য দাখিলকৃত খাজনা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ফেরত দেওয়ার রায় কার্যকর হলে ঐ টাকা পরবর্তীসময়ে এল.আর. হাইস্কুল উন্নয়ন তথা ভবন নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হয়।

জিনের শিক্ষক

আধ্যাত্মিক পুরুষ সৈয়দ ইলিয়াছ কুদ্দুছ কুতুবুল আউলিয়া (র.) (যার মাজার মুরাড়বন্দ দরগা শরীফ)-এর অধস্তন পুরুষ ছিলেন। বানিয়াচং মীর মহল্লার সৈয়দ গোলাম ইমাম (র.)। জানা যায়, তিনি এক সময়ে কুলাউড়ার 'লাতু'র মুন্সেফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ কোর্টটি স্থানান্তরিত হয়ে বানিয়াচং মীর মহল্লার সৈয়দ বাড়িতে স্থাপিত হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আলী আমাম পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কথিত আছে যে, পিতার ইন্তেকালের পর মাওলানা সৈয়দ আলী ইমাম (র.) একদিন স্বপ্নে দেখেন পিতা সৈয়দ গোলাম ইমাম (র.)-এর চেহারা মোবারকে জোক

www.pathagar.com

লেগে আছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন 'ব্রিটিশ আদালতে চাকুরি করে ব্রিটিশ সরকারের বেতন ভোগ করার শাস্তি, তাই তুমিও বুঝে শুনে এই চাকুরি করবে' এই স্বপ্ন দেখার পরদিনই তিনি চাকুরি থেকে ইস্তাফা দিয়ে ধর্ম কর্মে আত্মা নিয়োগ করেন। সৈয়দ আলী ইমাম (র.) এর পুত্র মাওলানা সৈয়দ গোলাম ছামদানি (র.) উর্দু, আরবি ও ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করায় দেশে বিদেশে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে বহু ছাত্র তখনকার সময়ে সুনাম অর্জন করেছেন। জানাজায় তাঁর কাছে জিনরা এসে লেখাপড়া করত। একদিন জিন ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন যদি তোমাদের লেখাপাড়ার খবর আমার ছাত্ররা জানতে পারে তাহলে তারা ভয় পেতে পারে, তাই জিন ছাত্রদের আর পড়াবেন না জানিয়ে দিলেন। হঠাৎ একদিন তার এক জিন ছাত্র এসে বলল, হুজুর আমার দেশে আপনাকে দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি রাজি হলেন। একদিন রাতে তার জিন ছাত্রের সঙ্গে চলে গেলেন জিনের রাজ্যে। অনেক কিছু তৈরি খাবারের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল কাঁঠাল ফল। তিনি জিন ছাত্রের কাছে একটি কাঁঠালের চারা পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁকে একটি কাঁঠালের চারা দিয়েছিল। তিনি বাড়িতে রোপণ করেছিলেন। এই কাঁঠালগাছটি দেখার জন্য অনেক লোক আসত। ১৯৬৪ সালের বন্যায় কাঁঠালগাছটি নষ্ট হয়ে যায়। এ বংশের সৈয়দ গোলাম হাফিজ (র.) তার জ্ঞান ও মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ দিল্লির দরবার থেকে 'মীর' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং তার সম্মানার্থেই পরবর্তী সময়ে পাড়ার নাম হয়েছিল মীর মহল্লা। এ বংশের কৃতী পুরুষ ডা. সৈয়দ গোলাম রহিম (ময়না মিয়া) (র.) কৃতি খেলোয়ার সৈয়দ জাফর ইমাম (র.) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য।

গ. কবিগান

হবিগঞ্জে একসময় কবিগানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। দুই দল কবির উপস্থিতিতে বিষয়ভিত্তিক বির্তকের কৌশলগত বাকচাতুর্যের লড়াই কবিগানের মূলপ্রতিপাদ্য। দল দুটি থাকলেও মূলত দুপক্ষের দুজন কবির মধ্যে লড়াই হয়। সহযোগীরা মূল কবিকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে কথা-গানে-সুরে দোলা দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ছন্দ ও সুরের মিশ্রণে প্রশ্ন ও উত্তর করা হয়। তাৎক্ষণিক প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি করে কাব্যিক ভাষায় তালে-লয়ে-সুরের সংযোজনে পরিবেশন করতে হয়। কবিদের উপস্থাপনার ভঙ্গি, টপ্পা ও পোশাক উপভোগ্য। দূর দূরান্ত থেকে কবিগানের আসরে মানুষ জমা হয়। কবিরা কবিয়াল নামে পরিচিত। প্রাচীন কবিয়ালদের 'সরকার' নামে সম্বোধন করা হতো।

'কবি গান বস্তুত ১৮/১৯ শতকের সন্ধি লগ্নেই কলকাতা ও পল্লি বঙ্গের সংযোগে সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কী 'কবিগান' শব্দটি ১৯ শতকের শুরুর দিককার[১]'। কবিগান শুধু পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল না। পরন্তু পূর্ববঙ্গেও প্রচলন ছিল[২]। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি-গান সম্পর্কে বলেন, 'বাংলার প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিয়ালদের গান, ইহা একটি নতুন সামগ্রী'[৩]। 'বাঙ্গালী জাতি সংগীত ও কাব্যের বিশেষ অনুরাগী, সংগীতে

www.pathagar.com

স্বাভাবিক টান বশত লোক কবিগানের এত আদর করিত'[৪]। স্বভাবত এই স্বাভাবিক টানেই 'বিংশ শতকের প্রথম দিকে হবিগঞ্জে কবিগানে বহু প্রচলন ছিল'[৫] বলে প্রকাশ। হবিগঞ্জ তখন সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি মহকুমা ছিল। সিলেট জেলা বলতে হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট সদর মহকুমা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিলেট জেলায় যে সুরেলা লোক সংগীতের ভুবন গড়ে উঠেছিল, সে ভুবনে হবিগঞ্জের কবি গানের যথেষ্ঠ চর্চার তথ্য বিদ্যমান পাক ভারতের বিশিষ্ট গণসংগীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর আত্মজীবনীমূলক 'উজান গাঙ বাইয়া' গ্রন্থে। কবিগান সম্পর্কে ঐ দীর্ঘ একটি রচনায় লিখেছেন 'আমাদের বাড়ির একটি ঐতিহ্য ছিল কবিগানের। আমার জেঠাতুতো ভাই সূর্য কুমার ও বসন্ত কুমার ছিলেন আমাদের সংগঠনের মূল সংগঠক। কবিগানে নেশায় নিজেরা যে মতো মেতেছিলেন আমরা সবাই মাততাম সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে বাড়িতে আসতেন একজন ঢুলি মারফত আলী ও একজন গায়েন শিক্ষক, ত্রিপুরার বিটঘরের গঙ্গাচরণ ঘোষ। তাঁরা আমাদের বাড়িতে থাকতেন। আরো আসত কিছু 'ছোকরা', তারাও আমাদের বাড়িতে থাকত। সারা বাংলার কবিয়ালদের গুরু হরি আচার্য্যে রামকৃষ্ণ বিষয়ক কবিগানের মাধ্যমে প্রথম যুগান্তর আনেন। স্বদেশি আন্দোলনকে কবিগানের বিষয় করে এনেছিলেন কবি গানের পালায়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলত– 'যাত্রা শুনে ফাতরা লোকে, কবি শুনে ভদ্রলোকে'[৬]। এপ্রবাদটি এখনো শিক্ষিত প্রবীণ লোকদের মুখে মাঝে মধ্যে শোনা যায়। কবিগানের আসরে কবিয়ালদের সৃজনশীলতা, কবি প্রতিভা এবং সংগীত সাধনার অপূর্ব সমন্বয়েই শহুরে শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করে কবিগান[৭]। তথ্যবহুল সুন্দর প্রশ্ন উত্তর, অশ্লীলতাবিহীন কবি কণ্ঠের সুরেলা কারুকাজই কবিগানকে ভদ্র আসনে স্থান করে দেয়। আর এতে করে ঐ প্রবাদটির জন্ম। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আত্মজীবনী পাঠে আরো জানা যায়, 'কবি হরি আচার্য্যের দলকে আমাদের বাড়িতে আনা হয়। তার বিপরীতে ময়মনসিংহের কবিয়াল ছিলেন'[৮]। 'সিলেট জেলায় মূলত ময়মনসিংহের কবিয়ালরাই কবি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো'[৯]। যেহেতু পাশের জেলা ময়মনসিংহসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলায় পেশাদার কবিয়াল ছিলেন, তাঁরা বায়না করে কবিগানের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন 'কবিয়ালদের জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়ও ছিল কবিগানের আসর'[১০]।

পরবর্তীকালে হবিগঞ্জের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে বানিয়াচঙের সুবল ভট্ট, গোবিন্দ সাহা, মাধবপুরের তারিনি সরকার, তরুণী সরকার ও কুমোদিনীর কথা শোনা যায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লেখেন, 'বাবার বন্ধু দারগা প্রসন্ন চন্দ ছিলেন একজন কবিগানের রচয়িতা। তাঁর কবিগানের দলও ছিল। গোবিন্দ সাহা ছিলেন মাধবপুরের গায়ক, বোলা বাজিয়ে তিনি গাইতেন। আমাদের অঞ্চলে দীর্ঘকাল গোবিন্দ খাঁ ও তার বেহালা কবিগানে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল[১১]। তিনি আরো বলেন, 'তখনকার দিনে বিখ্যাত কবিগানের দল মনোমোহিনী দল ও শেখ সরলার দল। শেখ সরলার দল মিরাশী আমাদের বাড়িতে কবিগান করতে এসেছিল। গণিকা পরিচয় হলেও কবিগানের কবিয়াল হওয়ায় সরলাকে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হয়েছিল'[১২]। তিনি হবিঞ্জের বিখ্যাত মহিলা কবিয়াল কুমোদিনীর কথা মনে করে লেখেন, 'ডিরুগর থেকে ফিরে এসে যখন

www.pathagar.com

ক্লাস নাইনে ভর্তি হই হবিগঞ্জ গভর্মেন্ট স্কুলে, তখন আমরা শুনতে যেতাম কুমোদিনীর কবিগান। প্রকাশত গণিকালয়ে থাকতেন তিনি, তবু খুব উঁচুদরের সম্মান ছিল শিল্পী বলে'[১৩]। মাধবপুরের কবিয়াল গোবিন্দ সাহা ও হবিগঞ্জের কুমোদিনীর মধ্যে পালা হতো। উভয়ই বেহালা বাজিয়ে পালা গাইতেন। তাঁরা কেবল প্রশ্ন-উত্তরই করতেন না দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে হাস্যরস সৃষ্টিতে কুশলী ছিলেন। কুমোদিনী সুকণ্ঠ গায়িকা ও নৃত্যেও পারদর্শী ছিলেন। কবি লড়াইয়ে এই দুই জুটি খুবই উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আত্মজীবনী থেকে আরো জানা যায়, মাধবপুর উপজেলার বেজুড়া গ্রামে জয়নাথ নন্দী (উপাধিপ্রাপ্ত রায় সাহেব) কবিয়াল ছিলেন। তাঁর একটি কবি দলও ছিল–'সম্পর্কে আমার দাদু কবিয়াল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষিত হলেও কৃষির প্রতি টান অনুভব করতেন তাই তাঁর কৃষি বিষয়ক অনেক কবিগান আজো আমার খাতায় বেঁচে আছে'[১৪]।

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলাধীন সুবিধপুর গ্রামের প্রয়াত কবি তারিণী সরকার[১৫]-এর কথা আজো লোকমুখে শোনা যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে সুরেলা কণ্ঠে উত্তর, প্রত্যুত্তর যথাযথ দিতে পারতেন। অনুরূপ মাধপুরের মাঞ্চল গ্রামে জন্ম নেওয়া সম্প্রতি প্রয়াত কপিল উদ্দিন সরকার[১৬]-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি সিলেটের দুরবিন শাহ ও সুনামগঞ্জের শাহ আবদুল করিমের শিষ্য ছিলেন। তিনিও কবিয়াল ছিলেন। তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান ভালো ছিল। তাই সকল বিষয়ই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

নবীগঞ্জ উপজেলায়ও কবিগান হতো 'কবিগান ছিল উপভোগ্য, কবির লড়াই উপভোগ করার জন্য অনেক লোক সমাগম হতো। দুই দলে কবিতা ও গানের মাধ্যমে লড়াই চলত এবং দলের নায়ক ছিলেন স্বভাব কবি। এদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং কথার পিঠে কথার জবাব দেয়ার ভঙ্গি ছিল অতি চমৎকার এবং প্রশংসার দাবিদার'[১৭]। দুর্গা পুজা উপলক্ষে রাতে এ কবিয়াল গানের আসর হতো ক্রমে তিনদিনই। কবিয়ালদের জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়ও ছিল কবিগানের আসর'[১৮]। কালী পুজার সময়ও কবিগান হতো বানিয়াচং ও আজমিরীগঞ্জে।

কবিগানের উপস্থাপনার রীতি, গায়ন রীতি ও আনুষ্ঠানিকতা অঞ্চল ভেদে কমবেশি পার্থক্য রয়েছে। হবিগঞ্জ অঞ্চলের কবিগান আসরে প্রধানত পল্লিগ্রামের মধ্য শৌখিনদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো একজনের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরই বাড়িতে প্রশস্ত উঠানে হতে দেখা যায়[১৯]। হেলারকান্দি গ্রামের বনমালি চৌধুরীর বাড়িতে দূর্গা পুজার সময় কবিগান হতো। বানিয়াচঙের যাত্রাপাশা গ্রামের হৃদয়ানন্দ গোস্বামী একজন খ্যাতনামা কবি সরকার ছিলেন। কবিগানের আসর অনুষ্ঠানে উঠানে পৃথকভাবে মঞ্চ তৈরি করা হতো। দর্শক-শ্রোতারা ঘিরে বসে রাত দশটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত রাত জেগে কবিদের যুক্তি তর্ক হাসি ও কাব্যে রস সৃষ্টির বর্ণনা শুনতেন চারপাশে। রাধা-কৃষ্ণ, গুরু-শিষ্য-নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, রাসুল জীবন-কৃষ্ণ জীবন, শরিয়ত-মারিফত, নারী-পুরুষ, লয়-প্রলয় এমন কী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কারবালার বিষাদময় যুদ্ধ নিয়েও কবি লড়াই হতো।

উচাই গ্রামে একটি কবিগানের আসরে গেলে ঐ আসরের কবিয়াল মোহিত সরকার জানান, কবিগান পরিবেশনকালে কবিয়াল নিজ পছন্দের সুন্দর পোশাক পরে মঞ্চে

www.pathagar.com

ওঠেন। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কবিগানে বির্তক হলে কবিয়াল নিজ ধর্মের পোশাক পায়জামা পাঞ্জাবি ও উত্তরীয় অথবা ধুতি পাঞ্জাবি উত্তরীয় পড়েন। সাধারণত কবিয়ালরা নিমা ফতুয়া উত্তরীয় বা ওড়না ব্যবহার করে থাকেন, কেউ রঙিন, কেউ সাদা। শুরুতেই সালাম আদাব জানিয়ে বন্দনা গাওয়া হয়। তার আগে আয়োজক পক্ষ থেকে একজনকে সভাপতি নির্ধারণ করে মঞ্চে বসানো হয়। তিনি শেষাবধি মঞ্চে বসা থাকেন। দোহারিগণ মঞ্চে বসে গানে দোহার দেয়। দুই দলে বিভক্ত হয়ে দু দলই প্রধান কবিকে সহযোগিতা ও সমর্থনসূচক কাজ করে থাকে। অনেক দলে মেয়েরাও থাকে। গানের মধ্যে চিকন কণ্ঠের একটি মেয়ে বা শিশু শিল্পীকে বেঁছে আনা হয়। বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সাধারণত বেহালা, হারমনিয়াম, বাঁশি, মন্দিরা ও ঢোল। ঢোলকের কারুকার্য অনুষ্ঠানের প্রাণ। নয়ন ঢুলি সাং, দুলবপুর, আশরাফুল ঢুলি সাং পুরাসুন্দা, খুরশেদ আলী ঢুলি-এ কাজে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় কবিয়ালদের মধ্যে সুরেশ সরকার সাং- বেগুনাই, কানাই সরকার সাং, রাজিউরা, শাহিনুর সাং, জলসুখা, শাহ্ মর্তুজ আলী সাং, উচাল, শাহীন সরকার সাং, বুল্লা, কারী মাঈন উদ্দিন সাং, আগুয়া, কোকিলা বেগম সাং, চুনারুঘাট, প্রাণকৃষ্ণ গোপ সাং আজমিরীগঞ্জ—এই পালাকাররা হবিগঞ্জে বর্তমানে পালাগান গেয়ে থাকেন। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বির্তক প্রতিযোগিতার মধ্যে একঘেয়েমি দূর করার জন্য মাঝে মধ্যে এলাকার খুবই জনপ্রিয় লোকসংগীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। গানের কথা ও সুর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। মজার বিষয়, কবিগান চলাকালে দর্শক-শ্রোতাদেরকেও পক্ষ সমর্থন করে দুই ভাগে ভাগ হতে দেখা যায়। আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি নিয়ে কবি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন কবিয়াল মোহিত সরকার। প্রয়াত আয়াত আলী সরকারও একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ গোপ আজমিরীগঞ্জের উঁচু মাপের একজন কবিয়াল।

এই কবিগান এখন আর আগের মতো পরিবেশিত হয় না। বাউলাগান ও মালজুরা গান হিসেবে ঢং ও ভাব বদলিয়ে পালাগানে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের অবহেলিত স্বভাব কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতা করে কবিগানের মতো লোক সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে রক্ষা করা প্রয়োজন। কবিগানের লোকজ আবেদন শ্বাশত। কবিয়ালরা একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য হাস্যরসের অবতারণা করে থাকেন। কবিগান এখনও লোক মুখে গীত হতে শোনা যায় :

ও কবিয়াল বুঝলায় না
আম খাইও জাম খাইও কাঁঠল খাইও না
কাঁঠল খাইলে পেট ফুলবো
ডাক্তর পাইবা না।
ও কবিয়াল বুঝলায় না ॥ (১ম পক্ষ)

ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, লাজে মরি
লঙ্কার সাথে পানি ভাত
তাতে ঢালছে ঘি
ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। (২য় পক্ষ)

www.pathagar.com

তারিণী সরকার ও তরুণী সরকার সহোদর ভাই, তাঁদের বিপরীত পক্ষ ছিলেন কুমুদিনী পাল। প্রতিদ্বন্দ্ব দুই কবিয়াল পরস্পরকে আক্রমণ করছে এইভাবে কটুবাক্য ব্যবহার করে–এতে হাস্যরসের সৃষ্টি হতো।

কামার কুমার তেলি পাল
সাতদিন ভরা কবি গাইয়া
ছিড়তা পারলা না
কুমোদিনীর কুকড়া কুকড়া বাল। (১ম পক্ষ)

লিঙ্গ যেদিন সিংহ হইবো
তলপেটেতে বাজবে তাল
পাড়ের ছুটে উইয়া যাইবো
কুমোদিনীর কুকড়া বাল। (২য় পক্ষ)[২০]

কথায় আছে–কবিগানে মজা শেষের দিকে। বিশেষত কবিয়ালরা যখন টপ্পা গাইতে শুরু করে তখন দর্শক শ্রোতা আনন্দ উপভোগ করেন থাকে। কবিয়াল একে অপরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। অনেক ক্ষেত্রে অরুচিকর কথা কবিগানে সাময়িক হাস্যরস্য সৃষ্টি করলেও পরবর্তীসময়ে মার্জিত রূপ লাভ করে।

বিদ্যা বুদ্ধি নাই শালার
কানের চিপাত কলম তইয়া
নাম লিখছে 'সরকার'। (১ম পক্ষ)

শালা কউ মূর্খ কউ বেশি খুচতা কইতাম না
জানে সবাই কুত্তার পেটে ঘি-ভাত হজম হয় না। (২য় পক্ষ)

বাঙালি জাতি সংগীত ও কাব্যের বিশেষ অনুরাগী। এত গান এত কবিতা বোধহয় অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। কবিগান সাধারণত জনসাধারণের উপভোগের রসবস্তু ছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন তাঁর 'হারামনি' সপ্তম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় এই মন্তব্য করেছেন।

কবিগানের শিল্পীদের সঙ্গে প্রধান সমন্বয়কারী

www.pathagar.com

রাম বিরাম

আল্লাহ-নাম ভরসা করিয়া শুনো মমিন ভাই
কৃষকের কাহিনি কিছু বলিবার চাই।
কৃষক অইয়া হাল চাষ করে কৃষক ফলায় তাতে,
কৃষক অইয়া জীবন রক্ষা হইয়া যায় তার যাতে।
কত কষ্ট মাথা ফেনরে জমিন নিল জলে
চৈত্র মাইয়া বুনা জলে জ্যৈষ্ট মাসে তলে।
কত পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয় পানি দলা রং হইলো ,
জলের শতমিন (কুমির) অন্ধকার দেখিলো।
কত আফাল বাইল নাও মারিল মসজিদ করল কাইত ,
গাছ বিরিক ভাঙ্গিল করল লাতে পাত।
পারু উলা ঈদেরের দেওয়াল করে পাকা
গৃহস্তি করিয়া কত খরচ গেল টাকা, তাতে আছে লিখা।
পাব দেখা একে হবে দুনা আফালে ভাঙ্গিয়া নিল দেওয়ালেরই কোনা ,
রাজা গুণে প্রজা সুখি বানিয়াচং চঙ্গগড়
ধর্মে ছিল দেওয়ান সাহেব ফিরাইয়া দিলা ঘর।
ধন্যি গাইমো তার গুন যার বানিয়াচং পরগনা
ঢেউ বান আপাল তুফান কিছুই তো লাগে না।
পালন কর্তা নালিশ করমু কারে
গবুর কষ্টে জিগুর কাটে মুনিষ্টি অনাহারে
পানি মোরে চাইলা গুড়ে আছে কত ভয়
এই সব কষ্ট কি লোকের প্রাণে সয়?
প্রাণ যায় প্রাণে দিল ডাক,
তারি তারি লইয়্যা যায় ডাক্তারখানাত
কীরে ডাক্তার বাবু অস্ত্র নিয়ে নজর কইরা চায়
কানের ভিতর জলে বদ্ধ দেখা যেমন যায়।
ধর হাতে পায় প্রাণ যায়
ডাক্তার অস্ত্র লইয়া করছে হায় হায়।
সরকার থেইকা বড় বাজারে মাইরা দিছে ঢোল
কীরে পানির তলে হইছে কিরা খাইলে করবা ভুল।
আবুরা পুষ্কুনির জল করে ব্যবহার
তরি আছে যার আনে জল বারে বার।
বারী বেওয়া নিনাইয়া ভাই করজা জল খায় ,
করজা জল খাইয়া রাত্রে নাহি নাও পায়।
কেও কেও জল আনিলো চাইয়া নাও
গিরতাইনে কষ্টের জল দিয়া ধোয় পাও।
জামাই কয় তর তো জাতের বাও

www.pathagar.com

গালি দিল বউ ধরল পাও।
কলসি করল খালি জলের লাগি
বউয়ের সঙ্গে লাইগ্যা দিছে তালি।
জামাই কয় তর তো কপাল ভালা,
বউয়ে কয় বেটরোয়ার পোলা
পাইছলে দেইক্যা মোরে একদিন যে মারছিলে।
তর ঘর কেঠায় করে তিন দিনের মাইরে গাঁ জ্বলে।
আইত যদি মোর পরানের ভাই
দেখাইয়া দিতাম তর জাতের বরাই।
উলু তুফা শেখের বেঠি উরি পুনদিয়া খাই
উরা উরি লইগ্যা গেল মাঝ ঘরের ঠাঁই।
তোমরা দেখ আইসা ভাই
কেমন করে মারে সাক্ষী করি তাই।
কলসি ভাইঙ্গা জল পড়ে ঘর ভাইসা শেষ,
এইসব কীর্তি কাণ্ড সবই করলাম শেষ।
দারুণ নদীর জল আসিয়া খাইছে কত দেশ,
ধরল আরেক বেশ কবি শেষ।
আব্বাস উলা নাম,
সবারে জানাবে তাহার অধরের সালাম।
আমার কীসের গতি আছে করি রস্ত পারি,
আল্লাতালার দোয়া চাই কুতুবখানি বাড়ি।

ঘ. ভাট কবিতা

আমাদের গ্রামগঞ্জে একেবারে ভিন্ন ধরনের একশ্রেণির কবিতা রচিত হতো। এখন তা দুর্লভ। স্বল্পশিক্ষিত পল্লিবাসীদের রচনা হলেও কাহিনি, ঘটনা, বর্ণনা, সুর ও ছন্দে আমাদের শহর, গঞ্জ ও গ্রামের প্রাকৃতজনের চিত্ত বিনোদনের বিশেষ খোরাক ছিল। কবিতাগুলোর বিষয় পার্থিব ভালোবাসা। এসব কবিতার লেখক, পাঠক ও সমজদার গ্রামের সাধারণ লোক ছিল বলে একে 'গ্রামকবিতা', 'লোককবিতা', 'পথুয়া সাহিত্য'[১] বলা হতো। এইরূপ কবিতা মুদ্রিত পুস্তিকা শহর-গঞ্জের বইয়ের দোকানে বিক্রি হতো না। শহরের কোনো বড় রাস্তার মোড়ে অথবা গ্রামের হাট-বাজার অথবা ঘন জনচলাচলের জায়গায় এই কবিতা সুরছন্দে আবৃত্তি করে শুনিয়ে ক্রেতার ভিড় জমিয়ে কবিতা বিক্রি করা হতো। ঘুরে ঘুরে আসর জমিয়ে কবিতা বিক্রি হয় বলে একে "ভাট কবিতা" বলা হয়ে থাকে।

৩০ বছর আগে হবিগঞ্জেও এই লোককবিতা বিক্রি হয়েছে। গ্রামগঞ্জের খ্যাত প্রেম-বিরহের কাহিনি, ষড়যন্ত্রের কাহিনি, দণ্ডিত ফাঁসির কাহিনি, কামপ্রবণতা অসতীর কাহিনি, দুঃখ-দুর্দশা, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের কাহিনি ইত্যাদি বিষয় সহ ধর্ম বিষয়ক কিছু লোক কবিতা প্রকাশ হয়েছে। যতদূর জানা যায়, এসব কবিতা মুসলমান লোককবিরা

www.pathagar.com

রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনেকটা পুঁথির মতো রচিত, তাই পাঠকালেও ছন্দিত কবিতাগুলো পুঁথিপাঠের মতো সুর তুলে পাঠ করতে হয়। হবিগঞ্জের প্রায় সব থানাতেই দুএকজন লোককবি ছিলেন। তাঁরা নিজের কবিতা লিখে ছাপিয়ে ফেরি করে বাজারে বাজারে সুর করে কাহিনি বর্ণনা করে কবিতা বিক্রি করেছেন। আবার কেউ কেবলই বিক্রেতা ছিলেন। তাঁরা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বত্ব ত্যাগ করে বিক্রেতাদের কাছে কবিতা হস্তান্তর করেছেন।

হাফ ডিমাই আকারে নিউজপ্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত লোককবিতাগুলোর মূল্য ১/২ টাকার মধ্যে ছিল। নিউজপ্রিন্ট কাগজে বেশিদিন পুস্তিকাগুলো সংরক্ষণ করা যেত না। ফলে লোককবিতা সংরক্ষণ করা যায়নি। একটি কাগজের চার ভাঁজের আট পৃষ্ঠায় কবিতাগুলো ছাপা থাকত। যেমন একটির ১ম পৃষ্ঠায় অর্থাৎ প্রচ্ছদে 'আল্লাহু আকবার', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'নকল হইতে সাবধান', 'আদি-আসল' ইত্যাদি উল্লেখসহ কবি ও কবিতার নাম রয়েছে। প্রচ্ছদের একপাশে কবির ছবি ও মূল্য লেখা আছে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় বন্দনা রয়েছে– 'প্রথমে বন্দনা করি নামেতে আল্লাহর/তারপর বন্দনা করি নবী মোস্তফার/তারপর বন্দনা করি ওস্তাদের পায়/তারপর বন্দনা করি পিতা-মাতার/এখনও আমি বন্দনা করি, শ্রোতাবন্ধুগণের/ আমার এ কাহিনি যারা মন লাগাইয়া শুনে/এইবারে করি ক্রান্ত আমার সকল বন্দনা/গাইমু অখন কবিতা আমার সুরে সুরে বর্ণনা।' এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষে কবিতা কাহিনী বর্ণনা শুরু হয়। কোনো কবি তাঁর নিজ পরিচয় পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় দিয়ে থাকেন, কেউ রচনার শেষাংশে ভণিতায় কবির পরিচয় দিয়ে দেন।

এই নিবন্ধকারের সংগ্রহে কিছু লোককবিতা ছিল। নিউজপ্রিন্টের কাগজে ছাপানো পুস্তিকাগুলো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গেছে। মনে পড়ে হবিগঞ্জ শহরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর আধাপাকা একটি হোস্টেল ছিল। বর্তমানে সেখানে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও তার গুদাম ঘর। এরই সম্মুখে ঘাটিয়া বাজারের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার পূর্ব পাশে একটি পুকুর ছিল। পুকুরের পূর্বপাড়ে আবাসিক এলাকায় একটি মেয়ের সঙ্গে পিটিআই ট্রেনিংরত এক শিক্ষকের চোখাচোখি, তারপর প্রণয় সেসঙ্গে সংসার বাঁধার স্বপ্ন, সে থেকে একদা পলায়ন। দুই ধর্মের দুই বিশ্বাসীর এই প্রণয় ঘটনার উপর মোহনপুরের আবদুল জব্বার নামের এক লোককবি ভাট কবিতা প্রকাশ করেন, যার নাম 'পিটির মিলন না যায় ভুলন'। এই অসবর্ণ প্রেমের কবিতার বেশ কাটতি ছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে এই ভাট কবিতা হবিগঞ্জের কোর্ট ও আদালত প্রাঙ্গণে মানুষের ভিড় জমিয়ে বিক্রি করতে দেখা গেছে। রেলস্টেশনেও লোককবির এই কবিতা বিক্রি হতো। এ থেকে বোঝা যায়, এসব লোককবিতা প্রাকৃতজনের চিত্ত বিনোদনের খোরাক ছিল।

নবীগঞ্জ উপজেলার ওসমানী রোডস্থ আলী ভিলা নিবাসী ছোনোওর আলী একজন লোককবি ছিলেন। তিনি 'আজব লীলা কলির খেলা' নামে একটি ভাট কবিতা লিখেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর এই কবিতাটি লেখা।

www.pathagar.com

কবিতাটির শুরু এভাবে– ‘ওহে দয়াময় সদাশয় তুমি কর্ণধার/তুমি তো অনাথের বন্ধু পরোয়ারদিগার/ তোমায় ভক্তি করি প্রণাম করি নোয়াইয়া শির/দ্বিতীয় বন্দনা করি আখেরি নবীর/বন্দেগি করি পিতা-মাতা ভদ্র শ্রোতা শিক্ষাগুরু আর/তৃতীয় বন্দনা করি জগৎ ফাতেমার/তিনি বরকত মাতা লিখি হেতা নবীর নন্দিনী/যাহার হাতে দিছে আল্লাহ বেহেশতের নিশান/বন্দিগি পাড়া প্রতিবেশী ময়মুরুব্বিগণ, চতুর্থ বন্দনা শ্রোতাদের চরণ/বন্দী আমি বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, না জানি রচনা, পীর মুর্শিদের চরণ বন্দী মনেতে বাসনা/এখন লিখে যাই শুনেন ভাই, শ্রোতাবন্ধুগণ/ ভুলভ্রান্তি হইলে যত করিবে মার্জন/ লিখি কলির যুগে মনোরঙে পাড়ি ধরিলাম সাঁই/কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো তোমার দয়া চাই/দেখলাম যাহা চোখে কলির যুগে লেখিয়া জানাই, কত মসজিদ নিয়ে মারামারি আমি দেখতে পাই/ কেবা মেম্বার হবে, হবে চেয়ারম্যান এসকল ব্যাপারে/ আসলে স্বার্থের জন্যে হইতে চাই লিডার। পাইয়া পরের টাকা কথাবার্তা কী বলিবো আর লেখি কলমে যা এই অধমের আসে যার যার। কবি জোনাতর আলী এই শাড়ির পথুয়া কবিতা বা লোককবিতা অনেক লিখেছেন, তার লিখা ‘লণ্ডনের কবিতা’র অংশ নিম্নরূপ ঃ

হবিগঞ্জের প্রাচীনতম বসতী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ গ্রাম বানিয়াচং। এককালে বানিয়াচং রাজ্য ছিল। এই বানিয়াচংয়ে ম্যালেরিয়া বা প্রকাশিত কালাজ্বরের করালগ্রাসে গ্রামটি জনশূন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। ‘শতকরা ৭৫% পরিবারের ঘরে বাতি জ্বালানোর মতো জীবিত লোক ছিল না। লাশ দাফন কাফনের লোক পাওয়া যেত না’[২]। দুভিক্ষ আর পথ্য-ঔষধের অভাবে এক চরম দুদর্শার করুণ চিত্র গ্রামের লোক কবির মনকেও নাড়িয়ে ছিল, তাই লোক কবি আব্দুল হেকিম ভাট কবিতা রচনা করে এই করুণ চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরেছিলেন।

হায়রে দারুণ ম্যালেরিয়া দেশ নিল উজাড় করিয়া
তব দেহেতে বুঝি দয়ার অংশ নাই ॥
কত পুত্রশোক মা জননী কাঁদে সদা হুতাশিনী
পিতার শোকে পুত্র কাঁদে, ভাইয়ের শোকে ভাই,
স্বামীর শোকে স্ত্রী কাঁদে কেশ-বেশ নাই বাঁধে
পাগলিনী হইয়া বলে কোন দেশেতে যাই ॥
বানিয়াচং পরগণা ধরি গৃহ ছিল সারি সারি

www.pathagar.com

হেন দৃশ্য কোনো দেশে দেখতে নাহি পাই ॥
হায় রে দারুণ
ছিল হেন সোনারপুরী ম্যালেরিয়া রোগে ধরি
শ্মশানেতে পরিণত করিয়াছে ভাই।
কোনো ঘরে দশজন ছিল এক দুই-জন রাইখা গেল,
কোনো ঘরে সান্ধ্যবাতি দিতে কেহ নাই।
শৃগাল ডাকে দিনের বেলা বাজে রে তিন তারের খেলা
মরি মরি একি লীলা কভু দেখি নাই ॥
হায় রে দারুণ
একে তো রোগের জ্বালা জিনিসপত্রের দর বেতালা
তাতে আবার রেশন কার্ড নিতে হবে ভাই।
কাপড় যদি আনতে হয় কন্ট্রোলেতে যাইতে হয়,
একদিনের কাপড় কিনা কভু সম্ভব নয়।
লোকের ঠেলায় লোক মরে ঘরে নাহি সে ঢুকতে পারে
জোর থাকিলে যাইতে পারে নইলে পারে নাই।
হায় রে, গরিব লোকের উপায় নাই চিন্তা করে দেখ ভাই
মোটা সুতার মার্কিন ছাড়া চিকন পাবে নাই।
গরিব লোকে যদি ডাকে চক্ষু মেলে নাই দেখে
বলে বেটা ভালো কাপড় আমার কাছে নাই।
উচিত পয়সার কারবার করি তবু ভাই তার পায় ধরি,
দুই-চার কথা বেশি কইলে ঘাড়ে ধরে ভাই ॥
হায় রে দারুণ
বড়বাবু যারা পাট্টর বুক ভাঙ্গে তারা
চিকন ডুরার ধুতি পরে করিয়া ধুলাই,
যত বেটা স্টোর কিপার নওয়াব বাচ্চা বরাবর
বলে এখন বন্ধ করো বেচা কেনা নাই।
বেলা দশটা বেজে গেল ভাত খাইতে এখন চলো
স্টোরের কাজে মত্ত হয়ে জীবন গেল ভাই ॥
হেকিম কয় ভাই সকলের সোজা রাস্তায় যাও রে
ঠেকবে একদিন শেষের দিনে উপায় দেখি নাই ॥
হায় রে দারুণ

আজ থেকে একশ এগার বছর আগে ভারত বর্ষের সবচেয়ে বড় গ্রাম বানিয়াচঙে ভট্ট পদবীধারী জনগোষ্ঠী 'ভট্ট কবিতা নামে নতুন এক কবিতার ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। যা আমাদের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। এখন এই ভট্ট কবিতা বিলুপ্তপ্রায়। সিলেট বিভাগের প্রথম ফোকলোরবিদ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, তিনি বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এই ফোকলোরবিদ ১৯০২ সালের দিকে ভট্টকবিতা সংগ্রহ শুরু করেন। এর আগে কবিতাগুলো ভট্ট মহাশয়গণ মুখে মুখে রচনা করে বিভিন্ন

আসরে, পার্বণে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসম্মুখে তুলে ধরতেন। কেউ কেউ এই লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে গড়া কবিতাগুলোকে সুর ও তালের মিশ্রণে গান করতেন, এতে এই কবিতা 'ভট্ট সংগীত' নামে পরিচিত হয়। এই ভট্ট কবিতা বা সংগীত এলাকায় বেশ সুনাম কুড়ায়। দেশে যখন খবরের কাগজ ছিল না, ভট্টগণের রচিত প্রাচীন বা সমকালীন উপাখ্যানের সঙ্গে নানা প্রকারের লোক শিক্ষার প্রচারে সমাজ উপকৃত হতো। কোনো দানশীল ও ধর্মপরায়ণ ভূস্বামী কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে ভট্ট কবিতার স্থান ছিল[১]। এই ভট্টকবিতা কেবল বানিয়াচঙের ২নম্বর ইউনিয়নের 'ভট্টপাড়া' এবং ৪নম্বর ইউনিয়নের 'ভট্টহাটির' বাসিন্দাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বানিয়াচং ছাড়া অন্যান্য গ্রামের ভট্টরা এই কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের কবিতা সম্ভবত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রাচীন বইপত্র ও লোকমুখে প্রাপ্ত ভট্ট কবিতা :

ভট্ট কবির নাম	ঠিকানা	কবিতার নাম	মন্তব্য
১. মখরন্দ ভট্ট	ভট্টপাড়া, বানিয়াচং	তথ্য নাই	
২. নব নারায়ণ ভট্ট	মুহরীপাড়া, বানিয়াচং	শ্রী রাধিকার বস্ত্রহরণ, হরির বাল্য লীলা	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা-৩১
৩. রাম মোহন ভট্ট	পশ্চিমবাগ, বানিয়াচং	আগমনী, কৃষ্ণের ছেলেবেলা, দক্ষযজ্ঞ, মটন লীলা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা-৪৮
৪. রঘুনাথ ভট্ট	মুহরীপাড়া, বানিয়াচং	কিশোর ভবন ও দৌলত খাঁ	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা-৪৫
৫. গৌর চন্দ্র ভট্ট	আগনা (কামার গাঁও), নবীগঞ্জ	ব্রহ্মনিরূপণ, রাধিকার মান ভঞ্জন, শরৎকালের আগমনী ও থাকবস্তার জরিপ।	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা-২৩
৬. চন্দ্রমোহন ভট্ট	পশ্চিম ভাগ, বানিয়াচং	ভাওয়ালের কবিতা, ময়মনসিংহের ডাকাতি	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা-২৩
৭. ভৈরব চন্দ্র ভট্ট	হাতুয়া কান্দি, চুনারুঘাট (তরপ)	জয়দেব	'শ্রীহট্টের ভট্ট সংগীত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, পৃষ্ঠা - ৩৮
৮. যোগেন্দ্র ভট্ট	ভট্টহাটি, বানিয়াচং	কোনো কবিতা খুঁজে পাওয়া যায়নি	হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'উজান গাং বাইয়া' গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে

ভট্ট কবিতা পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের পরে অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি হবিগঞ্জের ছয়জন[২] কবির ২০টি কবিতা তাঁর সম্প্রাদিত গ্রন্থ 'শ্রীহট্টের

www.pathagar.com

ভট্ট সঙ্গীত' গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থটি যতীন্দ্রমোহন গ্রন্থশালা, কলকাতা থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে সংগ্রহ বা গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি।

বানিয়াচঙের যোগেন্দ্র ভট্ট নামে একজন শিল্পী, তিনি হবিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অন্যদের মতো ভট্ট কবিতা ও গান করে বেড়াতেন। লোকে তাঁকে 'ভাটের বামন' বলে ডাকত। তিনি প্রায় বছরই চুনারুঘাট থানার মিরাশী গ্রামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাড়িতে এসে ভাটের গান শোনাতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভাটের গানকে 'গাথামূলক গান' বলে অভিহিত করেছেন[৩]। ভট্ট কবিতাগুলো পৌরাণিক ধর্মকাহিনির ভিত্তিতে রচিত হতো, ধর্মপ্রাণ লোকেরা ভক্তিভরে শুনত। হবিগঞ্জের বানিয়াচঙে ১৯৪৪ সাল ম্যালেরিয়ার বছর ও ১৯৫৬ সাল ধলির[৪] বছর। এই বছরগুলোতে ভীষণ দুর্যোগ ছিল, ছিল দুর্ভিক্ষ। এর বর্ণনা দিয়েও অনেকের সঙ্গে ভট্টরাও কবিতা রচনা করেছেন। স্বল্প শিক্ষিত এই ভট্ট কবিদের মধ্যে মকরন্দ্র ভট্ট সর্বোৎকৃষ্ট কবি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁর কোনো কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ভট্ট সংগীত

গৌরাঙ্গ চন্দ্র ভট্টের কবিতা (ব্রহ্মনিরূপণ)

গুণজ্ঞানীগণ করহ শ্রবণ
ব্রহ্মনিরূপণ কথা।
দ্বিতীয় নাহিক সর্বথা ॥
ব্রহ্ম সারাৎসার ব্রহ্ম নিরাকার
নির্বিকার নিরঞ্জন।
সে পরমেশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর
ব্রহ্ম জ্ঞানী জ্ঞানাঞ্জন ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নাহি তার অন্ত
ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি অণ্ডে অণ্ডে
এক ব্রহ্মের বিভূতি ॥
দুগ্ধে ছাপা ননী আছয়ে যেমনি
কেহ তা না দেখতে পায়।
শুনো বলি মর্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্রহ্ম
ছাপা আছেন তেমনি প্রায় ॥
সে ব্রহ্ম নিষ্কল সূক্ষ্ম সুনির্মল
স্তুতি নিন্দা বিবর্জিত।
নিত্য জ্যোতির্ময় স্থানে বিরাজয়
তমাদি ত্রিগুণাতীত ॥
এক ব্রহ্ম সত্য সকলি-অনিত্য
চাহিয়া দেখ তত্ত্ব জ্ঞানে।
ব্রহ্ম সত্য হয় জগৎ মিথ্যাময়
ভট্ট গৌরচন্দ্রে ভনে ॥

www.pathagar.com

ঙ. লোককবিতা

লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার বলে খ্যাত বানিয়াচঙের কবি ও লোকসাহিত্য নিয়ে গর্ব করা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার অনেকগুলো কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বানিয়াচঙে। একসময় বানিয়াচঙের রাজ পরিবার দেশের ২৮টি পরগনা শাসন করত। তখন তাদের পরিবারকেন্দ্রিক ঘটনার কাব্য কাহিনি আলাল দুলাল, অধুয়া সুন্দরী লিখে মনসুর বয়াতী ও জন্মান্ধ কবি ফৈজু ফকির বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়াও সুনাবান গীতের লেখক শ্রীধর বাণিয়া এবং কামরুপ শাসনাবলি গ্রন্থের লেখক পদ্মনাথ সরস্বতী বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণকারী ও শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস সমগ্র ভারতবর্ষে সাহিত্যাঙ্গনকে করেছেন সমৃদ্ধ।

অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'শ্রীহট্ট ভট্ট সংগীত' নামে ১৯৮৯ সালে বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ যতীন্দ্র মোহন সংগ্রহশালা কলকাতা থেকে যে সংগীত সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে তার ৩৭টি কবিতার মধ্যে ৩০টি কবিতাই বানিয়াচঙের ভট্ট কবি কর্তৃক রচিত। একসময়ে বানিয়াচঙের লেখকদের লেখা গ্রন্থ/কাব্য ছিল সর্বস্তরের মানুষের অত্যন্ত প্রিয়।

চ. লোকছড়া

আমাদের লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোকছড়া। ছড়ার সঙ্গে শিশুদের সুনিবিড় সম্পর্ক যুগযুগান্তর ধরে। ছড়া শিশুদের চিরকাল ধরে মনোরঞ্জন করে আসছে। মা-ই প্রথম শিশুকে ছড়া শোনান, কোলে নিয়ে, বিছানায় রেখে। শিশুর মুখে কথা ফোটার আগেই মা শিশুর কানে পৌঁছে দেন ছড়া। শিশু ছড়া শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা যাকে ঘুমপাড়ানোর ছড়া বলি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *ছেলে ভুলানো ছড়া* প্রবন্ধে ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে, এবং ছড়াগুলিও হেরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাদৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে ওধর করিয়া তুলিতেছে।' এখানে মেঘ শিশু শস্যকে প্রাণ দিয়ে বড় করে যেভাবে তেমনি ছড়া স্নেহ রসে শিশুর মনোজগৎ ও স্বাস্থ্য তৈরিতে সহায়ক হয়। শিশুর ছড়াটি মার মুখ থেকেই আবৃত্তি হয়ে থাকে, তাই ছড়ার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক রয়েছে। ছড়া কেবল শিশুদের জন্য নয়, কিশোর বয়সের খেলার ছড়া আছে। আছে যৌবনকালসহ সকল বয়সের জন্যই। তাই ছড়ার বিষয়গত বৈচিত্র্য রয়েছে আমাদের গ্রামীণ খেলাধুলা, কৃষি কাজকর্মে। মূলত লোকছড়া রয়েছে জীবনের নানা বিষয়েই। হবিগঞ্জ জেলায় লোকছড়াগুলো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

সংগৃহীত লোকছড়া

১

মাথা ডুলাই পিয়ারী
ডিম পাড়ে এক হালি
একটা ডিম নষ্ট
পিয়ারীর বড় কষ্ট।

www.pathagar.com

২

আইজ ইস্কুল ছুটি
গরম গরম রুটি
কহে উকা ইস্কুল বন্দ
গোলাপ ফুলের গন্ধ
পরশু ইস্কুল খোলা
পড়া না পারলে কানমলা ॥

৩

অরমবিবির খরমপাও
আসে যাইবো, দুঃখনি পাও
দুঃখ পাইলে ওষুধ নাই
ওষুধ চাই টোকা নাই ॥

৪

আয় চান পড়িয়া
মুমুর ঘোড়ায় চড়িয়া।
হাত ধুইবার সাবান দিমু
পা ধুইবার খড়ম দিমু
বাড়িত বইবার পিড়া দিমু
আমন ধানের চিড়া দিমু
কানা গাইয়ের দুধ দিমু
পানখাইবার বাট দিমু
চান্দের কপালে চান
টিপ দিয়া যায়।

১-১২ নং ক্রমিকে ছড়াগুলো সংগ্রহ করা হয় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া নুসরাত তাম্মি ও তার বান্ধবীদের কাছ থেকে। সুমাইয়া নুসরাত তাম্মি (১৩), পিতা আবু সালেহ আহমদ, শেখের মহল্লার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। বান্ধবী হচ্ছে– সাবরিনা হক তন্নি (১৩), গ্রাম মোহরের পাড়া ২ তানিয়া আক্তার (১৩), গ্রাম যাদুকর্ন পাড়া (১৩), রেজওয়ানা জাহান খান (১৩), মিয়াখানী, ইসরাত জাহান খান (১৩), গ্রাম মিয়াখানী।

১

আসের (হাঁসের) বাচ্চা থৈ থৈ
বাঘের বাচ্চা কোলে লই
ও সখী তোর বাড়ি কই
আমার বাড়ি খুডুংগা
বিল থেকে জামুগা
মাগুর মাছ খামুগা
মাগুর মাছের লম্বা দাড়ি
পাটা পুতাইল দার করি
কামালের পুটকির মধ্যে ঘা মারি।

www.pathagar.com

২

ইসুন বিছুন ছাবু দানা
ছাবু গেল পোক মারা
পুতের বউ রাণি
বড় গাঙ্গের ঢেউ
মামা আইছুন বিয়া করতে
এত সুন্দর বউ
সেই বউ ভালো না
দালানের খুঁটি
বাইতে দিনে ছল্লা করে
আইত বাপের বাড়ি।

৩

কলের ডাণ্ডা রোকেয়া টাণ্ডা
কলের চাবি রোকেয়া ভাবি।

৪

নুর মোহাম্মদ ছল্লাল্লাহ
গাছে ধরে করলা
সেই করলা মিষ্টি
বাপ পুতে সৃষ্টি।

৫

ডিব্বা রে কয় ডাব্বা
আমারে কয় লাল আব্বা।

৬

পুলিশের মেয়ে টিপ দিলে মেলে
পয়সা দিলে না করে
ঘু দিলে আকরে।

৭

কাঠবিড়ালি কাঁঠাল খায়
রুপ বিলাসী দেখে যায়

৮

রাজার মেয়ের বিয়া
লাল শাড়ি দিয়া
লাল শাড়ি দুড়া হাপ
ফাল দিয়া উটে কইন্যার বাপ
কইন্যার বাপের নাম কী
কাঞ্চিকাটা জিলাপি।

www.pathagar.com

৯

হুফুর বাড়ি গেছলাম
খই চিড়া খাইছলাম
হুফু দিল ভাঙ্গা ঘর
আল্লাহ্ আকবার

১০

ইছুন বিছুন দারগা বিছুন
ছিয়ায় লড়ে গাইলে লড়ে
বাবুর মায়ে চাউল কাড়ে
চাউল কারানি মাইগো
আমার দোষ নাইগো

১১

আম খালাম্মা জাম খালাম্মা
তেতুই খালাম্মা
এবার একটা বৎসর গেল
মায়ের মুখটা দেখলাম না
সকল জামাই খাইতে বইছে
লেংড়া জামাই কই
লেংড়া জামাই ঢাকা
লাঠিটা বাঁকা

১২

চল কুত কুত এলে এলে
তর মা আমার চকির তলে

১৬.০২.১২ তারিখে উম্মে ছালমা রুবি (২৪), পিতা মরহুম মহিবুছ সামাদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি, গ্রাম : সংগ্রাম রায়ের পাড়া, বানিয়াচঙ, হবিগঞ্জের কাছ থেকে ১৩-২২ নং ক্রমিকের ছড়াগুলো সংগ্রহ করা হয়। তিনি জানান ছোটবেলায় খেলার সময় এই ছড়াগুলো ব্যবহার করতেন।

১৩

বাঁশের পাতা লড়ে চড়ে
সীমার কথা মনে পড়ে
যদি সীমা জানতে চাও
একখানা চিঠি পাঠাইয়া দাও।

১৪

ডাইল ভাত খাইছলাম
ডাইল ঘন তোমার কথা মন।

১৫

ঘাড়ি সাজাইলাম কউ বসাইলাম
কউর নাম চন্দন
যাইব কউ লন্ডন।

www.pathagar.com

১৬

নয়ে নব ঘোড়া
দশে পদ জোড়া
এগারার এমা
বারর বিমা
তেরর পান খাও
ষোল গান গাও
সতেরয় আটারয় টিকা
উনিশে উলু
বাইশে বুলু
তেইশে কিসমিস
চব্বিশে কদম ফুল।

১৭

আমার নাম মিতা,
চুলে দিবো ফিতা।
কানে দিবো দুল,
রক্তজবার ফুল।

১৮

পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলিনা
তার সাথে আড়ি
যাব না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ির উপর তলা
না উঠিলে অনেক ভালা
মাগো তোমার পায়ে ধরি।
পুতুল নিয়ে খেলা করি
পুতুলের মাথায় কুঁকড়া চুল
বেঁধে দিবো গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের গন্ধ,
জামাই বাবু অন্ধ।

১৯

এপেসটু বাইসটু
নাইন টেন টেসটু
সুলতানা বেবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বাবু এসেছে
পান-সুপারি খেয়েছে

www.pathagar.com

পানের আগা মরিচ বাটা
স্পিংয়ের ছবি আঁকা
যার নাম রেণু মালা
তাকে দিব মুক্তার মালা

২০

চালে ধরে চাল কুমড়া
বেরাত ধরে লাও,
এক বেটি খাইল
সাত পাতিল জাও।

২১

মায়ে করে পুত পুত,
ঝিয়ে করে সুয়া।
আরনি খাইতায়রে পুত,
মিটা গাছের গুয়া।
মিটা গাছের গুয়া খাইয়া,
দাঁত কেন পড়ে।
এমন মায়ের পুত নাই,
ধইরা আনতে পারে।

২২

টুনটুনি গো পাখি, নাচনা দেখি
না বাবা নাচব না, পড়ে গেলে বাঁচব না
বড় আপুর বিয়ে, কসকো সাবান দিয়ে
কসকো সাবান ভালো না, বড় আপুর বিয়ে হবে না

১৮.০২.১২ তারিখে শিরিন আক্তার (২২), গ্রাম : দোকানটুলা সুফিয়া মতিন কলেজের বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী– তার কাছ থেকে ২৩-৩০ নং ক্রমিক পর্যন্ত ছড়াগুলো সংগ্রহ করা হয়।

২৩

ছে ছে ছে ইউর ছাম
ছি ছি দাদু পান-সুপারি খান
পান-সুপারি খেয়ে দাদু
হাট বাজারে যান
হাটে ছিল পাগল কুকুর
কামড় দিয়েছে
সেই কামড় খেয়ে দাদু
মাঠে নেমেছে
পানিতে ছিল কুমির মামা
কামড় দিয়েছে

www.pathagar.com

সেই কামড় খেয়ে দাদু
চালে উঠেছে
চালে ছিল টেপলা টেপলি
কামড় দিয়েছে
সেই কামড় খেয়ে দাদু মারা গিয়েছে।

২৪

এতিনারে এতিনা
তিন দিন ধইরা মুতিনা
তিনদিনের জ্বরে
মাথা বিষ করে।

২৫

বুড়িগো বুড়ি কই যাও
নাতিন বাড়ি
কিতা লইয়া,
পিঠা লইয়া
একটা পিঠা দেওনে
ছুঁইতে পারলে নেওনে।

২৬

আউলা জাউলা পাকিস্তান
দেশে আইলো ইরি ধান
ইরি ধানের গন্ধ
ভাবি কেন কান্ধো
তোমার ভাইয়ে মারছে
মারছে মারছে ভালা করছে
ডাক্তরের ধার নিয়া গেছে
ডাক্তরে বেন্ডিস করছে
ডাক্তরে কয় পারতাম না
আল্লায় কইন ছাড়তাম না।

২৭

হাতে নাই আংটি
মনে নাই শান্তি
১টার সময় রান্ধি
২টার সময় খাই
বন্ধুর কথা মনে হইলে
ফুল বাগানে যাই
ফুল কেন ফুটেনা
পেঁপে কেন পাকে না

www.pathagar.com

পেঁপে অহন ঝনঝন
জামাই আইলো তিন জন
জামাইর নাম বক্কর
আল্লাহু আকবার।

২৮

লেম্বু গাছের তলেগো
কোকিল পাখি ডাকে গো
ও কোকিল ডাকিলো ডাকিছ না
শ্যামের গলা ভঙ্গাইছনা
শ্যাম গেল মাতাপুর
কিইনা আনলো চাম্মাফুল
চাম্মাফুলের গেরানে
জামাই আইলো অরানে
জামাইর নাম রইশয়্যা
জুতার ভারি টাইস্যা।

২৯

উমালিরে ভাই
কলিকাতা যাই
কলিকাতা লন্ডন
কুটি কুটি বাইঙ্গন

৩০

চল কুত আনাইয়া
নৌকা দিমু বানাইয়া
যদি নৌকা লড়ে
বিয়া দিমু দূরে।

ছ. পাঁচালি

পাঁচালি গ্রাম্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগীত। এই সংগিতের দুটি ভাগ একটি ভাবমূলক আর একটি কাহিনিমূলক। ভাবমূলক সংগীতে সুরের বৈচিত্র্য আছে; সে জন্য এই সংগীতের বহিরঙ্গ গঠনেও বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় থাকে। কিন্তু সংগীতের কাহিনিমূলক করা হয় বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যহীন। কাহিনিমূলক গান যখন লিখিতভাবে প্রচার করা হয়, তখন তাকে সাধারণত পাঁচালি গান বলে'[১]। পাঁচালি কাহিনি প্রধান গান, পৌরাণিক ও লৌকিক দেব দেবীর পার্থিব পূজাচারকে কেন্দ্র করে পাঁচালি গান গাওয়া হয়। এই গানের পয়ার অংশ একজন এক সুরে ধীর লয়ে গান করে, লাচারী বা ত্রিপদী অংশ অন্যরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকে। পাঁচালি বই দেখে গানের সুর তালে তালে গাওয়া হয় বলে 'পাঁচালি গান' বলা হয়। এই পাঁচালি সন্ধ্যার পর সাধারণত মেয়েরাই দলবদ্ধভাবে গেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

হবিগঞ্জ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে বিভিন্ন তিথির নির্ধারিত বারে পাঁচালি গান আজো প্রচলিত আছে। তার মধ্যে ১. শনির পাঁচালি–শনি বারে; ২. সত্য নারায়ণের পাঁচালি– প্রতি পূর্ণিমায় পূজো দিয়ে উপবাস করে পাঁচালি গাওয়া হয়; ৩. বিপদনাশিনীর পাঁচালি– মঙ্গলবারে পুজা দিয়ে গাওয়া হয়। ৪. সুবচনীর পাঁচালি– ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাঁচালি পড়তে হয় সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে; ৫. শ্রী লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালি– প্রতি বৃহস্পতিবারে এই পাঁচালি গাওয়া হয়। তিথি নক্ষত্রের বিধি নিষেধ নেই। দিনের যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পুজা সম্পন্ন করে পাঁচালি গীত হয়; ৬. শ্রী মনসা দেবীর পাঁচালি– আষাঢ় মাসের নাগপঞ্চমীতে পুজা ও ব্রত শেষে পাঁচালি গীত হয়; ৭. শিবের পাঁচালি– ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শিবরাত্রিতে পুজা, উপবাস করে পাঁচালি গীত হয়। সাধারণত এই এলাকায় সোমবারে শিবের পাঁচালি হয়ে থাকে; ৮. মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি– মঙ্গল কামনায় পুজা অন্তে প্রতি মঙ্গলবার মহিলাগণ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে পাঁচালি গেয়ে থাকে। 'মঙ্গলচণ্ডীর বরে সাধুর ভবন/সুখ সম্পত্তিতে পূর্ণ হয় অনুক্ষণ'; ৯. সন্তোষীমাতার পাঁচালি– সিদ্ধিদাতা গণেশ দেবের একমাত্র কন্যা সন্তোষী। তাঁর ঘরে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সর্বদা বিরাজমান, তাই দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি লাভের আশায় সন্তোষী মাতার ব্রত পালন করা হয়ে থাকে প্রতি শুক্রবার। এর তিথির কোনো বিধি নিষেধ না থাকায় সাধারণত পুজা দুপুরে করা হয়। পুজা অন্তে পাঁচালি গীত হয়, লুট হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন টক জাতীয় কোনো খাবার গৃহে রান্না, খাওয়া বা রাখা হয় না। নারীরা এ পুজার আয়োজন করে থাকে[২]; ১০. কল্কিনারায়ণের পাঁচালি– মনের বাসনা পূরণে মানত ও কোনো কিছু হারানো গেলে মানত স্বরূপ কল্কিনারায়ণের সেবা দেওয়া উপলক্ষ্যে কল্কিনারায়ণের পাঁচালি গীত হয়ে থাকে। সাধারণত শনিবার সন্ধ্যার পর পাঁচজন পুরুষ এই পূজার বিধিতো 'পাঁচ টিক্কা দিয়া পাঁচ সিলিম তামাক সাজায়ে/পাঁচ জনে খাবে তামাক একত্রে মিলে বসে। ভক্তিভরে যেইজন আমায় পূজা করে/অলক্ষ্মী চলে যায় লক্ষ্মী আসে ঘরে'[৩]।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল গ্রামে কবি দ্বীজবিশ্বনাথ কল্কিনারায়ণের পাঁচালি লিখেছেন। তাঁর লেখা পাঁচালি হবিগঞ্জ এলাকায় বিগত ৫০ বছর ধরে গীত হয়ে আসছে। লাচারী ও পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালিটি নিম্নরূপ :

লাচারী : ও হে কল্কি নারায়ণ, তুমি বিঘ্ন বিনাশন
ওহে প্রভু অগতির গতি ॥
করি তোমা প্রণিপাত এই করো দীননাথ
শ্রীচরণে রেখো যেন মতি ॥
কেমনে বর্ণিব তোমা, বেদনারে দিতে সীমা
বিবিঞ্চি বাঞ্চিত নারায়ণ
আমি অতি হীনমতি, না জানি ভক্তি স্তুতি
পুরাও মনের আশা এই আকিঞ্চন
যথা পূর্বাপর মতো পাঁচালিতে পরিণত
করিলাম হরিষ অন্তরে

দ্বিজ বিশ্বনাথ কয় কোথা দেব দয়াময়
অন্তিমে চরণে স্থান দিয়ো অভাগারে ॥

পয়ার : কর্ণাট নগরে বাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ
অতি কষ্টে দিনগুলি করিছে যাপন।
পরিবারে আছে পত্নীপুত্র তিন জন
গোবিন্দ জ্যেষ্ঠপুত্র আর মদন মোহন
পুত্রবধূ ঘরে আছে সর্বসুলক্ষণা
মদনখঞ্জ আর অন্ধ একজনা
এই হলো ব্রাহ্মণের পরিবারের লোক
অতি কষ্টে দিন যায় বিধাতা বিমুখ
ব্রাহ্মণী দেখিতে নারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে
অপগণ্ডপুত্র যার মারিবার তরে
পুত্রবধু দেখিলে ফিরায় যে বদন
শেষকালে এই ছিল কর্মের লিখন
সম্পত্তির মধ্যে ছিল একমাত্র গাভী
ব্রাহ্মণ রাখিল নাম যতনে সুরভি।

***

কামিনী কুমার কৃষ্ণকান্তের তনয়
উপাখ্যান জানি আর তার কাছে সমুদয়
পাঁচালিতে পরিণত করে বিশ্বনাথ
কল্কিনারায়ণ পদপদ্মে দৃঢ় আশ

* * *

শুনো হে ব্রাহ্মণ তবে বলি তব ঠাঁই
কল্কি নারায়ণ সেবা করি সবাই
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কল্কি নারায়ণ সেবা
জিজ্ঞাসা করিলেন বলো তিনি কেবা?
শুনিয়া রাখালগণ হাসিতে লাগিলো
কল্কি নারায়ন দেব দ্বীজে না চিনিলো
বলিতে লাগিল সব রাখালিয়াগণ
কলিতে প্রত্যক্ষ দেব কল্কিনারায়ণ
যে যাহা বাঞ্ছা করে সিদ্ধি হয় কাম
দারিদ্র্য খণ্ডন হয় যে লয় তার নাম।
এমনি নামের গুণ কী বলিবো তোমা
হারানো রতন পায় এই তো মহিমা
অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন
কী আর বলিবো তোমা মাহাত্ম্য কথন।
কল্কি নারায়ণ বরে হারা নিধি পাইলো আনন্দে দ্বীজবর গৃহ মধ্যে গেল

www.pathagar.com

কিছুদিন সংসার বাস করিয়া ব্রাহ্মণ অবশেষে বৈকুণ্ঠেতে করিল
গমন।
কল্কি নারায়ণ কথা অপূর্ব কথন
সম্পূর্ণ হইলো গ্রন্থ হরি বল মন।[৪]

এছাড়াও অনেক পাঁচালি রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সধবা মহিলাগণ এই সকল পাঁচালি গেয়ে থাকেন। পাঁচালি মাধ্যমে দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা করে তারা দেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে থাকে। তারা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও উলুধ্বনিপূবর্ক ব্রতকথা অন্তে প্রসাদ ভক্ষণ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পাঁচালি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করে থাকে।

হবিগঞ্জের দ্বীজ বিশ্বনাথ ছাড়া আরো অনেক কবি পাঁচালি রচনা করেছেন, তার মধ্যে বানিয়াচং উপজেলার মান্দারকান্দি গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ্যযোগ্য।[৫]

জ. পুথিসাহিত্য

পুথি পাঠ : শাশ্বত বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অংশ পুথিপাঠ। আমাদের গ্রাম বাংলার গ্রামীণ মানুষের গল্প ও কাহিনি শোনার পিপাসা মিটিয়েছে এই পুঁথিপাঠ। অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণ পুঁথি রচনার মাধ্যমে ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ধর্মীয় গুণাগুণে প্রভাব, প্রচার ও স্থাপনে নিষ্ঠাবান থেকে পুঁথি রচনা করে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব গ্রহণ করেছেন।

পুথি নামে এই বিরাট সাহিত্যটি পাঠ করে পল্লি বাংলার জনগণ অবসর বিনোদন করতেন। পুঁথিপাঠ 'আনন্দ বটিকা' রূপে চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করত। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে অবসাদ ও ক্লান্তির মহৌষধ ছিল এই আনন্দ। পুথি জনগণকে বহুকাল থেকে আশা-আনন্দে উদ্বেলিত করে কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে, শুনিয়েছে জীবন বিধানের সুমহান তত্ত্ববাণী। এক কথায় বলা চলে, সাধারণ জীবনের অবসরে আনন্দ উপভোগের একমাত্র অবলম্বন ছিল পুথি যেমন, তেমন ছিল তত্ত্বজ্ঞান আহরণের অবলম্বন। কেউ পড়ে, কেই শুনে আনন্দ ভোগ করত। পুঁথিপাঠের আসর ছিল সামাজিক মিলনের উৎস ও ক্ষেত্র। গ্রাম-বাংলার হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে এর রসাস্বাদন করত।

আসরে বসিয়াছো যত হিন্দু মুসলমান
সবাকার তরে আল্লাহ হও মেঘাবান (পুঁথি–ইউসুফ জুলেখা)

আমাদের অতীতদিনের প্রজ্ঞাবান শায়েরগণ কিংবদন্তি থেকে কিছু প্রণয়মূলক ও রূপকাহিনিমূলক ঘটনাকে প্রতিপাদ্য করে আবার কেউ কেউ রাজা-দরবেশদের ও পরবর্তীকালে জমিদারদের কিছু কাহিনি নিয়ে পুঁথি রচনা করেন। কিন্তু এসব পুঁথি তাদের জন্য নয়। পুথি রচনার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে জ্ঞান দানসহ সাময়িক বিনোদনের ব্যবস্থা করা। পুথি আমীর হামজা, পুথি সোনাভান, পুথি হাতেমতাই, পুথি গাজী কালু চম্পাবতী, পুথি লাইলী মজনু, পুথি শিরি ফরহাদ প্রভৃতি কাহিনি ভিত্তিক পুথির সঙ্গে পুথি জঙ্গনামা কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়েও পুথি রয়েছে। পুথি ডান থেকে বাম দিকে লেখা, তাই আরবি, ফারসি নিয়মে ডান থেকে বাম দিকে

www.pathagar.com

পাঠ করতে হয়। শায়ের এবং পুথি পাঠকের বিশ্বাস ডান দিক দিয়ে লেখা বা পাঠে ফজিলত রয়েছে। তাই পুথি অত্যন্ত নিবিড় বিশ্বাসে পাঠ ও শ্রবণ করতে হয়। তবে ছন্দের একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যে পয়ার থেকে ত্রিপদী ছন্দে পুথি লেখা রয়েছে।

পুঁথিপাঠ সাধারণত সকল সময়েই গ্রাম বাংলা কম বেশি হতো। তবে গ্রীষ্ম, হেমন্ত বা শরতের রাতে বেশি পুথিপাঠের আসর বসত। কোনো এক গৃহস্থের বাড়ির উঠানে চাটাই বা মাদুর বিছিয়ে বেশ একটা বড় রকমের জটলা করে সবাই বসত, আর মাঝখানে কুপি বাতি বা হারিকেনের আলোতে পুথিপাঠ করত। পুরুষরা উঠানে বসলেও মেয়েরা বসত একটু দূরে, কম বয়সের মেয়েরা বসত আরো দূরে। সবাই কিন্তু পুথি পাঠ করতে পারে না। এজন্য অভিজ্ঞতা দরকার। পুথি সুর করে আবেগ দিয়ে ভাব ব্যক্ত করে পাঠ করতে হয়। সেরা পুথি পাঠক সেই যাঁর পুথিপাঠ শুনে কাহিনির সঙ্গে শ্রোতারা একাত্ম হয়ে যায়। এমনি সেরা পুথি পাঠকের কদর বেশি। তাকে বিভিন্ন আসরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আজ আর তেমনটি নেই। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কেড়ে নিয়েছে বাংলার ঐতিহ্য এই পুথিপাঠকে। তাই এখন আর আগের মতো পুথিপাঠের আসর বসানো বা পুথির সন্ধান অথবা পুথি বিষয়ক আলোচনায় আমাদের সাহিত্যপিপাসু শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। যদিও আমরা জানি যে, অতীতের মধ্যে নিহিত আছে বর্তমানের বীজ। বর্তমানকে অতীত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানা দরকার। জানা দরকার হবিগঞ্জ জেলার পুথি ও পুথিপাঠ সম্পর্কে।

হবিগঞ্জ জেলায় অনেক বয়াতি, পল্লি কবি, মরমি কবি ও শায়েরগণ বেশকিছু পুথি রচনা করে আমাদের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সংগ্রহের অভাবে এর অনেক কিছুই বিস্মৃত প্রায়। তবু কিছু পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুথিগুলো বহু বিষয়ের সংমিশ্রণে থাকলেও ইসলামি রীতির অনুসরণে লেখাই বেশি। পুথিগুলোতে শুরুতেই হাম্‌দ ও নাত রচনা করে আল্লাহ ও রসুলের গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে। হবিগঞ্জের পুথির মধ্যে 'পুঁথি নূর নছিয়ত' ও 'ছহি শেখ ভানুর পুথি' জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাছাড়া পুথি নুর নাজাত, পুথি তরিকতে হাক্বানী, পুথি শরিয়তনামা, পুথি আজব কাহিনি, পুথি ঈমান গাছ, পুথি ছিলট বিবির বয়ান প্রভৃতি পুথি আমাদের পুথি সাহিত্যের জগতকে সমৃদ্ধ করেছে। পুথিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১. পুথি নূর নছিয়ত : এর শায়ের বিশিষ্ট সুফি সাধক সৈয়দ শাহ নূর। তিনি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানাধীন দিনারপুর পরগণার জালালসাপ গ্রামের বাসিন্দা। পুথিটি সিলেটি নাগরী লিপিতে লিখিত একটি কলমি পুথি। পুথিটি ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক যা মুরিদের উদ্দেশেই প্রণীত। বর্ণনা অনুযায়ী এর রচনাকাল ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

২. পুথি নূর নাজাত : ১৩১৪ বাংলায় পুথিটি সিলেটি নাগরী লিপিতে প্রকাশিত হয়। পুথিটির সায়ের বাহুবল উপজেলাধীন মধুপুর নিবাসী সৈয়দ জহুরুল হোসেন। তিনি এ পুথির মাধ্যমে ভক্ত সাধক হৃদয়ে খোদার প্রেম ভক্তি স্পর্শকাতর শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। পুথিটি আজ দুষ্প্রাপ্য।

www.pathagar.com

৩. ছহি শেখ ভানুর পুথি : আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সুফি দার্শনিক মরমি কবি শেখ ভানু এই পুথির প্রণেতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন পুথিকার হিসাবে স্বনামধন্য এই ব্যক্তি হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলার ভাদিকারা গ্রামের বাসিন্দা। হবিগঞ্জের পল্লিবাসীর বাড়িতে বাড়িতে একদা পঠিত হতো শেখ ভানুর পুথি। আজো প্রাচীন লোকমুখে এই পুথিপাঠের সংবাদ শোনা যায়। পুথিটিতে বিভিন্ন ঘটনার বয়ান রয়েছে। যেমন :

আল্লাহ বল ভাই যত মুমিনান ॥ তোরা এছা লিখি আমি কান্দনের বয়ান,
কান্দনের তোরা শুন ভাইজা ॥ একখানেই খেলা করে দুই সন্তান।
এর মধ্যে এক লাড়কা কান্দিয়া উঠিলো॥ আসিয়া তাহার মাতা তুলে লইবে কোলে,
চোখ দুটি তার মাথা দিবে পুছাইয়া ॥ দুধ পিলাইবে তারে কোলে উঠাইয়া।
যে পুলা না কান্দিবে থাকিবে খেলায় ভুলিয়া ॥ দুধ না দিবে মাতা তারে কোলে লইয়া,
আয় ভাই মুমিন সব হুশ কর দিলো॥ ভবের খেলায় দিন গেল পড়িয়া গাফিলে।
পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই বেরাদর॥ কেহই না যাইবে সঙ্গে তোমার কবরের ভিতর,
মরিলে যে কান্দবে লোকে শুন তার হাল॥ ভবের ভাবিক হইয়া করিবে খেয়াল।
স্ত্রী বলে কোথা গেলা পরম আমার ॥ কে দিবে ঢাকাই শাড়ি অঙ্গের অলংকার,
সে কথা করিয়া মনে করিবে কান্দন ॥ শয়ন ঘরেতে কেহ্ না করিবে শয়ন।
পুতে কান্দব সুর কইরে গলা ॥ কে দিবে আনিয়া আম কাঠাল কলা ,
ভাই কান্দবে কে হবে দুঃখ-সুখের সাথি॥ সোয়ারী ঘোড়া গেল কান্দবে তোর নাতি।
ওহে আল্লাহ পরোয়ার কাদির সোবহান॥ কান্দিরে নি দয়া হবে হাশরের ময়দান,
দয়া যদি নাহি কর ওহে দয়াময় ॥ কান্দিয়া আরশ আমি লড়াইমু নিশ্চয়।
এ বিনে অধম ভানু না জানে সাধন ॥ দয়া করিয়া শুন এই অধমের কান্দন॥

৪. পুথি শরিয়তনামা : হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রায়ধর গ্রামের মুসলিম মনীষী মৌলানা মো. আছাদুল্লাহ প্রণীত পুথি শরিয়তনামা। এতদভিন্ন পুথি মারিফতনামা আরেকটি পুথির সন্ধান রয়েছে। এতে তিনি নিজের পরিচয় বর্ণনা করেন এভাবে–

'নাম মোর এ যে আরজ করি যাই, অধম আছাদ বলে মোরে সবে ভাই॥
নামের কিছু কাজ ভাই নাহি মোর, দুনিয়ার নিবাস আছে রায়ধর।
তরপের ভিটেতে মোর গ্রাম হয়, হবিগঞ্জের কাছে সবে জানিবায়।
নাকিছ আছাদে বলে পরোয়ার। ঈমানের সহিত মোরে কর হে পার ॥

'মারিফতনামা' পুঁথিতে তিনি দরবেশের বর্ণনা দিয়েছেন।– 'এই পুঁথি পাঠে জান মমিনান/বার গোরো ফকিরের জান বিবরণ।'

৫. পুথি আজব কাহিনি : চুনারুঘাট উপজেলাধীন গোছাপাড়া নিবাসী মৌলভী আঞ্জব আলী রচিত 'পুঁথি আজব কাহিনি' ও 'পুঁথি ঈমান গাছ' নামে দুইখানা পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। একজন বিজ্ঞ আলেম ওয়ায়েজ ও সূফী সাধক সায়ের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। পুথি লেখার কারণ শায়ের এভাবে বর্ণনা করেন যে-

'নরনারী শুন সবে দিয়া মন / এই পুথি লিখিবার কী কারণ ॥
আসাম বেঙ্গলে প্রায় সব গাঁয় / ছোট বড় সকলেরে দেখা যায় ॥
আরিপুরি একটাই জমিয়া / পুথি পড়া শুনে খায়েশ করিয়া ॥

www.pathagar.com

পাঠকের মনে কত আনন্দ / পয়ার ত্রিপদী অতি পছন্দ ॥
গাজী কালু, আবুসামা, সুনাভান / শহীদে কারবালা ও প্রেমের গান ॥
সোহরাব রুস্তম ও ইস্পিন্দিয়ারের / আমির হামজা কিচ্ছা হাতিমের ॥
কত আর লড়াই দাসাতান / অয় মনে শুনেন পাতিয়া কান ॥
এসব পুথির কথা মূল্যহীন / কিতাবে না পাইবে ইহার চিন ॥
কোন পুথি শুনিলে হইবে পাপ / বেগর তওবায় না হইবে গুণাহ্ মাফ ॥

৬. পুথি তরিকতে হাক্কানী : চুনারুঘাট উপজেলাধীন বাঘারুক গ্রামে বাসিন্দা মো. রমজান আলী ওরফে ছাওয়াল শাহ এই পুথির প্রণেতা। তিনি পুঁথিতে বয়ান করেন–

হবিগঞ্জ মহকুমা জিলা ছিলহট, তরপ পরগণা আছে থানা চুনারুঘাট,
ইহার অধীনে আছে বাঘারুক গ্রাম, সেখানে আস্তানা আমি স্থাপন করিলাম।
সদরঘাটে জন্ম মোর দিনারপুর পরগণা, পূর্ব বুনিয়াদ কোথাকার কহি তার ঠিকানা।
গাজীপুর জেলা জান আছে হিন্দুস্থান, সেখানে আছিল মোদের আদ্য বাসস্থান।
খাজা জয়নুদ্দীন শাহ আসি দিনারপুর, সেখানে বিবাহ এক করিয়া হুজুর,
আস্তানা করিয়া পরে রহিলা সেখানে, আর দুই বিবাহ তিনি করেন দুইখানে।
দিনারপুর আওলাদের আমি একা আছি, ভাইবোন যত ছিল দাফন করেছি।
চারি তরিকার পীর দাদা জয়নুদ্দীন মোর, জিন্দা হালে কোথা গেলা নাই কোনো খবর,
ভালোমন্দ জায়গা কত দেখি তালাসিয়া, মেহের করিয়া আল্লাহ দিলা মিলাইয়া।
এরপর দুইবার বয়তুল্লাহ যাইয়া, মদিনা মনোয়ারা আইলা জিয়ারত করিয়া।
নামি-দামি মাজার কত জিয়ারত করলা, আল্লাহর হুকুমে এসে বাঘারুক রহিলা।

৭. পুথি এশকে মৌলা : এই পুথির রচয়িতা বাহুবল উপজেলাধীন রাউতগাঁও নিবাসী মৌলভী আবদুর রশিদ। তিনি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এই পুথিটি রচনা করেন। পুঁথিতে বর্ণনা করেন :

পুঁথি লেখিতে বড় সাধ ছিল মনে, এতদিন পুরাইলা আল্লাহ নিরঞ্জনে।
ছাপাইতে পারি যদি মেহের খোদায়, পারিলে আছান হবে যত নিদান।
খরচের অভাবে ভবে আছি বড় পেরেশান, কুদরতে কাদের যদি করেন এহ্ছান।
কোন উছিল্লায় যদি দেন মিলাইয়া, মুমিনের খেদমতে তবে পুঁথি দিব ছাপাইয়া।

আর্থিক সঙ্গতি ছাড়া এই শায়ের পুথি ছেপে প্রকাশ করতে পারেননি যদিও, তবু তিনি নিরাশ হননি। পরবর্তীসময়ে তাঁর এক আশেক এই পুথি ছাপানোর দায়িত্ব নেন। পুথির প্রারম্ভে ভূমিকায় শায়ের লেখেন–ভাবুক প্রেমিকে যদি পড়িবে এ পুঁথি, আঁধারে আলোক জ্বলি ধরিবেক জ্যোতি। আদরে পড়িবে যে এই প্রেমের মালা, ঘুচবেক অন্ধকার দূর হবে জ্বালা।

৮. পুথি ছাত্তারনামা : এটি একটি কলমি পুথি। পুথির শায়ের সদর উপজেলাধীন নিজামপুর ইউনিয়নের গৌরাঙ্গচক গ্রামের বাসিন্দা। পুথিটির বিবরণ :

আল্লাজীর নাম স্মরণ করিয়া, হাজারবার সিজদা করি ছির ঝুঁকাইয়া,

www.pathagar.com

মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ পিয়ারা আল্লার, দরুদ-ছালাম ভেজি হাজারে হাজার।
শরীয়ত-তরিকত-হকিকত-মারফত, চারি মঞ্জিলে এবাদত করিলেন হযরত।
বেগুনা হইয়া তিনি ভবেতে আসিলা, বন্দেগি করিলেন খোদার এস্কেতে মজিয়া।
নবীজীকে দোস্ত বলেছেন আপে পরওয়ার, দোস্তের উপর দিলেন উম্মতের ভার।
আল্লাহর বন্দা নবীর উম্মত হইতে যদি পারে, আরামে থাকিবে তারা বেহেস্ত মাঝারে।
না হইলে দোজখে যাইবে কত বিড়ম্বনা, আজাবে গিরিপ্তার হইবে ভোগবে যন্ত্রণায়।
কত সাজা দিবে মনরে সাজার অন্ত নাই, বেপানা হইয়া কানলে ফল কিছু নাই।
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আবদুছ ছাত্তার, নবীজীর সঙ্গে প্রেম না হইল আমার॥

৯. পুথি সিলেটি বিবির বয়ান : হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মশাজান নিবাসী সৈয়দ মোস্তফা কামাল এই পুথির শায়ের। তিনি সমসাময়িক ঘটনার আলোকে পুথিটি লিখেছেন।

দিন গেলে আসে মাস, বছর গেলে যুগ/ তিলে তিলে শুরু হয় অসুখ-বিসুখ।
আইজ ধরে মাথাত বিষ, কাইল হয় জ্বর/ সুখে-দুঃখে করে বিবি সাত হাইর ঘর।
পনরো আনা বাদ দিয়া,এক আনা কই/ বেবাক বয়ান করার লায়েক যে নই।
ইশারায় বুঝি লইও ভাই আর বোন/ কী হালে গুয়াইলা বিবি বদনের ছিক্‌নাই।

শহরের যান্ত্রিক কর্মব্যস্ততার মধ্যে পুঁথিপাঠের মূল্য তেমন না থাকলেও গ্রাম-বাংলার ছায়াঘেরা শান্ত-নির্জন পরিবেশে এর মূল্য অধিক। বলা চলে, বাংলার এমন কোনো গ্রাম নেই যে গ্রামে পুঁথি পাঠ সমাদৃত নয়। এই পুঁথি যাতে বিলুপ্ত না হয় সেজন্য পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসহায়ক

১. স্বরোচিষ সরকার, 'বাংলাদেশের কবি গান উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য : বৈশাখী লোক উৎসব', প্রবন্ধ ১৪০০, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৬
২. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, হারামনি (সাত খণ্ড), বাংলা একাডেমি, মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৩৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৪. পৃষ্ঠা ৬৫, পৃ. ৬৯
৫. নন্দলাল শর্মা, হবিগঞ্জ জেলা বিলুপ্ত প্রায় ও চলমান লোকসংগীত। প্রত্যয়, সংখ্যা ষষ্ঠ ১৪১৬।
৬. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সাং- মিরাশি, উপজেলা : চুনারুঘাট, জেলা : হবিগঞ্জ।
৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জীবন নদীর বাঁকে, অনুষ্ঠপ কলকাতা, মাঘ-১৩৯৬ পৃ. ২৩
৮. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেশের লোক নাটক বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৬৩
৯. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উজান নদীর বাকে, পৃ. ৮
১০. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদনা), বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমি, প্রবন্ধ,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কবিয়াল, যতীন সরকার, পৃ. ১২৮

১১. এ.কে পাল চৌধুরী, জীবন স্মৃতির কিছু কথা, পৃ. ৭

১২. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উজান নদী বাইয়া, পৃ. ২৫

১৩. ঐ

১৪. ঐ ২৬

১৫. হবিগঞ্জ শহরের ডাকাইয়া পট্টি নামক স্থানের একটি গলিতে ছোট বনিতালয় ছিল আজমিরীগঞ্জের ঐ কুমোদিনী। স্বামীঃ পরিত্যক্ত হয়ে বনিতালয়ে আশ্রয় নেন এবং শিল্প প্রতিভা প্রকাশে সমর্থ হন।

১৬. ঐ, পৃ. ১৫, ১৬

১৭. তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল, হবিগঞ্জের মরমি সাধক।

১৮. সরগম, ১৭ বর্ষ সংখ্যা (অক্টোবর ২০১২), পৃ. ৫৮ (তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ মারা যান)।

১৯. এ.কে পাল চৌধুরী, জীবন স্মৃতির কিছু কথা, পৃ. ০৭

২০. ১২.১১.১২ তারিখে উচাই গ্রামে মোহিত সরকারের বাড়িতে আয়োজিত কবিগান প্রত্যক্ষ করা হয়। ১০.০৫.১২ তারিখে আরিফ উল্লা (৭০) শিক্ষাগত যোগ্যতা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, পেশা কৃষি, গ্রাম কুতুবখানী তাঁর কাছ থেকে এই কবিগানটি সংগ্রহ করা হয়। এই কবিগানটির লেখক আব্বাস উদ্দিন, তাঁর পরিচিতি বাউলগানে দ্রষ্টব্য।

২১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ০৩। জগন্নাথপুরের ইতিহাস, ০২। সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ০৪। বানিয়াচং দর্পণ

২২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-২য় ভাগ, ২য় খণ্ড : অচ্যুতচরণ চৌধুরী তথ্যনিধি, প্রকাশ ১৯১০ পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩৯২ (জগন্নাথপুরের কথা)।

২৩. সিলেট বিভাগের পরিচিতি : সৈয়দ মোস্তফা কামাল, ২০০৪ পৃষ্ঠা ৫৬।

২৪. খোয়াইপাড়েরকিসসা/হবিগঞ্জেরগীতি-কেচ্ছা (তরফদার মুহাম্মদ ইসমাঈল পাণ্ডুলিপি)

২৫. নন্দলাল শর্মা, প্রত্যয় (হবিগঞ্জ সাহিত্য পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ), পৃ.৪৪

২৬. ভট্ট কবির তালিকার ক্রমিক নং ২ হতে ৭ পর্যন্ত

২৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : উজান গাঙ্গ বাইয়া (১৯৯০), পৃ. ২৬

২৮. ব্যাপক ফসলহানি হয় বন্যার জন্য

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় সংস্করণ) ১৯৬২-ছ-১৩১

৩০. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড ৪র্থ সংস্করণ), কলকাতা বুক হাউস (১৯৭৩), পৃ. ১৬৯

৩১. জ্যোৎস্না রানী দাশ (৫৫), জঙ্গলবহুলা, মাছুলিয়া হবিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার ৩০.১০.২০১৩

৩২. শ্রী দীলিপ চন্দ্র রায় (সম্পাদক, কল্কি নারায়ণের পাঁচালি, ১৯৯৯), নিউ এ্যজ পাবলিকেশন, পৃ. ৬

৩৩. শংকর অধিকারী (৫৪), পৈল পশ্চিম পাড়া, হবিগঞ্জ। তাঁর কাছ থেকে দ্বীজ বিশ্বনাথের লেখা কল্কি নারায়ণের পাঁচালিটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তারিখ ০১.১১.২০১৩

৩৪. নন্দলাল শর্মা : সিলেটের জনপদ ও লোক মানস (২০০৬), পৃ. ৭১

৩৫. পুঁথি সাহিত্যে হবিগঞ্জ, তরফদার মুহাম্মদ ইসমাঈলের পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত)

www.pathagar.com

গ্রাম/স্থান নাম

বানিয়াচং গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লার নামকরণ

চারটি ইউনিয়ন ও প্রায় ১২০টি পাড়া বা মহল্লা নিয়ে এ গ্রামের সার্বিক অবয়ব গঠন করেছে। গ্রামের ভেতরে যে পাড়া বা মহল্লা রয়েছে তাদের ইতিহাস ও নামকরণের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। ধারণা করা যায়, বানিয়াচঙের অনেক পাড়া বা মহল্লার নামকরণ করা হয়েছে রাজা হাবিব খাঁ ও তার পরবর্তী বংশধর দেওয়ান আনোয়ার খাঁর সময়। তৎকালীন মোগল রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বানিয়াচং গ্রামের অনেক পাড়া বা মহল্লার নামের মিল পাওয়া যায়। কারণ ঢাকায় মোগল বাহিনীর সঙ্গে আনোয়ার খাঁরযোগসূত্র ছিল বলে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

পাড়া বা মহল্লার নামের বিন্যাস থেকে বানিয়াচং যে দুর্গ নগরী ছিল তারও প্রমাণ মিলে। কথিত আছে যে, রাজ গোবিন্দ দিল্লিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেক মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে বানিয়াচং প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে তার এই প্রত্যাবর্তন পরবর্তী সময়ে বানিয়াচঙে ইসলাম ধর্মের প্রচার হতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বানিয়াচঙের মুসলিম রাজত্বের সময়ে পাড়া বা মহল্লার যেসব নাম পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে সেনানিবাসসংক্রান্ত ৯টি মহল্লা হচ্ছে– পাইকপাড়া, তকবাজখানী, সৈদারটুলা, তোপখানা, পাঠানটুলা, দোকানটুলা, ভাউয়ালিটুলা, বুরুজপাড়া, মাদারিটুলা। মুসলমান ব্যক্তির নামে নামগুলো হচ্ছে– আমিরখানী, হেঙ্গুমিয়ার পাড়া, খনকারিবাগ, আখন্দ মহল্লা, মিরমহল্লা, শেখের মহল্লা, আদমখানী, গরিবহুসেন, কুতুবখানী, ইনাতখানী, জামালপুর, মজলিশপুর, কামালখানী, মিয়াখানী, মহব্বতখানী, দোয়াখানী, শরিফখানী, তাতারিমহল্লা। পেশাভিত্তিক মহল্লা হচ্ছে, কাজীমহল্লা, নাগের খানা, ঢালি মহল্লা। এছাড়াও বাগ দেওয়ানবাগ, পুরানবাগ, ফুলবাগ, ছিলাপাঞ্জা, দরগামহল্লা নামে মুসলিম আমলের অনেক মহল্লা রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস গ্রামে বেশি থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ও কম ছিল না। লক্ষ করলে দেখা যায়, ৩০টি পাড়ার নামেই হিন্দু বসতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তির নামে রয়েছে ৯টি পাড়া। এগুলো হচ্ছে– রুপরাজখারপাড়া, রঘু চৌধুরী পাড়া, সংগ্রাম রায়ের পাড়া, চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া, ভবানন্দ খাঁর পাড়া, নৈর পাড়া তিলকরাম নায়েবের পাড়া, বাণেশ্বর বিশ্বাসের পাড়া, কালিদাসঠেখা হিন্দুপেশা বাচক নাম রয়েছে ৪টি। গোপ মহল্লা, মহুরী পাড়া (মোহরের পাড়া), কবিরাজপাড়া, ঠাকুরপাড়া। হিন্দু পদবি বাচক নাম আছে ১০টি– সেনপাড়া, আচার্যি পাড়া, নন্দীপাড়া, ভট্টপাড়া, দাসপাড়া, দত্তপাড়া, রায়ের পাড়া, চৌধুরীপাড়া, জাদুকর্ণ পাড়া, কাষ্টগড়। এছাড়াও বিজয় নগর গণ্ডবপুর, হাজরা পাড়া, কালিকা পাড়া, যাত্রাপাশা, দেশমুখ্য পাড়া, প্রথমরেখ নামগুলোতে হিন্দু বসতের চিহ্ন ছিল (বানিয়াচং বৃত্তান্ত, ফজলে এলাহি, পৃষ্ঠা ১৪০)। এসব পাড়া বা মহল্লার রয়েছে নিজস্ব পঞ্চায়েত প্রথা ও ফান্ড। এসব ফান্ড থেকে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ তথা দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। প্রতি মহল্লায় রয়েছে এক বা একাধিক

www.pathagar.com

সর্দার। তাঁরা যেকোনো দুর্যোগ, মারামারি, দলাদলি, কোন্দল নিরসনে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন। কয়েকটি মহল্লা নিয়ে আবার ছান সর্দার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তাদের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় ও সম্মানজনক। গ্রামের যে কোনো ঘটনা ঘটলে প্রথমে সর্দারের বা ছন সর্দারদের শরণাপন্ন হতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে সর্দারের মতামতকে প্রধান্য দেওয়া হয়। বানিয়াচঙের পঞ্চায়েত প্রথা বহু পুরনো ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. মজলিশপুর

রাজা গোবিন্দ সিংহ ওরফে হাবিব খাঁর পুত্র, রাজা মজলিশ আলম খাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ করা হয় মজলিশপুর। গ্রামে একটি বিরাট দিঘিও খনন করা হয়েছিল যা মজলিশ খাঁর দিঘি বলে লোকমুখে প্রচলিত ছিল।

২. কামালখানী

বানিয়াচং রাজ পরিবারের অধস্তন পুরুষ কামাল খাঁর নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় কামালখানী। কামাল খাঁ গ্রামে একটি দিঘি খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩. তোপখানা

১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহর আমলে গৌড় গবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধে করার জন্য দিল্লি থেকে সিকান্দার গাজীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য আসে । তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুশিয়ারা নদী ধরে বানিয়াচং এসে যেখানে বসবাস গড়ে তোলেন তার নাম পরবর্তীসময়ে হয়ে যায় তোপখানা। বর্তমানে এই মহল্লাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে– যেমন পুরান তোপখানা, উত্তর তোপখানা (আখলাক হুসেন খান খেলু)।

৪. তিরকর মহল্লা

বানিয়াচং রাজা হাবিব খাঁর দল তীরন্দাজ বাহিনীর বাসস্থান ছিল যেখানে সেই স্থানের নাম পরবর্তীকালে তীরন্দাজ থেকে ক্রম বিবর্তন হয়ে নাম হয়েছে তিরকর মহল্লা।

৫. চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া

যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য এ এলাকায় রাজার চার ধরনের সৈন্যবাহিনী বসবাস করত। চতু থেকে চার, রণ থেকে রঙ্গর ক্রমবিবর্তনে পরবর্তীসময়ে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া।

৬. ভাউয়ালীটুলা

ভায়াল ফকির নামে এ এলাকায় এক ফকির বাস করত। তারই নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় ভাউয়ালীটুলা।

৭. সেন পাড়

দেওয়ান আনোয়ার রাজার সময় এক হিন্দু বাহ্মণ যাজক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সেন বংশীয়। ঐ স্থানে রাজা তাকে বসবাসের অনুমতি দেন। পরবর্তীসময়ে ঐ স্থানের নাম সেন পাড়া হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৮. ভট্টপাড়া

দেওয়ানগনের স্মৃতিগাঁথা ভাটাস ও পাঁচালি গেয়ে কয়েকজন বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সংগীত গায়কদের ভট্ট উপাধি দিয়ে স্বতন্ত্র স্থানে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করতেন ঐ স্থানের নাম পরবর্তীসময়ে ভট্ট পাড়া নামে নামকরণ করা হয়। নব নারায়ণ ভট্টও মুকরন্দ ভট্ট নামে দুজন ভট্ট কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

৯. মিনাট

মিন অর্থ মাছ হাট অর্থ বাজার। এই দুটি শব্দের ক্রম বিবর্তনে মিনাট রূপ লাভ করেছে। এখনও ঐ মহল্লায় জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে।

১০. দাশ পাড়া

মুবারী বিশারদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তার জামাতা রঘুনাথকে বানিয়াচং এনে দশ পাড়া পল্লি নির্মাণ করেন। দশ পাড়া থেকে পরবর্তীকালে দাশ পাড়া নামকরণ হয়েছে।

১১. নৈর পাড়া

বানিয়চঙে আদি পুরুষ কেশব মিশ্রের জনৈক বংশধর গণপতির পুত্র সদাশিব, সদাশিবের তিন পুত্র, নৈ, লী, রূপরাজ খাঁ। নৈ-এর নামকরণে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় নৈর পাড়া।

১২. তকবাজখানী

বানিয়াচঙের মুসলিম শাসক হাবিব খাঁর দক্ষ অসি চালনো সৈন্যদের বাসস্থান ছিল ঐ এলাকায়। তাদের নামের অপভ্রংশ থেকেই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে।

১৩. জামালপুর

দেওয়ান জামাল খাঁর নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় জামালপুর।

১৪. দেওয়ান দিঘির পাড়

দেওয়ান আনোয়ার খাঁ বাড়ির পুর্ব পাশে একটি দিঘি খনন করেন। পরবর্তীকালে এই দিঘির পাড়ে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং এই মহল্লার নামকরণ করা হয় দেওয়ান দিঘি।

১৫. শরীফখানি

শরীফ নামে একজন জ্ঞানী ভদ্রলোক এসে এ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তারই নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় শরীফখানি।

১৬. মীর মহল্লা

সৈয়দ গোলাম হাফেজকে দিল্লির তৎকালীন সম্রাট তার প্রজ্ঞা ও মেধার সম্মান স্বরূপ মীর উপাধি প্রদান করেন। তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় মীর মহল্লা।

www.pathagar.com

১৭. যাত্রাপাশা

রাজা কর্ণ খাঁ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে এক সময় বানিয়াচঙে রাজ পণ্ডিত সমাগম হয়েছিল। বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম নিষ্ঠা তর্কালঙ্কার নামের পণ্ডিত সকলের মন ও মতো আচ্ছাদিত করে ছিলেন। রাজা তাঁকে বিনয় সহকারে সেই স্থানে অবস্থান করতে অনুরোধ করেন। পণ্ডিত সম্মতি দিলেন। রাজা তখন তাঁর রাজধানী থেকে পশ্চিমে একটি পুকুর ও বাড়ি তৈরি করে তাকে বসবাসের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন রাজগুরু ও সমাজপতি। অনেকেই গুরু দর্শনে তাঁর কাছে যেতেন। কালক্রমে এই মহল্লার নাম হয়ে যায় যাত্রাপাশা।

১৮. চৌধুরী পাড়া

পণ্ডিত রঘুনাথ ভট্টাচার্যের বংশধর শ্রী হরি বানিয়াচং রাজবংশের উকিল হিসেবে মুর্শিদাবাদে সেখানে গমণ করলে দেওয়ান খুশি হয়ে শ্রী হরিকে চৌধুরী পদবি ও ভূমি দান করেন। চৌধুরীর এলাকার নামকরণ করা হয় চৌধুরী পাড়া।

১৯. রূপরাজ খার পাড়া

বানিয়াচং রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পুত্র সদাশিব। তার পুত্র দত্ত, তৎপুত্র নন্দন ও গণপতি, গণপতির পুত্র নৈ ও রূপরাজ খাঁ খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে এলাকায় বসতি স্থাপন করেন ঐ এলাকার নাম হয়ে যায় রূপরাজ খাঁর পাড়া।

২০. বিদ্যাভূষর্ণ পাড়া

রাজা কর্ণ খাঁর বংশের জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাভূষণ নাথের নামে ঐ মহল্লার নামকরণ করা হয় বিদ্যাভূষণ পাড়া।

২১. চান্দের মহল্লা

রাজা কর্ণ খাঁর বংশের জনৈক চাঁদ খাঁর নামানুসারে ঐ মহল্লার নামকরণ করা হয় চান্দের মহল্লা।

২২. ভবানন্দ খাঁর পাড়া

জনৈক রাজ কর্মচারী ভবানন্দ খানের নামানুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় ভবানন্দ খাঁর পাড়া।

২৩. খন্দকার মহল্লা

খন্দকার উদ্দিন নামের একজন বুজুর্গ এখানে বাস করতেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় খন্দকার মহল্লা।

২৪. গরিব হোসেন মহল্লা

গরিব উল্লা নামে এক ব্যক্তি এলাকার বাসিন্দা হয়ে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করেছিলেন। পরে ঐ এলাকার নাম তাঁর নামে নামকরণ করা হয় গরিব হোসেন মহল্লা।

www.pathagar.com

২৫. তাম্বুলী টুলা

তাম্বুল ফার্সি শব্দ। এর অর্থ পান। ঐ এলাকার লোকজন পানের ব্যবসা করত বলে এলাকার নামকরণ করা হয়েছে তাম্বুলী টুলা।

২৬. কাষ্টগড়

রাজসৈনিক রূপে রাজপুতনা থেকে ত্রিয় সম্প্রদায়ের হিন্দু বংশজাত এদেশে এসে এখানে বসবাস করতেন। এরা কাঠের ব্যবসা করত। কালক্রমে এলাকার নাম হয়ে যায় কাষ্টগড়।

২৭. নন্দী পাড়া

সম্প্রদায়ের উপাধি নন্দী। নন্দী সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কাজ করেছিল। নন্দী উপাধি থেকে এলাকার নামকরণ করা হয় নন্দী পাড়া।

২৮. শেখের মহল্লা

ভারত উপমহাদেশ থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশধর এক ব্যক্তি এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তখন গ্রামের চারদিকে হিন্দু সম্প্রদায় বসবাস করত। এলাকায় যেহেতু মুসলমানের বাস ছিল তাঁর এই শেখ উপাধি থেকে মহল্লার নামকরণ করা হয় শেখের মহল্লা।

২৯. ঠাকুরাইন দিঘির পাড়

দিল্লির রাজদরবার থেকে গোবিন্দ সিংহ মুসলমান হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর হিন্দু স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাজা তখন তাঁকে স্বতন্ত্র বাসভবনসহ একটি দিঘি খনন করিয়ে দেন। তখন থেকে এলাকার নামকরণ করা হয় ঠাকুরাইন দিঘির পাড়।

৩০. কাজী মহল্লা

উমেদুর রাজার সময় ইনাতাবাদ থেকে সৈয়দ এনায়েত উল্লা নামে এক ব্যক্তি বানিয়াচং এসে বসবাস শুরু করেন। তার পুত্র সৈয়দ শাহ হোসেন ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তাই রাজা তাঁকে রাজদরবারে কাজী নিযুক্ত করেন। কাজী সাহেব যেখানে বসবাস করতেন সেই স্থানের নাম কাজী মহল্লা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৩১. দোকানি টুলা

ব্যবসায়িদের আঞ্চলিক ভাষায় দোকানদার বলা হয়। দেওয়ান আনোয়ার খাঁর সময় একদল লোক তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন বাজারে গিয়ে ব্যবসা করত। দোকানদার থেকে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় দোকানিটুলা।

৩২. সৈদারটুলা

এক সহোদর ভাই ও বোন ঐ এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। তার বোনকে আত্মীয়রা এক পর্যায়ে হত্যা করেছিল। এই সহোদর ভাই ও বোনে বসবাস করা থেকেই সহোদরটুলা পরে অপভ্রংশে সৈদারটুলা নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

৩৩. আচার্যপাড়া

হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার্য বংশীয় লোক এখানে বসবাস শুরু করলে এলাকার নামকরণ করা হয় আচার্যপাড়া।

৩৪. নাগের মহল্লা

রাজার আমোদ-ফুর্তি করার জন্য ঢাক ও তবলা বাদক নিযুক্ত ছিল। যারা এই কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের উপাধি ছিল নাগ। বসবাসের জন্য রাজা তাদেরকে স্বতন্ত্র ভূমি প্রদান করেন। তাদের এই উপাধি থেকে ঐ মহল্লার নামকরণ করা হয় নাগের মহল্লা।

৩৫. হেঙ্গু মিয়ার পাড়া

হেঙ্গু মিয়া নামে এক সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এখানে বাস করতেন। তাঁরই নামানুসারে এলাকার নামকরণ করা হয় হেঙ্গু মিয়া পাড়া।

৩৬. মাতাপুর

মাতা বলতে আঞ্চলিক ভাষায় শেষ প্রান্ত বোঝায়। এলাকার শেষ প্রান্তে গড়ের খাল সংলগ্ন কিছু লোক বসতি গড়ে তোলে। কালক্রমে এই এলাকার নাম হয়ে যায় মাতাপুর।

৩৭. পাঠানটুলা

দিল্লির দরবার থেকে একদল পাঠান বীর এখানে এসে বসবাস শুরু করলে কালক্রমে এলাকার নাম পাঠানটুলা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

৩৮. তাতারী মহল্লা

পশ্চিম অঞ্চল থেকে তাঁতি শ্রেণি এসে বসাবস শুরু করলে ঐ এলাকার নাম হয়ে উঠে তাঁতি মহল্লা। কালক্রমে ঐ এলাকার নাম তাতারী মহল্লা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

৩৯. দরগা মহল্লা

রাজা তাঁর স্ত্রীর কথামতো বানিয়াচং পূর্ব দিকে গড়ের খাল সংলগ্ন একটি দরগা নির্মাণ করেন। পরে দরগা মসজিদ নামে দরগা সংলগ্ন একটি মসজিদ ও নির্মাণ করা হয়। ঐ দরগার নামানুসারে ঐ এলাকার নামকরণ করা হয় দরগা মহল্লা।

৪০. জাতুকর্ণ পাড়া

দিল্লিতে গোবিন্দ খাঁ প্রাণ নাশের আদেশ হলে এই সময় তাঁর পণ্ডিত মুবারী বিশারদের প্রচেষ্টায় দৈবানুগ্রহে অব্যাহতি লাভ করেন। মুবারী বিশারদ ও তাঁর বংশধর অনেকেই ছিলেন পাণ্ডিত্য গুণে গুণান্বিত। তাঁদের বিভিন্ন ধরনের কার্যাকলাপকে মানুষ জাদুবিদ্যা বলে মনে করত। তাঁরা যে এলাকায় বাস করত সেই এলাকার নাম জাদুকর্ণ পাড়া বলে খ্যাত হয়। পরবর্তীসময়ে ঐ পাড়া জাদুকর্ণ নাম ধারণ করে।

www.pathagar.com

৪১. দেশমুখ্য পাড়া

এ এলাকায় হিন্দু ব্রাহ্মণ এক মেয়ে এক মুসলমান ছেলের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলে ঐ মেয়ের পরিবার ও এলাকার মানুষ বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটাতেন। তারা গিয়ে রাজ পরিবারে দেওয়ানের কাছে নালিশ করলে রাজা এই মহল্লার নাম দেন দেশমুখ্য পাড়া।

৪২. যাত্রা দিঘি

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে বানিয়াচঙের রাজা যুদ্ধের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করার জন্য একটি বিরাট দিঘি খনন করেন যা যাত্রা দিঘি নামে নামকরণ করা হয়। যুদ্ধের সময়ে ঐ দিঘিতে সকল রণতরী সমবেত হতো। এবং নৌ সেনারা পরিকল্পনামাফিক আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করত। রাজা হিন্দু সমাজের মানুষের দুর্গা, মনসা, পূজার মূর্তিগুলো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে এই দিঘিতে যাত্রা করার নিয়ম চালু করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে রাজা এই নিয়ম চালু করেছিলেন যে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা এই দিঘি থেকেই শুরু হবে। ফলে এসব কারণে দিঘিটির নামকরণ হয় যাত্রা দিঘি।

৪৩. পাইকপাড়া

পাইক অর্থ সেনা। এ এলাকায় রাজার সৈন্যদের বাসস্থান ছিল। তাদের নামের অপভ্রংশ হিসেবে মহল্লার নামকরণ করা হয় পাইকপাড়া।

৪৪. দেওয়ান বাগ

ইশা খাঁর বংশধর মনেন্দ্র খাঁ পত্তন কৃত নতুন বাড়ির নাম ছিল দেওয়ানবাগ। অনেকেই মনে করেন সেই সময় হাবেলি স্থাপন এবং সমগ্র এলাকায় ফুলের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই থেকে এ এলাকার নামকরণ করা হয় দেওয়ানবাগ।

৪৫. আদমখানী

আদম উল্লা নামে একজন ফকির বা দরবেশ এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই মহল্লার নামকরণ করা হয় আদমখানী।

৪৬. তিলক তালক নায়েবের পাড়া

৫/৬ নং তালুকের মালিক কালিপ্রসাদ চক্রবর্তীর দুই জন নায়েব তিলক ও তালক। দুই ভাইয়ের বাসস্থান এই এলাকায় গড়ে উঠলে একসময় এই মহল্লার নাম তিলক তালক নায়েবের পাড়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রয়োজনীয় শিল্প-চর্চার মাধ্যমে নান্দনিক সৃষ্টিই শিল্প। প্রয়োজন এবং নান্দনিক এই দুয়ের অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে মৌলিক কারুকার্য পরিস্ফুটিত হয়েছে লোকশিল্পে। যেমন হাঁড়িপাতিল, কলসি গ্রামীণ মানব সমাজে গৃহস্থালিকাজে খুবই প্রয়োজনীয়। তেমনি কাঁথা-বালিশ, পাটির খলই, টুকরি ইত্যাদিসহ কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, কাসাশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, দেওয়ালচিত্র, আলপনা ইত্যাদি আমাদের লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক কথায় বলা চলে মাটি, কাঠ, বাঁশ, বেত, রং, তুলি আমাদের লোকজ শিল্পের ঐতিহ্য, যার ব্যাপক লোকপ্রিয়তা আজও সমাজে বিদ্যমান।

১. মৃৎশিল্প

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় মৃৎশিল্পী রয়েছে। তারা বহু আকর্ষণীয় মাটির পাত্র তৈরি করে। সাধারণ মানুষের জীবনে মাটির পাত্রই দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রধান উপকরণ। তখন মৃৎশিল্পীদের যথেষ্ট কদর ছিল। এখন আর তেমনটি নেই, প্লাস্টিক ও অনান্য ধাতব সামগ্রীদখল করে নিয়েছে মাটির থালা-হাঁড়িপাতিলের স্থান। কালের ধারায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও মৃৎশিল্পের বহু আকর্ষণীয় জিনিসের কদর এখনও রয়েছে।

মাটির তৈরি পাত্র

এসময় হবিগঞ্জ জেলায় বহু মৃৎশিল্পী ছিল। মাটির জিনিস তৈরি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে অন্যান্য পেশায় চলে গেলেও আদি পেশায় নিয়োজিত শিল্পীর

www.pathagar.com

সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। রুদ্রপাল সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করে বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা ধরে রেখেছে। মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলস, গামলা, শরা, মূর্তি, খেলনা, ফুলের টবসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী তারা তৈরি করছে। নারী পুরুষ সবাই কর্মী। পুরুষরা মাঠ বা খেত থেকে বিশেষ ধরনের এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে বাড়িতে এনে রাখে। নারীরা পরবর্তী কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে।

উপজেলা		ইউপি	গ্রাম	কাজে নিয়োজিত পরিবার সংখ্যা
হবিগঞ্জ সদর	রাজিউরা	চানপুর		৬০
			আ. রহিমপুর	৫০
			সাধুর বাজার	৭০
			সুরাবই	১২
			লুকরা	১৬
চুনারুঘাট		সাটিয়াজুরী	সাটিয়াজুরী	২০
বাহুবল			দত্তপাড়া	১২
			মেটরি	৬০
মাধবপুর			ফটিয়ারা	১৬
			মটকা	১২
			হরিশ্যামা	৯০

মোট = ৪১৮

এই হিসেবে দেখা যায়, হবিগঞ্জ জেলায় প্রায় ৪১৮টি পরিবার মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত।

প্রধানসমন্বয়কারী ৪.১২.২০১২ তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় লোকড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামের মৃৎশিল্পী সুভাষ পালের বাড়িতে যান সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে :

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম?

মৃৎশিল্পী : সুভাষ পাল

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার বাবা-মায়ের নাম?

মৃৎশিল্পী : আমার বাবার নাম স্বর্গীয় সুনীল পাল ও মায়ের নাম স্বর্গীয়া সুমবতি পাল।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার বয়স কত?

মৃৎশিল্পী : আমার বয়স ৩৫ বছর।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কী করেন?

মৃৎশিল্পী : আমি একজন মৃৎশিল্পের কারিগর।

প্রধান সমন্বয়কারী : এ ব্যবসায় কীভাবে এলেন ?

মৃৎশিল্পী : আমার বাবা-দাদারা এ কাজ করতেন। জাত ব্যবসা হিসেবে কইরা যাইতেছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনারা এই মধ্যপাড়া গ্রামে কত পরিবার পেশায় জড়িত আছেন?

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পী : প্রায় ১৫/১৬ পরিবার এ কাজে জড়িত।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনাদের এই পেশাজীবীদের প্রধান কে?

মৃৎশিল্পী : প্রভুত পাল। বয়স ৫৫/৬০ বছর। এবং জিতেন্দ্র পাল, বয়স ৫০ বছর।

প্রধান সমন্বয়কারী : আমি দেখতে পেলাম পরিবারের নারীরাও কাজ করছে। সবাই কি এই কাজে নিয়োজিত?

মৃৎশিল্পী : সবাই মিলে এ কাজ করতে হয়, নইলে যে কাজ ওঠানো যাবে না। আর বিক্রির কাজটা আমাদেরকেই করতে হয়।

প্রধান সমন্বয়কারী : কীভাবে হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করেন বলেন তো?

মৃৎশিল্পী : আমরা পুরুষরা মাঠ থাইক্যা চিকন মাটি নিয়া আসি। এই মাটিকে গুঁড়া করে পানি দিয়া খাই করি। এই খাই মাটি নরম হইলে আথাই (ফ্রেম) দিয়া হাঁড়ি-পাতিল সহ যা করতে হয় তাই বানাই, তারপর রৌদ্র দিয়া শুকাই।

প্রধান সমন্বয়কারী : সব কাজ কি আপনি অর্থাৎ পুরুষরা করেন?

মৃৎশিল্পী : না। যখন সময় পাই নিজেরা করি নাইলে মাটি নরম করা, আথাই করা, রৌদ্রে দেওয়া মহিলারা করে। আমরাতো বিক্রি করতে হাটে বাজারে যাই।

প্রধান সমন্বয়কারী : তারপর কী করেন বলুন?

মৃৎশিল্পী : তারপর শুকনা জিনিসগুলিরে বাটায় দিয়া পুড়ি।

প্রধান সমন্বয়কারী : কী দিয়া আগুনে পোড়ান?

মৃৎশিল্পী : এই দেখেন বাটা, আগুনে পোড়া হচ্ছে মাল। বন (খের) বা লাকড়ি দিয়া আগুন করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : কী কী মাল আপনারা তৈরি করেন ?

মৃৎশিল্পী : সব ধরনের তৈয়ার করি। এই ধরেন হাঁড়ি, পাতিল, কলস, শরা, তাগার, গামলা। বাচ্চাদের জন্য খেলনার গরু, ঘোড়া, হাতি, হাঁস, ব্যাংক ইত্যাদি তৈরি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : কোথায় বিক্রি করেন?

মৃৎশিল্পী : বাজারে, মেলায়, গ্রামেগঞ্জেও ফেরি দেই।

প্রধান সমন্বয়কারী : জিনিসের চাহিদা কেমন এই মাটির দ্রব্যে ?

মৃৎশিল্পী : না। বেশি নাই, কোনো মতে কষ্ট করে চলছি। আর কোন বিদ্যা তো জানি না। তাই এ কাজই করতে হবে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনাকে ধন্যবাদ।

মৃৎশিল্পী : আপনারেও। আদাব।

২. নকশি কাঁথা

পল্লি লোক শিল্পের এই নকশি কাঁথা মহিলাদের শিল্প। এই কাঁথায় আমাদের পল্লি জীবনের নানাবিধ ঘটনার ছবি বুনন হয়ে থাকে। নকশি কাঁথার কাঁচা মাল হিসেবে পুরনো শাড়ির বিভিন্ন রঙের পাড় থেকে সুতা সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত সুতার রং মিলিয়ে একাধিক সুতাকে একত্র করে হাতের তালু দিয়ে পাঁকিয়ে মোটা সুতা বানানো হয়। তারপর ঐ সকল সুতাকে হাতের চার আঙ্গুলে জড়িয়ে পাঁকিয়ে কিছায় বা ডিবির

www.pathagar.com

মধ্যে রাখা হয়। সুই মরিচা থেকে মুক্ত রাখার জন্য নারিকেল তেলে ভিজিয়ে রাখা হয়।

মহিলারা কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে কাঁথার সুতা সংগ্রহ করে নকশি কাঁথা সেলাই করে থাকে। সূক্ষ্ম নকশার কাজ ধীর গতিতে করতে হয় বলে একটি নকশি কাঁথা তৈরি করতে অনেক দিন লেগে যায়। অনেকে এ কাজকে একটি তপস্যা মনে করেন। মহিলারা এই কাঁথা সেলাইকালে পান, সুপারি, হাতপাখা নিয়ে বসে। কাজের ফাঁকে পান মুখে দেয়, গরমে ক্লান্ত হলে হাতপাখার বাতাস করে। নকশি কাঁথায় তারা সাধারণত ফুল, মাছ, লতা, পাতা, ধানের শীষ, চাঁদ, তারা, হাতি, ঘোড়া আবার কখনো দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করে থাকে। শীত নিবারণের জন্য লেপ-কম্বলের বিকল্প হিসেবে নিম্ন আয়ের মানুষ নকশাবিহীন কাঁথা তৈরি করে থাকে। তারা কয়েকটি পুরাতন শাড়িকে জোড়া দিয়ে লম্বালম্বি করে সেলাই করে নেয়। নিজে ব্যবহারের জন্য কষ্টসাধ্য নকশা তৈরি করে না। এগুলো নকশা কাঁথা হিসেবে গণ্য নয়।

হবিগঞ্জে নানা ধরনের নকশি কাঁথা তৈরি হতে দেখা যায়। লেপকাঁথা, বালিশে ঢাকনা কাঁথা, বিছানার কভার কাঁথা, নকশি থলে, রুমাল, দস্তরখানা, জায়নামাজ, গিলাফ ইত্যাদি। হবিগঞ্জের মনিপুরি সম্প্রদায় বিভিন্ন নকশি কাঁথা তৈরি করে থাকে নিজের ব্যবহার এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশে। শৌখিন ও অভিজাত পরিবারেরা এই নকশি কাঁথাগুলো সংগ্রহ করে। মনিপুরি ও খাসিয়া সম্প্রদায় হবিগঞ্জ জেলার অন্যতম নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, বাহুবল উপজেলায় তাদের বসবাস। তাদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানে ও পোশাকেআষাকে নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এবং সেসঙ্গে ধরে রেখেছে নকশি কাঁথার মতো একটি মূলবান লোকশিল্পকে।

০৩.১১.১১ তারিখে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে কর্মরত মনোয়ারা বেগমের (৪৫) স্বামী জহুর মিয়া, শেখের মহল্লা, শিক্ষাগত যোগ্যতা তৃতীয় শ্রেণি, বানিয়াচং হবিগঞ্জের সঙ্গে নকশি কাঁথা নিয়ে আলাপ হয়। তিনি জানান যে, গ্রাম অঞ্চলের নারীরা শখের বশে এসব কাঁথা সুন্দর করে তৈরি করতেন। নকশা করা একটি কাঁথা সেলাই করতে ১৫/২০ দিন সময় লাগে। প্রায় বাড়িতেই নিজেদের ব্যবহারের জন্য নকশি কাঁথা তৈরি করে ট্রাঙ্কে ভরে রাখে। এক রঙের শাড়ি কিনে কিনারের ডুরা কেটে বিভিন্ন মাপের কাঁথা রং-বেরঙের সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ১০-১৫ বছর ধরে এই কাঁথা বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনরা দেশে এলে উপহার হিসেবে অনেকেই দিয়ে থাকেন। অনেক পরিবারে বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকে নকশি করা জায়নামাজ তৈরি করা হয়, যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমন খুব কম পরিবারই আছে যেখানে ঘরের ট্রাঙ্ক বা সেলফে নকশি করা কাঁথা নেই। সাধারণত এসব কাঁথা শীত মৌসুমেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. হাতপাখা

লোকশিল্পে হাতপাখা অন্যতম। গ্রাম বাংলায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে কৃত্রিম বাতাস পাওয়ার জন্য নারী-পুরুষ সকলেই হাতপাখা ব্যবহার করে আসছে। ব্যবহারিক জীবনে হাতপাখা গরমে শান্তি দিলেও হাতপাখার মাধ্যমে পরিবারের আভিজাত্য ও নারীদের রুচিবোধের পরিচয় মেলে। হাতপাখা বাঁশ ও বেত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এক লোকশিল্প।

www.pathagar.com

হবিগঞ্জ অঞ্চলে সাধারণত তিন রকম হাতপাখার প্রচলন দেখা যায়। তালপাতার পাখা, কাপড়ের তৈরি পাখা ও বাঁশের তৈরি পাখা। এই পাখাগুলোকে 'বিছুন' বলা হয়।

তালপাতার পাখা

হবিগঞ্জের উজান এলাকায় মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলাগুলো থেকে তালগাছের পাতা (ডাগ্গা) সংগ্রহ করে শুকিয়ে ডাঁটা হাতুল হিসেবে ও পাতা পাখারুপে ব্যবহার করা হয়। এখানে হাতুল ও পাখা একত্রে যুক্ত রয়েছে। ভিন্নভাবে সংযোগ করার সুযোগ নেই। তালপাতার পাখা অন্যান্য পাখার মতো চারদিক ঘুরিয়ে বাতাস করার সুযোগ নেই, কেবল দুপাশে বাতাস করা যায়। ব্যক্তিগত ব্যবহার ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে তালপাতার পাখা বিক্রি হয়ে থাকে।

কাপড়ের তৈরি পাখা

হবিগঞ্জের সব উপজেলায় কাপড়ের তৈরি পাখার কমবেশি ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই পাখা মহিলারাই তৈরি করে। কাপড়ের তৈরি পাখায় সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকে। তাই পাখার ধরন বিভিন্ন প্রকারের হয়। বাঁশের একটি রিঙের মধ্যে রঙিন কাপড় দিয়ে রিংটি মুড়িয়ে দেওয়ার পর জমিনে বা মধ্যস্থলে রঙিন সুতা বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়। সুই-সুতা দিয়ে এই জমিনে মাছ, পশু, পাখি, ফুল, ঘর ইত্যাদির নকশা বুনন হয়। গ্রামের মহিলারা নিজ নিজ পছন্দ মতো 'ভালবাসা', 'সুখে থাক', 'ভুলো না', 'যাও পাখি' ইত্যাদি বাক্য ছোট ছোট সেলাই করে পাখায় সুতো দিয়ে লিখে দেয়। তারপর একটি লম্বা বাঁশের অথবা কাঁঠের কাঠিকে দুই ফালি করে পাখাটি সুতো দিয়ে কাঠির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এই কাঠির নিচে বাঁশের একটি চুংগি ঢোকানো হয়। চুংগিটি হাতে ধরে ঘোরালেই পাখা ঘুরে ঘুরে বাতাস দিতে থাকে। সকল হাত পাখার মধ্যে কাপড়ের তৈরি পাখাই গ্রামের আভিজাত পরিবার ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশি ব্যবহৃত হয়।

বাঁশের তৈরি পাখা

বাঁশ থেকে বেত উঠিয়ে বেতগুলোকে বিভিন্ন রং দিয়ে রঙিন করে রোদে শুকোনো হয়। তারপর এই রঙিন বেতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পাটি বাইনের মতো পাখা বাইন করা হয়। মাপ অনুযায়ী হয়ে গেলে তার মুড়ি চিকন বাঁশের ফলি অথবা জালিবেত দ্বারা মুড়িয়ে সুই-সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়। বাঁশের একটি লম্বা কাঠির দুই ফালির মধ্যে আটকে সুই-সুতার দ্বারা শক্ত করে বেঁধে দিয়ে নিচে বাঁশের চুঙি লাগিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে একটি বাঁশের পাখা মহিলারা তৈরি করে। বাঁশের তৈরি পাখা রং করা। রং ছাড়া দুই ধরনের রয়েছে।

সকল প্রকারের হাতপাখা বিশেষত মহিলারাই তৈরি করে থাকে। নিজ পরিবারের প্রয়োজনে ব্যবহার ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে পাখা তৈরি হয়। গ্রামের হাট বাজার ও মেলায় হাতপাখা বিক্রি হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম মৌসুমে হাতপাখা শহর ও গ্রামের প্রসিদ্ধ রাস্তায় ফেরি দিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায়। হাত পাখা নারীদের তৈরি হলেও এখন পুরুষরা বাণিজ্যিকভাবে তৈরির জন্য নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে করছে। তারা পাইকারি-খুচরা দুভাবে হাতপাখা বিক্রি করে থাকে।

www.pathagar.com

৪. বাঁশ-বেত শিল্প

বাঁশ গ্রামীণ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। জীবনের প্রতিটি কাজেই বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। তাই হবিগঞ্জের উজান অঞ্চলের বাড়িগুলোতে বাঁশের চাষ হতে দেখা যায়। প্রায় বাড়িতেই বাঁশের ঝাড় রয়েছে। হবিগঞ্জের শাহজির বাজার (সুতাং নদীরপাড়) বাঁশ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রসিদ্ধ হাট। এখান থেকে ভাটি অঞ্চলের উপজেলাগুলোতে বাঁশ সরবরাহ হয়ে থাকে। ঘর তৈরি ও মেরামতসহ গ্রামীণ জনজীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরিতে বাঁশ ও বেতের ব্যবহার অনস্বীকার্য। চুনারুঘাট, মাধবপুর, মিরপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, বুল্লা বাজার প্রভৃতি স্থানে হাটের দিন বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্য কেনাবেচা হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনীয় কুলা, ডালা, খাঁচা, উরা, ধুচনি, চালনি, চাঙ্গারি, ডুলি বা টাইল, চাচ বা ধারী ইত্যাদি বিক্রি হয়। এসব জিনিস ভাটি এলাকার বাজারের দোকানিরা উজান এলাকা থেকে এনে বিক্রি করে থাকে। হবিগঞ্জ শহরের বাজারের একটি অংশের নাম ছিল 'ধারীহাটা'। এখানে নির্দিষ্ট হাটবারে বাঁশ ও বেতের তৈরি সমস্ত জিনিসপত্র কেনাবেচা হতো। ধারীহাটা নামকরণে বোঝা যায়, হবিগঞ্জের মানুষ বাঁশশিল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

হবিগঞ্জের সুতাং নদীর তীরে বাঁশের বাজার

১৫.১০.১১ তারিখে সাংবাদিক ও হাওর গবেষক আখলাক হুসেন খান খেলুর সঙ্গে বাঁশ ও বেত নিয়ে আলোচনা। এক সময় এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ছিল বাঁশের বাগান। কুটিরশিল্পের অন্যতম কাঁচামাল ও গৃহায়নের উপকরণ হিসেবে বাঁশের ও বেতের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। বাঁশের বাগানে বিভিন্ন ফলদ উদ্ভিদ ও মানুষের বাসস্থান গড়ে তোলার কারণে এখন আগের মতো বাঁশ আর নেই। প্রায় ৮৫ ভাগ বাঁশ ও বাঁশঝাড় উজাড় হয়েছে। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখনও কয়েক লাখ টাকার বাঁশ বিক্রি হয়ে থাকে। প্রতিটি বাঁশের মূল্য ১৮০ থেকে ২৫০ টাকা। বানিয়াচং অঞ্চলে যেসব বাঁশ উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদিত হয় তার মধ্যে রয়েছে বাড়া বাশঁ, জাত বাড়া, তেলি বাড়া, খিল বাড়া, ঝাই, বাখাল, মৃত্তিকা ইত্যাদি। কিছু কিছু এলাকায় মুলি বাঁশও জন্মে। গ্রাম অঞ্চলে বড়োয়া বাঁশের কদর সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলের বাঁশ ও বেত বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানির চাহিদা ছিল। গৃহস্থালি কাজের জিনিসপত্র, ঘর তৈরি, দালানকোটা নির্মাণে ও মৌসুমি সবজি চাষে, বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরির কাজে বাঁশের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। মাছ শিকারের জন্য এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বাঁশের তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করা হতো।

www.pathagar.com

অনেক পরিবার বাণিজ্যিকভাবে এই পেশার সঙ্গে জড়িত থেকে সংসারের ব্যয়ভার বহন করছে। বাঁশ দিয়ে কুলা-ডালা, ঢোল, টুকরি, ধুছুন, গরুর মুখোশ, চালুন, উড়া, ধান রাখার টাইল ইত্যাদি তৈরি করে এলাকার চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও বিক্রি করে থাকে। বাঁশ ও বেত দিয়ে কুটিরশিল্পের প্রায় ২৪-২৫ জাতের জিনিস তৈরি করতে পারতেন। শেখের মহল্লার আবদুস শহিদ খাঁ, মোহরের পাড়ার জিলাই উল্লা, আদমখানীর ফুলমিয়া, শরিফখানীর তৈয়ব আলী প্রমুখ। শের আলীর ছেলে বাঁশ দিয়ে তীর ধনুক তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাঁশ দিয়ে পলো বানানোর জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন আদমখানীর ফুল মিয়া, মোহরের পাড়ার উছমান উল্লা প্রমুখ। বাঁশ দিয়ে মাছ শিকারের জন্য কুচা যার মাথায় লোহার পাতের সুই, গুতিয়া বা জুতিয়া যার মুখে নাকা যোক্ত কালাই, আত্তর যার মুখে তিন ও সাত ঢালা নাকা যুক্ত কালাই সংযুক্ত থাকত। হলঙ্গা, পলো, ছাই, পাঠি, উছ, হলঙ্গা গুই ইত্যাদি উপকরণ যা এখনও খুবই জনপ্রিয়। এসব মাছ ধরার হাতিয়ার বুরুজপাড়া ও নোয়াপাড়া গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই তৈরি করা হতো। তারা মাছ মারার এই হাতিয়ার অন্যান্য জেলে সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রি করত।

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি হতো দেশীয় অস্ত্র—টেটা, জগর, বল্লম, তীর, হামুইল্লা পাজুন ইত্যাদি। এতে ব্যবহার করা হতো লোহার চুকি জাতীয় এক প্রকার ধরনের জিনিস যা প্রায় প্রতিটি ঘরেই রাখার রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। এলাকায় প্রায় বাড়িতেই ঘরের চাং বা মাচান মুলি জাতীয় বাঁশ দিয়ে কারুকাজ করে নির্মাণ করার রেওয়াজ বহুকাল ধরে চালু আছে। বিয়েতে বর ও কনে বহনের জন্য বাঁশের তৈরি পালকি, চৌদল খুবই জনপ্রিয় ছিল। জিনিসপত্র বহনের জন্য সাধারণ দিনমজুর বাঁশের তৈরি বেউ ব্যবহার করত, যা শত বছর ধরে জনপ্রিয়। একসময় হামুলিয়া পাজুন যার মুখে লোহার তৈরি ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা সুই সংযুক্ত থাকে তা ঘরে ঘরে রাখার রেওয়াজ ছিল। বাড়া বাঁশ থেকে বেত তুলে গরুর নিচে দেওয়ার গুচাইছ, দড়ি, গরু-মহিষের গাড়ি ও গাড়ির জোয়াল হল্লা পাজুন ইত্যাদি এ এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

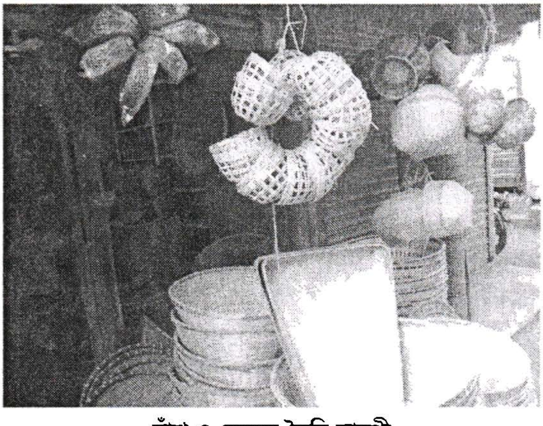

বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী

www.pathagar.com

বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র রাখার টাক, বসার জন্য মোড়া, পাখির খাঁচা, গরমের পাখা ও ছাতা শখের বশে কেউ কেউ তৈরি করতেন। বাঁশ দিয়ে কৃষিকাজে পানি সেচের জন্য সেওতি বা হেউত, কোন জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হতো। গরু ও মহিষের গাড়ি, জোয়াল, হল্লা তৈরিতে বাঁশের কোনো বিকল্প ছিল না। বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলে এবং দক্ষ লোকবল দেখে উপজেলা প্রশাসন আশির দশকের দিকে বর্তমান শহিদ মিনার এলাকায় কুটিরশিল্প তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। প্রতিষ্ঠানে তৈরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে চালুন, ধুছুন, খলই, হাতপাখা ছিল খুবই জনপ্রিয়। বেশ কয়েক বছর চলার পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদিত বাঁশ ও শ্রমিকের চাহিদা বিবেচনা করে কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানটি চালু করলে বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। এ এলাকার মুক্তা দিয়ে তৈরি পাটি ও চাটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। গ্রামে অনেক পরিবার বেত দিয়ে পাটি, চাটি, জায়নামাজের আধি, নিজেদের প্রয়োজনে অনেক পরিবারের লোকজন অবসর সময়ে তা তৈরি করত। এই মুক্তা এখন আর বেশি চোখে পড়ে না। খালি বাড়ি ও জঙ্গলে জন্মিত জালি বেত যা এক ধরনের ব্যবসায়ীরা সিলেট নিয়ে রপ্তানি করত। এই পেশার সঙ্গে উপজেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের কারিগর রয়েছে। তারা নিজেদের প্রয়োজনেই এ সব তৈরি করে থাকেন।

হবিগঞ্জে বিশেষত মাধবপুর, চুনারুঘাট ও বাহুবল উপজেলার পাহাড়ি এলাকার টিলাগুলোতে একরকম বেতগাছ দেখতে পাওয়া যায়, যা অনেকটা জালি বেতের মতো। গায়ে ও পাতায় ধারালো সরু কাঁটা রয়েছে। পের (জঙ্গলা) বেঁধে জন্মায়, স্থানীয় লোকেরা 'কাঁটা বেত' বা 'গল্লা বেত' বলে থাকে। এই বেত দিয়ে একধরনের অল্প আয়তনের পাটি তৈরি করে পাহাড় পাদদেশের লোকেরা ব্যবহার করে এবং আঁধি (জায়নামাজ) তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। টিলাগুলো আবাদ হয়ে লেবু-আনারসের বাগান হওয়ায় এই বেত আগের মতো আর দেখা যায় না। তবে মূরর্তা বা মুক্তার বেত দিয়ে চাটি, আঁধি, পাটি তৈরি করে তারা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে কাদা-মাটিতে বিশেষত বাড়ির আঙ্গিনায়, ঘাটলায় মুক্তার চাষ ভালো হয়।

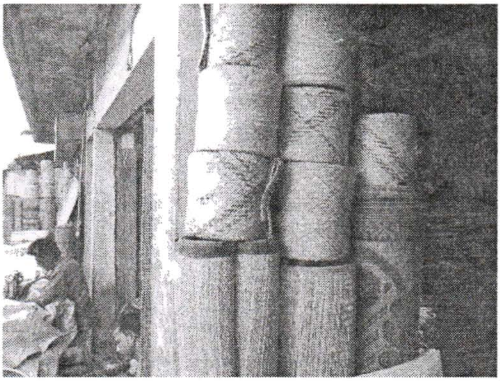

বেতের তৈরি ছাটি ও পাটি

www.pathagar.com

৫.শঙ্খশিল্প

হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চল খ্যাত বানিয়াচং আজমিরীগঞ্জ ও লাখাই এবং নবীগঞ্জ উপজেলার খাল-বিল-হাওর-নদীতে শঙ্ক (স্থানীয় ভাষায় শামুক) ও ঝিনুক পাওয়া যায়। এই শামুক ও ঝিনুক হাঁসের প্রিয় খাদ্য। মাছশিকারীরা বাঁশের তৈরি 'ছাই' যন্ত্রের ভেতরে শামুক ও ঝিনুক ভেঙ্গে পানিতে ডুবিয়ে রেখে মাছ শিকার করে। এই শামুক ও ঝিনুকে এক সময় মুক্তা পাওয়া যেত। বানিয়াচঙের জাতুকর্ণপাড়া, পাড়াগাঁও, প্রথমরেখ ও আজমিরীগঞ্জের গ্রামের লোকজন এর সন্ধান করে স্থানীয় কবিরাজদের কাছে বিক্রি করত। কবিরাজরা এর মিশ্রণে ওষুধ তৈরি করত। ফলে শঙ্খশিল্পে পরিণত হয়। ইদানীং শঙ্খশিল্প হারিয়ে গেছে।

তথ্য : আবু সালেহ্ আহমদ, বানিয়াচং।

৬. নকশি শিকা

নকশি শিকা আমাদের লোক ঐতিহ্যেরই অংশ, লোক সংস্কৃতিভুক্ত একটি লোকশিল্প। এই শিল্প নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় একটি গৃহস্থলি উপকরণ। আকার ঘর ও রান্নাঘরে নকশি শিকা শোভা পায়। নিত্য ব্যবহার্য শিশি, বোতল, হাঁড়িপাতিল ও অন্যান্য জিনিসপত্র যত্নসহকারে রাখা হয়। নকশি শিকা শুধু সৌন্দর্যই প্রদর্শন করে না, পরিবারের রুচিবোধ ও লোককর্মের প্রশংসা করে, বিশেষত মহিলাদের। গ্রামের অভিজাত পরিবারের ঘরে সুতা ও পাটের তৈরি শিকা হবিগঞ্জে ব্যবহার হতে দেখা যায়। ঘরের দেয়াল বা বেড়া (দাপ্‌না) ঘেষে একটি বাঁশের লাঠির দুপ্রান্তে শিকা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। শিখায় রাখা হয় নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কৌটা, হাড়ি পাতিল ইত্যাদি। শিকাগুলো বিভিন্ন ধরনের। পাটের গোছা পাঁকিয়ে পাঁকিয়ে রঙিন সুতায় প্যাঁচানো চারটি লড়ি জড়ানোর উপর ভাগ এক করে গিট দিয়ে বাঁধা, নিচে চাক বা বেড়ি। চাক বা বেড়িকে পাট ও রঙিন সুতা দিয়ে জড়ানো। বাঁশের চাকটিকে সহজে চেনা যায় না। এক বাড়িতে দেখা গেল এরূপ ছয়টি নকশি শিকা বাঁশের লাঠিতে ঝুলানো আছে। অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, দুটি নকশি শিকা ঘরের দেয়ালে দুপাশে পেরেক দিয়ে আটকানো। শিকা দুটিতে ফুলের (কাগজের ফুল) টব বসানো রয়েছে। খুবই সুন্দর কারুকার্যে শিকা দুটি তৈরি। নকশা প্রায় একই, কেবল রঙের বদল করা হয়েছে। শিকাগুলো পাট ও সুতারই তৈরি, তবে এই পাটের গোছাকে পাঁক দিয়ে খুবই সরু করা হয়েছে। এতে হাতের ভাঙা কাচের চুরির টুকরো ভেতর দিয়ে পাঠ ভরে স্থানে স্থানে রঙিন সুতা প্যাঁচ দিয়ে আবার ওপরের অংশে মেয়েদের মতো চুলের বেণি বেঁধে তৈরি করা হয়েছে। বাঙালি লোকশিল্প জগতে গর্বিত অধ্যায়গুলো আজ লুপ্তপ্রায়। ঐতিহ্যে নিদর্শন নকশি শিকা আজও স্মৃতি হয়ে জাগ্রত বাঙালির মনিকোঠায়।

৭. টাইল বা ডুলি

ধান সংরক্ষণের জন্য বাঁশের বেতের তৈরি টাইলের ব্যবহার প্রতিটি গ্রামে রয়েছে। প্রায় চার থেকে দশ মণ ধান মজুদ রাখার জন্য টাইল তৈরি হয়। বাখাল বাঁশের বেত উঠিয়ে পাতলা করে ছিলে সেই বেত আড়াআড়ি বাইন করে টাইল তৈরি করা হয়। টাইলে

www.pathagar.com

কৃষক মাটি ও গোবর মিশিয়ে ভালো করে ভেতর দিক লেপে রৌদ্রে শুকিয়ে নেয়। তারপর এতে ধান মজুদ করে। বীজ ধান সংরক্ষণকালে কৃষক ধানভর্তি টাইলের মুখ বন (খের) দ্বারা বন্ধ করে মাটি ও গোবর দিয়ে লেপ দিয়ে দেয়। এতে বীজধান ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়। এই শিল্পটির ব্যবহার গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে হয়ে আসছে।

বাঁশের তৈরি মাছ ধরার নানা যন্ত্র হবিগঞ্জের ভাটি এলাকায় বিশেষত আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, নবীগঞ্জ, বাহুবল উপজেলায় পাওয়া যায়। হাওর জলাশয়ে মাছ শিকারের জন্য এসব যন্ত্র ব্যবহার হয়ে আসছে। যন্ত্রগুলো– কুঁচা, হলঙ্গা, ফলা, চাঁই, পাটি, উইচ, লুঙ্গা, ফিলুইন ইত্যাদি। যে সকল উপজেলার গ্রামে জেলে সম্প্রদায় রয়েছে সেই গ্রামের হাট-বাজারে মাছ ধরার যন্ত্র বেশি বিক্রি হয়। গ্রামের জেলে সম্প্রদায় নিজ ব্যবহার ও বাণিজ্যিকভাবে ঐসব যন্ত্র তৈরি করে থাকে। তাছাড়া কৃষিকাজের জন্য মই, পাজুন, জোয়াল, টুকরি, খাঁচা ও গরুর মুখের হুফা তৈরি হয়ে থাকে। বাড়ির গৃহস্থালির জন্য বাঁশ বেতের তৈরি চালুন, ধুছুইন, ডালা, খলই, গছনা, ধুচনি, হাতপাখা ইত্যাদি তৈরি হয় এবং বাজারে বিক্রি হয়। এসব লোকপ্রিয় বাঁশশিল্প আমাদের লোকজ ঐতিহ্য।

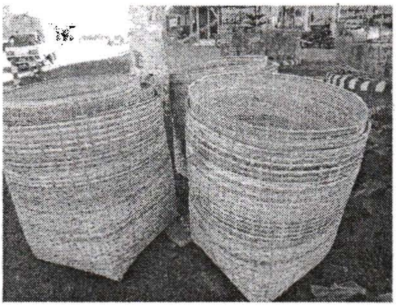

বাঁশের তৈরি টাইল ও টুকড়ি

৮. আলপনা

বিয়ে শাদি বা যে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে অনেকে আলপনা করে থাকেন। গ্রাম অঞ্চলের ৯৫ ভাগ কাঁচা ঘর। ঘরের মেঝে লেপার সময় লাল মাটি দিয়ে আলপনা করা হতো। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পূজা ব্রত, পার্বণের সময় চুন বা চালের গুঁড়া, করাতের গুঁড়া দিয়ে আলপনা করা হতো। ইদানীং রং দিয়েও বিভিন্ন বাড়িতে আলপনা করা হয়। এইসব আলপনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নিখিল আচার্য্য (৫০) জাদুকর্ণ পাড়া, শেখ মুক্তার মিয়া (২৮) শেখের মহল্লা, হিমাংশু পাল (৩০) চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া, রুমন (২৯) চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া, সেতু মিয়া (২৪) সাগর দিঘির দক্ষিণ পাড়, আজিদ মিয়া (২৬), যাত্রাপাশা, আবদুল মুমিন (২৭), মজলিশপুর প্রমুখ। তাঁরা বিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন ডিজাইনে গেইট তৈরি, কুঞ্জ তৈরি, মালা তৈরি করে সুনাম অর্জন করছেন। আগে ঘরের সামনে কাঠের মধ্যে ইদানীং পাকা ঘরের ভিটায় কিংবা ওপরের বহিরাংশে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আলপনা করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৯. দেয়াল চিত্র

দেয়াল চিত্রে যাই আঁকা হয়ে থাকে তার মূলে 'মঙ্গল চিত্র'। মাটির দেয়ালঘর হবিগঞ্জের বিশেষত মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ সদরের গ্রামগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। চা বাগানের বস্তি এলাকায় ও তৎসংলগ্ন গ্রামে মাটির দেয়ালের ঘর বেশি। এসব ঘরের দেয়ালে আল্পনা আঁকা আছে আবার ভিন্ন ভিন্ন ছবিও আঁকা রয়েছে। দেয়ালে আঁকা চিত্রগুলো 'স্বস্তিকা চিহ্ন', সহজভাবে বোঝানো হলো 'মঙ্গল চিহ্ন'। মাধবপুর, চুনারুঘাট, বাহুবলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও হিন্দু বাড়িতে দেয়াল চিত্র দেখা গেল। বাড়ির দেয়ালে মাটি দিয়ে আঁকা চিত্র রয়েছে স্থায়ীভাবে। যেন মাটিতে খোদাই করা চিত্র। এ চিত্রগুলো পশুরাজ সিংহের, পদ্ম ফুলের, বৃহৎআকারের আলপনা। কোনো কোনো বাড়ির দেয়ালে রং দিয়ে চিত্র আঁকা। এই আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে দেব-দেবীর ছবি, পশু, ফল, ফুল এর ছবি বেশি। আলপনা ও ত্রিশপ ছবিও রয়েছে। বাড়ির বাসিন্দারা জানান, এ সবই মঙ্গলের জন্য। কেউ বলেন, বিপদআপদ থেকে রক্ষার জন্য, কেউ বলেন সৌন্দর্যচর্চার অভিপ্রায়ে এ দেয়াল চিত্রগুলো আঁকা হয়েছে। আরো দেখা গেল অধিকাংশ বাড়িতেই ঘরের মূল দরজার সামনে মাটিতে আলপনা আঁকা রয়েছে। সৌন্দর্য ও মঙ্গল কামনায় লোকশিল্পের এই মাধ্যম আলপনা ও দেওয়াল চিত্র লোকমনে স্থান করে নিয়েছে।

১০. নৌশিল্প

মঞ্জু সূত্রধর (৪৭), পিতা : কামিনী সূত্রধর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণি, শরিফখানী, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, জানান যে, নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে বানিয়াচং অধিপতির কাছে খাজনার পরিবর্তে ৪৮ খানা কুশা নৌকা দেবার কথা হয়। সে অনুসারে তিনি ৪৮ খানা বৃহৎ কুশা নৌকা দেন। সে সময় থেকেই বানিয়াচঙে প্রচুর জারুল, নিম, রঙ্গিন গাছ পাওয়া যেত যা নৌকা তৈরির জন্য উপযুক্ত ছিল। তখন থেকেই বানিয়াচঙে বেশ কয়েকটি পরিবার বংশ পরম্পরায় শরীফখানী, মোহরের পাড়া, যাদুকর্ণ পাড়া, সেনপাড়া, নোয়াপাড়া গ্রামে তাদের আবাস স্থল গড়ে তুলেছিল। স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে সূত্রধর বা মিস্ত্রী বলা হয়। তারা এ অঞ্চলের নৌকা তৈরি, মেরামত, ঘর, আসবাবপত্র তৈরি করে দিতেন। মিস্ত্রিরা ডিঙ্গি, কোষা, বারকি, ধানের নৌকার পাশাপশি নকশা করে পানসি, সারেঙ্গি, গস্তী নৌকাও তৈরি করতে পারতেন। সারেঙ্গি নৌকা, ধানের নৌকা তৈরি করে তারা প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন সুকেশ সূত্রধর– পিতা : সুকুমার সূত্রধর; সুনামনি সূত্রধর, পিতা : কামিনী সূত্রধর; অনিল সূত্রধর, পিতা : বজেন্দ্র সূত্রধর, শরিফখানী; জ্যোতিষ সূত্রধর, পিতা : যুগেন্দ্র সূত্রধর, সুনাধন সূত্রধর, মোহরের পাড়া; প্রিয়লাল সূত্রধর, পভূল্য সূত্রধর, সেনপাড়া। চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া গ্রামের করিম মিস্ত্রি প্রায় ৫০ বছর আগে ৩০-৪০ হাত লম্বা কয়েকটি শাড়ি নৌকা/দৌড়ের নৌকা বানিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জানা যায়, ৬০-৭০ দশকে ২০-২৫টি নৌকা বানিয়ে গ্রাম অঞ্চলে নিয়মিত ভাড়া দিতেন। হলিমপুরের রঙ্গিলা মিয়া (৭০) এখনও বারকি নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, ঘাসের নৌকা বানানোর ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছেন।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

মোঙ্গলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালির সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদই হবিগঞ্জের লোকপোষাক পরিচ্ছদ। খুব একটা ভিন্নতা নেই। তবে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, কৃষিজীবী-বুদ্ধিজীবী শ্রেণির পোশাক-পরিচ্ছদে বয়সভিত্তিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা ও পদমর্যাদা পোশাক-পরিচ্ছদে প্রতিফলিত হয়।

পনের শতকের গোড়ার দিকে দেখা যেত শিশুবেলা থেকে প্রায় ১৫ বছর পর্যন্ত মানুষেরা নেংটি ও গামছা পরত । তবে পাক-ভারত আমলে ধুতি পরার প্রচলন ছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ধুতি পরত। তবে কিছু কিছু লোক লুঙ্গিও পরত। দেশ বিভাগের পর পর মুসলমনেরা ধুতি, বার্মিজ লুঙ্গি ও নিমা, জোলা শার্ট, খাটো পাঞ্জাবি পরতে শুরু করে। ঐ সময় উচ্চ শ্রেণির লোকেরা ইংলিশ হাফ প্যান্ট ও ফুল প্যান্ট পরা শুরু করে। হাই স্কুলের অনেক হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে যেত। মহিলারা ধুতিকে দ্বিখণ্ডিত করে পরত। পরবর্তী সময়ে একইভাবে শাড়িকে দু ভাগ করে পরত। ১৭৫০ শতকের দিকে ঘাগড়ি ও ব্লাউজ পরত। দেশ বিভাগের পর সোলোয়ার কামিজ ও শাড়ি পরা শুরু হয়।

হিন্দুদের মধ্যে ধুতির ব্যবহার রয়েছে। তবে তাদের আচার অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণে ধুতির ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। ধুতি আড়াই হাত বহরের এবং ১১/১২ হাত লম্বায় মিহি সুতায় তৈরি অর্থাৎ উন্নত মানের। গ্রামেগঞ্জে শ্রমজীবী লোকেরা আড়াই হাত বহরের পাঁচহাতি লুঙ্গি পরে থাকে।

আগে থান কাপড়ের লুঙ্গি ছিল। এখন বিভিন্ন মিলের লুঙ্গি, বাবুর হাটের লুঙ্গি, টাঙ্গাইলের লুঙ্গি, মাস্টার কালামিয়া লুঙ্গি নামে দামি লুঙ্গি পাওয়া যায়। জেলে-কৃষকরা কম দামের লুঙ্গি পরে। গেঞ্জি বা পুরাতন হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে কাজ করার সময় গামছা কোমরে অথবা মাথায় বেঁধে রাখে। গামছা সকল শ্রেণির লোকেরা ব্যবহার করে। গামছা বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন দামের রয়েছে।

নারীদের প্রিয় পোশাক শাড়ির কদর সকল মহলেই রয়েছে। শাড়ির রকম, মান ভেদে মূল্য নির্ধারিত হয়। অনেক উন্নত মানের শাড়ি শহরের অভিজাত মহিলারা বিবাহ বা অনুষ্ঠান পার্বণে পরে থাকে। গ্রামীণ জনপদের নারীরা কমদাম শাড়ি নিত্য ব্যবহার করে। দশ হাতি বলে উল্লেখ্য থাকলেও ব্যবহারে ও ধোয়ায় শাড়ির দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে নয় হাতি হয়। গ্রামের গরিব মেয়েরা ছায়া বা ব্লাউজ ব্যবহার করে বলে মোটা সুতার শাড়ি পছন্দ করে। ছাপাশাড়ি বধূরা পরত আর বৃদ্ধ বা বয়স্করা মিলের এক রঙের শাড়ি পরত। আটপৌরে পোশাক হিসেবে শাড়িকে দুভাগ করে পরতে তারা পছন্দ করত বেশি। এখনও টুকরো শাড়ির ব্যবহার রয়েছে। কোথাও বেড়াতে গেলে অপেক্ষাকৃত ভালো শাড়ি পরে থাকে।

বর্তমানে হবিগঞ্জের গ্রাম ও শহরের পুরুষের পোশাক হলো- লুঙ্গি, ধুতি, গেঞ্জি,

www.pathagar.com

শার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, কোর্ট, স্যুট, সাফারি, ফতুয়া, গামছা, জাঙ্গি, মোজা, টুপি, চাদর, জাম্পার, জ্যাকেট, মাফলার, শাল ইত্যাদি। মেয়েদের পোশাক হলো শাড়ি, ব্লাউজ, ছায়া, সেলোয়ার-কামিজ, ওড়না, সেমিজ, চাদর, ম্যাক্সি, বোরকা ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আচকান-পায়জামা, পুরুষ অভিজাত মুসলমানরা পরত-এখন বিশেষ অনুষ্ঠানে কদচিৎ এ পোশাকে বয়স্ক দুএক জনকে দেখা যায়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এসেছে। শর্ট শার্ট শর্ট প্যান্ট শর্ট পাঞ্জাবি, শর্ট কামিজ, শর্ট ব্লাউজ ইত্যাদি পোশাক চোখে পড়ে। বাসাবাড়িতে মেয়েরা শাড়ির পরিবর্তে ম্যাক্সি পদে। কর্মজীবীরা মধ্যবিত্ত মহিলার সেলোয়ার-কামিজকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বেশ কিছু মুসলমান নারী ধর্মীয় অনুশাসনে পর্দা প্রথা মেনে চলে। তারা ঘরের বাইরে বোরকা ব্যবহার করে। শহরের ও গ্রামের নারীদের ব্যবহৃত বোরকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে শহরে শরীর অথাৎ মাথা থেকে পায়ের গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ঢাকা মুখ মন্ডলে পৃথক ওড়না অথবা পাতলা ঢাকনা ব্যবহার করা হয়। গ্রামের সাধারণ নারীদের ব্যবহৃত বোরকা মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত লম্বা।

হবিগঞ্জে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে মনিপুরী ও খাসিয়াদের বাস রয়েছে। তাদের ধর্মাচার, লোকাচার ও ভাষা ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদেও রয়েছে ভিন্নতা। সম্মিলিতভাবে তারা উপজাতি নামে পরিচিত। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, সংস্কারের পৃথক ঐতিহ্য থাকলেও হবিগঞ্জবাসী হিসেবে সুন্দর একটি সমন্বয় সাধন করে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করছে। বাড়িতে কাজকর্মের সময় তাদের নিজেদের হাতে বোনা পোশাক ব্যবহার করে। তাদের পোশাকে জাঁকজমক বা বিলাসিতা দেখা যায় না। হাট-বাজারে, স্কুল-কলেজ ও শহরে যাতায়াতের সময় তারা শার্ট, প্যান্ট, শাড়ি পরে। বর্তমান সময়ে তাদের অনেকেই আধুনিক সবরকম পোশাক পরে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

১. মাজারের গান

(সংগৃহীত)

১.

তোমরা দেখবে যদি আসর
শুনবে যদি আসর
ফতে গাজীর মাজার দেখ, শাহজিবাজারে।
শাহজালালের সঙ্গী-সাথি বাবা ফতে গাজী
মাজার দেখ শাহজিবাজারে

শাহজালালের সঙ্গী-সাথি বাবা ফতে গাজী
ধ্যানে মশগুল হইলে না আসি
গহীন এমনও জঙ্গলে
ফতে গাজীর মাজার দেখ শাহজিবাজারে ॥

(আরে) দমে দমে জপলেন নাম, মহানই আল্লার
(আরো) আল্লা বিনে নিদান কালে, কে আছে আপনার
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছিল নিত্য সাথি তাঁর
পুরানো সেই মসজিদ আছে তোমরা দেখবে যদি আসর
বাবা গাজীর মাজার দেখ শাহজিবাজারে ॥

(আরে) বাঘ ভাল্লুক বন্য জন্তু জানোয়ার
নিশিতে জানায় আসিয়া সালাম হাজারও বার
(আরো) টিলায় টিলায় বসছে মেলা
দেখতে কত সুন্দররে, আহা কত সুন্দররে
দেখবে যদি আসরে পতে গাজীর মাজার আছে শাহজিবাজারে।

২.

বাবা কুতুবুল আউলিয়া
মুড়ার বন্দে আছ তুমি আছর ছাপিয়া॥

www.pathagar.com

খোদার প্রেমে আশেক হইয়া
রাজ্যপাঠ ত্যাগ করিয়া
ছয়ত্রিশ বৎসর ছিলে তুমি বৃক্ষেতে ঝুলিয়া
বাবা কুতুবুল আউলিয়া...

অলিকুলের শিরমণি গুপ্ত ধনের ও ধনী তুমি
মারফতের মূলখণি পেয়েছি খুঁজিয়া
বাবা কুতুবুল...

সৈয়দ আহম্মদ ধর্মনাশা ঐ চরণ করি ভরসাও
পুরাও হে মনের আশা রাখ চরণে বান্দিয়া
বাবা কুতুবুল আউলিয়া...

৩.

হবিগঞ্জের মুড়ার বন্দে
বাবার লাগি সবাই কান্দে...(২)
গাছগাছালি ছায়া হয়ে, জনম, জনম আছে দাঁড়ায়ে
কুতুবুল আউলিয়ার মাজারেতে,
হাজার কাঙ্গাল মানত করে...॥

চেনা-অচেনা পাখির গানে
খোয়াই নদীর কলতানে...
আল্লাহু, আল্লাহু, করে সবে
কুতুবুল আউলিয়ার মাজারেতে...॥

শুনো, শুনো ও ভাই আজব এক ঘটনা
বাবার দরগায় পূর্বে, পইচমে শুয়ে একজনা...
মাটির নিচে শুয়ে বাবায়...
সবই দেখে রে...॥

৪.

তোমার মাজার আন্ধাইর করিয়া, জ্বলে না তো বাতি
বাবা শাহসুলতান ফতেহ গাজী
শাহজালালের সঙ্গী সাথি, শাহসুলতান হইয়া সাথি রে
তরফ বিজয় করলা আসি সঙ্গী নিয়ে বারো সাথিরে।

www.pathagar.com

সবাই গেলা নিজ নিজ পথে, বাবা রইলেন রঘুনন্দন পাহাড়েতে
ধ্যানে মশগুল হইলেন হেথায়, আল্লার রাহে ইয়া রাজুন।
মাস গেল বছর গেল গেল কত যুগ,
আবাদ করিলা জঙ্গলা, মানুষ করল ভোগ।
করিয়া উঠিল সেথায় কত কারিগরি
বাবা শাহসুলতান ফতেহ গাজী॥
কেরামতি-তেলেসমতি, কী করিব বর্ণনা
বিজলি বাতি স্টেশন হইল পাশে একখানা।
সাহেব সুবা সবাই আইল সময় মতো সুইস দিল,
সবই আছে আগের মতো
জ্বলল না তো বাতি শাহসুলতান ফতেহ গাজী।

৫.

সৈয়দ ইলিয়াস বাবা কুতুবুল আউলিয়া
মুড়ারবন্দ গ্রামে বাবা বসত ও করিলা
তরফ রাজ্য ধন্য হইল তাহারে পাইয়া ॥

খোয়াই নদীর গ্রাম তীরে বাম তীরে ঘর গাঁও গ্রামধরে
নির্জন ঘরে বাবা জনমও লইলা।
শত শত বৃক্ষরাজি বাবারও মাজারে
শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ করিয়াছে আহারে
পাপী-তাপী আসে যত মনে দুঃখ লইয়া
সবে পায় শান্তি মাজারও জিয়ারত করিয়া।
দলে দলে আসে ভক্ত নদীতে ওজু করিয়া
পোয়া মাইল লম্বা দরগা দেখে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥

২. উরি গান

'উরি' একটি আঞ্চলিক শব্দ; হোলি শব্দের অপভ্রংশ। হোলি–উলি–উরি। এরই উৎসবের নাম হোলি উৎসব বা দোল উৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে এ উৎসব হয়ে থাকে। বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয় বলে এ উৎসবকে 'বসন্ত উৎসব' বলা হয়। বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে বহিরাঙ্গন উৎসবে নারী-পুরুষ যোগদান করে। তারা রং খেলায় মেতে ওঠে। কেউ কেউ রঙের বিকল্প হিসেবে কাদা ছোড়া ছুড়িও শুরু করে দেয়।

বসন্ত উৎসবের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদিম মানুষের সভ্যতা বিকাশের স্তরে স্তরে প্রতিবছর বসন্ত সমাগমে এই উৎসব হচ্ছে, নব সৃষ্টির এই আবেগ-অনুভূতি, যৌন-ক্ষুধার এই তীব্র আবেদন। বর্তমানে মানুষ সভ্য হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য প্রভাবে-সংস্কারবশে ভুলতে পারে না বসন্তের এই উৎসব। নব-সৃষ্টির এই আনন্দ-মুখর অনুভূতি; বসন্তকালে এই যে নৃত্যগীতিময় রঙিন উৎসব তারই সূক্ষ্ম রূপায়ণ আর

www.pathagar.com

সংগীত 'উরি গান' নামে পরিচিত। উরি গান প্রেমসংগীত হলেও সেটা আদতে কাম-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত'[১]।

প্রাচীন পার্বণ হোলি বা বসন্ত উৎসবে উরি গান গাওয়া হয়। 'একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলনলীলা হোলি উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এর ইহার ফলে হোলি উৎসব দোল উৎসবে পরিণত হয়'[২]। উরি গানকে এলাকায় 'সাক্ষাত গান' বলে থাকে। এ রাধা-কৃষ্ণের গান, এ গান দোলপূর্ণিমা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সরস্বতীপূজা পর্যন্ত উরি গান গাওয়া হতো। বসন্তগানকে বিচ্ছেদ গান বলা হতো। প্রতি সন্ধ্যার পর অথবা রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উরিগান গাওয়া হতো গ্রামের হিন্দুবাড়িতে। এখন আর তেমনটি নেই। তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দোল পূর্ণিমার সময় এখন উরি গান বা বসন্তগানের প্রচলন রয়েছে। এ গানে ঢোল বা খোলই প্রধান বাদ্যযন্ত্র; সে সঙে হারমোনিয়াম, বেহালা, ছোট করতাল, মন্দিরা ব্যবহার হয়ে থাকে। উরি গান দলবেঁধে গাওয়া হয়।

হবিগঞ্জের বিশেষত ভাটি এলাকার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে দোল পূর্ণিমার উৎসব হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে সমবয়সী পুরুষ-নারীরা একে অন্যের গায়ে আবির বা রং ছিটিয়ে আনন্দ করে। রাতে উরি গানের আসর বসে। হিন্দু সমাজে উরি গানের ব্যাপক প্রচলনএখনও আছে। কয়েকজন উরি গান শিল্পী ও গীতিকারের সঙ্গে নিবন্ধকারের সাক্ষাৎ হয়েছে। একজনের সঙ্গে আলাপচারিতা উপস্থাপন করা হলো–

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম : ঠিকানা বলুন ?

শিল্পী অজয় : আমার নাম ডা. অজয় মিহির দাশ, পিতা : মৃত সুকময় দাশ, গ্রাম-সন্তুষপুর, ডাকঘর : মানপুর, উপজেলা : লাখাই, জেলা : হবিগঞ্জ।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি গান ছাড়া কী করেন ?

শিল্পী অজয় : আমি একজন পল্লি চিকিৎসক ও বাউল শিল্পী।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার ওস্তাদ কে?

শিল্পী অজয় : আমার দাদা, তিনিও একজন শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে এই গান শিখেছি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার বয়স কত? কতদিন গান করছেন এবং আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?

শিল্পী অজয় : বর্তমান বয়স চল্লিশের ওপরে। আমি ছাত্রাবস্থায়ই গান বাজনার সঙ্গে জড়িত হই। এখন আমি নিয়মিত বাউল শিল্পী। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কি উরি গান করেন ? এ গান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

শিল্পী অজয় : প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দোল পূর্ণিমাতে উরি গান হয়ে থাকে। আমরা মূলত চার-পাঁচ জন শিল্পী যন্ত্রসহ বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়ে উরি-গান গাইতে যাই। সঙ্গে থাকে আরো অনেক লোক। তারা গানে দোহার দিয়ে থাকে। সর্বমোট ২৫/৩০ জনের একটি বড় দল আমাদের।

প্রধান সমন্বয়কারী : উরি গান পরিবেশন পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বলুন।

শিল্পী অজয় : আয়োজকের বাড়িতে গিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে শ্রী রাধা-কৃষ্ণের যুগল ছবিকে আসন হিসেবে অনুষ্ঠানের স্থান দিয়ে মাল্যদানে ভূষিত করি পরম শ্রদ্ধাভরে, তারপর

www.pathagar.com

গুরুদেবের ওপর বন্দনা গাই। তারপর এক এক করে উরি গান, বসন্ত গান প্রায় সারারাতই গেয়ে থাকি। গানের শেষে বাড়িওয়ালা সবাইকে প্রসাদ রূপে খিচুরি-ডালনা, পায়েস, মিষ্টান্ন খেতে দেন।

প্রধান সমন্বয়কারী : কোন গীতিকারের উরি গান আপনারা বেশি গেয়ে থাকেন ?

শিল্পী অজয় : আমার রচিত গানই আমি দল বেঁধে বেশি গেয়ে থাকি। তাছাড়া অনেক মহাজন আছেন তাঁদের ভালোভালো গান আমরা গেয়ে থাকি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আচ্ছা, এতলোক নিয়ে গানের দল বাঁধার কারণ কী?

শিল্পী অজয় : মূল গায়ক যখন গানের পদ-বাক্য গেয়ে যান, তখন অন্যরা সমবেত কণ্ঠে অপর পদ গেয়ে দোহার দেন। কণ্ঠ বেশি হলে গান সুন্দর ও উচ্চ স্বরে গীত হয়। অনেক বাড়িতে মাইক ছাড়া উরি গাইতে হয়। তাছাড়া গানের সঙ্গে নাচও হয়। তাই বেশি লোকের দরকার হয়।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনাকে ধন্যবাদ।

শিল্পী অজয় : আপনাকেও ধন্যবাদ। আদাব।

০৪.১১.২০১৩ তারিখে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়।

রচনা : ডা. অজয় মিহির দাস

প্রাণ সখি রে বল আর কত দিন থাকব রে তাঁর আশায়।
আসিল সুখের বসন্ত, না আসিল শ্যামরায় ॥ ঐ
আসবে বলে প্রাণ কান্ত গনার দিন ফুরায়।
মথুরাতে গিয়া বন্ধে, কারে লইয়া প্রেম খেলায় ॥ ঐ

ছিলাম কী আর হইলাম কী পিরিতির জ্বালায়
মনজানে আর আমি জানি–
জানে না তো শ্যাম কালায় ॥ ঐ

জন্মেজমের মনের আশা থাকতে না পুরায়
প্রেমের জ্বালা বুকে লইয়া
নিবো একদিন শেষ বিদায় ॥ ঐ

বসন্তগান

১

রচনা : ডা. অজয় মিহির দাস

শীত গেল বসন্ত আইল গো সখি
কালিয়া নাই ঘরে।
উদাসিনী বানাইল আমি অবলা রে গো ॥ ঐ

www.pathagar.com

নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু রে সখি, দয়া নাই অন্তরে
মন বসে না গৃহকাজে, প্রাণ ছটফট করে গো ॥
কোকিলার ডাক শুনিয়া গো সখি পরান বিদরে।
বন্ধুর জ্বালা বুকে লইয়া ঘুরি দ্বারে, দ্বারে গো ॥ ঐ

থাকতে যদি না পাই তারে গো সখি
চাই না আর মরিলে।
ডা. জনেল জয় কয় বাঁচব না আর–
না দেখলে বন্ধুরে গো ॥

২

আইল রে বসন্তকাল
দুঃখনীর দুঃখের কপাল
প্রাণকান্ত বিনে প্রাণ তো
আর বাঁচে না।
দুরন্ত বসন্ত আর যে আসে না
তারে, কইরো গো মানা
প্রাণকান্ত বিনে প্রাণ তো
আর বাঁচে না।

সূত্র : ১. মো. সিরাজ উদ্দিন কাসিমপুরী : বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩, পৃ.১৩২
২. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : উজান গাঙ্গ বাইয়া, পৃ. ১৯

৩. কর্ম সংগীত

গানের দেশ বাংলাদেশ। পল্লি বাংলার মানুষ পল্লি গানই অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেরণা ও অনুভূতি প্রকাশে আপনা থেকেই গান সাথি হয়।

কর্মের সাথি গানই 'কর্ম সংগীত'। এ সংগীতে শ্রম লাঘব হয়, সেসঙে কর্মে প্রেরণা জোগায় এবং কর্মে মনোনিয়োগ করে কর্ম সম্প্রদানে সহায়তা করে। এই জাতীয় কর্ম পল্লিভিত্তিক ও শহরকেন্দ্রিক রয়েছে। যেমন পল্লি গ্রামে কৃষিকর্মে বিশেষত পাটখেত নিড়ানিতে, ক্ষেতে ধান কাটার সময় সমবেতভাবে চাষিরা গান গেয়ে থাকে। আবার নদী বা হাওর-বিলে নৌকা বাওয়াকালে বৈঠার দ্বারা গানের তাল রক্ষা বিশেষত নৌকা বাইচ কালে বৈঠার দ্বারা সমবেতভাবে তাল রক্ষা করে বাওয়া অথবা পাহাড়-জঙ্গলে কাঠুড়িয়ারা কাটা গাছ অপসরণে বা স্তুপ আকারে সমবেতভাবে গান করে থাকে। এগুলো পল্লিকেন্দ্রিক কর্ম সংগীত। আবার শহরে দালান গৃহের ছাদ পেটানো কালে অথবা ডিপ টিউবয়েলের পাইপ বসানের সময় শ্রমিকরা সমবেতভাবে গান করে। এগুলো শহরকেন্দ্রিক কর্ম সংগীত। ছাড়া শহর-গঞ্জের শ্রমিকদের কোনো গুরুভার কর্ম সম্পাদনকালে ছড়া জাতীয় কিছু গান টানা সুরে দ্রুত তালে গীত হতে দেখা যায়। এতে

www.pathagar.com

শ্রমিকরা শক্তি সঞ্চার করে দ্রুততার সঙ্গে কর্ম সম্পাদনে উৎসাহ পায়। এই ছড়াগুলোও কর্মসংগীতভুক্ত। যেমন-

সাবাস ভাই, জোর চাই-
মার ঠেলা, মার টান, হেঁইও॥
আল্লার জোরে, নবীর জোরে
মার টান, মার ঠেলা, হেঁইও ॥
জোয়ান ভাই, জোর চাই–
মার ঠেলা, গেছে গা, হেঁইও ॥

ট্রাকে বড় বড় গাছ বোঝাইকালে শ্রমিকরা সুর তোলে–, একজন 'সাবাস ভাই' বলে, অন্যরা সমাবেত কণ্ঠে 'জোর চাই' বলে শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

এভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্মে শ্রমিকরা ছড়াগান গেয়ে ভারীকর্ম সম্পাদন করে। কথার গাথুনি বা কাব্য ভাব কিংবা রসগত আবেদন বিচারে বিজ্ঞ মহলে এর মূল্যায়ন যাই হোক, শ্রমিকের কর্ম প্রেরণা ও শ্রম লাঘবে সহায়ক বলে এই ছড়াগুলো কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত যা লোকসংগীতের উপাদান। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি।

১. বউ ফালাইয়া কেউ বিদেশে যাইও না
বাড়ির পিছে খাইল্যা চুরা ঘটাইবে দুর্ঘটনা
বউ ফালাইয়া কেউ বিদেশে যাইও না ॥

২. হেইয়া বল, হেইয়া বল
সাহস, শক্তি, বুদ্ধি, বল
হেইয়া বল, হেইয়া বল ...

৩. নানায় কেনে নাতিন বিয়া করে
দেইখা আইলাম বটগাছের তলে
এখন মরে তখন মরে তবু নানা কানাকানি করে
নানা কেনে নাতিন বিয়া করে ॥

হাস্য রসাত্মক হেয়ালি ছড়াগান গেয়ে মনের আনন্দে দশ জনের একটি শ্রমিক দলকে ডিপ টিউবয়েল কাজে রশি টেনে শ্রমসাধ্য কাজ করতে দেখা যায়। তারা উল্লিখিত ছড়াগানগুলো গেয়ে গেয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করেছিল। ছড়া গানগুলো এ সময়ই তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। শ্রমিক সুজন মিয়া, সাং : প্রতাপপুর, থানা : বানিয়াচং; শামীম মিয়া, সাং: জলসুখা ও জুলহাজ উদ্দিন, সাং : কাকাইলচেও, থানা : আজমিরীগঞ্জ এদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায় শ্রমসাধ্য কাজ করার সময় এ ধরনের কর্মসংগীত গাওয়া ছাড়া শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় না। এবং একতালে সমবেতভাবে শক্তি প্রয়োগ না করলে পাইপগুলো ওঠানো যায় না। তাই মনের আনন্দে কাজটি করতে তারা এই ছড়াগান গেয়ে থাকে।

শ্রমিকদের ছাদ পেটানো সংগীত সাধারণত আঞ্চলিক কোনো জনপ্রিয় প্রেম সংগীত অথবা অন্যান্য সংগীতের কিছু কিছু অংশ জোড়া দিয়ে তারা গেয়ে থাকে। একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করা ও শ্রম লাঘব করার জন্য বড় আয়তনের ছাদ পেটানোর সময় সুকণ্ঠের

www.pathagar.com

নবীন কোনো শিল্পীকে বায়না করে আনতে শোনা গেছে। বর্তমানে ক্যাসেট বাজিয়ে ছাদ পেটাতে দেখা যায়। নবীগঞ্জ উপজেলায় এক বাড়ির দালানের ছাদ পেটানোর সময় সমবেত কণ্ঠে একটি গান গাইতে শোনা যায়। গানটির ভাব সংগীত হিসেবে গীতিকার রচনা করলেও শ্রমিকরা প্রেম সংগীত বিবেচনায় রস উপভোগের জন্য আনন্দে গেয়েছে, আর তালে তালে ছাদ পিটিয়েছে।

গীতিকার : মুহিত সরকার
উচাইল, হবিগঞ্জ।
রাইত আইও পরানের বন্ধু দিনে করি মানা
তোমার লাইগা সাজাই রাখমু ফুলের বিছানা ॥

১. মনি মুক্ত হীরা কাঞ্চন দিমু সোনা দানা
পরশের বিছানায় বইয়া খাইবায় তুমি খানা ॥

২. চুপে চুপে আইয়ো বন্ধু কেউ যেন দেখে না
তুমি জানবায় আমি জানমু অন্যে যে জানেনা ॥

৩. তোমার লাগি সারা অঙ্গ হইয়াছে দেওয়ানা,
পরান পাখি ছটফট করে বুঝাইলে বুঝে না ॥

৪. মনের আগুন দাউ দাউ করে নিভাইলে নিভে না,
মোহিত শাহ কই সইব কত এই জ্বালা মন্ত্রণা ॥

নাইল্যা পাতা নড়েচড়ে, বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।
বৈশাখ মাসে নাইল্যা ফালাইলাম আলি
জৈষ্ঠ্য মাসে নাইল্যা না বাঁচলে আগা ভাইঙ্গা মরে
বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।
আষাঢ় মাসেতে ভাই নাইল্যা দিল ফাল
ঘন ঘন মেঘ পাইয়া ভইরা উঠল খাল
আগাত নতুন পাতা বাতাসে হেলে
নিচেতে মরা পাতা অজরে ঝরে
বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।
শাওন মাসে ভাই রে নাইল্যার ভরা যৌবন
নাইল্যা পাতার গিরো খাইলে বুঝতায় কেমন।
এই সময় নাইল্যার ভাই, গাছে ফুল ধরে তোমার কথা মনে পড়ে।
ভাদ্র মাসেতে ভাই নাইল্যার বয়স হইল পুরা
কাইটা দাগ দেও খালে বানাইয়া ভুরা।
নইলে বিপদ হইব এই কষ্ট পরিশ্রমে
তোমার কথা মনে পড়ে।

হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে পাট চাষ করা হয়। পাট চাষের কষ্টকর কাজ আগাছা নিড়ানি ও পাট কেটে পানিতে বিছানো এবং পঁচা আঁশ ধুঁয়ে শুকানো এই সকল কাজে চাষীদের শ্রম লাঘবের জন্য সমবেত কণ্ঠে মাঠে গান গাইতে শোনা যায়।

www.pathagar.com

৪. মেয়েলি গীত

মেয়েলিগীত একান্তভাবে আঞ্চলিক। অঞ্চল ভেদে মেয়েলি গীতে সেই অঞ্চলের নারীর জীবন যাপনের, প্রেম ভালোবাসার, সুখ-দুঃখের নিখুঁত চিত্র, ভাব, ভাষা ও উপমার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই মেয়েলিগীত সেই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় সংগীত।

হবিগঞ্জ মূলত সিলেট অঞ্চলেরই একটি অংশ। ১৯৮৪ সালে মহকুমাটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী নয়, মূল স্রোত 'সিলেটি সংস্কৃতি'র ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাঙালি লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে; শিকড়চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সিলেট অঞ্চলের বিশেষত সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ এই জেলা দুটির মধ্যে ভাষা ও ক্রিয়া আচরণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই মিল মেয়েলি গীতেও বিদ্যমান। তেমনি মিল রয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণার সঙ্গে। ভাটি বাংলারই সাংস্কৃতিক বন্ধনে সৃষ্টি হয়েছিল 'ময়মনসিংহ গীতিকা'।

হিন্দু-মুসলমান এই বাঙালি সম্প্রদায়ের মাঙ্গলিক পর্ব-পার্বণের আচার-ক্রিয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বাভাবিক ধারায় স্বতর্স্ফূতভাবে রচিত ও গীত হচ্ছে মেয়েলি গীত। এছাড়া পল্লিনারীর প্রেম-বিরহ, পারিবারিক গঞ্জনা, প্রতিকার, বেদনা, প্রাপ্তির আনন্দ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে গীত হয় মেয়েলিগীত। এই মেয়েলিগীত কবে রচিত হয়েছিল এর জবাবে বলা যায় 'ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়া মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে'[১] বলে ধারণা রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, মেয়েলিগীতের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। 'পল্লি বধূরা নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এবং প্রতিদিনের জীবন কাহিনি সবার কাছে তুলে ধরেন তাদের মেয়েলি গীতে, আর এটাই এ গানের বৈশিষ্ট্য'[২]। গীতগুলোর রচয়িতা গ্রামের সাধারণ নারীরাই। হবিগঞ্জেও মেয়েলিগীতের প্রচলন রয়েছে।

মেয়েলিগীত অভিজাত শ্রেণির গীত নয়। সাধারণত অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মহিলারা মেয়েলিগীত শুরু করেছিল, এখন কিছু শিক্ষিত মহিলার সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তবে উচ্চশিক্ষিতরা আজও এই গীতে জড়িত নয়। গ্রামের মধ্যবয়সী নারীরা মেয়েলিগীতে বিশেষ উদ্যোগী হলেও দুএক জন বয়স্কা সধবা বা বিধবা মহিলাকে দেখা যায় গীতের পদ ও সুর স্মরণ করিয়ে দিতে। এতে বোঝা যায়, বয়সে তাঁরা খুবই পারদর্শী ছিলেন। সম্পর্কে তাঁরা দাদু, নানি, মাসি কিংবা পিসি। কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়া শুনে শুনে এই গীত মুখে মুখে প্রচারিত ও গীত হয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, হয় না মঞ্চ বা সাজ-সজ্জার। যে যে পোশাকে আছে, সেভাবেই যোগ দেয় গীতে। একজন মহিলা গীত শুরু করলে অন্যরা দোহার দিয়ে থাকে, এভাবেই সমবেত কণ্ঠে মেয়েলিগীত বাড়ির উঠোনে বা আঙিনায় অথবা ঘরের একটি বড় কক্ষে পাটি বা মাদুর বিছিয়ে গোল হয়ে বসে গীত গেয়ে থাকে। এখানে গীত শোনার জন্য বিভিন্ন বয়সের নারীরা ভিড় জমায়, গীত শুনে আনন্দ উপভোগ করে, আবার দুঃখে কাতর হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আবার কখনো ঠাট্টা-মশকরায় মেতে ওঠে। গীত শেষে আয়োজক তার সাধ্যমতো আপ্যায়নে পান মিষ্টি খাইয়ে থাকে।

মেয়েলিগীতের মধ্যে বিয়ের গীত সর্বোৎকৃষ্ট হলেও মেয়েলিগীতে পরিধি বেশি,

www.pathagar.com

আর বিয়ের গীতের পরিধি কম। তবে মেয়েলি গীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এক অনুষ্ঠানের গীত অন্য অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় না। অনুষ্ঠান ভিত্তিকগীত নির্ধারিত রয়েছে- যেমন গর্ভদান, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাসন, অধিবাস, উপনয়ন ইত্যাদি হিন্দু পরিবারের আচারের মেয়েলিগীতগুলো। মোটকথা হিন্দুদের ব্রত-আচার বেশি, তাই এ সম্প্রদায়ের মেয়েলিগীতও বেশি। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে গীতগুলো যেমন বিজয়ার গান, ভাই ফোঁটার গান ও বিভিন্ন ব্রত গান নারীরাই বেশি গেয়ে থাকে। এছাড়া আরো বিবিধ বিষয়ে মেয়েলিগীত রয়েছে। যেমন– ধামাইল গান ও নৃত্য। নানাবিধ ব্রত আচার ও বিবাহ উপলক্ষে ধামাইর গান ও নৃত্য হয়ে থাকে। বিশেষ ভঙ্গিতে গীতের তালে তালে হাততালি দিয়ে বৃত্তাকারে সমবেত কণ্ঠে গান ও নাচ হয়। সংখ্যায় ছয় থেকে দশ জন নারী ধামাইল নাচ-গানে অংশ নেয়। ধামাইল গীতে যেহেতু নারীরাই অংশ নেয় এবং তারাই নেচে গেয়ে পরিবেশন করে এবং নারীরাই উপভোগ করে তাই ধামাইল মেয়েলিগীতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া 'বারমাসি' গান বাংলা সাহিত্যের লোকসংগীতের ধারার একটি অনবদ্য সংযোজন, 'শ্রুতিনন্দন মোহন ভঙ্গিমা অর্থাৎ আঙ্গিকের ও অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের জন্য এ গান বিশেষ অভিনিবেশের দাবি রাখে'[৩]। পল্লি অঞ্চলের লম্বা গীত 'বারমাসি' মেয়েলি গীতেরই অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু সাধারণত স্বামীহারা নারী সারাটি বছর ধরে কতযে বেদনায় প্রতিটি মাস যাপন করছে তারই করুণ চিত্র, দুঃখের গভীর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বারমাসি গীতে। হবিগঞ্জের লোককবিদের রচিত ছয়টি বারমাসির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছয়টি বারমাসি 'সিলেটের বারমাসির গান'[৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তারমধ্যে হবিগঞ্জের সূফি দার্শনিক কবি শেখ ভানুর 'মনের বারমাসি'টি মেয়েলিগীতভুক্ত, যেহেতু এ বারমাসির বর্ণনায় নারী হৃদয়ের আর্তিই ফুটে উঠেছে–

> 'না আছে খেওয়ার নাউ, না দেখি খেওয়ানি।
> কূলেতে বসিয়া ডাকি আমি অভাগিনী।
> মরিয়া ভাসিমু আমি যমুনারই জলে
> বন্ধুহীন অভাগিনী দেখিবে সকলে।'[৫]

এখানে নারী অর্থে অভাগিনী উল্লেখ আছে, পুরুষ হলে অভাগা হতো। নারীর মনের আকুতি বাসনা পরিস্ফুটিত হয়েছে, এখানে এক্ষেত্রে নারীর মন মরমি স্তরের দিকে ধাবিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনটি হয়। যেহেতু নারীরা ঘর-সংসার, ধর্ম-কর্ম সকল স্তরেই বিচরণ করে।

৫. বিয়ের গীত

মেয়েলিগীতের মধ্যে বিয়ের গীতের গুরুত্ব, প্রচলন ও জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। মেয়েলি গীত ও বিয়ের গীত বাংলাদেশের লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মেয়েলিগীতের পরিধি ব্যাপক আর বিয়ের গীতের পরিধি নির্ধারিত, কেবল বিয়েকে উপলক্ষ করে। এর কোনো লিখিত রূপ নেই, বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতা কমবেশি আঞ্চলিকভাবে গান গাইতে শোনা যায়। আগে এমনটি অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক গান শোনা না গেলেও বিয়ে উপলক্ষে গীত হতো প্রচুর, অনেকটা অত্যাবশক গণ্য করে। নারী

www.pathagar.com

মহলের এ দাবি পুরুষ মহল উপেক্ষা করতে পারেন না। বিয়ের গীতের মধ্যে কোনো রকম কৃত্রিমতা নেই। নেই কোনো বাদ্যযন্ত্র, মঞ্চ বা সাজ-সজ্জা, স্বাভাবিকভাবেই নারীরা মনের আনন্দে বিয়ের গীতে অংশ নেয় সমবেত কণ্ঠে গীত হতে দেখা যায়। আমাদের পল্লি গ্রামে বিয়েবাড়িতে আজো বিয়ের গীতের যথেষ্ট কদর ও প্রচলন রয়েছে। গায়ন পদ্ধতি মেয়েলিগীতের মতোই, মধ্যবয়সী নারীরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে বসে বিয়েরগীত গায়। হাতপাখা, পানের বাটা সঙ্গে থাকে। জিরিয়ে নিয়ে একাধারে অনেক গান তারা করে থাকে, এতে গ্রামের সকল বয়সের নারীরা ভিড় করে।

মেয়েলিগীতের মধ্যে বিয়ের গীতই সর্বোৎকৃষ্ট। বাঙালি মুসলিম বিয়ে থেকে হিন্দু বিয়ের আচার বিস্তারও জটিল। বৈদিক ও লৌকিক উভয় আচার দ্বারা হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন হয়। বৈদিক আচারে ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার আর লৌকিক আচারে বিয়ের গীত, ধামাইল গান ইত্যাদি রয়েছে। মুসলিম বিয়েতে গান গাওয়ার আবশ্যকীয়তা আছে বলে জানা নেই, তবু বিয়ের আনন্দের সঙ্গে গীত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

বিয়ের গীত অভিজাত শ্রেণির গীত নয়। পারিবারিকভাবে বিয়ের আয়োজন হলে বর-কনে উভয় পক্ষই স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ের আয়োজন করে থাকে। মহিলারা বিয়ের গীতের আয়োজন করে। আজকাল অভিজাত শ্রেণির বিয়ে অনুষ্ঠানে বিশেষত 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠানে দামি শিল্পীদের সম্মানী দিয়ে আনা হয়। বিয়ের গীতে নারীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলতা এক্ষেত্রে তা হারিয়ে কৃত্রিম রূপ রসে ভরে তোলে। আর যারা শিল্পী সংগ্রহ করতে পারে না তারা বিয়ের গীতের ক্যাসেট বাজিয়ে কৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করে। লোকসংগীতের লোকগীতির সার্বজনীনতা কেবল গ্রামীণ জনপদের বিয়ের গীতেই নিহিত আছে।

আমাদের বাঙালি সমাজ জীবনে 'হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত সিলেটের বিয়ের গীত পর্যালোচনা করলে এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্যও ধরা পরে। হিন্দু সমাজের বিয়ের পর্ব কেন্দ্রিক গানগুলোর মধ্যে রয়েছে জল ভরা, ঘটক আগমন, বর সাজানো, কনে সাজানো, হলুদকোটা, কামানো, নান্দিমুখ, বর-বরণ, বধূ-বরণ, বাসর হোম, দধি মঙ্গল, বাসি বিবাহ, কন্যা বিদায়, যাত্রা মঙ্গল, দ্বিরাগমন ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক গীত। একইভাবে মুসলমান সমাজের গানগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্বন্ধ, কন্যা সাজানো, বর সাজানো, গায়ে হলুদ, মেহেদি লাগানো, নওশার আগমন, কাবিন, বিয়ে পড়ানো, কন্যাদান, দামান-কন্যা বিদায়, বরের শ্বশুর বাড়ি যাত্রা, নাইওর, দজগন ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক গীত'[১]। হবিগঞ্জ সিলেটেরই অংশ। তাই এখানেও হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে উপলক্ষে আর্থিক সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে কমবেশি ঐ সকল পর্বের বিয়ের গীত হয়ে থাকে।

সূত্র : ১. জফির সেতু (সম্পাদিত), সিলেটের বিয়ের গীত : শুদ্ধস্বর, কাঁটাবন-ঢাকা (২০১৩), পৃ. ১৫।

বিয়ের গান-১

হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুরবাড়ি।
রঙ্গিলা দামান্দের মায়েরে ডাকইন মাইনি আইছইন ঘরা॥
উঠে বিদায় দাও গো মাইঝি যাইতাম শ্বশুরবাড়ি।

www.pathagar.com

যাইতাম শ্বশুরবাড়ি॥
হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুরবাড়ি।
যাও যাও রে বাবা যাও শ্বশুরবাড়ি।
যাও শ্বশুরবাড়ি॥

বেইলের দুইফর উদয় হইলে আইয়ো মাইজির কোলে।
হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুরবাড়ি॥
রঙ্গিনা দামান্দের চাচারে ডাকইন চাচানি আইছইন ঘরে।
উঠে বিদায় দাওগো চাচা যাইতাম শ্বশুরবাড়ি॥
হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুরবাড়ি।
যাও যাও ওরে বাবা যাও শ্বশুরবাড়ি॥
বেইলের দুইফর উদয় হইলে আইয়ো চাচার কোলে
আইয়ো চাচার কোলে॥

হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুড়বাড়ি।
রঙ্গিলা দামান্দের মামুরে ডাকইন মামুনি আইছইন ঘরে॥
উঠে বিদায় দাও গো মামু যাইতাম শ্বশুর বাড়ি।
যাও যাও ওরে বাবা যাও শ্বশুর বাড়ি॥
বেইলের দুইফর শেষ করিয়া আইয়ো মামুর কোলে।
হবিগঞ্জের রঙ্গিলা দামান যাইতা শ্বশুরবাড়ি॥

বিয়ের গান-২

সাগর দিঘির পারে ময়নার মাওফা সাজে
পালকি সাজে গিড়ুয়াল বান্ধে
ময়নায় বিদায় মাঙ্গে রে॥
পালকি সাজে গিড়ুয়াল বান্ধে
ময়নায় বিদায় মাঙ্গে রে॥

আনরে ময়নার বাবাজিরে আন ডাকো দিয়া।
ময়না যাইতা আপন দেশ বিদায় দেওকা আইয়া॥
ময়না যাইতা দূরই দেশ বিদায় দেওকা আইয়া।
কীসের বিদায় দিতাম ঝিয়াইরে হিয়া যায় ছিঁড়িয়া
কীসের বিদায় দিতাম ঝিয়াইরে কলিজা যায় ছিঁড়িয়া॥
থাকিতা না পারইন বাবাজিয়ে ময়না না দেখিয়া
থাকিতা না পারইন বাবাজিয়ে ময়না না দেখিয়া॥

সাগরদিঘির পারে ময়নার মাওফা সাজে
পালকি সাজে গিড়ুয়াল বান্ধে

www.pathagar.com

ময়নায় বিদায় মাঙ্গে রে॥
আনরে ময়নার মাইজিরে আন ডাকঅ দিয়া।
ময়না যাইতা আপন দেশ বিদায় দেওকা আইয়া॥
ময়না যাইতা দূরই দেশ বিদায় দেওকা আইয়া।
কীসের বিদায় দিতাম ঝিয়াইরে হিয়া যায় ছিঁড়িয়া
কীসের বিদায় দিতাম ঝিয়াইরে কলিজা যায় ছিঁড়িয়া॥
থাকিতা না পারইন মাইজিয়ে ময়না না দেখিয়া
থাকিতা না পারইন মাইজিয়ে ময়না না দেখিয়া॥
সাগরদিঘির পারে ময়নার মাওফা সাজে
পালকি সাজে গিড়ুয়াল বান্ধে
ময়নায় বিদায় মাঙ্গে রে॥

বিয়ের গান-৩

বড় ভাবি কই গো জলদি করি বারও গো
কইন্যা লইয়া আইছন তারা কইন্যা তুলো আইয়া গো॥
চাচি আম্মা কই গো ইতাকিতা করো গো
পিশাচিনি কইন্যার মুখে দেউগো॥

ছোট নন্দাই কই গো অবায় তুমি আই গো
সোনারূপার পানি দিয়া পাও দুইখান ধোয়াও গো॥
কইন্যা লইয়া আইছন তারা কইন্যা তুলো আইয়া গো।
কইন্যা লইয়া আইছন তারা কইন্যা তুলো আইয়া গো।
কইনা বেটির মুখখানি দেখতে ঝলমল করে গো॥
না জানি কোন রাজার বেটি ভাই জানে আইনছন গো।
বড় ভাবি কই গো জলদি করি বারও গো
কইন্যা লইয়া আইছন তারা কইন্যা তুলো আইয়া গো॥

বিয়ের গান-৪

হবিগঞ্জের দোয়াত কলম সিরিমপুরি কাগজে
এমন করি লেখছে চিটি রসিক চান্দের উদ্দেশে॥

পত্র লইয়া যাওরে কোকিল ভাব মনে মনে।
আমার প্রতি রসিক চান চিনবে তুই কেমনে॥

হবিগঞ্জে দোয়াত কলম সিরিম পুরি কাগজে
এমন করি লেখছে চিটি রসিক চান্দের উদ্দেশে॥

www.pathagar.com

মাথায় আঁচরা চোখে কাজল সাহেবের চাকরি করতেছে।
পত্র পাইয়া রসিক চান্দে ভাবে মনে মনে।
থুইয়া আইছনইন ছেংড়া বালি দুই নয়নে কানতেছে।
তুইয়া আইছি কাঁচা ফল বাওয়ে বুঝি পাকতেছে।
হায় গো আমার পতি নাই দেশে॥

বিয়ের গান- ৫

ঢোলের বাড়ি শূন্যরে পাইকের নাচন দেইখারে
চমকা উঠে ঝিয়ের মার পরানিরে
চমকা উঠে বালীর মার ফরানিরে॥

আগে যে কইছলায়গো ও দয়াল চাচিগো
কোলের দিয়াইন খেইলে না থুইয়া যাইতে গো
দুধের ঝিয়াইন দুধে না থুইয়া যাইতে গো
কোন খানে দেখছ গো কোনখানে শুনছ গো
বিয়া কইরা নওশা একলা যাইতেগো
বিয়া কইরা গাবরু একলা যাইতে গো
আমার ঐ না মা গো পন্থপানে চায়নি গো
দেখে নওসা বিয়া কইরা আয়নি গো
দেখে গাবরু বিয়া কইরা আয়নি গো॥

বিয়ের গান-৬

নতুন বধূ সেজে ময়না যাইত স্বামীর ঘর
বিয়ের শাড়ি পরে ময়না কান্দে ঝর ঝর
বাপে কান্দে মায়ে কান্দে, কান্দে ভাইবোনে
আজ বুঝি যাইব ময়না সকলরে ছুঁইড়ে
খেলার সাথি ছিল যারা কান্দে জারে জার
জনম দাতা পিতা কান্দে
পুকুরপাড়ে বৈশ্যের ময়না গো।

সংগ্রহ : শাহ্ ডেইজি আক্তার, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী।

গান-৭

কী সুন্দর সাজছইন দামান
হকলের সেরা দুলাগো
সবার সেরা দুলা
কী সুন্দর হাতখানা দামানের
তরপেরই মূলাগো

www.pathagar.com

তরপেরই মূলা
কী সুন্দর কান দুইটা দামানের
হোয়াগার মার ডালা গো
হোয়ার মার ডালা
কী সুন্দর চুখ দুইটা দামানের
নয়নেরই তারা গো
আসমানেরই তারা
কী সুন্দর চানবদন দামানের
দেখতে লাগে ভালা গো দেখতে লাগে ভালা

গান-৮

বানিয়াচুঙ্গের রাজপুত্র ঐ না দামান সাজিয়া
মা ময়ুরপঙ্খি নৌকা লইয়া আইলা তাইন উজাইয়া।
চাইয়া তোমরা দেখ গো দেখ কেমন সুন্দর গো
নিলুয়া বাতাসে দুলছে কেমন মাথার বান্দা পাগড়ি গো
কলের গানের বাজনা শুনি, ঐ না বোমের আওয়াজ গো
গাঙ্গের ঘাটে যাই চল আয়না তুলি দামান গো
কই গেলা গো কইন্যার মা, কই গেলা বুবাইজান
জলদি কইরা তুইলা আনো, দামান ঘাটে খাড়া গো
আসই দামান ঘর খাও দুধের শরবত গো
সখীরে আজ তুইলা দিমু, কইর তুমি মহব্বত গো

মালা বদল

হাতে মেন্দি পায়ে আলতা কানে ঝুমকা দুল গো
কেমন সুন্দর লাখছে যেমন ফুটছে গোলাপ ফুল গো
ঐ না গোলাপ দিলাম তোমায় গলাতে জরাইয়া
রাইখো তুমি সারাজীবন আদর যত্নে ভুলাইয়া।
যাও যাও মাইগো, যাও শ্বশুরবাড়ি
দুয়ারে খাড়াইয়া আচইন, তোমার শ্বশুর শাশুড়ি গো

বাবা

শ্বশুর শাশুড়ির কথা করিও পালন
না করিলে মন্দ হইবো রাখিও স্মরণ॥

ধামাইল গান

কইতথ কইতথ কইতথ কইতথ রে
দুঃখিনী রাধার বন্ধু কইতথ রে

www.pathagar.com

আমার বাড়ি যাইতে বন্ধু খালে হাঁটু পানি
জল গামছা ভিজাইয়া যাইতে ওসর দিমু আমি॥

হুরুছাব গেলা বাজারে গামছা বান্দিয়া করি
বাজার থেকে কিনয়া আনলা চিতল মাছের গাড়ি
চিতল মাছের গাড়ি খাইয়া গলাত লাগল কাড়া
মাইয়ে যে মানসা করছইন জুড়ে দিবা পাঠা
শ্যাষ বেচুম তিসি বেচুম আরো বেচুম তিল
মাথার খরচের লিগা সোনার জিঞ্জির
ভালা লাগুগ বুড়া লাগুক তোমরা জানো কী
ওরু ঠাকুরে দিছুইন তাবিজ ফালাই দিমুনি।

বিয়ের গান-৬

দামান আইছইন– আইছইন গো
বাংলাঘরের সামনে গো
জলদি কইরা তোল দামান তোল গো
ময়মুরব্বি আইছইন গো॥

দামানদেরে দেখতে যেমন
রাজ দুলাল নন্দন গো
রং যেমন দামান্দেরও
কাঁচা হলদির মুড়া গো
চুখ যেমন ডাগর ডাগর
চাইর ব্যাটারি লাইট গো
মনটা অতীত নরম নরম
কচি লাউয়ের ডগা গো

রাখ রাখ কথা রাখ, কামের মুরাদ নাই
কইন্যার বাবারে জলদি, লইয়া আওয়া চাই।

আইন আইন বেওয়াই সাহেব
আয়েন মেহমানরা
দয়া করে তশরিফ নেন
অতিত হকলে রা

কত যতনে কইরাছি, মাইয়াডারে বড় গো
মাথায় রাখলে উকুইনে খায়

www.pathagar.com

মাটিত রাখলে পিপঁড়ায় গো।
দামান আমার বুকের ধন দিলাম তোমায় সঁপিয়া গো
জলদি কইরা দাও বিদায়
সময় বইয়া যায় গো
উঠ উঠ উঠগো ময়না, বেলা হলো শেষ
সন্ধ্যাবাত্তি জ্বলার আগে যাইবা শ্বশুর দেশ
ও ময়না বেলা হলো শেষ॥

বিয়ের গীত বা ধামাইল

বিয়ের গীত বা ধামাইল বানিয়াচং অঞ্চলের কৃষ্টি কালচারের একটি চিরাচরিত প্রথা। চল্লিশ দশকের আগেও ও যে কোনো বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলেই মেয়েরা বিয়ের তারিখ হওয়ার পর থেকেই মেয়ে ও বরের বাড়িতে বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে এ গান গাইত। গানগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগ্রহ কালে তারা কেউই লেখকের বা শিল্পীর নাম উল্লেখ করতে পারেননি। অধিকাংশ গীতই অনেক পুরনো ধাচের।

১১.১২.১১ তারিখে আম্বিয়া খাতুন (৬০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তিনি তার দলে আরো তিনজন নিয়ে নিম্নের চারটি গীত গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য তিনজন হলেন : ১. হুসনা বেগম (৫৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। ২. খাইরুল বেগম (৪৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। ৩. মনিরা বেগম (৪০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

এক

দলানের উপর গো আচ্ছা সুন্দর বিবিগো
বিবি মাঙ্গইন হাজার টেহার জাতগো লক্ষ টাকার জাত গো
জাত না খুলিয়া গো জাত ও দেখইন টুটা গো
চিছক্কির মারল ভরা সবার মাঝেগো॥ ঐ

আগে দে কইছলাম গো অতি দয়ার বাপ চাচা গো
ঠাকুর জাত না করাইত বিয়া গো ।
ঠাকুরের ও বেটি গো এছা দিমাক করে গো
চিছক্কির মারল ঠাকুর সবার মাঝেগো॥ ঐ
বিবি মাঙইন হাজার টাকার শাড়ি গো লক্ষ টাকার শাড়ি গো
শাড়ি না খুলিয়া শাড়ি দেখইন টোটা গো
চিছক্কির মারল ঠাকুর সবার মাঝেগো॥ ঐ
আগে দে কইছলাম গো অতি দয়ার বাপ চাচা গো

www.pathagar.com

সইয়দ জাত না করাইতায় বিয়াগো
সইয়দের ও বেটি গো এছা দিমাগ করে গো
চিছক্কির মারল ভরা সবার মাঝে গো॥ ঐ

দুই

ঢাকা থেকে আইলা দামান লাল ঘোড়া দৌড়াইয়া
বিক্রমপুর থেকে আইলা দামান নীল ঘোড়া দৌড়াইয়া
বাইরাও বাইরাও ঝিরা গো আবের পাংখা লইয়া
বাইরাও বাইরাও ঝিরা গো অজুর পানি লইয়া
আজকে কেন ঝিরা গো তোমার চেরা হইছে মইলা
আজকে কেন ঝিরা গো তোমার কাপড় হইবে কালা
তোমার মায়ের কথায় সাধু চেরা হইছে মইলা
তোমার বইনের কথায় কাপড় হইছে কালা
মারে মারি গো ঝিরা দুধে জল মিশাইয়া
বইনরে গো জিরা দূর বিয়া দিয়া
ভাইরে মারিমো গো হাতের বন্দুক দিয়া
মারে মারিলেরে সাধু ঘরের সুন্দর যাইব
বইনরে মারিলেরে সাধু দূরে খেসি যাইব
ভাইরে মারিলেরে সাধু কমরের জোর যাইব
আমার আখলেরই ঝিরা আমার পছন্দেরই ঝিরা॥ ঐ

তিন

সেরে কইর গো মানা সেরে কইরগো মানা
আমরা যদি যাইগো জলে সে যেন যায় না।
সে যে থাকে আড়ালে সে যে থাকে নীরবে
আমরা সাত বোন সতী নারী জলেরই ঘাটে
সে যে ধরে শাড়ির খুটে
সেরে কইর গো মানা
আমরা যদি যাইগো জলে সে যেন যায় না
আমরা ছয় বোন সতী নারী জলেরই ঘাটে
সে যে ধরে শাড়ির খুটে
সেরে কইরো গো মানা॥

চার

নাই আমার চাটিগো নাই আমার পাঠিগো
নাই আমার বিয়ার ও জঞ্জালিগো
আছে আমার চাটিগো আছে আমার পাটিগো

www.pathagar.com

আছে আমার বিয়ার জঞ্জালি গো
আছে আমার শাদির জঞ্জালি গো।
আমার এই যে ঝিয়াই হবে আড়াই বছর গো দুধ ও খাইয়া
উরে শুইয়া রইছুন গো
আমার এই যে ঝিয়াই গো হবে আড়াই বছর গো
পড়াইয়া ঝিয়াই উরে শুইয়া রইছুন গো।

১০.০১.২০১২ তারিখে শিল্পী আবু মোতালেব খান লেবু (৫২), শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ, পেশা : চাকুরি, গ্রাম : তোপখানা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তার কাছ থেকে মোহনলালের দুটি গান সংগ্রহ করা হয়। মোহন লালের পরিচিতি গানে দ্রষ্টব্য।

এক

উন্মাদিনী হইলাম যার লাগিয়াগো– রূপ দেখিয়া॥
ওগো, সে জনারে আবার মোরে
দেখাও আনিয়া গো রূপ দেখিয়া॥

১. আড় নয়নে দেখলাম চাইয়া,
জলের ঘাটে শ্যাম কালিয়া গো ।
সেয়ে, তীরে বসে বাজায় বাঁশি
হাসিয়া হাসিয়া গো– রূপ দেখিয়া॥

২. নয়নে রাখিয়া নয়ন –
কলসিতে জল ভরি যখন গো ।
তখন গেলি ভাসি জলের কলসি ।
প্রেমের ঢেউ লাগিয়া গো রূপ দেখিয়া॥

৩. হেন কালে শ্যাম নগরে,
বাঁশি রেখে আমায় ধরে গো
সে যে কলসিখানি দিল আনি,
জলে জাম্প দিয়া গো – রূপ দেখিয়া॥

৪. কলসীতে জল ভরি–
আমি যখন গৃহে ফিরি গো।
ওগো, ভেবে বলে মোহন লালে–
কাঁদে আমার হিয়া গো– রূপ দেখিয়া॥

দুই

'সইগো'–
মিনতি করিয়া
শ্যামকে আনো গিয়া।
ওগো, সারা নিশি রইলাম বসি
শ্যামের লাগিয়া॥

www.pathagar.com

১. চামেলি ফুলেরই মালা,
রেখেছি গাঁথিয়া॥
'কৌতূহলে'
শ্যামের গলে ,
দিব পরাইয়া– শ্যামকে আনো গিয়া॥

২. সুগন্ধি আতর চন্দন
রেখেছি পিষিয়া॥
ওগো, নব রঙ্গে
শ্যামের অঙ্গে,
দিব ছিটাইয়া–শ্যামকে আন গিয়া॥

১. শ্যামকে দরশনের লগি,
কান্দে আমার হিয়া॥
ওগো, ভেবে বলে মোহন লালে
শীঘ্র যাও চলিয়া॥

আবু মোতালেব খান লেবু

উল্লেখিত বিয়ের গীতটি তিনি নিজে লিখেছেন এবং সুর দিয়ে শুনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

শুন শুন আদরের ময়না করলাম তোমায় দান
শ্বশুরবাড়ি যাইয়া রাইখো বানিয়াচঙের মান।
দামানদের মর্জিমতো কইরো তারে খুসি
মন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া হইয়ে চরণদাসী
শাশুড়ির খেদমত করতে কইর নাকো হেলা
সংসারে মজিয়া থাইকো সকাল সন্ধ্যাবেলা
শাশুড়ির মন যোগাইয়া থাইকো ছায়ার মতো
আদর সম্মান কইরা যাইয়ো ইষ্টি কুটুম যত॥

মায়া কইরা খাইতে দিয়ো দেবর আর ননদেরে
জীবন যৌবন সইপ্যা দিয়ো সোনার দামানদেরে ॥

আ. আজিজ

১১.০১.১২ তারিখে আবদুল আজিজ (২৮), শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : বাবুর্চী, গ্রাম : গরীব হোসেন, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তার কাছ থেকে নিম্নের দুটি গান সংগ্রহ করা হয়।

(এক)

ঐ দেখা যায় কদম তলায় শ্যাম চাঁন কালিয়া
এগো নাম ধরিয়া বাঁজায় বাঁশি জয় রাধা বলিয়া

www.pathagar.com

চল গো সখি যমুনাতে কলসি কাঙ্খে লইয়া
এগো আমার তাপিত অঙ্গ শিতল হইব বন্ধুরে দেখিয়া
শাশুড়ি ননদীর জ্বালা কেমনে থাকি সইয়া
মনে লয় গো প্রাণটি দিতাম জলে জাম্পদিয়া
ঘরে বাইরে হইলাম দুষি তার প্রেমে পড়িয়া
এগো প্রাণ বন্ধে কয় সাধ মিটাইলাম দাসিরে কান্দাইয়া॥ ঐ

(দুই)

কালার বাঁশির সুরে করল উদাসিনীগো শান্তি রাণী
হায় হায় সুনিল বাবুর এই বাসনা শান্তি বিনে প্রাণ বাঁচে না
এগো মনে লয় যাইতাম উড়িয়া শান্তি দেশের তরে গো॥ ঐ

হায় হায় টুলের উপর লেম বসাইয়া পত্রখানি দেও
দেখিয়া গো এগো সেই না পথ যাইব আমার বন্ধুয়ারই দেশেগো ঐ

হায় হায় একটি ঘরের নটি দরজা বাহিরে ভিতরে তালা
এগো সেই তালা খুলিতে লাগে মাইকের ও ছুরানী ওগো শান্তি রানি
কালার বাঁশির সুরে করল উদাসিনীগো শান্তি রানি ॥২

মো. মনজুর মিয়া

১৫.০১.১২ তারিখে মনজুর মিয়া (২৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : বাবুর্চী, গ্রাম : সৈদারটুলা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তার কাছ থেকে নিম্নের দুটি গীত সংগ্রহ করা হয়।

(এক)

সখী কইও গো বোঝাইয়া প্রাণ বন্ধু চোখের দেখা যায় যেন দেখিয়া
সখী গো মরণের আর নাই গো বাকি প্রাণ বন্ধে দিল ফাঁকি
কোনো দিন জানি যাইমো গো মরিয়া ও সখী গো
ও বন্ধুরে তর প্রেমের বেমারি আমি বিনারোগে হইলাম রোগী
ও আমার দেখলা কত উজাড় করিয়া কবিরাজ ডাক্তার, বাইদা
সখী কইও গো বুঝাইয়া প্রাণ বন্ধু চোখের দেখা যায় যেন দেখিয়া
সখী গো মরণের আর নাই গো বাকি প্রাণ বন্ধে দিল ফাঁকি

(দুই)

কেন গো রাই কাঁদতে আছ আকুলিনী হইয়া
এগো আইজ নিশিতে আসিব শ্যাম বাঁশিটি বাজাইয়া
জাতি জ্ঞাতি ফুলমালতি আনগো তুলিয়া॥
এগো শ্যামরে আইলে দিও মালা প্রাণ জুরাইয়া
ছোয়া চন্দন ও পিষ যতন ও করিয়া॥ ঐ

www.pathagar.com

শ্যামরে আইলে দিয়ে চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া
কেন গো রাই কাঁদতে আছ আকুলিনী হইয়া॥

মো. মোবারক মিয়া

০৪.০২.১২ তারিখে মোবারক মিয়া (২৮), পিতা : সায়েম উল্লা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশাঃ বাবুর্চি, গ্রাম : গরীব হুসেন, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। এর থেকে নিচের তিনটি গান সংগ্রহ করা হয়–

(এক)

সখি ঢেউ দিয়ো না জলে
এগো ঢেউ লাগিলে সোনার ছবি মিশে যাইবো জলে
সখি ঢেউ দিয়ো না জলে ॥

হায় হায় সোনা বন্ধের রূপ আমি দেখি পানির তলে ॥
এগো ঢেউ লাগিলে সোনার ছবি মিশে যাইবো জলে।
সখি ঢেউ দিয়ো না জলে ॥
হায় হায় হাতে হাতে ধরিবো জলে এই না কদম তলে
এগো ঢেউ লাগিলে সোনার ছবি মিশে যাইবো জলে ॥
সখি ঢেউ দিয়ো না জলে ॥
হায় হায় না জানি কোন এমন জনে ছবি যে এঁকেছো
এগো ধরতে গেলে না দেয় ধরা ধরি কোন সন্ধানে
সখি ঢেউ দিওনা জলে ॥
হায় হায় কলসি ডুবাইয়া বন্ধে বইলা কদম তলে ॥
এগো কদম ফুল ঝরিয়া পড়ে কলসির উপরে ।
সখি ঢেউ দিয়ো না জলে ॥
হায় হায় শিকারি শিকার করে তাল নিরাই ধরিলে।
এগো ঢেউ লাগিলে শিকার করা ঘটবে না কপালে
সখি ঢেউ দিয়ো না জলে ॥

(দুই)

যে দুঃখ অন্তরে সখিগো সহে না যায় ॥
এগো আর কত কাল গাঁথো মালা প্রাণ বন্ধুর আসায়।
সখিগো সখি সহে না যায় ॥
হায় হায় আসব বলে কথা দিয়া গো সখি আমারে কাঁদায়॥
এগো আর কত কাল গাঁথব মালা প্রাণ বন্ধুর আশায়।
সখি গো এগো কোকিলারই কুহু সুরে পুড়া প্রাণ জুড়ায়।
সখি গো সখি সহে না যায়
বাউল আবদুল করিম বলে গো সখি হইলাম নিরুপায়।
এগো দেশছাড়া করবে নাকি প্রাণ বন্ধুয়ায়
সখি গো সখি সহে না যায় ॥

www.pathagar.com

(তিন)

ও আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়া যায় গো
আইলো না গো বন্ধু শ্যামরায়
হায় হায় আসব বলে বনমালি
আমি বান্ধিয়াছি চুলের বেণি গো।
আমার সেই বেণি কার মাথায় পরাই গো।
আইলো না গো বন্ধু শ্যামরায়।
হায় হায় আসবো বলে বনমালি
আমি বিনা সুতে মালা গাঁথি।
আমার সেই মালা আমি কার গলায় পরাই গো
আইলো নাগো বন্ধু শ্যামরায় ॥
হায় হায় আসব বলে বন মালি
আমি বানাইছি পানের বিড়ি।
আমার সেই বিড়ি কারে বা খাওয়াইগো।
আইলো না গো বন্ধু শ্যামরায় ॥
হায় হায় আসব বলে বনমালি
আমি পিষিয়াছি চন্দনখানি
আমার সেই চন্দন কার অঙ্গে ছিটাই গো
আইলো না গো বন্ধু শ্যামরায় ॥

বউ সাজনি

০৫.০১.২০১২ তারিখে ছায়েদা বেগম (৪৮), স্বামী : মৃত আতাউর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, শাহিনা বেগম (৪৫), স্বামী : রেজন উল্লা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী। গ্রাম : মোহরের পাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। এদের কাছ থেকে চারটি গীত সংগ্রহ করা হয়–

(এক)

যেই হালা (সময়) লাল মণি জন্ম লইলা মাইর কোলে
যেই হালা দয়াল আল্লায় লেখলায় পড়ার ঘরে
আংটিখান পুইড়া আইতে সব সখি লীল মণি
আংটিখান পুইড়া আইতে পড়ে আইকের পানি
যেই হালা লাল মণি জন্ম লইয়া মাইর কোলে ঐ
কোলের সেই খালা দয়াল আল্লায় লেখলায় পড়ার ঘরে
শাড়িখান পইড়া আইতে সব সখি নীল মনি
শড়িখান পইড়া আইতে পড়ে চোখের পানিরে
সেই হালা লাল মনি জন্ম লইলা মাইর কোলেরে ॥

www.pathagar.com

(দুই)

খেইলে খেলাই খেইলাইন অবুঝ গো তোতা
ডালাইন গাছের তোতা এলাইন গাছের তলে গো তোতা
পরদেশি দামান গো আইয়া খেইলি ঢং গো
কয়লা গো তোতার মায়ে কাইন্দন তোতা কোলে লইয়া
কার লাগি পালছিলাম গো
রাজার চাকরি কইরা, বাদশার চাকরি কইরা
আগে যদি জানতাম গো পরার ঘরে লইয়া যাইব
দুধের সাথে ঝর মিশাইয়া মারিতাম তোতা ॥

(তিন)

লাল ঘোরা সোয়ারী সিফাই দামান
নীল ঘোরা সোয়ারী সিফাই দামান পাঘুড়ি উড়ে গায়ে
সেই না পাঘুড়ি দেখিয়া খেইলের জিয়াই
সেই না পাঘুড়ি দেখিয়া মনছুর জাদি কান্দইন জারে জারে
এক রাতে লাগাইয়া বাবাজী গো লুকাইয়া রইবায় মোরে।
এক রাত লাগাইয়া চাচাগো চাপাইয়া রাখবায় মোরে
আমার দেশে লুকুনি নাই গো জিয়াই লোকাইয়া রাখতাম তোরে
আমার দেশে ছাপুনি নাই গো জিয়াই লোকাইয়া রাখতাম তোরে।
তোর জামাই মিলে টের বড় চাকরিয়ান ধরাইয়া নিব আমারে
তোর দেবর পুলিশের চাকরি করে ধরাইয়া নিব আমারে
লাল ঘোড়া সোয়ারী সিফাই দামান
নীল ঘোড়া সোয়ারী সিফাই দামান ॥

(চার)

বাড় বাড়িতে ফুলের টঙ্গি সাজাইলায় সুন্দরী
তুমি ধর ডাল গো বালি আমি ধরি কল্লি
আমরায় দেশে নাই রে রাজা ফুল ও চুরাচুরি
আমরার দেশ নাই রে রাজা কলি তোলাতোলি
আমরা যে দাদাজি লন্ডনের বেপারি
হুকুমে আই না দিব লক্ষ ফুলের কলি
বাড় বাড়িতে ফুলের টঙ্গি সাজাইলায় সুন্দরী
আমারও যে নানাজি আমেরিকার বেপারি
হুকুমে আইনা দিব জবা ফুলের কলি
হুকুমে আইনা দিবা লক্ষ ফুলের কলি
বাড় বাড়িতে ফুলের টঙ্গি সাজাইলায় সুন্দরী

২৫.০২.১২ তারিখে খেলা বেগম (৪০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী। রাহেনা বেগম (৪৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, পেশা গৃহিণী। সাং : হলিমপুর, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

www.pathagar.com

-এদের কাছ থেকে দুটি গীত সংগ্রহ করা হয়।

(এক)

দামানদের ও সাত ভাই সাত ঘোড়া সোয়ারী
একলা দামান রাজা চৌদল সোয়ারী
চল যাই চল যাই দামান দেখিবারে
দেখছি দামানদের মাথা ভালা ডাব-নারেকেলের জোয়ারে
চল যাই চল যাই দামান দেখিবারে
দেখছি দামানদের কপালে ভালা আসমানের চান্দরে
দামানদের ও সাত ভাই সাত ঘোড়া সোয়ারী (ঐ)
দেখছি দামানদের দাঁত ভালা আয়নারের দানারে
চল যাই চল যাই দামান দেখিবারে (ঐ)
দেখছি দামান হাত ভালা বেলাইনের জোয়ারে
চল যাই চল যাই দামান দেখিবারে
দেখছি দামানদের হাঁটুইন ভালা হন হন কইরারে
চল যাই চল যাই দামান দেখিবারে
দামানদের ও সাত ভাই সাত ঘোড়া সোয়ারীরে ।

(দুই)

মেনদি রোয়াইয়া সাধু যাইনগো বাণিজ্যে
যখন মেনদি এক পাতা ছাড়িল
তখন সাধুর মায়ের মনে হইল
যখন মেনদি দুই পাতা মেলিল
তখন সাধুর বইনের মনে হইল
যখন মেনদি তিন পাতা ছাড়িল
তখন সাধুর বিবির মনে হইল
উজান গাঙ্গের ভাটা মেনদি ভাইট্টল গাঙ্গে ভাসে
কও মেনদি আমার বাড়ির খবর
তোমার মাইয়ে না খাইন দানা পানি
তোমার বইনে না যাইন জামাইর বাড়ি
তোমার বিবি না লইন ঘর বাড়ি ॥
মাইরে কইও খাইতা দানা পানি
বইনরে কইও যাইতা জামাইর বাড়ি
বিবিরে কইও লইতা ঘর বাড়ি
মায়ের লাগি আনতাইন পাটের শাড়ি
বইনের লাগি হিরা লাল বাংড়ি
বিবির লাগি দাঁতের অইনা মিছরি
মায়ের শাড়ি ইন্দুরে ছুকিল

www.pathagar.com

বইনের বাংড়ি ভাইঙ্গা চুরমার হইল
বিবির মিশরী কাগজে শুকাইল।
তবুও সাধু না আইলো বাড়িত।
মেনদি রোয়াইয়া সাধু যাইনগো বাণিজ্যে ॥

শিল্পী মোবাশ্বির হোসেন তান্না (৩২), শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি, পেশা : শিল্পী, গ্রাম : দোকানটুলা, বানিয়াচঙের কাছ থেকে ১৫.০২.১২ তারিখে একটি গান সংগ্রহ করা হয়–

(এক)

আয়লো সাখি তরা
জলের ঘাটে যাই,
আষাঢ় মাইয়া ভরা জলে
শ্যামের নাও দৌড়াই ॥

জারুল কাঠের নাও তার
পিতলে বান্ধা গলুই,
মন চায় পাল উড়াইয়া
পিরিতের গান কই।
মন হরিয়া করতে চাই
হাউসের আশনাই ॥

দারুণ জ্বালা শ্যাম পাবার
কেমনে ঘরে রই,
ভাসা জলে লীলুয়া হাওয়া
মন দোলে সই।
মন সঁপিয়া সাজাতে চাই
বিনোদিনী রাই ॥

গানটি ২০১১ সালে জুলাই মাসে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

০৫.১১.১১ তারিখে রাতে গীতিকার মহিবুর রহমানের বাড়িতে গেলে তাঁর রচিত দুটি ধামাইল গীত সংগ্রহ করা হয়। মহিবুর রহমানের পরিচিতি গানের অংশে দেওয়া আছে–

(এক)

তরা দেখ গো নয়নে
প্রাণ বন্ধু চিকন কালা আসিবে কোন দিনে
যাওগো তরা নন্দালয়ে কালার দরশনে ॥

১. আসিবে আসিবে বলে কালা চাইগো পন্থ পানে
কাম বিচ্ছেদে মলিন হলো দেহ রূপ বদনে ॥

www.pathagar.com

২. কেন আমায় পাগল করে বাঁশের বাঁশির টানে
নন্দালয়ে থাকে চুরা কাহারই অধীনে ॥

৩. সারে গামা পাধা নিসা ধ্বনি উঠে টানে
নিষাদে মুহিত হইয়াছে বিশ্বজুড়ে গানে ॥
৪. সানেতে শাঁ মুহিত হয়ে ঢুকে আমার প্রাণে
মহিবুর কয় আসবেনি কালা আমারই মরণে ॥

(দুই)

কী পাগল করিল আমায় কালার বাঁশির সুরে
চাইতে চাইতে রজনী শেষ ডুব দিব গো শ্যাম সাগরে
কালার বাশির সুরে।

১. বাঁশের বাঁশি বাজল গো সই রাত্র দ্বি প্রহরে
মন মোহিনী যৌবনের ঢেউ উদিল অন্তরে গো সখি ॥

২. বাঁশের বাঁশির ষষ্ট ঘাটে সইগো ডাকে আমার নামে
শ্যাম আমার গলারই মালা থাকব ধারে ধারে গো সখি ॥

৩. মান কুলমান সবই দিলাম সইগো করিয়াছি পন
আমি রাধা শ্যাম বিহনে খুঁজব কুঁচ বিহারে গো সখি ॥

৪. যাব খুঁজে তার তাল্লাসে সই গো চল আমার সাথে
শ্যাম আমায় ডাকিল কেন ভাবছি মহিবুরে গো সখি ॥

কালার বাঁশির সুরে।

বিয়ের গীত

০৬.০২.১২ তারিখে মোহরের পাড়ার অজিত বণিকের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে সাতটি বিয়ের গীত সংগ্রহ করা হয়। গীত পরিবেশন করেন জ্যোৎস্না বণিক (৪০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, পেশা : চাকরি, কলি রাণী বণিক (৩৮), শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা : টেইলারর্স; আরতী রাণী বণিক (৪০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, পেশা : গৃহিণী; দীপালি বণিক (৪২), শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, পেশা : গৃহিণী।

১

আদ্রিস্নান (মেয়ে)
তোমরা দেখগো নাগরী আদ্রিস্নানে
বইছইন উমা, হিমালয় কুমারী।
মঙ্গল ঘটে জল ভরি আনেন দেবময়ী,
স্বর্ণ খাটে বসাইন উমা পূর্বমুখী করি,
আর্ঘন করইন মায়ের উমা অতি যত্ন করি।

www.pathagar.com

সোনার বাটায় ধান্য দুর্বা হিরার বাটায় করি,
আর্ঘন করয়ইন মায়ের উমা অতি যত্ন করি।
চারদিকে সঙ্গী-সাথি দাঁড়াইয়াছে বেড়ী,
হরিদ্রা চন্দন লাগাইন নির্মল্যান করি।
শতেক আয়ো জুকার দেন উচ্চস্বর করি,
শিরে জল ঢালেন মায়ে দিয়া স্বর্ণ জারি।
স্নান করি উমাধনে উত্তম বসন পরি,
মনসাধে সাজন করাইন সঙ্গের সহচরি।
ভুবন মোহন সাজে সাজিলেন গৌরী,
অন্তিমে মায়ের চরণ মাগো সন্ধ্যারানী।

২

রাধা বলে বাঁশি বাজে দিবানিশি,
আকুল স্বরে শ্যামের বাঁশি
ডাকে রাই রূপসী।
গৃহকাজে থাকি যখন তখন বাজাও বাঁশি,
মর্মে মর্মে পৌঁছে সে-স্বর বানাইল উদাসী।
শাশুড়ি ননদী দেয় কাল শাসনের ফাঁসি,
বাঁশি অন্য কারো নামটি না লয় আমায় করে দুষী।
প্রাণসখিগণ নিষেধ কর বাজাতে কাল বাঁশি,
সন্ধ্যায় বলে প্রেমের ডোরে বান্দা কালশশী।

৩

জল ধামালী

রাস্তা ছাড়ো নাগর কানাই জল ভরিতে যাই,
জল লইয়া গৃহে যাইব বিলম্বে কাজ নাই।
রাস্তাঘাটে ছল কর নির্লজ্জ কারাই,
রাজ পন্থে যাকাজুড়ি মুখে লজ্জা নাই।
বনে থাক ধেনু রাখ রাখালিয়ার ভাই,
সুজনার পিরিতের মর্ম রাখাল বুঝে নাই।
সন্ধ্যারানি বলে লীলা বুঝার সাধ্য নাই,
বিনে সুতে রাধার প্রেম বান্দা যে কানাই।

৪

জল ধামালী

সব সখি সঙ্গে রাধা নামল গঙ্গার জলে,
কালাচাঁদে বস্ত্র হরে রাখল কদম ডালে।
জল হইতে উঠিয়া দেখইন বস্ত্র নিল চোরে,

www.pathagar.com

কুক্ষেনেগো প্রাণসখি এসেছিলাম জলে।
গ্রাম দেখি না আশেপাশে লোক দেখি না কাছে,
কৃষ্ণ বুঝি রাধার বসন হরিয়াছইন ছলে।
মুরলী বাজাইন কৃষ্ণ বসি কদম ডালে,
মৃদু মৃদু স্বরে বাজে অতি কলে কলে।
সন্ধ্যায় বলে দশম দশা ঘটল আজি জলে,
রাধারানি মান কুলমান হারাইলা সমূলে।

৫

নিরদ বরন রূপের কিরণ দেখলাম যমুনায়,
ভুলা নাহি যায় গো তারে পাশর না যায়।
হাতে বাঁশি মাথেচূড়া ময়ূর পুচ্ছ তায়,
(ও তার) গলে শোভে বনমালা চাঁচর কেশ মাথায় ॥

কটিতটে পীত ধরা পবনে উড়ায়,
পরিধানে মোগার ধুতি কি আছাক দেখা যায় ॥

যুগল পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বায়
ও তার রূপের জাদু লাগল মনে গৃহে থাকা দায় ॥

সন্ধ্যারানি বলে যে রূপ ভুবন ভুলায়
সেই রূপের শর বিধিল রাধার হিয়ায় ॥

৬

সব সখিগণ কুঞ্জ সাজায় আনন্দিত হইয়া,
এগো আসবে রাধার প্রাণবন্ধু রসের বিনদিয়া।
নানা জাতি গন্ধপুষ্প আনিলা তুলিয়া,
এগো স্তরে স্তরে রাখেন পুষ্প শয্যাতে সাজাইয়া।
বিচিত্র পালং মাঝে সুচিত্র বিছানা,
এগো ঝিলিমিলি মশারিতাতে রাইখাছে সাজাইয়া,
বন্দের আসার পন্থ পানে চায় নিরখিয়া।
সন্ধ্যা বলে রাইয়ার পদে মিনতি করিয়া,
নিশি শেষে আসবেন বন্ধু মুরারি বাজাইয়া।

৭

শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণটি গেল, প্রাণনাথ মোর নাহি এল,
আসব বলে চিকন কালা আশাতে নৈরাশা কইলো ॥

www.pathagar.com

কেঁদে কেঁদে নিশি গত, আশায় আর থাকিব কত,
জ্বালায় পুড়ায় জনম যায় গো সই।
এগো কালার সঙ্গে প্রেম করিয়া
নয়নের জল সার হইলো ॥

সখি গো অতি সাধের গাঁথা মালা,
মালা দেখলে বাড়ে জ্বালা,
আতর গোলাপ বাঁশি হয় গো সই।
ও তার আসার পন্থে চাইতে চাইতে,
সাধের নিশি ভোর হইলো ॥

সখি গো ভাইবে সন্ধ্যারানি বলে,
আসবে বন্ধু নিশি শেষে,

চিন্তায় আকুল হইও না গো রাই॥

৬. আনুষ্ঠানিক গীত

প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে। আনন্দময় বিষয়গুলোকে আহরণ করে। কোনো জাতি তার সুদীর্ঘদিনের জীবন-যাপনের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা ও মানবিক মূল্যবোধ, কর্মদক্ষতা, সামাজিক কর্মকাণ্ড, নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রেম ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে। এ আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলেই সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেশে গ্রামের সহজ সরল মুসলিম মহিলারা কোনো না কোনো কাজে বিরল অবদান রেখেছে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও বয়সের ভারে নুয়ে পরা কিছু বৃদ্ধা মহিলাদের জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানা যায়।

এখনো হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এলাকাভিত্তিক আঞ্চলিক ভাষায় গীত, গান, জারি, ভাওয়াইয়া, কিচ্ছা, পুতিপড়া, ধামাইল গীত দলবেঁধে গায়। কোনো বিয়ে হলেই গাইয়ে মহিলাদের কদর বেড়ে যায়। গ্রাম থেকে তাঁদেরকে বেছে আনা হয় গীত গাওয়ার জন্য। হবিগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন গ্রামের নাম ও শব্দের ছন্দের মিল। অনেকটা কবিতার মতো, যেমন শাহজিবাজার, সাধুর বাজার, পুড়াইগলা, মনতলা, উলুকান্দি, বামকান্দি, বানিয়াচং, সতং, রাজিউরা, বাঘাসুরা, সুচিউড়া, ব্রাহ্মণডুড়া, নিতাইরছক, মিঠুরছক, গদাইনগর, সুঝানগর, লস্করপুর, বরমপুর, কাজীরগাঁও, রাণীগাও, সুদিয়াখলা, তালতলা, এসব গ্রামের মানুষের উদারতাও বেশি। তাঁরা বিয়ে মুসলমানি (খতনা) বা শিশু বাচ্চাদের নতুন দাঁত গজালে নানান ভঙ্গিতে গান গেয়ে আনন্দ দেয়। এবং বিয়েতে গীত গায়। কিছু নমুনা দেওয়া হলো–

www.pathagar.com

(১)

জৈষ্ঠ না আষাঢ়ো মাসে,
পানি ভরা গাঙ্গে* ।

ছান (স্নান) করিতে আইছইন দামান,
ভাবিরা তাঁর সঙ্গে* ।
ছান (স্নান) করিয়া আইলা দামান,
খাইতে দিলা হাতকাটা* ।
রসুগুলার রসে ভরা,
নানান জাতের পিঠা* ।
শালাশালি হাতে তালি,
খাওন খাইলা রঙে* ।

দাদি অরি (শাশুড়ি) আড়ি পাইতা,
গুজা অইয়া (হইয়া) যায়* ।
নয়া দামান্দের মুখপানে,
পিইরা পিইরা (ফিরে) চায়* ।

কইলো না কেন নয়া দামান্দে,
আছা না উক ঢঙ্গে* ।
ছান (স্নান) করিতে আইছইন দামান,
ভাবিরা তাঁর সঙ্গে* ।

(২)

বানদিছ্ না'লো ফুলের সজ্জা,
এমনোই আমার লাগে লজ্জা* ।
পইল্যা পইল্যা জামাই আইছে,
আমার বাড়িতে* ।
লাগাল পাইলে টান দিতাম,
দাদার দাড়িতে* ।

ঝেংগা কদম তার লাগিয়া,
পানি কাটি কাছি দিয়া* ।
বিয়ার পানি পড়ল বুঝি,
কানের হাঁড়িতে* ।

www.pathagar.com

লাগাল পাইলে টান দিতাম,
দাদার দাড়িতে* ।

মা-চাচিদের চৌখের জলে,
ক্যামনে দিব পালকিত তোলে* ।
অবাগির ধন আজকে যাইব,
পংকিরাজের গাড়িতে* ।
লাগাল পাইলে টান দিতাম,
দাদার দাড়িতে* ।

বিয়েতে গান পরিবেশন করছেন মহিলারা। সংগ্রহ : কবি এম এ ওয়াহিদ

(৩)
কোন পন্তে আসিবা
ছোয়ারিতন নামিবা
ছাত্তির উপর গুঞ্জুরে ভমরা* ।

কোন পন্তে আসিবা
দামান্দের ওই বাপ-চাচা
কোন পন্তে আসিবা বৈরাতি
ছাত্তির উপর গুঞ্জরে ভমরা* ।
রৌদের ঐ তেজে
কইটা ফুল ফুটছে
যাইতায়নি গো কইনার মা
জামাই লামাইতে
ছাত্তির উপরে গুঞ্জরে ভমরা* ।

www.pathagar.com

৭. ঘাটু গান

ঘাটু গান এক শ্রেণির লোকসংগীত, আজ বিলুপ্ত প্রায়। বর্ষাকালে মাঠ ঘাট যখন জলে ভরপুর, গ্রামবাসী তখন অলস জীবন কাটাত। তখনই বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবে কিছু লোক গ্রামের ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে নাচ-গান শুনত। গ্রামের সাধারণ পরিবারের ১২/১৪ বছরের সুন্দর চেহারা, সুশ্রী দেহ গঠন ও সুকণ্ঠের অধিকারী একটি বালককে নাচ গান শিখিয়ে বালিকা সাজিয়ে নাচাত। এই রূপদল বা সম্প্রদায়ই ঘাটুদল বা ঘাটু সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। তাদের পরিবেশিত নাচ-গানই ঘাটু গান। আর বালিকাবেশী বালকই ঘাটু। তাদের মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল থাকত।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক সাহিত্য' গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'গ্রামের ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া গান গাওয়া হতেই বালকের নাম ঘাটু হইয়াছে'। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ব্যবহারি শব্দ কোষ' নামের একটি অভিধানে উল্লেখ রয়েছে, 'মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এক শ্রেণির গ্রাম গান (ইহাতে একটি বালককে রাধিকা বেশে সাজানো হয়, সে আসরের মাঝখানে অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া রাধিকার মিলন বিরহ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে, এই বালককে ঘাটু বলা হয়, পৃষ্ঠা ২৯৬)।

ভাটি এলাকায় জলে ভাসমান একটি সাজানো নৌকার পাটাতনের ওপর ঘাটু গানের আসর বসত। ৭/৮ জনের একটি দল ঢোল, বাঁশি, দোতারা ইত্যাদি সাধারণ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান করত, আর সেসঙ্গে ঘাটু সাজে নারীবেশী একটি কিশোর নাচ করত। হাওরের কিনারা ঘেঁষা গ্রামগুলোর ঘাটে ঘাটে মাঝারি বজরা নৌকা ভিড়িয়ে ঘাটুগান চলত। সারাদিন গভীর রাত পর্যন্ত গ্রামবাসী ঘাটুগান উপভোগ করত। ঘাটুগানের প্রধানকে বলা হতো সরকার ।

ঘাটুগান সাধারণত প্রচলিত সুরে হলেও গানে প্রধানত উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব বেশ ছিল, কিন্তু পরবর্তীসময়ে সে প্রভাব আর থাকেনি। গানের কথাগুলো তেমন কাব্যিক নয় তবে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, বাংলা, হিন্দি, আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহারও কোনোকোনো ঘাটুগানে পাওয়া যায়। গানগুলো এগারো মাত্রা স্কেলে উচ্চরাগে, ষোল মাত্রা তালে বেশি গীত হতো বলে জানা যায়। গান পল্লিসুর প্রধান হওয়ায় সমবেত কণ্ঠ ধ্বনিতে শ্রোতাদের হৃদয়ে সহজে পৌঁছাত, নাচের মুদ্রা বা মান তেমন না থাকলেও সুন্দরী কিশোরীর দেহ ভঙ্গি প্রদর্শনে মুগ্ধ হতো দর্শক। নাচের প্রধান মুদ্রা হলো দর্শকের সামনে কামোদ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা।

ঘাটুগানের উৎপত্তি বা প্রচলনের সঠিক সময় ও স্থান নির্ণয়কালে জানা যায়, 'বৃহত্তর ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল ও সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ঘাটুগান নামক এক শ্রেণির লোক সংগীত প্রচলিত আছে (বাংলার লোক সাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৯১)'।

'ষোল শতকের দিকে এই ঘাটুগানের প্রচলন হয় বলে ধারণা করা হয় (কালের কণ্ঠ, তারিখ ২০.০৯.২০১২)'। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের শেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটু পুত্র কমলা'-এর সিডি, ফ্লেপ ও টাইটেলে বলা হয়েছে যে 'প্রায় ১৫০ বছর আগে হবিগঞ্জ জেলার জলসুখা গ্রামে এক বৈষ্ণব আখড়ায় ঘেটু গান নামে এক নতুন সংগীত

www.pathagar.com

ধারার সৃষ্টি হয়েছিল'। এ থেকে জানা যায়, হবিগঞ্জ জলসুখা গ্রাম ঘাটুগানের জন্মস্থান। এ তথ্যের সপক্ষে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর 'জীবন নদীর বাঁকে' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অনুসন্ধান বিশারদের মতে এ গান (ঘাটু) বা প্রথার উৎপত্তি ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার সঙ্গমস্থল জলসুখায় (পৃষ্ঠা ৪১৫)'।

জলসুখা গ্রাম হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলাধীন একটি প্রাচীন ভাটি জনপদ ও প্রসিদ্ধ একটি ইউনিয়ন।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, ঐ অঞ্চলে তেরো জন জমিদারের বাস ছিল। তারমধ্যে বারোজন হিন্দু ও একজন মুসলমান জমিদার ছিলেন। হিন্দু জমিদারের মধ্যে প্রয়াত গিরীশ চন্দ্র রায় গং ও মুসলমানের মধ্যে মৃত রমজান আলী চৌধুরী ওরফে গোঁছা মিয়া চৌধুরী ছিলেন। তাঁরা গ্রামের শৌখিন মানুষের বিনোদনের জন্য বর্ষাকালে যাত্রাগানসহ নানান আয়োজন করতেন। খরস্রোতা কুদালিয়া নদীতে নৌকাবাইচের ব্যবস্থা হতো। এক পর্যায়ে তাঁরাই ঘেটুগানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। গ্রামের একমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গোপীনাথের আখড়াটিতে কোনো এক সময় ঘেটু গানসৃষ্টি হওয়ার তথ্যের যথাযত প্রতীয়মান হয়। গোপীনাথের বৈষ্ণব আখড়াটি পরিদর্শনকালে দেখা গেল অতিপ্রাচীন এই আখড়াটি সেকালের চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি। প্রচণ্ড (প্রস্থ) গাঁথুনি ও কারুকার্যে ভরপুর ছিল। বর্তমানে অযত্নে অবহেলায় রয়েছে। আখড়াটি গাছপালা ভরপুর। এখন অনেকটাই ভূতুড়ে স্থানে পরিণত।

যেহেতু ঘাটু গানের উৎপত্তি শ্রী রাধিকা বিরহ থেকে (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আত্মজীবনী, ৪১৫) এবং কৃষ্ণ বিরহে অধীর হয়ে এক ভক্ত নারীর সাজে সজ্জিত হয়ে দয়িতার (প্রণয়িনী) যে হৃদয় বিদায়ক ভাব ভঙ্গিমা প্রকাশ করেছিল, আজও পেশাদার ঘাটুকে তার উপভোগকারীদের মনোরঞ্জনে সে ভাব ও ভঙ্গিমাই গানের সুরের সঙ্গে প্রকাশ করতে হয় (ঐ, পৃষ্ঠা, ৪১৫) বলে উল্লেখ আছে। তাছাড়া শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা লোক সাহিত্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'ঘাটুগান প্রেম সংগীত হইলেও ইহার প্রেমে মিলন নাই। রাধা-কৃষ্ণের নাম ইহার মধ্যে থাকিলেও, এই রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনচারী নহেন। বিচ্ছেদই ইহার পরিচয়, (পৃষ্ঠা, ২৯৪/২৯৮)। কৃষ্ণলীলা থেকেই ঘাটুগানের উদ্ভব হয়েছে বলে জনাব শামসুজ্জামান খান মনে করেন (বাংলাদেশের লোকসংগীত, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা, ৩৮)। এছাড়া 'ময়মনসিংহের লোকগীতি ও লোকসংগীত' প্রবন্ধে মো. আজিজুল হক চৌধুরী (গ্রন্থ : ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, জেলা বোর্ড ময়মনসিংহ, পৃষ্ঠা, ২০৩) ঘেটুগান প্রসঙ্গ লিখেছেন, 'প্রধানত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় লীলা অবলম্বনেই ঘাটুগান গাওয়া হতো'। তিনি আরো লিখেছেন, 'কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর অথবা শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য বঞ্চিতা রাধা উপলক্ষ করে বিচ্ছেদ (ঘাটু) গানগুলোতে একটি চিরন্তন বেদনা সুর শুনা যায় (ঐ, পৃষ্ঠা, ২০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ লিখেছেন 'ঘাটুগানের বিষয় বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেম (পৃষ্ঠা ১০৬)।

হবিগঞ্জ অঞ্চলের কিশোর বয়সে ঘাটু ছিলেন এমনি একজন শিল্পীর সাক্ষাৎকালে জানা যায়, ঘাটু মানেই রাধিকা। রাধা কৃষ্ণের কাহিনি ঘাটুগানের মাধ্যমে নেচে গেয়ে

www.pathagar.com

প্রকাশ করা হতো। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বৈষ্ণব আখড়ায় ঘাটুগান সৃষ্টির যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। তাই জলসুখার গোপীনাথের আখড়াটি ঘাটুগান সৃষ্টির স্থান হিসেবে গণ্য করা যায়।

তবে জলসুখা অঞ্চলের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় আখড়ার বৈষ্ণবদের প্রচেষ্টায় যে লোকসংগীতের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের অবসর বিনোদনের চাহিদার জন্য মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘেটুগান আনন্দের আসরে রূপ নেয়। আসরে রূপ নেওয়ার পর হাওর অঞ্চলগুলোর কিছু সৌখিন কুরুচিপূর্ণ অশিক্ষিত শ্রোতার চাহিদায় নাচে গানে ধীরে ধীরে অশ্লীলতা চলে আসে। ফলে নৈতিকতার-বিচারে সভ্য সমাজে ঘাটু গান অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। এ নিয়ে অনেক ঝগড়া বিবাদ কখনো আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। লোকবিজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ বলেন 'লোক মনোরঞ্জন নিমিত্তই ঘাটুগানের আয়োজন করা হয়' (বাংলার লোকসাহিত্য, পৃষ্ঠা ১০৬)। তিনি আরো বলেন, 'উদ্ভবকালে ঘাটুনাচের আধ্যাত্মিক দিকটি প্রধান ছিল। পরে যখন তা লোকসমাজে প্রবেশ করে তখন লোক চৈতন্য ধারা প্রবাহিত হয়। তখন আস্তে আস্তে এর আদর্শচ্যুতি ও রুচি বিকৃতি ঘটে' (ঐ, পৃষ্ঠা ১০৮)।

হবিগঞ্জের সুনীল সরকার (৭২), কিশোর বয়সে ঘাটু সেজে নাচগান করেছেন অনেক। পরবর্তীসময়ে যুবক বয়সে বিভিন্ন পেশাদার যাত্রাদলে নারীর ভূমিকায় (এ সময় যাত্রা বা নাটকে অভিনয়ের জন্য কোনো নারী পাওয়া যেত না, তখন পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হতো। এরূপ নারীর ভূমিকায় অভিনয়কারী পুরুষশিল্পী হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন) অভিনয় করেছেন।

হবিগঞ্জের লাখাই, আজমিরীগঞ্জ, কাকাইলচেও, নোয়াগাঁও প্রভৃতি ভাটি অঞ্চলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি শৌখিনদলে প্রায় চার বছর সুনীল সরকার ঘাটু কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ঘাটুদলে ঘাটু হিসেবে তাঁর গুরুত্ব ছিল সবার চেয়ে বেশি। পারিশ্রমিকও ছিল অনন্যদের চেয়ে অধিক। অনুষ্ঠানে দর্শকদের পুরস্কার (তাঁর ভাষায় 'উপরি') পেয়েছেন অনেক। দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে তার গায়ের জামায় সেপ্টিপিন দিয়ে টাকা গেঁথে দিতেন। এই সুনীল সরকার এখন সুনীল বৈষ্ণব। তাঁর রূপ লাবণ্য এখনও কমেনি। কিশোর বয়সে কতই না রূপবান ছিলেন। তিনি প্রায় ২৮ বছর ধরে হবিগঞ্জ শহরে একটি আশ্রমের দায়িত্বে আছেন। আলোচনাকালে তিনি আরো জানান, 'ঘাটুগানের অশ্লীলতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গান মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমসংগীতে পরিণত হওয়ায় যুব সমাজের কাছে ঘাটু অনুরাগ ও আসক্তি বেড়ে যায়।

মাধবপুর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নের নোয়াহাটি গ্রামের প্রয়াত দেবিন্দ্র সরকার কিশোর বয়সে ঘাটু ছিলেন। মাধবপুর, বানিয়াচং, আজমীরিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে তিনি ঘাটু হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর ছেলে হিরেন্দ্র সরকার (৫০) জানান, মেয়ের পোশাক পরা রূপবান দেবিন্দ্র সরকারকে কিশোরী ভেবে অনেক স্থানে আটকে রাখা হয়। নিজ উপজেলা মাধবপুরের সীমান্ত এলাকা মনতলা-হরষপুর গ্রামে এক পূজো উপলক্ষে ঘাটুগানের আসরে কিছু দুষ্ট লোক (তাঁর ভাষায়

www.pathagar.com

'ডাকাত') হঠাৎ মঞ্চের হ্যাজাক বাতি নিভিয়ে ঘাটুকে অপহরণ করে। পরে এই সুন্দরী কিশোরী যে বালক তা দেখে কিছুটা উত্তম মাধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়। এছাড়া ঘাটু বালকের সঙ্গে সম্প্রদায়ের এবং সম্প্রদায়ের বাইরে অনেকেরই সম্পর্ক সামাজিক বিচারে সুস্থ ছিল না। তাই ঘাটু গান ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

হবিগঞ্জ জেলার সীমানা পেরিয়ে বর্ষায় ভাসা পানিতে ভাসমান কয়েকটি ঘাটু সম্প্রদায় ছিল। বিশেষত সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জে এই ধরনের মৌসুমি ঘাটু সম্প্রদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। ঘাটুগানের সৃষ্টি হবিগঞ্জ অঞ্চলে হলেও তুলনামূলকভাবে হবিগঞ্জে ঘাটু দলের সংখ্যা কম ছিল। হবিগঞ্জের ঘাটুরা বায়নায় অন্য অঞ্চলে বা জেলায় কাজ করত। গান গেয়ে বা নেচে অর্থ উপার্জনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। হবিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ঘাটুগানকে অঞ্চল ভেদে ঘেটুগান, ঘাটু গান, ঘাউট্টাগান ইত্যাদি বলা হতো। ঘাটুকে ঘাউট্টাপুল্লা বলেও সম্বোধন করা হতো।

ঘাটুগান সংগ্রহে গানের জন্মস্থান হিসেবে খ্যাত জলসুখা গ্রামে খোঁজ নিতে গেলে ঐ গ্রামের ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মরহুম এমদাদুর রহমান সোনা মিয়ার পুত্র মশিউর রহমান বাবুল আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেন। তিনি গ্রামের প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন, শিল্পীদের নিয়ে গানের আসর বসান। ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন দুজন শিল্পী যাঁরা কিশোর বয়সে ঘাটুগানের দলে ছিলেন। তাঁরা হলেন গিরীন্দ্র চন্দ্র দেব (৭২) ও অমর চন্দ্র দেব (৭৩) তাঁরা ঘাটু গান গেয়ে আমাদের শোনান। গানের খাতা এখনও তাদের সংরক্ষণে আছেন। তাঁরা জানান বজ্রবুলী সুরে ছোট ছোট গানগুলোকে ভাগ করে দিশাঅংশ গাইবে ঘাটু, আর বাকি অংশ গাইবে সাখিরা। এভাবে দোওয়ার দিয়ে দিয়ে গানকে লম্বা করে অনেক সময় পার করে দেওয়া হয়। গানের সঙ্গে তাল রেখেই ঘাটু নাচ করে। গান নাচ ভাবে আবেগে ফূর্তিতে দর্শকরা উপভোগ করেন।

ব্রজবুলী = মৈথিলী ও বাংলার মিশ্রণে সৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ভাষাবিশেষ।
ব্রজ = শ্রীকৃষ্ণে লীলা স্থান (মথুরা)
ব্রজ কিশোরী = শ্রী রাধিকা।

৮. জারিগান

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছরই মহরমের শোকগাঁথা নিয়ে পহেলা মহরম থেকে অর্থাৎ আরবি মাসের প্রথম থেকে দশ দিন পর্যন্ত প্রিয় নবী হযরত মুহম্মাদ (স.) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র এবং হযরত আলী (রা.) এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হোসেইন (রা.) এর পরিবারের ৭২ জন সদস্য ফোরাত নদী তীরে পানির জন্য পিপাসায় কাতর হয়ে এজিদের দ্বারা কারবালার ধুধু মরু প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেছিলেন– সেই শোকাবহ মমান্তিক ঘটনাই 'কারবালার কাহিনি' বা 'মহরমের কাহিনি' হিসেবে পৃথিবীর সকল মুসলমান পালন করে আসছে। হবিগঞ্জের মুসলিম সমাজ অত্যন্ত ভাবগম্ভীরভাবে এই অনুষ্ঠানটি পালন করে। মহরম মূলত সিয়া পন্থী মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলেও সুন্নি মুসলমান অংশগ্রহণ করে থাকে। শিয়া-সুন্নি মতালম্বী উভয়ই পবিত্র মহরম পালন করে থাকে। তবে হবিগঞ্জে সুন্নিরাই বেশি ভাগ পালন করতে দেখা যায়। এই শোকগাঁথার ঘটনার

www.pathagar.com

আয়োজিত অনুষ্ঠানে হবিগঞ্জ অঞ্চলে মর্সিয়া ও জারি গানের প্রচলন মূলত মুখ্য। 'জারি' শব্দের অর্থ বিলাপ বা ক্রন্দন। শব্দটি ফারসি ভাষা। প্রচলিত অর্থে মহরম উপলক্ষে শোকগাঁথাই 'জারিগান'। কারবালার করুন কাহিনি জারিগানের বিষয়[১]। মর্সিয়া ও জারি অর্থ ও বিষয়বস্তু এক, কিন্তু ভাষা ভিন্ন[২]। 'মর্সিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থও শোক করা, ক্রন্দন করা-বিলাপ করা[৩]। 'মর্সিয়ার মূল বিষয়বস্তু কারবালার ঘটনা। মর্সিয়ার একটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে জারি গানের মাধ্যমে। জারিগনের জনপ্রিয়তা কারবালার শোকাবহ ঘটনার জন্যই'[৪]। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে কারবালার শোকাবহ কাহিনি জারিগানের মধ্যেই বর্ণিত হয়ে আসছে। এ কাহিনি নিয়েই প্রথমে জারিগান শুরু হয়[৫]।

হবিগঞ্জের অগণিত আশেক পাঞ্জাতনের ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মর্সিয়া-জারি পরিবেশন ও রচনা করে তাঁদের উৎসারিত শোকগাঁথার মাধ্যমে নিজস্ব পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। হবিগঞ্জে জারি, মর্সিয়াগুলোতে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দাবলির সমাহার পরিলক্ষিত হয়। এগুলোতে পাঞ্জাতন ভক্তদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বই কিছুই নয়। এসমস্ত শোকগাঁথার ভাষা প্রাঞ্জল, ছন্দ ও শব্দ গাঁথুনি বৈচিত্র্যে ভরপুর, সুর করুণ ও মর্মস্পর্শী[৬]। মর্সিয়া পরিবেশনকালে দেখা যায়, আশেকানরা জারির সঙ্গে হাত বুকে মেরে মাতুম করছে, কেউবা নিজ শরীরকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলছে। কিন্তু জারিগান পরিবেশনকালে এরূপ ক্ষোভ প্রকাশ নেই, আছে জারিপাঠে মহরমের কাহিনি বর্ণনায় দুঃখ প্রকাশে কান্নার সুর, আছে ইয়া হাসান, ইয়া হোসেন বলে বিলাপ। এই জারিগান আমাদের লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। জারিগান সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন 'বাংলার লোকসঙ্গীতে একমাত্র জারিগানেই একটু পৌরুষের স্পর্শ আছে'[৭]। কারণ তিনি বলেন 'অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোনো পল্লিগানে যুদ্ধ করা হয় নাই'[৮]।

'মুসলমানরই এদেশে জারিগানের প্রথম প্রবর্তন করে। বাংলাদেশে যে এত সহজে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল আর দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছিল তাহা এইসব জারিগানের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল[৯]। এই জারিগান সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'জারিগান মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান'[১০]।

হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মহরম উপলক্ষে জারিগান হয়ে থাকে। বিশেষত হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সুলতানশী, সুরাবই, চাঁনপুর, বরকান্দি, মির্জাপুর, নাতিরপুর, আন্নারপুর, রিচি, লোকড়া, রায়পুর, বামকান্দি, জালালাবাদ, নোয়াগাঁও, কামড়াপুর, কাশিপুর, জয়নগর, কালনী, পৈল, এড়াইলা, পাঁচপাইড়া, তেঘরিয়া, ভাদৈ, আউশপাড়া, শরীফপুর, হাতিরটার, চরহামুয়া, শংকরপাশা, পুরাসুন্দা প্রভৃত্তি গানে মহরমে জারি গান হয়ে থাকে[১১]। এ গ্রামগুলোতে 'মোকামবাড়ি' বলে পরিচিত ও ছোট-বড় 'হোসেনি দালান' নির্মিত রয়েছে। খ্যাত পীর সাহেবদের বাড়ি 'হাবেলি' বলে গণ্য ও সমাদৃত। এখানেও মহরম উপলক্ষে জারিগানের প্রচলন রয়েছে।

হবিগঞ্জ অঞ্চলের মহরমের প্রাণকেন্দ্র সুলতানশী হাবেলির 'দরবার-এ-মুস্তফা'র পীর-এ কামেল ও মর্সিয়া-জারির রচয়িতা সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেইনী চিশতী

www.pathagar.com

সাহেবের সঙ্গে তাঁর হাবেলিতে এ বিষয়ে আলোচনা করে জানা যায়[১২] 'হবিগঞ্জ অঞ্চলে জারিগান প্রথমে বাহুবল উপজেলায় চন্দ্র চরি হাবেলির শাহ্ ওছি উল্লাহ্ (রা.) সাহেবের আমল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীতে সুলতানশী হাবিলিতে আসে। সুলতানশী সৈয়দ আলাই মিয়া, সৈয়দ মলাই মিয়া ও সৈয়দ ঝলাই মিয়া-এই তিন ভাইয়ের সময় পাক পাঞ্জাতন তরিকার ভক্ত হিসেবে মহরম পালন শুরু হলে জারিগানের প্রচলন শুরু হয়। এ প্রায় ২০০ বছর আগে থেকে। 'সুলতানশী-চন্দ্রচরি, রাইতে দিনে কর্তালের বাড়ি' নিকটবর্তী এই দুটি বাড়িতে মহরমের জারিগানের আয়োজনের ফলে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও খুলা হলের কারণ থেকে এ প্রবাদটি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা।

যে যে স্থানে পাক পাঞ্জাতনের তরিকায় মহরম শুরু হয়েছে সেই সকল স্থানে জারিগান সেই সময় থেকেই চালু হয়েছে। যেহেতু মহরমের কাহিনি নিয়েই জারিগানের সৃষ্টি। 'মহরমের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সুরাবই সাহেব বাড়িতে হযরত ফুল শাহ্ (রা.) সময় হতেই আনুষ্ঠানিক মহরম পালন হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে'[১৩] ।

সুলতানশী হাবেলির পীর সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় আরো জানা যায়, 'মহরম উপলক্ষে ১ তারিখ হতে ১০ তারিখ পর্যন্ত কারবালার করুণ কাহিনি স্মরণে ইমাম হাসান হোসেন (র)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমতায় আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে না রেখে ইসলামী অনুশাসনের বা বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমনি শরিয়তি দলিল বৃত্তিক নিয়মের মধ্যেই আয়োজন হয়ে থাকে। সকল কার্যাদি তিনি নিজে তদারকি করে থাকেন। অত্র অঞ্চলে মহরম উদযাপন, জারিগানের প্রচলন ও প্রসারে মহাকবি সৈয়দ সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সুলতানশী হাবিলী'র অবদান আজও বিদ্যমান'[১৪] ।

'জারিগান বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। অঞ্চলভেধে পরিবেশন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনিরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও মিল নেই[১৫]'। সুলতানশী হাবিলীর পীর সাহেব আরো বলেন 'বৃহত্তর সিলেট কুমিল্লা ময়মনসিংহ ও ঢাকার প্রায় পাঁচ লক্ষ সুন্নি মুসলমান একা নিয়মে মহরম পালন করে আসছে। বিদায় জারিগানের পরিবেশন পদ্ধতি ও কাহিনির মিল রয়েছে'[১৬] ।

হবিগঞ্জ অঞ্চলে জারিগানের সম্পৃক্ত বিশিষ্ট স্থানগুলোতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কালে জানা যায়, মহরমের প্রথম তারিখ থেকেই পাঁচ পাঞ্জাতন তরিকা ভক্তরা দশদিন রোজা রাখেন, তাঁরা নিরামিষ ভোজন করে থাকেন। খালি পায়ে হাঁটেন ও মাটিতে পাটি বিছিয়ে ঘুমান। সারা দিন রাত ঘুমের মধ্যে কাটান। নামাজ-কালাম আদায় করে বিশেষ প্রার্থনায় দশ দিন অতিবাহিত করে থাকেন। মহরমের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুরুষরা সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা এমনকী গভীর রাত পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে দলবদ্ধভাবে মর্সিয়াও জারি পরিবেশন করে। জারিয়াল দলকে বাড়িওয়ালা সিন্নি হিসেবে আখনি রান্না করে খেতে দেয়। এভাবে হবিগঞ্জ অঞ্চলের গ্রামগুলোতে জারিগনের প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। গ্রামের নারীরাও দলবদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে জারিগান গেয়ে থাকে। উভয় দলেরই বয়াতি থাকে। বয়াতি জারিগানের ধুয়া ধরে ও দলের

www.pathagar.com

অন্যরা গানে দোহার দেয়। দোতারা, ঢাক, ঢোল, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র জারিগানে ব্যবহৃত হয়। জারিগান পরিবেশনে দিন-রাতের কোনো বিধি নিষেধ নেই। ৯ই মহরম আশুরা দিবস। এ উপলক্ষে প্রতিটি মোকাম বাড়িগুলোতে বড় সমাবেশ হয়। একাধিক জারিয়াল দল সারা দিন রাত জারিগানের আসর করে শোকের মাতম করে আগত ভক্তদের প্রাণ কাঁদিয়ে দেয়। যেহেতু 'জারিগানের মতো ব্যথার সুর অন্য কোনো গানে ধ্বনিত হয়ে উঠে নাই'[১৭]। আয়োজক কর্তৃক তৈরি সিন্নি তবারক খেয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফেরে। ১০ মহরম তাজিয়া মিছিল হয়। শহরতলি বড় বড় দল তাদের সুদর্শন তাজিয়া কাঁধে বহন করে শহর প্রদক্ষিণ করে, তারা দলে দলে মর্সিয়া ও হাহাজারিমূলক জারিগান গেয়ে মহরমের কাহিনি বর্ণনা করে। গ্রামগঞ্জেও তাজিয়া বহন করে আশপাশের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে থাকে। মিছিলের অগ্রভাগে রাস্তায় লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও তলোয়ার যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করা হয়। শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বা রাস্তার মোড়ে তাজিয়া থামিয়ে মূর্ছা যায় ও লাঠি খেলা হয়। আশপাশের উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়ে এ মহান ত্যাগের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে। মিছিলে আগত লোকদের ক্লান্ত, বিমূর্ষ দুঃখে ভারাক্রান্ত দেখালেও তাদের জীবন বাজি দেওয়ার উদগ্রীব সাহস লক্ষণীয়। মিছিল শেষে ইমাম পাড়ায় তাজিয়া শপে দিয়ে মহরমের আনুষ্ঠানিকতায় শেষ হয়।

মিছিলে কাগজের তৈরি ছোট ছোট ঘোড়া, তুলার তৈরি 'বোরাক', দুলদুল তৈরি করে। এমনকি জ্যান্ত ঘোড়াকে সাজিয়ে নিতে দেখা যায়। সিয়া সম্প্রদায় বোরাক তৈরি করে এবং মানত-মানসিক লোকজন তাদের মানতের আশা পূর্তিতে কাগজের ঘোড়া তৈরি করে মিছিলে যোগ দেয়। এ লৌকিক বিশ্বাস। জ্যান্ত ঘোড়ার ব্যবহার জায়েজ বলে জানা যায়।

জারিগান অনুষ্ঠানের প্রধান সময় মহরম মাস হলেও হবিগঞ্জ অঞ্চলে বিভিন্ন সময় নানান উপলক্ষে জারিগানের আসর বসতে শোনা যায়। মূল বিষয় 'বিষাদ সিন্দু'-তে বর্ণিত কারবালার ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য কিছু বিষয়ে জারিগান হয়ে থাকে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনী কর্তৃক ত্রিশ লক্ষ জীবন হরণের ওপর একটি জারি গান স্বাধীনতার পরপরই হবিগঞ্জের টাউন হলে উচাইলের কবিয়াল আয়াত আলী সরকার পরিবেশন করেছিলেন, যা আমি দর্শক হিসেবে প্রত্যক্ষ করে ছিলাম।

কবিগান ও জারিগানের কবিয়াল বা বয়াতি মুসলমান সম্প্রদায়ের একই ব্যক্তিরা। জারিগানের হিন্দু সম্প্রদায়ের কারো নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। কবিগানের সঙ্গে জারিগানের পরিবেশন পদ্ধতি প্রায় একই, তবে কবিগানে বির্তক আছে, জারিগানে বির্তক নেই–বর্ণনা রয়েছে। কবিগানে প্রশ্ন-উত্তর আছে, আছে আক্রমণ, ব্যঙ্গ রস, কটূ বাক্য, জারিগানে তা নেই। আছে ব্যথার করুণ সুর ও সুখগাঁথা কাহিনি পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন জারিগানের সঙ্গে কবিগানের তুলনা করে বলেন 'হয়তো এ দেশি কবি গানের অনুকরণেই আমাদের মুসলিম সমাজে জারি গানের প্রচলন হইয়া ছিল'[১৮]।

জারিগান সংগ্রহের উদ্দেশে হবিগঞ্জ অঞ্চলে সম্পৃক্ত কয়েকটি স্থানে যাওয়া হলে জারি সংগ্রহসহ জারিগান পরিবেশন প্রত্যক্ষ করা হয়। তখন দেখা যায়, বাড়ির বৈঠক ঘরের সামনে (বাংলা ঘর) উন্মুক্ত জায়গায় কোথাও বাড়ির প্রসস্থ উঠোনে চর্তুদিক ঘিরে

www.pathagar.com

দর্শকের ভিড়, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের পঞ্চায়েত বা সর্দার সাহেব মাঝের খালি জায়গায় এক কোণে চেয়ার নিয়ে একদিকে সভাপতি হয়ে বসে আছেন। মহিলারা দূর থেকে ঘরের আঙিনায় জড়ো হয়ে উঁকিঝুঁকি রত। সভাপতির অনুমতি প্রাপ্তিতে মূল বয়াতি রঙিন লম্বা পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা পরে গলায় লম্বা একটি চাদর উত্তরীয়র মতন ঝুলিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে একটি রুমাল বেঁধে ও পায়ে নূপুর বেঁধে সংরক্ষিত ফাঁকা গোলাকার জায়গায় উপস্থিত হয়ে সকলকে সালাম জানায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন পোশাক গায়ে কোমরে গামছা বেঁধে আট জন, কোথাও ১০ জন, কোথাও বা ১২/১৫ জন জারিয়াল দল সঙ্গে যন্ত্রীদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে যথানিয়মে সবাইকে সালাম জানায়, তারা সবাই পুরুষ এবং ধর্মে মুসলমান। (স্থান ভেদে জারিয়ালদের পোশাকের বৈচিত্র্য রয়েছে)। মূল বয়াতি এবার বন্দনা শুরু করলে—

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আর মুরুব্বিয়ান
সভার মাঝে আছেন যত হিন্দু-মুসলমান
এই অধীনের সালাম আদাব করিবেন গ্রহণ
দোয়া চাই মঙ্গল মতো জারি যেন
পারি করিতে বর্ণন।
প্রথমে বন্ধনা করি ফতে গাজী আউলিয়া
শাহজি বাজার ফতেপুরে আছেন তিনি শুইয়া
তার পর বন্ধনা করি আমারই পীর মুর্শিদ চরণে
শুরু করি মাতা পিতার পরের স্থান পীর বাবার স্মরণে।[১৭]

বন্ধনার সঙ্গে ঢুলকের বড় বড় ঠোকা। সাথিরা নিরব। তারপর ঢুলি একাই ঢুলের কিছু মহড়া বাজাল সঙ্গে বাঁশির করুণ সুর। এবার মূল বয়াতি পশ্চিমমুখী হয়ে মাটি সালাম করে সভার মাঝে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে দিশা গেয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার দলের জারিয়ালরা দিশা ধরে সমস্বরে দোওয়ার দিয়ে গেল। সঙ্গে যন্ত্রীরাও সহযোগিতা করল। বয়াতি নানা ভঙ্গিতে নেচে গেয়ে মহরমের বীরত্ব ও করুণ রসে মিশ্র শোকগাঁথার কাহিনি বর্ণনা করল। উপস্থিত গ্রামবাসী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জারিগান উপভোগ করল। এই পদ্ধতিতে জারিগান আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ধারণ বা পোশাক ও নূপুরের ব্যবহার হতে দেখা যায় না। স্থানে স্থানে জটলা বেঁধে বয়াতিরা জারিগান গায়, সঙ্গে কিছু যন্ত্রী থাকে। মর্সিয়া তুলে তালে তালে শোক জানায়। এছাড়া শহরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হলের মঞ্চে পরিবেশিত জারিগানে বন্দনা থাকে না, বয়াতি নামে শিল্পী তার ছোট দল নিয়ে জারিগান গেয়ে থাকে।

হবিগঞ্জ অঞ্চলে যাঁরা জারিগান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুলতানশী হাবেলির সৈয়দ আবদুল করিম হোসানী চিশতী, সৈয়দ আবদুর রহিম হোসানী চিশতী, সৈয়দ গোলাম মুস্তফা হোসানী চিশতী, সৈয়দ আবদুল আলীম হোসানী চিশতী, সৈয়দ গোলাম হায়দর হোসানী চিশতী, চানপুরের আবদুল হাকিম, শরীফপুরের নাসির উল্লা, হাতির টানের সিকান্দর আলী গাইন, ইয়াসিন উল্লা, এড়ালিয়ার শাহ্ মো. ইব্রাহিম, আউশ পাড়ার নবাব মিয়া, মশাজানের সৈয়দ আব্দুল নবী ফুল মিয়া, বাম কান্দির কিস্মত আলী শাহ্,

www.pathagar.com

গবিনপুরের আদিম উল্লা, পুরাসুন্দার কলন্দর আলী, সুরাবই গ্রামের রিয়াছত খা, শায়েস্তানগরের শাহ্ আলম বেলাতী, বানিয়াচঙের মমতাজ আলী, স্থান ঘাটের মুন্সী জহুর উদ্দিন, আউশ পাড়ার সৈয়দ ইসাইল আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য[২০]। এছাড়া হবিগঞ্জের বিশিষ্ট লেখক সিলেট বেতারের গীতিকার অ্যাড মো. শাহজাহান বিশ্বাস কয়েকটি জারিগান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত বানিয়াচঙের জারিগান শেখ ভানুর জারিগান ও হবিগঞ্জের জারিগান উল্লেখযোগ্য। হবিগঞ্জের কয়েকটি জারিগান নিম্নে দেওয়া হলো।

পুড়াসুন্দর কলমদর ফকিরের একটি উল্লেখযোগ্য জারিগান—

আল্লা আজগরে লাশ লইয়া বানু মাত্তম জুড়িলা রে
ও বাছা আজগর কই গেলায় রে।
আল্লা কুলেতে লইয়া দুধ আর খাওয়াইমু কারে
আত্মা পানি খাইয়া, শান্ত হইয়া কুলেতে আসিবায় রে
ঐ আশাতে পন্থপারে রইলাম চাইয়া রে
আল্লা পানিনি খাইয়াছ বাছা, চান্দ মুখেতে বল রে।
আল্লার গলেতে লউয়ের ধারা কেনরে
সর্ব অঙ্গ লউ-এ ডুবা কী কারণে রে
আল্লা কি গুনাহ করিলাম আমি আল্লাজির দরবারে
আল্লা কোন পাষাণে কোন পরানে এ ডাকাতি করলায় রে
পিয়াসা বালকের গলে কেনে তীর মারিলায় রে
আল্লা কই আছে দুরন্ত তীর আনিয়া আমায় দেওরে
আল্লা বুকেতে লাগাইয়া তীর পরান ত্যজিব রে
এ ধরাতে এই জীবন আর না রাখিব রে
আল্লা পরান ছাড়া হইলা বানু কহিতে বলিতে রে
ও বাছা আজগর কই গেলায় রে।

শেখ ভানুর জারি

প্রথমেতে আল্লা রাসুল বন্দী আমি আজ
সিলেটের শাহজালাল হইলা আউলিয়ার তাজ ॥
হবিগঞ্জের মুড়ারবন্দে কুতুবুল আউলিয়া
ফতেহপুরে ফতেহ গাজী আছেন শুইয়া ॥
শ্রদ্ধাভাজন মা-বাবা আর মুর্শিদ কাণ্ডারি
সবায় সালাম দিয়া শুনাই শেখ ভানুর জারী ॥
আরে ও-ও-ও-ও ...
হবিগঞ্জের পশ্চিম দিকে ভাটি অঞ্চলে
লাখাই থানা সেথায় আছে জানেন সকলে ॥
সেইখানেতে আছে শুনেন ভাদিকাড়া গ্রাম
শেখ ভানু জন্ম নিয়া বাড়াইলা সুনাম ॥
বার শ ছাপ্পান্ন সালে শেখ ভানু জন্মিলা

www.pathagar.com

ভাদিকাড়া গ্রামটি ভানু উজালা করিলা ॥
তেজারতি শুরু করেন অতি বাল্যকালে
সদাই কেনাবেচা করতেন ভৈরব অঞ্চলে ॥
আরে ও-ও-ও-ও ...
সওদা বোঝাই নৌকা লইয়া নদীর উপর দিয়া
নিত্য যাওয়া-আসা করতেন আনন্দিত হইয়া ॥
একদিন ভানু বইসা আছে ছৈয়ার উপরে
মরা একটি মানুষ আসে তাহার নজরে ॥
সেই লাশেরই বুকে বইসা কাকে চক্ষু খায়
এই ছবি দেখিয়া ভান করেন হায় রে হায় ॥
সোনার বরণ তনু হায় রে কাকে ছিঁইড়া খায়
মরণ হইলে পরে আমার কী হবে উপায় ?
আরে ও-ও-ও-ও ...
কত আড়াই বড়াই করি এই দেহ রে লইয়া
মরণ হইলে সোনার তনু রইবে রে পড়িয়া ॥
স্ত্রী-পুত্র-ইষ্টি কুটুম কেউ হবে না সাথি
কয়বরেরই আন্ধাইর ঘরে কেউ দিবে না বাতি ॥
এই ভাবিয়া শেখ ভানু কান্দেন জারে জার
আল্লা ছাড়া কিছু নাই রে মিছা এ সংসার ॥
আহাজারি করেন ভানু হইয়া বেসামাল
তোমার দিদার দেখাও মোরে ওগো পাক দয়াল ॥
আরে ও-ও-ও-ও ...
বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ি সকলই ছাড়িয়া
খোদার রাহেতে ভানু গেলেন চলিয়া ॥
কান্দেন বিবি সারবানু জুলায়খা বসিয়া
সোনার পুরী আন্দাইর হইল জনমের লাগিয়া ॥
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রাসুল
দয়াল আল্লা শেখ ভানুরে করিলা কবুল ॥
শেখ ভানুর জারি ভাইরে এই করিলাম শেষ
সালাম-আদাব সবার তরে জানাইলাম অশেষ ॥

হবিগঞ্জের জারি

আল্লার নাম লইয়া আমরা নবী করলাম সার
যার উছিলায় সৃজন হইলো এ ভব সংসার
বাবা শাহজালাল আরো কুতুবুল আউলিয়া
ফতেপুরের ফতেহ গাজীর বন্দনা করিয়া
সবার সাথে মা ও বাবায় সালামও যে করি

www.pathagar.com

শুরু করলাম শুনেন সবে হবিগঞ্জের জারি।
আরে ও... ও ...
খোয়াই নদীর তীরে মোদের হবিগঞ্জ শহর
হিন্দু-মুসলিম বসত করি নাহি আপন-পর
মহাকবি সৈয়দ সুলতান দ্বিজবংশী দাস
বিপিন চন্দ্র পাল আর হেমাঙ্গ বিশ্বাস
দীনহীন, শাহনুর, শেখ ভানু রতন
আরাকানের সভাকবি কোরেশী মাগন
ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস আর বৃন্দাবন দাস
স্বভাব কবির নামটি জানি জয়তুন বিশ্বাস
কবি গোলাম মর্তুজা আর উস্তাদ বাবর আলী
কাব্য-গানের ছন্দ-সুরে তাঁদের মিতালি
নাচের ঝংকার তোলেন শংকর সরকার
নৃত্যশিল্পী ছিলেন তিনি মোদের অহংকার
আরে ও... ও ...
মনসুর বয়াতি ছিলা বানিয়াচঙের প্রাণ
চোখের জলে লেইখা গেলা 'মদিনা'র গান
ফরাসি দেশের পণ্ডিত রিমা রলা নাম
মদিনার কাহিনি পইড়া করিলা সুনাম
বানিয়াচঙের সেই কাহিনি আলাল দুলাল
আঁধুয়া সুন্দরী ও সুরত জামাল।
কমলাবতী বিসর্জিলা-সাগর দিঘির জলে
কান্দন রানি আইজও শুনি রাত্রি নিশাকালে
হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চল সীমাহীন হাওর
আষাঢ়িয়া বানে সাজে অকূল সায়র।
কত সুন্দর চায়ের বাগান উজানি নগরে
চোখের নজরে তারা ঝলমল ঝলমল করে
হবিগঞ্জের জারি ভাইরে এই করিলাম শেষ
সালাম আদাব সবার তরে জানাইলাম অশেষ।

সৈয়দ আব্দুন নূর হোছেনী চিশতী ওরফে দীনহীন-এর জনপ্রিয় জারিগানটি নিম্নরূপ :

মাওম করইন জয়নব হায় হায়রে ও ভাই হুছেনা উঠ চল যাই
মদিনা
শ্যামের মুল্লুকে সাম হইলরে ও ভাই হুছেনা উঠ চল যাই
মদিনা।

১

মদিনা ছাড়িয়া তুমি আসিলায় কবলা জমি, আমি কেমনে যাইব একেলারে ও ভাই হুছেনা।

www.pathagar.com

২

জয়নাল আবেদীনে ডাকিতেছইন গনে গনে ও ভাইরে নয়ান
তুলিয়া দেখ তোমার পিয়ারা ছকিনারে ও ভাই।

৩

কী দয়া কইরাছ যে ভাই, অকুলে ভাসিয়া বেড়াই ও ভাইরে
তুমি বিনে কুলত দেখিনারে ও ভাই হুছেনা।

৪

বে নিশান হইয়াছ রে ভাই, নিশান খুঁজিয়া না পাই, ও
ভাইরে রইল নিশান আবিদ আর ছকিনারে ও ভাই।

৫

রহমের সাগর তুমি, কোরানে শুনিয়াছি আমি, ও ভাইরে যার
কাণ্ডারি হও তুমি তার নাও ডুবেনারে ও ভাই।

৬

কবলায় কী সুখ পাইয়া, গিয়াছ আমারে ছাড়িয়া, ও ভাইরে
কইমু কী আর তুমি কী জান নারে ও ভাই।

৭

আউয়ালে আখেরে জানি, দিয়াছ চরণ ও দুইখানি, ও ভাইরে
দীনহীনরে বঞ্চিত কইরো নারে ও ভাই হুছেনা উঠ চল যাই মদিনা।

সৈয়দ গোলাম নবী হোসেইনী চিশতী ওরফে দুলাল মিয়া রচিত জনপ্রিয় জারিটি নিম্নরূপ :

ধুয়া : হায় গা আল্লাহ সহে না অন্তরে বংশপুরী সবই নিয়া ভাসাইলা অকূলে জয়নালের আর কেহ নাই, আপন এতিম হইলাম সংসারে।

১. আল্লাহ কতই আদর করে ডাকিয়া নিতেন কোলে, মদিনাতে ছিলাম যখন জানের সঙ্গেতে। ঐ

২. আল্লাহ আগে যদি জানতাম হায় রে বাবাজি আমারে, সঙ্গে আনিয়া ছাড়িয়া যাইবেন আমায় একা ফেলে॥ ঐ

৩. আল্লাহ না আসিতাম কারবলাতে মদিনা ছাড়িয়া, বাবাজানের চরণ ধরিয়া থাকতাম পড়িয়া॥ ঐ

৪. কী ভাবিয়া কোন পরানে বিমার হালে মোরে, কার হাতে রাখিয়া আমায় গেলেন কারবালার রণে॥

৫. সর্বহারা করিয়া হায় রে হারামুরে দলে, কতই না বেইজ্জত করিয়া খীমা খানা নেয় লুটে॥

৬. প্রাণের বাবা ও বাবা, দেখলায় না আসিয়া, একা পাইয়া নিষ্ঠুর সীমার বান্দিয়া লইয়া যায় আমারে॥

৭. আল্লাহ নবীর উম্মত উদ্ধার করিতে, আপন সাধে সাধে প্রাণী দিলায় কর্বলাতে কউল আদায় করিবারে ॥

www.pathagar.com

৮. আল্লাহ প্রাণে নাহি ধৈর্য মানে বিরমন দেইখা, ছিড় ছাড়া পড়িয়া আছে লহু নদী বহিয়া চলিছে।

৯. আল্লাহ সোনার তনু ধূলির মাঝে গড়াগড়ি যায় রে, দাফন কাফন করিতে বাবা হইল না আমারও ভাগ্যে॥

১০. আল্লাহ হায়, হোছন হোছন বলে কান্দে কুল আলমে, পুত্র হইয়া কেমনে সহিয়া তোমায় রাইখা যাইতাম রে॥

১১. আল্লাহ তোমার জয়নাল লইয়া যায় রে, এজিদার সামনে, দয়া রাইখ প্রাণের বাবা আর বেইজ্জত হইও না যে।

১২. আল্লাহ দুঃখ আমার বলিও গিয়ে, নবীজীর চরণে, এত চিত্তম কেন ঘটাইলো তার ও উম্মত মুসলমানে॥

১৩. আল্লাহ জয়নাল তোমার অবুঝ ছেলে, বেপানা জানিয়ে, চরণ তলে রাখিও বাবা নজর রাখিও দুলালেরে॥

ধুয়া : রইল দুঃখ কারবালায় আসিয়ারে ও ভাই হুছন নয়ান তুলিয়া
দেখ রে, আল্লা দুপুইরা ডাকাতি হইল জয়নবের লাগিয়ারেও ভাই হুছন॥

১

বলিতে কেউ নাই আপন, সবই দেখি দুশমন, কবলার ভুবন,
লৌয়ে লালে ভাসে দেখি নাজুক সোনার তন রে ॥

২

কী বলল দুঃখেরই কথা, বুক ফাইটা যায় লাগে ব্যথা, উপায়
কী এখন, তোমার ছগিনা ছুগেরায় কান্দইন হইয়া অচেতন রে॥

৩

যার পানে চাই সেওই কান্দে, ক্ষিার ভিতর শিশুগণ, পানিরও
কারণ, আল্লা পানি বিনে নবীর বংশের এত বিরমনরে॥

৪

পলাইবার আর জায়গা নাই, সঙ্গে কইরা নেও না ভাই, সঙ্গী
যতজন, আমি অকুলে ভাসিয়া বেড়াই পাগলের মতনরে॥

৫

তুমি ভাই ইমাম হুছন, যে পাইল তোমার চরণ, তার কিসের
কমরণ, আল্লা আমি দুঃখিনী জয়নবের আশা না হইল পুরণ রে॥

৬

পাতকির বন্ধু তুমি, কোরানে শুনিয়াছি আমি, ইমাম রতন,
আল্লা ইমামের গমে প্রেমে হইবনি মরণরে।

৭

অধম কাঙালের আশা, মনে নাই আর অন্য দিশা, বিনে ঐ
চরণ, আল্লা তোমার দাস বলিয়া চরণেতে রাখিও স্মরণ রে॥

www.pathagar.com

২৫.০২.১২ তারিখে শিল্পী হরিপদ দাস (৪৫), পিতাঃ অক্কুর মনি দাস, মাতাঃ সুমঙ্গল দাস, গ্রামঃ হারুনি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি.। তিনি একজন বাউল শিল্পী ও গীতিকার। তার কাছ থেকে তার নিজের লেখা এই জারিটি গীত করার পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়—

সোনার বাংলা আর রুপের বাংলারে
এই দেশেরই মাঠে ঘাটে সোনা ফলে রে ॥

১

ছায়া ঘেরা জন্মভূমি তুলনা যার নাই
এই দেশেতে জন্ম আমার বাংলার গান গাই
পাখিরা সব গান ধরে আকুল হইয়া রে ॥

২

এ দেশেতে আছে অনেক আঁকাবাকাঁ নদী
দিবা নিশি শ্রুত বহে নিরবধি,
হরিপদ রায় রূপ দেখে মন
পাগল হইল রে ॥

১০.০৩.১২ তারিখে খাইরুল বেগম (৪৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : শেখের মহল্লা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তার নিজ বাড়িতে এই জারি গীত করার পর সংগ্রহ করা হয়।

কাছুমালী রণে গেল, সখিনারাও মেন্দি তুলাইন
যত বিবি গণ কাছুমালির মেইন্দা তুলাইন একে লা হুসন
সখিনারে গোসল করাইন যত বিবিগণ
কাছুমালীর গোসল কারাইন একেলা হুসন।
ওরে হায় হায় মাত্তম।
গুইরা মাইরা যাইন বা কাছুম ফিইরা ফিইরা চাইন
আজ কেন ফুলের সখিনা সানে আছাড় খাইন।
আগে যদি জানতায় কাছুম রণে যাইবায়
মন তে কেন করলায় কাছুম সখিনার রিরমনা।
সখিনার মিন্নতি করইন হইয়া জারে জার
এক রাত্রি থাকিয়া যাও সখিনার বাসর
আওলাদ থইয়া যাও দুনিয়ার উপর
কও কও রে ঘোড়া শহীদের খবর
খোল খোল সখিনাগো হাতের ও বেসর।
মায়ের কাছ থেকে হইনে বিদায় হইয়া অবিকল
সখিনার ভরাইল আল্লায় কারবালায় ডুবাইন।
হায় রে হায় হায়মাত্তম।
কারবালায় ও রোইল পড়িল কিসের ও মাত্তাম।

www.pathagar.com

আল্লায় আনারস কাটিয়া দেখুইন তাতে দানা নাই
সখিনার বড়াই আল্লায় কারবালায় ডুবাইন।
নারিকেল কাটাইয়া দেখুন তাতে পানি নাই।
পানি বিনে স্তনের দুধ গেল শুকাইয়া।

১৫.০২.১২ তারিখে আব্দুল ছত্তর (৭০), শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, পেশা : কৃষি, গ্রাম : পাড়াগাঁও, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ তাঁর কাছ থেকে মহরম উৎসবে এই দলগত পরিবেশনের সময় তিনটি জারি সংগ্রহ করা হয়।

(এক)

কারবালাতে রোদন শোনা যায়,
কান্দে সখিনায় কী হইল রে জঙ্গ কারবালায়
আয় রে ইমাম কুপা শহর চৌদিকে এজিদের লস্কর
রও নহর বহে কারবালায় ॥ ঐ

১

মহরমের ১০ তারিখে আরাফাত ময়দানের বুকে
পানি লুটে দারুণ এজিদায়
একে একে নবীর বংশ ফুরাত কুলে হইলো ধ্বংস
কান্দে বিশ্ব দুই ইমামের দায় ॥ ঐ

২

আজাগর বাচ্চারে লইয়া দুলদুলে সওয়ার হইয়া
যায় রে ইমাম ফুরাত কিনারায়
জলেতে নামিলে পরে কাফেরেরা নজর করে
তীর মারিল মাসুম বাচ্চার গায় ॥ ঐ

৩

বাচ্চার গায়ে রক্ত ঝরে, কান্দে ইমাম ঝরে ঝরে
ঘরে ফিরে কী বলিব হায়
রক্ত মাখা শিশুর গা দেখিয়া জননী মায়
সোনার অঙ্গ ধুলাতে লুটায় ॥ ঐ

(দুই)

জয়নব ও সারবান কান্দইন গো ডাকিয়া রাসুল
কী লিখা লিখছ বিধি দারুণ ও কপালে
আমরা লক্ষ নাই সরাল ও সংসারে
জয়নব ও সারবান কান্দইন ও ডাকিয়া রাসুলরে
আল্লাহু পিয়ারা মোহাম্মদ দিন রৌসন
তিনির পিয়ারা দুই ইমাম হাসান ও হুসেন
তে কেন জালিমের দলে দিল জ্বালাতন
জয়নব ও সারাবান কান্দইন গো ডাকিয়া রাসুল

www.pathagar.com

জয়নব বেওয়া সারবান বেওয়া, বেওয়া সখিনা
এক ঘরে তিন বেওয়া সুনার মদিনা
পালকা নাতে নারী গণে কী হবে উপায়
জয়নব ও সারাবান কান্দইন গো ডাকিয়া রাসুল
আওয়াল ও শুক্রবারে জুম্মার ও নামাজ
নিমবরে বসিয়া পড়য়ইন খুদবারই বয়ান
খুদবা পড়িয়া দোয়া কর আমরারই কারণ
জয়নব ও সারবান কান্দইন গো ডাকিয়া রাসুল
নিদান কালে কোথায় রইলায় হানিফ চাচা জান
চক্ষুতে না দেখিলায় জয়নালে নিদান
জয়নব ও সারাবান কান্দইন গো ডাকিয়া রাসুল

(তিন)

হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা গিরিল পাপি দয়া নাই তোমার
জালিম ও জোলুম সব চরিমার
আবু দিয়া সৈয়দ শিশু কান্দিয়া জার জার
আল্লাহ হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার
যখন শুনিলায় মায় রণেতে গণ্ডুগুল
ঘর থেকে বাহির হইলা আওলাইল মাথার চুল
সাত পুত বলিয়া মায়ে কান্দিয়া লইলা কুলে
লাড়িয়া ছাড়িয়া না পাইন জাদুর বোল
আল্লা হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লা
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার
কে তোমায় শিখাইলো যাদু নুর নবী বয়ান
কে তোমায় শিয়াইল যাদু কারবালার ও ময়দান
কে তোমায় কাঠিয়া নিল এ সুন্দর বদন
ও নাতে নাত আলীর ও নন্দন
হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার
যখন যাদু আর গলায় ধরিল খুঞ্জন
মদিনার লোকে জুড়িলা মাত্তম
মাত্তমের সুরের উপর গগণ ও ধাইল
হায় হায় জালিমের দলে কী চিত্তম বাড়াইল
হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার

www.pathagar.com

আল্লা বলেন জিবরাইল লও খবর
আজ কেন সিংহাসন কাঁপে থর থর
রাসুলের ও মেয়ে আইছন
ফাতেমা জননী ঐ কারণে
সিংহাসন কাঁপে থরথর
হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার
যাও জিবরাইল লইয়া যাও খবর
ফাতেমাকে লইয়া যাও বেহেশত খানা ঘর
বেহেশত খানা ঘরে গিয়ে
সব খানা খাওয়ায় ও মায়ার পাথর
মায়ের বুকেতে বুলাও
হায় হায় নবী হাবিব ও আল্লাহর
মদিনা ঘিরিলো পাপী দয়া নাই তোমার

৯. বাউল গান

২০.০৯.১১ সকাল নয়টার সময় ইঞ্জিনচালিত নৌকায় বিথলঙ্গ গ্রামে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের আখড়াতে যাই। বানিয়াচং সদর থেকে বিথলঙ্গ আখড়াটি প্রায় ১৩ মাইল। বর্ষাকালে নৌকাইএকমাত্র যোগাযোগের সুবিধাজনক বাহন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যুগ সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ৩৬০টি আখড়ার মধ্যে এই আখড়াটি হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

আখড়ার মন্থ সুকুমার বৈষ্ণব (৬৫)-এর সঙ্গে আখড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কয়েক ঘণ্টা আলাপের পর তাঁর কাছ থেকে রামকৃষ্ণের ৪টি গান সংগ্রহ করি। আখড়ার সঙ্গে সংস্লিষ্ট কয়েকটি কিংবদন্তিও সংগ্রহ করা হয়। রামকৃষ্ণের গানগুলো সুর, তাল ছাড়াই গেয়ে শোনান রবীন্দ্র চন্দ্র দেব (৫৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ, পেশা : চাকুরি, গ্রাম বিথলঙ্গ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

(এক)

মুইনারে মোর মন গিয়াছিল
কৃপায় ত্বরাও ভবসঙ্কট হর।
কপট চাতুরি করি না ভজিনু তারে।
হেলায় হারিল প্রভু! বুদ্ধি নাই সে ধরে।
ভূমি, জল, অগ্নি বায়ু একত্রে পুড়িয়া।
সন্ধানে ব্রহ্মেতে ডুব ডাটে রাখ কায়া।
হিরামন দাস বলে ভক্তির এই সন্ধি।
চারি চন্দ্র এক করি মন কর বন্দী।

www.pathagar.com

(দুই)

তোমারে আমি ভজিব কেমনে হে নাথ,
তোমারে আমি ভজিব কেমনে।
অক্ষর নির্ণয় নাই, 'জপে তপে নাহি পাই,
রূপ বর্ণনা দেখি নয়নে।
তুমি সে জীবের জীব, তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,
তুমি প্রভু ধরণী আকাশ।
হইবো তোমার দাস, তুমি কর নিরাশ
যত দেখি সকলি বিনাশ। ...
হয়েছে হইবে যতে, তোমার মহিমা হতে
নিমেষেতে না রবে সকল ।
তুমি প্রভু দয়াময়, লীলা তব না বুঝায়,
এই ভাবে মন সে বিকল ।
যে কর সে কর তুমি, তোমায় কী বলব আমি,
মনে মাত্র এই রাখি আশা ।
রামকৃষ্ণদাস কয়, না দেও তুমি পরিচয়,
বঞ্চিতের গুরুই ভরসা ॥

(তিন)

'ভোজন কর মন, জ্ঞান অমৃত।
ছাড় হে অন্য আশা ভাব হে তারে।
নিশ্চিন্তে রহুক মন প্রভুর দ্বারে ॥

আন আন যত দ্রব্য সব বিনাশী।
গুরুর চরণ প্রসাদ পাইলে মন তরি॥
হীন রামদাসে বলে ফুলফল যত দেখি।
গুরেতে রাখ, নিবেদয়, নয়ন ভরে হেরি ॥
(অদ্যাপি আখড়ায় ভোগের পূর্বে প্রতিদিন গানটি গীত হয়ে থাকে)

(চার)

মন গুরু ভজ, পরম আনন্দে।
সুখে দুঃখে রও রে মন, তুমি প্রভুর ধ্যানে
সুখ সম্পদ পাইয়া মন ! তুমি না ভুলিয়া রইও ।
নিকটে যমের ঘাট রে, সাবধান হইও ॥

www.pathagar.com

যে আছে মনের দুঃখ গুরুবিনে কাহাতে কহি।
বাহ্য অভ্যন্তর নাহি মন, গুরুতে সকলি সঁপি
হীনরামদাসে বলে সমুদ্রে ভাসিয়া।
পাঁকে না ঠেকাইও নিও উদ্ধারিয়া ॥

বানিয়াচং যাত্রাপাশা গ্রামে শ্রী হৃদয়ানন্দ গোস্বামী ১৯২৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যাম বাউল আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা তার পূর্বপুরুষ। তিনি অনেক ধর্মীয় গান লিখেছেন, ৩০.০৯.১১ তারিখে শ্যাম বাউল আখড়ায় তাঁর ছেলে বাসুদেব গোস্বামী গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়-

(এক)

গুরু তোমার লাগি এই পুড়া প্রাণ
সদাই কেন কান্দে ও
দয়ার ধন গুরু আমার ও ॥

ও গুরু ও গাছের বল হয় শিকড় বাকল
মাছের বল হয় পানি
দুধের বল ক্ষীর সর ননী আমার বল তুমি ও ॥

গুরু ভব নদীর পাড়ে আছি
পার হইবার আশে
নাও আছে কাণ্ডারী নাই পার হইব কিসে ও ॥
ও গুরু এ দীন হৃদয়ানন্দ বলে
সমুদ্রে ভাসিয়া আর কতকাল রইব আমি
ঐ কূলের পানে চাইয়া ও ॥

(দুই)

গুরু মত্য পূর্ণ ব্রহ্ম এই মহাবাক্য দিয়েছিলে যে জন
সর্বজীবে পরমব্রহ্ম বলেছেন যে জন
সেই সিদ্ধা পুরুষ রায়কৃষ্ণ তোমায় করি নমস্কার ॥

রায়কৃষ্ণ নাম জপ মন রে আমার
ঐ মনেতে হরিবে মন ভব সিন্ধু পার।
কত শত সাধু পুরুষ কত মহাজন
তাঁর চরণে পূজা দিলেন মজাইয়া মন
শ্রী গুরুর বৈষ্ণব পদের মহিমা অপার,
আধ্যা গুরু মাছুলিয়া প্রধান বিথলঙ্গ
শ্যাম বাউলের ভক্তি ছিল রামকৃষ্ণ সার।

www.pathagar.com

জীব দয়া নামে রুচি শ্রী গুরুভজন
এই উপদেশ দিলেন গোসাই রাখিতে স্মরণ
গুরু বিনা ত্রিজগতে কিছু নাই আর ॥

০২.০৯.১১ তারিখে বানিয়াচঙ্গের কুতুবখানী মহল্লার অধিবাসী স্বভাবকবি আব্বাস উল্লার বাড়িতে যাই। তিনি ১৯১১ সালের প্রথম দিকে কুতুবখানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে কাব্যচর্চা করেছেন বলে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর ছেলে ও আত্মীয়স্বজনরা তার লেখা গানগুলো সংগ্রহে না রাখার কারণে অনেক গানই হারিয়ে গেছে। লেখাপড়া তেমন না থাকলেও গান ও গাথা রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কুতুবখানী গ্রামের কৃষক আব্দুল হামিদ মিয়া (৫৫)-র বাড়িতে যাই। তিনি গিয়ে আব্বাস উল্লার দুটি গান গেয়ে শোনালে একটি লিপিবদ্ধ করি।

দিবানিশি ভাবনা আর কই গেল রে দিন আমার
শুধিতে না পারিলাম আমি অভাগী মার দুধের ধার
যখন ছিল শিশুকাল, মায়ের ছিলাম হিরালাল
যখন ছিল যৌবনকাল, গানে বাজনায় হই মাতোয়ান
কই গেল রে দিন আমার ॥

মায় বলেন ভাইয়ের কাছে , এত ত্বরার কাজের ভার
কই গেল রে দিন আমার
যখন হইলো বৃদ্ধকাল, স্ত্রী-পুত্রের হইলাম কাল
মাল্যা বুড়া আমি লক্ষীছাড়া, লাঠিছাড়া চলনভার
কই গেল রে দিন আমার ॥

ভাবিয়া আব্বাস বলে ভাবলে কি আর যাবে আর
ভাবের কাছে অভাব নিয়ে ভাবলাম না আমি পরকাল
কই গেলরে দিন আমার ॥

মরহুম ফিরোজ আলী শাহ বানিয়াচঙের ছিলাপাঞ্জা গ্রামে ১৯২০ সালের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ও ভক্ত আছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁর বাড়িতে মাজার তৈরি করে প্রতি বছর মাঘ মাসের দুই তারিখ ওরস উদযাপন করেন। লোকমুখে তাঁর অনেক গান প্রচলিত রয়েছে। দুটি গান তাঁর শিষ্য আলাউদ্দিন (৫০), পিতাঃ রুস্তম উল্লা, গ্রাম : ছিলাপাঞ্জা, উপজেলা : বানিয়াচঙ্গ। এর কাছ থেকে ১৫.১২.১১ তারিখে লিপিবদ্ধ করি–

(এক)

ভিখারি সাজিয়া আমি হাত পাতিলাম দরবারে
ও দয়াল বন্ধুরে।
কিঞ্চিত দয়া করবায়নি আমারে

www.pathagar.com

ও দয়াল বন্ধুরে।
নইরাশার আশার তুমি অকূলিয়ার কূল
আমারে ত্বরাইয়া রাখিও পুলসিরাতের পুল।
বঞ্চিতরে বঞ্চিত করিও না মোরে
রাখিও চরণে ও দয়াল বন্ধুরে।
সয়ালে দয়াল তুমি অন্তরর্যামী
কৃপা কর জিজ্ঞাসি আমি।
বঞ্চিত করিও না মোরে
রাখিও চরণে দয়ালরে।
তোমার নামেরই মধু
যে পাইয়াছে হইয়াছে সাধু।
সারা জীবন ডাকলাম শুধু না পাইলাম তোমারে
ও দয়ালরে।
ফিরোজ আলী ভেবে আকুল যাইবে তোর কাছেতে
একদিন উঠতে হবে মিজানেরই পাল্লাতে।
ও দয়ালরে
কিঞ্চিত দয়া করবায়নি আমারে।

(দুই)

আমারে ভাসাইয়া জলে সাতার শিখাইয়া লও কূলে,
ভব যন্ত্রণা সহিতে না পারি ঠেকছি মায়াজালে।
ভবে আসি মায়ার রশি লাগল আমার গলে,
মুর্শিদ সাঁতার শিখাইয়া লও কূলে।
জ্ঞান শূন্য বুদ্ধি হারা হারাইয়াছি লাভে মূলে,
আমার বড়া ডুইবা রইয়াছে এ মনিপুর খালে।
মুর্শিদ সাতার শিখাইয়া লও কূলে,
হাতের আঙ্গুল নয় রে সাঁতার দিবার কল,
পায়ে যখন দেই গো বাড়ি যাইবা গিয়া রসাতল।
মুর্শিদ সাঁতার শিখাইয়া লও কূলে,
ফিরোজ আলী শাহ বলে থাক মুর্শিদের চরণ তলে।
আমারে ভাসাইয়া জলে সাঁতার শিখাইয়া লও কূলে ॥

শাহ আবু মিয়া বানিয়াচঙের দেওয়ানবাগ গ্রামে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মরমি ও বাউল গানের সাধক এবং লেখক। বাড়ি বাড়ি তিনি বাউল গানের আসর করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার অনেক শিষ্য রয়েছে। তিনি ১৯৮৮ সালের ২০শে জুন মৃত্যুবরণ করেন। তার লেখা কোনো গান পাওয়া না গেলেও ও শিষ্যদের মুখে মুখে অনেক গান শোনা যায়। তার শিষ্য ছত্তর মিয়া (৭০), গ্রাম : নন্দিপাড়া, বানিয়াচঙ্গ দুটি গান গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

কইতে নারী, সইতে নারী, রইতে না দেয় ঘরে

www.pathagar.com

বন্দের বাঁশি বাজে কোন বনে
যখন বন্দে বাজায় বাঁশি
তখন আমি রানতে বসি
আমি রন্ধনের কাজ রেখে বাকি
যাইগো বন্দের কাছেতে ॥

বন্দের বাঁশি বাজে কোন বনে
কদম্বর ডালেতে বসে বাজায় বন্দে মোহন বাঁশি
আমি শুনিয়া তার বাঁশির ধ্বনি পারি না ঘরে থাকিতে ॥

বন্দের বাঁশি বাজে কোন বনে
যখন ধরে প্রেমের জ্বালা, চেপে ধরি কলসির গলা
আমি কলসের জল বাইরে ফেলে যাই বন্দের কাছেতে ॥

বন্দের বাঁশি বাজে কোন বনেতে
শাশুড়ি ননদী বাদী কেমনে বন্দের পিরিত রাখি
আমি যদি যাই জলে ননদী যায় আড়ে আড়ে ॥

বন্দের বাঁশি বাজে কোন বনেতে
ভেবে আবু বলে আইও বন্ধু মরণ কালে
তোমায় দেখতাম দু নয়নে ॥

(দুই)
হইয়া নারী ঠেকলাম আমি
কেউর কাছে না যাইতে পারি।
কান্দি বসে ঘরের কোণে
আমার কান্দন কেউ না শুনে।
হইয়া নারী ঠেকছি আমি
কেউর কাছে না যাইতে পারি॥

ঘরেঁ বাইরে আমার বাদী
কেন বাবায় দেয় না শাদি।
আইলা ঘরে সরার কাজি
পাত্র দেখে বিয়ে দেয় না।
হইয়া নারী ঠেকছি আমি
কেউর কাছে যাইতে পারি না॥

www.pathagar.com

যত ছিল সঙ্গের সাথি
সকলেরই হইয়াছে পতি।
আমি কী কার করলাম ক্ষতি
পতির সেবা মোর হলো না।
নতুন ও যৌবনে সখি
ফুলের মধু ফুলে শুকায়।
আমার ফুলে ভ্রমর আসে না
হইয়া নারী ঠেকলাম আমি
কেউর কাছে যাইতে পারি না॥

আমি নারী কপাল পুড়া
জোয়ান বয়সে হইলাম বুড়া।
আবু বলে জ্বালা পোড়া
কোমল প্রাণে ধৈর্য আর সয় না।
হইয়া নারী ঠেকছি আমি
কেউর কাছে যাইতে পারি না॥

বানিয়াচং উপজেলার হলিমপুর গ্রামে মরহুম আ. গনি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া না জানলেও অনেক আধ্যাত্মিক ও মরমি গান নিজে তৈরি করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতেন বলে জানা যায়। ২০০৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দুটি গান ২২.০৯.১১ তারিখে তাঁর ছেলে মকবুল হুসেন গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

(এক)
আমি জনমও ভরিয়া যতনও করিয়ে
পালিয়াছি এক জঙ্গিলা পাখি
জানি না সে কালো পাখি
জানি না ভাই কালো পাখিটি আগে ছিল কার
নাম শুনিয়া কালা মনার হলাম তাবেদার
নিকটে তার বসে থাকি,
জানি না যে কালো পাখি
চৌদ্দ তলার উপরেতে পাখিরই আসন
নিচ তালাতে নেমে যায় ভাই মনে লয় যখন
ও যে ডিম পাড়িয়া যায় উড়িয়া তা দেওয়ার রাখিয়া বাকি
জানি না–
চোয়ালী কোঠ-ভেদ করে দেখ নদী একটি আছে,
সেই পারে পাখির বাসা হাজরা বাজের কাছে।
ও সে আপন বংশ রাজহংস
অগলা ভেঙে তারে ডাকে

www.pathagar.com

জানি না–
সংসার জুড়ে শুনি নামে অধর চাঁন
দরবারে আসে ঝুঁকি নিশি রাস্তায় ফাতায় ফান
বাউল গনি বলে ব্রাহ্মমাতলে
কতই নামে তারে ডাকি
জানি না–

(দুই)

মানুষ যারা চলে গেলে ও–
নাম মরে না দুনিয়ায়,
জিন্দা ঘোরে তাজা রুহ আওলিয়া হয় নীরব
শিয়াল কুকুর শয়তান যারা করে শুধু কলেরব।
পূণ্যের জন্য ধন্য আরব বলে লোকে কয়,
মানুষ যারা চলে–
ধর্মের দড়ি ছুড়ে গেলে পায় শিকলে পড়বে টানা
তখন মানুষ বুঝতে পারবে হয়নি আজ মুক্তিদান
বন্ধ হলে বাতাস উজান দেখবে মানুষ কে কোথায়
মানুষ যারা চলে–
আশা-যাওয়া ঘুরা ফিরা প্রমাণেতে পাওয়া যায়
বিশ্ব ভাগে অনু... ফুল ফুটে রোজ বিহনে
কাছেতে কাঞ্চন মিলিবে খোঁজ নেওয়া ভীষণ দায়
মানুষ যারা চলে–
সেদিন কাঁদবে জীব জানোয়ার–
আরও কাঁদবে গাছের ফুল
গাঙ্গের জল শুকাইয়া গেলে কাঁদবে শুধু দুটি কূল
গনি বলে মন রে বেভুল দিন গেল তোর অবহেলায়
মানুষ যারা চলে গেলে ও নাম মরে না দুনিয়ায় ॥

০৭.০৯.১১ তারিখে বিতলা শাহের গানটি দৌলতপুর গ্রামের বাউল শিল্পী মাখন বৈষ্ণব গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। বানিয়াচং উপজেলার মার্কুলি গ্রামের অধিবাসী আতা শাহ ওরফে বিতলা শাহ অনেক মরমি গান রচনা করেছেন। তাঁর পিতার নাম রবীন্দ্র বৈষ্ণব। তিনি ১৯৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বুঝলাম মন এটা স্বভাবের হাতি
চিনলে নারে মন সাঁইর কুদরতি বাতি ;
বারো বছর বয়স হইলো কে জানে পিষ্টে উঠিল
আমারে চালায় দিবারাতি ॥

কপালে কামসিন্দুর দিল, মায়া রশির প্যাঁচ লাগাইল
হইল আমার চঞ্চল মতি ॥

www.pathagar.com

থাকিয়া গর্দানের উপরে, সদায় টিপে কান ধরে
বিশ বছরে আনল ঘরে জ্যোতি ॥

দিবানিশি চালায় মোরে, আমি তো দেখি না তারে
রইল দুইটা কানের খ্যাতি ॥

ত্রিশ বৎসরে জানলাম তত্ত্বে, ছয়টা ভূত আমার পিষ্টেতে
আমারে চালায় দিবারাতি ॥

বানিয়াচঙের লামাপাড়া গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দে এলাহি বক্স জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি, মরমি সাধক ও সঙ্গিতপিপাসু। তার অনেক গান মুখে মুখে রচিত, আর এখনও মুখে মুখেই বেঁচে আছে। সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার নুরপুর গ্রামে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। ২৩.০৯.১১ তারিখে বাউল শিল্পী মোজাহিদ আলম তাঁর একটি গান গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

(এক)

পড় নামাজ, কর যাকাত, হজ কর ভাই মক্কার ঘর
হাসরে তারাইয়া লইবা রসুল পয়গম্বর।
ফজরের নামাজ পড়, আল্লাহকে ছজিদা কর
এশাতেও নামাজ পড়, যত আছ মমিনগণ।
নামাজে আছে শরিয়ত, মারফত চিনিয়া কর এবাদত
অজু কর পাঁচ ওয়াক্ত, কোরআনে আছে তত্ত্ব
পড় কলিমা শাহাদাত ॥
অধীনে বাউলশা বলে মুরশিদেরই চরণ তলে
খুঁজিলে পাইবে মক্কা তালাস কর আপন ঘর॥

(হবিগঞ্জের মরমি সাধক গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায়ও গানটি লিপিবদ্ধ আছে)

১৯৬৮ সালে পার্বতীচরণ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত কমল নারায়ণ বিশ্বাস। তিনি ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে নিজ গ্রামে এসে টোল প্রথার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করেছেন। তাঁর অনেক গান এখনও লোক মুখে শোনা যায়। তিনি ১৯২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গানগুলো ২৫.০৯.১১ তারিখে বাউল আ. ছত্তর (৬৫) নন্দিপাড়া নিজ বাড়িতে গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

(এক)

তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে দেখ না রে মন
ভবে এসে মায়া বশে 'আমার আমার' কওও অনুক্ষণ।
পঞ্চভূতে দেহ গড়া, আজরাইল আইলে সারা
আপন স্থানে যাবে তারা আমিত্ব কই রবে তখন।

www.pathagar.com

(বল) আমার দেহ, আমার মন, আমার প্রাণ, আমার ধন,
আমার কোথায় রইল এখন, কর অন্বেষণ॥
কায়া প্রাণে নাই সম্বন্ধ, বুঝ না কেন রে অন্ধ,
ঘুচিবে তোমার দ্বন্দ্ব, কালে ধরবে যখন
অহংকার পরিহরি, পার্বতীকে সঙ্গে করি
সোহং সোহং সোহং স্মরি মায়ের পদে সঁপে জীবন।

(দুই)
কী করিলে হায় দিন যায় (যায় রে ও মন)
দিন তো গেল রে, আর কি ফিরে পাবে তায়
নিয়ে পুত্র পরিবার সুখে বেঁধেছে সংসার,
যেদিন মুদবে আঁখি, সকল ফাঁকি সঙ্গি কেহ নয়তো কার
করবে অহংকার দিন দু চার,
তোমার দ্বারা পূত সব মিলে
শেষে অর্জিত ধন পেয়ে তোমাতে
আর কি স্মরিবে তোমায়।
হয়ে বিষয়ে মাতাল, কেন হারাও পরকাল
ভাব মায়ের চরণ, ও মোছ মন, রবে না জঞ্জাল।
সেতো কলো কলে, আর দেখতে না রে
তুমি সময় থাকতে পার্বতীকে
মজাও মায়ের রাঙ্গা পায় ॥

(গান ম্যালেরিয়া)
আবদুল হেকিম
হায় রে দারুন ম্যালেরিয়া দেশ নিল উজা করিয়া
তর দেহেতে বুঝি দয়ার অংশ নাই।
কত পুত্রশোক মা জননী কাঁদে সদা হুতাসিনী
পিতার শোকে পুত্র কাঁদে, ভাইয়ের শোকে ভাই,
স্বামীর শোকে স্ত্রী কাঁদে কেশ বেশ নাই বাঁধে
পাগলিনী হইয়া বলে কোনো দেশেতে যাই ॥

বানিয়াচঙ্গ পরগনা ধরি গৃহ ছিল সারি সারি
হেন দৃশ্য কোনো দেশে দেখতে নাহি পাই।
হায় রে দারুণ ম্যালেরিয়া দেশ নিলে উজারিয়া ॥

ছিল হেন সোনাপুরী ম্যালেরিয়া রোগে ধরি
শ্মশানেতে পরিণত করিয়াছে ভাই।

www.pathagar.com

কোনো গাঁয়ে দশ জন ছিল এক দুইজন রাইখা গেল,
কোন গাঁয়ে সান্ধ্য বাতি দিতে কেহ নাই।
শৃগাল ডাকে দিনের বেলা তিন তারের খেলা
মরি মরি একি লীলা কভু দেখি নাই ॥

হায় রে দারুণ .. ..
একে তো রোগের জ্বালা জিনিসপত্রের দর বেতালা।
তাতে আবার রেশন কার্ড নিতে হবে ভাই।
কাপড় যদি আনতে হয় কন্ট্রোলেতে যাইতে হয়,
এক দিনেতে কাপড় কিনা কভু সম্ভব নয়।
লোকের ঠেলায় লোক মরে ঘরে নাহি সে ঢুকতে পারে
জোর থাকিলে যাইতে পারে নইলে পারে নাই।
হায় রে, গরিব লোকের উপায় নাই চিন্তা করে দেখ ভাই
মোটা সুতার মার্কিন ছাড়া চিকন পাবে নাই।
গরিব লোকে যদি ডাকে চক্ষু মেলে নাই দেখে
বলে বেটা ভালো কাপড় আমার কাছে নাই।
উচিত পয়সার কারবার করি তবু ভাই তার পায়ে ধরি,
দুই-চার কথা বেশি কইলে ঘাড়ে ধরে ভাই ॥

হায় রে দারুণ .. .. . .
বড় বাবু যারা পাথর বুক ভাঙে তারা
চিকন ডুরার ধুতি পরে করিয়া ধুলাই,
যত বেটা স্টোর কিপার নওয়াব বাচ্চা বরাবর
বলে এখন বন্ধ কর বেচাকেনা নাই।
বেলা দশটা বেজে গেল ভাত খাইতে এখন চল
স্টোরের কাজে মত্ত হয়ে জীবন গেল ভাই ॥

হেকিম কয় ভাই সকলেরে সোজা রাস্তায় যাও রে
টেকবে একদিন শেষের দিনে উপায় দেখি নাই ॥
হায় রে দারুণ ...

০৪.০৯.১১ তারিখে মোহন লালের গান সংগ্রহ করার জন্য বানিয়াচঙের তোপখানা গ্রামের শিল্পী আবু মোতালেব খান লেবুর (৪৮) সঙ্গে দেখা করি। তিনি গানগুলো গেয়ে শোনালে তা রেকর্ড করা হয়। মোহন লাল সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ১৯৬৫ সালে বিক্রমপুর থেকে এসে বানিয়াচঙে দত্তপাড়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। গ্রামের মানুষ তাকে মনিন্দ্র সরকার নামেই চেনে। তিনি ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

(এক)
শ্যাম পিরিতে সুখ হইল না ,
এখন করি কী উপায় ॥

সখিগো, ওগো সখি,
ঘরে বাইরে কলংকিনী
হইলাম যার আশায় ।
ওগো, সে আমারে দোষী করে,
এখন নাহি ফিরে চায় ॥

মনে লয় ডুবিয়া মরি,
লোকেরই নিন্দায় ।
ওগো, আমার মতো দুঃখ এত,
সহিবে কোন অবলায় ॥

সখিগো, ওগো সখি,
কহে অধম মোহন লালে,
প্রেমের বেদনায় ।
এখন কার কাছে যাই,
ভেবে না পাই,
ঠেকেছি বিষম দায় ॥

(দুই)
এত কঠিন তোমারই হৃদয় ।
আমার নয়ন জলে পাষাণ গলে
গলে না তোমার হৃদয় ॥

আমারে বঞ্চিত করে,
ছিলে তুমি কার বাসরে ,
তুমি, কার বাসনা পূরণ করে,
এখানে হইলে উদয় ॥

আমি সে কোলেরই বন্ধু,
আমারে করিয়া যাদুরে ।
এখন, ফুলে ফুলে খাও মধু,
যখন যেমন মনে লয়॥

ভুলে যাও আমারই কথা,
প্রেম করিও যথা তথারে,

www.pathagar.com

তুমি দিলে মোরে যত ব্যথা,
তোমায় দেখে লাগে ভয় ॥

কহে অধম মোহন লালে,
সরলে গরল মিশাইলে রে,
তুমি, আমারে আপন বলে,
দিয়োনা আর পরিচয় ॥

(তিন)

রয়েছে শ্যাম,
কোন রমণীর ধারে
বলো মোরে।
আমারে বাসিয়া ভাল,
কী দোষে ছাড়িয়া গেল,
দুঃখ দিল অভাগির অন্তরে
বলো মোরে ॥

কোন রমণী আড় নয়নে,
চাহিয়া শ্যামেরই পানে
রূপে গুণে
ভুলাইল তারে।
কেবা এমন রূপবতী
হয়েছে মোর শ্যামের সাথি
এত মাতি
সইব কী প্রকারে বলো মোরে ॥

(চার)

কোন রমণী প্রেম বাসনায়
মালা দিল শ্যামের গলায়।
সেই বেদনায়
হৃদয় যায় বিদরে।
শ্যাম বলিয়া সঙ্গ ধরি,
হইলো প্রেমের অধিকারী,
এমন নারী
কেবা ব্রজপুরে বলো মোরে ॥

কোন রমণী হাসি মুখে,
শ্যামকে ভুলাইয়া রাখে,
পরম সুখে

www.pathagar.com

নিশি যাপন করে।
কহে অধম মোহন লালে,
শ্যাম কালিয়া না আসিলে,
প্রেম আগুনে মরিব সে পুরে
বলো মোরে ॥

আরজু শাহী বানিয়াচপয়া নন্দিপাড়া গ্রামে ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট বেতার কেন্দ্রের একজন বেহালা বাদক ছিলেন। সিলেট বেতারে যোগদান করার আগে বিভিন্ন আসরে অনেক বাউল গান পরিবেশন করেছেন। তিনি শতাধিক গান লিখেছেন বলে তাঁর এক শিষ্য জানিয়েছেন। তাঁর দুটি গান বাউল শিল্পী শাহ মুজাহিদ আলম গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

পিরিতির অনলে জ্বালিয়ে
পুড়িয়ে আমাকে কেন তুমি কাঁদালে
আমায় কামনা বাসনা পূর্ণ হলো না
সেজেছি পাতকিগোকুলে
বিরহের বেদনা কত যে যন্ত্রণা
নেই কোনো সান্ত্বনা না পেলো॥
আমি বুঝিতে পেরেছি তুমি যে ভিনদেশি
কষ্ট দিলে আমায় কেমনে
আরজু শাহি কয় মন করে শুধু উছাটন
এই ভবে আমি রহিয়াছি যার যে যদি
হয় না আমার
পিরিতের এক দরকার বুক ভাসাব নয়ন জলে
আমার প্রেম পিরিতি যাবে বিফলো॥

(২)

তোমার মুখের গান শুনিয়া আমার
মনে লাগল ফাগুন
পিরিতের আগুন লাগাইলে পিরিতির আগুন
প্রেম আছে যার গায় তারে দেখলে চিনা যায়
তিলে তিলে বাড়ে মায়া হইয়া দ্বিগুণ
প্রেম স্বর্গেরই খেলা তারে কইরো না হেলা
আসল প্রেমের প্রেমিক যে জন পাইয়াছে তার গুণ
প্রেম সত্য যদি হয় তাতে নাই জালিমের ভয়২
আরজু বলে এমন প্রেমিক এগিয়ে আসুন
লাগাইলে পিরিতের আগুন শেষ না হইয়া যায়।

আবু মোতালেব খান লেবু

www.pathagar.com

(এক)
কালার বাঁশি পাগল করল
অভাগিনীর মন প্রাণ
শুন লো সখি রাই বিবাগী
রাখতে নারী মন প্রাণ ॥

ও সখি লো,
কদমেরই ডালে বসে
বাজায় বাঁশি মোদন সুরে
যৌবন জ্বালা মিটাইতে চাই
সঁপিয়া মন প্রাণ।
কালার বাঁশির এমনি সুর
রাধার চোখে নাহি ঘুর
কাছে পাইলে কাইন্দা কইতাম
নিয়ে চল পাষাণ॥

ও সখি লো,
বন্ধের আশায় পথ চাইয়া
কিনারা না পাই তরি বাইয়া
সুতের শ্যাওলার মতো আমি
কত ভাইসা যাই,
ভেবে অধম পাগল বলে
কালার সনে প্রেম করিলে
হারাইতে হয় বিরহিনীর
সকল জাতি কূলমান ॥

(দুই)
থাকতে সময় ধইর পারি
ও সুজন নাইয়্যা।
বেলা বেলি পেইছে তোমায়
সখির ঘাটে যাইয়া
নাকের নোলক কানের দুল আর
নিয়ো পুতির মালা
নিজ জ্ঞানে পড়াইয়া
হাতে সোনার বালা
সাঁচ পানের খিলি তোমায়
দিবে যে খাওইয়্যা ॥

সখি তোমায় নিয়া নিবে

www.pathagar.com

আর সুজন নাইয়্যা
এত দিন যে কোথায় ছিলে
পাগল হইয়া ॥

তোমার আমার আশার আশায়
বইয়্যা আছি পন্থ পানে চাইয়া।

০৬.০৯.১১ তারিখে গীতিকার এম লোধন তালুকদারের কথামতো তাঁর সঙ্গে বড় বাজার বাউল কল্যাণ ফেডারেশনে দেখা করি। তিনি গানগুলো গেয়ে শোনানোর পর রেকর্ড করি। গান গাওয়ার সময় তার শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গির মধ্যে ছিল মাথা নিচ দিকে নিয়ে হাত উপর দিকে তুলে গান করা। এম লোদন তালুকদার, পিতা : মো. বাবুল তালুকদার, মাতা : মির্জা ছালেহা বেগম, গ্রাম ও ডাকঘর : গুনই ২নম্বর ওয়ার্ড, ৮নম্বর খাগাউড়া , বানিয়াচঙ, হবিগঞ্জ। তিনি জানান যে, তাঁর দাদা এবং বাবা ও বাউল গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি গান লেখা শুরু করেন ২০০০ সাল থেকে। এ পর্যন্ত গান লেখা হয়েছে ২৯৬টি।

(এক)

মানুষ দেখলে নারে ভেবে কোথায় হতে আসলে
তুমি আবার কোথায় যাবে।
চিরদিন থাকতে পারবে না এই মিছা ভবে।

ও মানুষ লোভে লালসায় মাতাল হইয়া কাটাইল জীবন,
আমার আমার করে গেল কিছুই নাই আপন
চিন্তা করে দেখলে না তুই কখন কী যে হবে।
ও মানুষরে গায়ে শক্তি দিয়া করালে অন্যায়-অবিচার,
মরে গেলে সবে মিলে করবে ঘরের বাইর,
বিদায় বেলা সঙ্গে সাথি একজনও না পাবে।
ও মানুষরে সময় থাকতে কর তুমি সে পাড়ের সম্বল,
হঠাৎ কোনো দিন এসে যাবে সাক্ষাতের সময়।
কয় লোধন শেষে কাঁদলে কী লাভ তোমার হবে ॥

(দুই)

আইলো না পরানের বন্ধু আমার নব যৌবন কালে
ওরে প্রেম শিখাইয়া কেন তুমি দূরে সরে গেলে।
আমারে দিয়া আশা শিখাইলে ভালোবাসা
প্রাণ কাড়িয়া নিলে, ওরে এখন আমায় ভুলে গিয়া
কার মন জুড়াইলে।
বসন্ত সময় কালে ডাকে যখন কোকিলে হৃদয়ে আগুন জ্বলে ,
ওরে অভাগী তোমায় ভেবে ভাসাই নয়ন জলেরে।
বন্ধু তোমায় পাইলে গলে থাকতাম

www.pathagar.com

জড়িয়ে লইয়া তোমায় কোলে। ওরে ..
কয় লোদনে বন্ধু আমার দুঃখও নাই মরিলে রে ॥

০৭.০৯.১১ তারিখে গীতিকার মকবুল মিয়ার কথামতো তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়ি হলিমপুরে দেখা করি। গানগুলো গেয়ে শোনানোর পর তা রেকর্ড করি। তার পিতার নাম আঃ গনি, গান গাওয়ার সময় তার শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গির মধ্যে ছিল মাথা নিচ দিকে নিয়ে হাত উপর দিকে তুলে গান করা। নিচের গানটি তিনি পরিবেশন করে।

মুর্শিদ আমার পরশ মনি
মুর্শিদ আমার সোনার চান
তোমার লাগি দিবা নিশি
কান্দে আমার মন প্রাণ।
তোমার কথা মনে হলে
ভেসে যায় নয়ন জলে
রাখ তোমার চরণ তলে আমি যে
তোমার কাঙ্গাল
মুর্শিদ আমার
আমি তোমার প্রেম ভিখারি যায়।
ছাইড়া ঘর বাড়ি–থাকি আমি তোমার বাড়ি
পাইতে তোমার সন্ধান
মুর্শিদ আমার–ইদরিশ শা বাবা
বাঁচিনে তোমারে ছাড়া
স্বপ্ন যোগে দিয়া দেখা
জুড়াইয়ে জলন্ত প্রাণ।
মুর্শিদ আমার–
উদাসী মকবুল বলে মুর্শিদেরই চরণ ধরে
দূরে দিয়ো না পায় ঠেলে
হইয়া তুমি পাষাণ।
মুর্শিদ আমার

২৫.০৯.১১ তারিখে বাউল শাহ মুজাহিদ আলমের বাড়িতে তাঁর একক গানের আয়োজন করলে সেখানে যাই, এবং দুটি গান রেকর্ড ও লিপিবদ্ধ করি। শাহ মোজাহিদ আলম ১৯৭৭ সালের ২০শে অক্টোবর মজলিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শাহ আবু ইছুব আলী, মাতার নাম : আছিয়া বেগম। তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রায় এক হাজার গান লিখেছেন। তাঁর ১২টি অডিও ক্যাসেট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবেশিত হয়েছে। মুজাহিদ আলমের অনেক ভক্ত ও শিষ্য রয়েছে। তিনি বানিয়াচং বাউল কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক।

(এক)

পাপী বলে ক্ষমা কর মোরে গো মুর্শিদ চাঁন মওলা
দয়াল পাপী বলে ক্ষমা কর ॥

www.pathagar.com

১
নিবেদন করি চরণে আমি যে তোমারে
পাড়ের কড়ি নাই যে আমার কেমনে যাই সে পাড়ে গো ॥

২
বেঁচে আছি এই ভবেতে যাহার ও খাতিরে
তাহাদের ওয়াস্তে দয়া কর, বলি যে কাতরে গো ॥

৩
নাম শুনেছি দয়াল আমি ফরিয়াদ দরবারে
সংকটে পড়িয়া ডাকি আমি গোনাহ্‌গারে গো॥

৪
নাম বিনে ভরসা নাই, মিছা এই সংসারে
মুজাহিদের কেউ নাই আপন কইব যাইয়া কারে গো॥

(দুই)
ভ্রমর ছাড়া ফুলবাগানে
ফুলের মূল্য নাই॥

১
আমার সারা অঙ্গে ভরা যৌবন,
আমি রাই সাজিলাম গো মনের মানুষ চাই ॥
ঘরে নাই মোর রসিক সুজন,
একা ঘরে ঘুম আসে না কেমনে ঘুমাই ॥

২
বন্ধুহারা পাগলিনী,
কোথায় আছে কেউ জাননি॥

৩
কে বা প্রাণের বান্দব হইয়া
যৌবন ফুলের গাঁথা মালা কার গলে পরাই ॥
আমায় নিবে উঠাইয়া,
মুজাহিদ বলে সঙ্গে যাব কলঙ্ক না ডরাই ॥

(তিন)
দরদিয়ার প্রেমে পড়ে শান্তি নাই মোর অন্তরে
রাস্তার পাগল, বানাইলে নাকি প্রাণের বন্ধুয়া মোরে
আরে ও পরানের বন্ধুরে, আমায় রাস্তার পাগল
বান ইবো নাকি প্রাণের বন্ধুয়ায় মোরে।

www.pathagar.com

১
বুঝি না তার মনের গতি, তার সঙ্গে আমার পিরিতি রে
দেখায় শুধু কেরামতি নব রঙের ভাব ধরে ॥

২
বিছানাতে শুইলে পড়ে, মনে আমার চিন্তা বাড়ে রে ...
ভাবনা-চিন্তায় ঘুমে না ধরে শুনাইবো যাইয়া কার ধারে–

৩
ভালোবাসার লেনাদেনা একবার কি মনে পড়েনা রে।
নিমাইর মতো চইলা যাইতাম ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ॥

৪
মুজাহিদ বলে ভালোবাসায় কাউকে হাসায় ॥
কাউকে কাঁদায় রে ..., কাউকে বানায় রাজা বাদশা ॥
কেউ ঘুরে দ্বারে দ্বারে ॥ ঐ

(চার)
বন্ধু আমায় ভালোবাসে দেখি নাই জীবনে
প্রাণ সখিগো কী আছে তার মনে ॥

১
ভাবের প্রেমিক ভাব জাগাইলো আমার হৃদয় কোনো,
প্রেম রশি গলায় দিয়া দূরে বসে টানে ॥ ঐ

২
মন ভুলে তো প্রাণ ভুলে না, ভুলি বো কেমনে,
কী জাদু করিল মোরে, সহে না পরাণে ॥ঐ

৩
প্রেমে স্বর্গ প্রেমে নর্গ প্রেমে শান্তি মিলে,
প্রেমিক যে জন সে মহাজন, প্রেমের বেদন জানে ॥

৪
মুজাহিদ বলে পাইলে সুখই মন দিয়াছি যারে
জানলে সখি বল মোরে দেখি দুনয়নে ॥ ঐ

(জাহান আরা খাতুন)

১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারি জাহান আরা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। জাহান আরা খাতুন হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, গান ও ছড়া লেখেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজেই সুর করে গানটি গাওয়ার পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচিত গান :

(এক)

আমার সঙ্গে বাড়ি সঙ্গে যে ঘর আর তো কোনো ঠিকানা নাই
একতারাটার সুরে সুরে সত্য কথা কইয়া যাই ॥

শাড়ি কত নানা রঙে
জেওর পাতি আরো সঙ্গে
হায় রে এসব রঙের ছুঁয়ায় মন সাজে না জাইন্যে ভাই ॥
একতারাটার ... যাই।

নিশা রাইতে মন কোকিলা বুকের ভিতর কাইন্দা কয়,
এমন মধুর জীবন আহা ক্যামনে গড়লা দয়াময় ॥
তবে কেনো ছেড়ে সবে
আন্ধার ঘরে যাইতে হবে।
এই কথাটার আসল জবাব কোথায় গেলে বল পাই-
একতারাটার ... যাই।

(দুই)

বাঁজলে বাঁশি কদমতলে ঢেউ উঠে যমুনার জলে
ছুটি আমি জলের ছলে রয় না ঘরে মন।
লোক লাজে করিনা ভয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে হৃদয়
কেন আমার এমন যে হয় বলবে সে কোন জন॥

কানেতে দিয়েছি তালা কানু আমার গলার মালা
দেখলে জুড়ায় দুঃখ জ্বালা সকল ব্যথা ভয়॥
বন্ধু আমার জীবন মরণ মণি মানিক অমূল্য ধন
বুকে পেলে রাঙাচরণ চাই না কিছু আর॥

(মঞ্জিল মিয়া)

০১.১০.১১ তারিখে কাওরাকান্দি গ্রামে মঞ্জিল মিয়ার বাড়িতে যাই। তিনি কাওরাকান্দি গ্রামে ১৯৬৪ সালের ২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. সোনা মিয়া। তিনি প্রায় এ যাবত ১০০ মরমি গান রচনা করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর গানগুলো গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

এই যে পৃথিবী করিয়াছ সৃষ্টি,
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছো মানুষও জাত

www.pathagar.com

কবুল করো আল্লাহ আমার মোনাজাত॥
আল্লাহ তোমার নিজ গুণে বানাইয়াছ মোহাম্মদকে,
দোস্ত বলিয়া স্বীকার করিলায়।
তুমি কাদির গুণী শুনিয়াছি আমি,
পাঠাইলায় সংসারে ছায়া ভিন্ন জাত।
বোরাকও পাঠাইয়া নিয়া ছিলে আরশে,
তুমি যে করিতে আলাপ।
সাতাইশ বছর কাটাইলেন আলাপও করিলেন
তবুও না দেখলেন আল্লাহ তুমি কেমন জাত ॥

আমি গুনাহগার ডাকি তোমায় বারেবার,
ওগো, আল্লাহ পাক পরোয়ার।
জগতের নিদানে কয়বর ও হাশরে,
ডাক্তার মঞ্জিল মিয়া বলে করিও নাজাত ॥

(দুই)
দুপুরবেলা কদমতলা বাঁশের বাঁশিটি বাজায়
রাই রাই বলিয়া ডাকে মোরে বন্ধু শ্যামরায় ॥
বাজাইয়া তার বাঁশের বাঁশি আমার মন করে উদাসী
মনে লয় গিয়া আমি ধরতেম তাহার পায় ॥
রাই বলিয়া ডাকে মোরে গিয়াছিলাম জলের ঘাটে
নয়ন জলে কলসি মোর ভরিয়া যায়।
ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে, কেমন করে জাগাইলো মোরে
মনে লয় তার ছবি আঁকে রাখতাম আমার গায় ॥
ভাবিয়া মঞ্জিল মিয়া বলে বন্ধু তোমারে পাইব কোন কালে
আমার ফুলের মালা পরাইব তোমার গায় ॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

(মুহিউদ্দিন)

বানিয়াচং উপজেলার শতমুখা গ্রামে ১৪৪৯ সালে স্বভাব কবি মুহিউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনসার আলী তিনি কবিতা ও গান রচনা করেন। ১০.১১.১১ তারিখে বড় বাজার বাউল কল্যাণ কার্যালয়ে গানটি গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান :

প্রেম সাগরে দিলাম পাড়ি প্রেমের তরি সাজাইয়া
আমারে ত্বরাইয়া নিও প্রেমের মালা পড়াইয়া।
প্রেমের জালে বন্দি হইলাম, প্রেমের বড়ি খাইয়া

www.pathagar.com

আমার আশা পুরাও বন্ধু প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া।
অন্ধকারে ডুবে আছি তোমার আশা করিয়া
আমারে করিও পার প্রেমের আলো দেখাইয়া।
জীবনে মরণে আমি পাই যে তোমায় খুঁজিয়া
নৈরাশ কইরো না বন্ধু, বলি বিনয় করিয়া ॥

(মো. মহিবুর রহমান)

বানিয়াচং উপজেলার সাগরদিঘির পশ্চিমপাড়ে ১৯৬২ সালের ২৮ ডিসেম্বর মো. মহিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃত. মো. হরমুজ উল্লাহ, মাতা মোছা. খোদেজা খাতুন। তিনি একজন মরমী কবি। এ যাবৎ তিনি শতাধিক মরমি গান ও অন্যান্য দুই হাজার গান রচনা করেছেন। তাঁর 'বাউলের প্রেম' ও 'বাউলের রত্ন সাগর' নামে দুটি পাণ্ডুলিপি। শতাধিক অডিও ক্যাসেটে তাঁর গান জেলার বিখ্যাত শিল্পীরা সুর করে গেয়েছেন। বর্তমানে তিনি বানিয়াচং সাবরেজিস্ট্রার অফিসের একজন সনদপ্রাপ্ত দলিল লেখক। ২০.১০.১১ তারিখে তাঁর বাড়িতে তাঁর সুর করা তিনটি গান গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

ভোরের বাঁশি বাজিল গো দয়াল
আমার দেহ গাঙের অচিন মোড়ে ॥

পাড়ি দিলাম ভব সাগরে লইয়া আমার ভাঙ্গা তরিরে
কৃপাসিন্ধু নাম জানিয়া বসে আছি আদমপুরে ॥

জানি তুমি প্রেম দরদী জোয়ার ডাকিলো শুকনা নদীরে
দশে ছয়ে ষোলজনে পাল তুলিল দেহপুরে ॥
আমার তরি নেও ত্বরাইয়া, পাপে গেল ভারী হইয়া রে
এ পাগল কয় মোহন বাঁশি বাজাইও না আমার ধারে ॥

(দুই)

বাঁশি বাজাইও না ওরে কালা, আমার নাম ধরে
তোমার বাঁশির সুরেতে রাত প্রহরে হায় রে বাড়ল বেদনা ॥
কালা রে, যখন আমার কাংক্ষে কলসি বাঁশির সুরে মন উদাসী
ওরে সুর শুনিয়া চেয়ে দেখলাম হায় রে
যমুনার স্রোত চলে না ॥

তোমার বাঁশের বাঁশির ষষ্ঠ ঘাটে বাজল বাঁশি কোন গহীনে রে
ওরে নিতে যদি সঙ্গে করে সইগো ঘুচত মনের যন্ত্রণা ॥

www.pathagar.com

নারী বুকে দিয়া জ্বালা, বাঁশি বাজায় হিজল তলায় রে
কী জাদু বাঁশিতে ভরা সইগো যাইতে চায় মন ঘরে থাকে না ॥

নারী যদি হইত কালা, বুঝত নারীর কী বেদনা গো
মহিবুর কয় কুল ছাড়িয়া সইগো হইত প্রেমের দেওয়ানা ॥

(তিন)
বাংলাদেশের পল্লি গাঁয়ে গাইরে বাউলা গান
গানে মিলে গোপন তত্ত্ব গানে করো অনুসন্ধান ॥ ঐ
১
বেহালাটা বাজাই সুরে চার তারে চার রূপ নেহারে
সুর ঝিল আর ভমের ঘুরে চার তারের চারটি মান ॥
২
সাথে আছে একতারাটা হারমনি আর মন্দিরাটা
ঢুগঢুগি আর ঢুলের টাটা বেহালাতে সব সমান ॥
৩
লালন হাছন করিম শাহে জালাল দূরবিন রমন গাহে
বাউলা গানের ডাইলা শাহে দেশের লোকের মন জোগান ॥
৪
এখনও যার প্রসার আছে দ্বিজ দাসে গান লিখেছে
তান সেনের গানে মেঘ বুজেছে মহিবুর কয় যার প্রমাণ ॥
আমি বাংলাদেশের পল্লি গাঁয়ে গাইরে বাউলা গান ॥ ঐ

(মো. শওকত আলী)

বানিয়াচং উপজেলার যাত্রাপাশা গ্রামে ১৯৪৬ সালের ৩১ আগস্ট মো. শওকত আলী জন্মগ্রহণ করেন।

নির্বাচিত গান :

আমার নয়ন মাঝে কে বিরাজে আমি তো জানি না
খেলা করে আমায় নিয়ে যে কোন জনা, আমি তো জানি না ॥

জনম থেকে শুধুই আমি, চিন্তা দিবস যামি
কিসের স্রোতে ভেসে এলাম হদিসটা তো পাইলাম না, আমি তো জানি না ॥

যখন একটা কিছু ভাবি, কে যেন দেয় পালটে সবি
মাঝে মধ্যে খেপে উঠি উপায় বুদ্ধি মিলে না, আমি তো জানি না ॥
জীবনের যত কাণ্ড, হয়ে যাবে লণ্ডভণ্ড
যতকিছু ফন্দি-ফিকির কোনোই কাজে লাগবে না, আমি তো জানি না ॥

www.pathagar.com

সাইঁজির খেলা বুঝা দায়, জীবন বাইছি ভাঙ্গা নায়
ডুবতে হবে অথৈ জলে, বাঁচবার উপায় দেখি না, আমি তো জানি না ॥

(মো. শাহজাহান বিশ্বাস)

বানিয়াচং উপজেলার শেখের মহল্লা গ্রামে ১৯৪৭ সালের ১ জানুয়ারি মো. শাহজাহান বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রকিব বিশ্বাস। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ০৬.১১.১১ তারিখে তাঁর গানটি গেয়ে শোনান বাউল শিল্পী হোসেন।

নির্বাচিত গান :

(এক)

পাগল বাঁশিরে আর ডাকিস না
আমায় ঘরের বাহির করিস না
ও তোর মোহন সুরে মন পুড়ে
আর আমায় জ্বালাইস না- পাগল বাঁশিরে
বন্ধু গেছে দূরদেশে আসবে বলে ফাগুন মাসে
আইজ আছি পন্থ চাইয়া, তুই কী জানিস না, পাগল বাঁশিরে ॥
বন্ধু আমার কেমন আছে জানি না খবর
তার লাগিয়া মন সদাই কান্দে কান্দেরে অন্তর ॥

বাঁশিরে তুই নিঠুর হইয়া কি লাভ ওরে আমায় মাইরা
জীয়ন্তে মরিয়া আছি-তুই কেন তা বুঝিস না পাগল বাঁশিরে ॥

(জমির আলী)

নির্বাচিত গান :

(এক)

সাধন করবে কি আর সময় গেলে
নিশা খাইয়া মাতাল হইলে দিন গেল তর অবহেলে ॥

যইবন হয় অমূল্য ধন সময় থাকতে চিনলা না মন
পড়িয়া কামিনীর ফেরে ধরা খাবে হিসাবের কালে ॥ ঐ

যে চিনিয়াছে পরশ রতন সুসময়ে করিয়াছে যতন
সেই জন হয় মহাজ্ঞানী চন্দ মিলে আমবস্যার কালে ॥ ঐ

জমির আলীর কপাল মন্দ বুঝিলাম না ভালোমন্দ
মায়ার কাছে অমূল্য ধন পাইয়া বিচার করলে ॥ ঐ

www.pathagar.com

(দুই)

শাশুড়ি ননদী বাদী একা ঘরে কেমনে রই
ছয় জনায় কুমন্ত্র দিয়া একেবারে কবে সই
যারে এত ভালোবাসি সে মোরে বলে দোষী
যাইবার বেলায় দিবে ফাঁকি ভালোমন্দ নাহি কয় ॥

ষোল্লাপনের জমিদারি হইয়া গেলাম নিলাম জারি
কেমনে যাইব স্বামীর বাড়ি সেই চিন্তাটি সদায় হয় ॥

বিচার দিলে রাজদরবারে আমারে যে দোষী বলে
হাইকোর্টে রায়ের কালে মুর্শিদ যদি দেয় আশ্রয় ॥

যেই দেশে নাই ঠিকানা জমির আলী হয় দেওয়ানা
যারে চাই তারে পাই না নয়ন জলে ভাসতে হয় ॥

(মো. মতিউর রহমান)

বানিয়াচং উপজেলার ইকরাম গ্রামের অধিবাসী। তিনি পেশায় একজন হোমিও চিকিৎসক। তাঁর পিতার নাম ইয়াদ আলী মিয়া। তিনি প্রায় দেড় হাজার গানের রচয়িতা। তাঁর গানের বিষয় তাওহিদি, প্রেমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মনোশিক্ষা, নিগূঢ়তত্ত্ব, বন্ধুবিরহ, মুর্শিদি, লোকগীতি, বিরহ ইত্যাদি। গানের দশ, বারখানা পাণ্ডুলিপি আছে।

তার মধ্যে ৬৪টি গানের সংকলন 'আশেকের গজল ভক্তের উপহার' প্রথম খণ্ড ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই দুটি গান গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান :

(এক)

আমার প্রিয়া না আসিল ভালো না লাগিল
রজনি পোহাইয়া যায় গো
জোয়ার ভাটায় ভেঙে পড়ে প্রেমের কোকিলা নাহি আয়গো ॥

আশা দিয়ে বন্ধে আশা পুরাল না
আমার পিপাসা মিটাইয়া দিল না
যদি পাব তারে নীরবে বাসরে যেতে নাহি দিব তায় গো ॥
আশার পথ চেয়ে আমি যে রয়েছি
বুকভরা ব্যথা কত যে সহেছি
সে কি তা বুঝে না আমার বেদনা, মতিউর তারে চায় গো ॥
মিলনের আশে আমি বসে আছি
পাইলে কাননে ধরিব যে খসি
নিয়ে হৃদমন্দিরে সব দিয়ে তাহারে মিশে যেতে চায় গো ॥

www.pathagar.com

(দুই)

যদি বন্ধু ড্রাইবার হইত রে, চালাই তো মোর গাড়ি,
সেই গাড়ি চড়িয়া যাইতাম
প্রাণ বন্ধুয়ার বাড়িরে যদি বন্ধু ... ।

তৈল-মোবিল-পেট্রোলের গাড়ি, বিদ্যুতের বলে,
বিশ্ব রোডে চলত গাড়ি,
সুজন পাইবার হইলেরে ... যদি বন্ধু ॥

আনাড়ি মাতাল ড্রাইবার গাড়ি চালাইলে,
হারায় লাভে মূলেরে ... যদি বন্ধু ...॥

হিরা ও মাণিক্য ভরা আছে সেই গাড়িতে,
আপনে চালাইলে গাড়ি
লুটিবে ডাকাইতেরে, যদি বন্ধু ... ॥

ট্রাফিকের সিগনাল ড্রাইভার যদি নাহি মানে,
অ্যাকসিডেন্ট করিয়া গাড়ি
মানে ধনে জনেরে, যদি বন্ধু ...॥

প্রেম নগরে যাইতে গাড়ি, কাম পুরে ভিড়ায়
মতিউর কয় সার্জন পুলিশ
নিবে জেলখানায়, যদি বন্ধু ড্রাইভার হইত রে ॥

(রাজবল্লব দাস চৌধুরী)

বানিয়াচং উপজেলার হরিপুর গ্রামে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ রাজবল্লব দাস চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উপানন্দ দাস চৌধুরী। তিনি বেশ কিছু আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছেন। ০৫.১১.১১ তারিখে বাউল শিল্পী লোদন তালুকদার বড় বাজার বাউল কল্যাণ ফেডারেশনে গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

এ ভব সংসারে মন রে মায়াময় সংসারে
আর কি হবে মানব জনম এ ভব সংসারে ॥

সাধন ভজন পূজন বিনা গুরুর কৃপা পাওয়া যায় না
শুধু আমার এই ভাবনা কে নিবে সে পাড়ে ॥

www.pathagar.com

মনে কি পড়ে না তোমায় ছেড়ে যাবে মায়ার সংসার
ভবে স্ত্রীপুত্র কেউ নয় তোমার আপন বল যারে ॥

যখন লীলা সাঙ্গ হবে ঘরের বাহির করে দিবে
তোমায় ঘিরে কাঁদবে সবে চির বিদায় করে ॥

রাজবল্লব কয় মনরে কানা করলে কত টাল বাহানা
দিন গেল তোর হুঁশ হলো না আত্মঅহঙ্কারে ॥

(রামজয় দাস)

বানিয়াচং উপজেলার কাঁঠালিয়া গ্রামে রামজয় দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় শত গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ২৭টি গান নিয়ে একটি সংকলন অবনী কান্ত দাশ, হবিগঞ্জ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

নির্বাচিত গান :

মন্ত্রমূলে জন্ম পুণপ্রকাশ করিল জ্ঞান, চক্ষুদান দিলে যেই জন ॥

বন্দি শাস্ত্র চতুর্দশ, পুরাণাদি অষ্টাদশ, যারে ব্যাস না পায় নিরূপণ
বন্দিমাতা সুরধনী, বিষ্ণু পদাস্তক যিনি, উদ্ধারিনী সাগর নন্দন ॥

ষড়ানন গণপতি, দেবগুরু বৃহস্পতি, যত ইতি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ
বাগ্দেবীর চরণ সার, বন্দি আমি বারে বার, রশনার কলুশ নাশন ॥

আইস মাতা দয়া করে, সুযন্ত্র ধরে ধরে, হৃদিপুরে সরোজ আসন
কণ্ঠে বৈস রগমালা, কইরো না মা অবহেলা, কৃষ্ণলীলা করিব কীর্তন ॥

হরি আসি ব্রজপুরে, দ্রাপড়েতে জন্ম ধরে, খেলা করে নিয়ে রাখালগণ।
রাজ রামজয়ে বলে সাড়, বাঞ্চাপুরে যশোদার, খেয়ে তার ননী মাখন ॥
(সূত্রঃ পাঁচমিশালী গানের বই)

(রামলোচন দাস)

বানিয়াচং উপজেলার বিথঙ্গল গ্রামের অধিবাসী রামলোচন দাস অনেক তত্ত্ব সংগীতের রচয়িতা।

নির্বাচিত গান :

প্রাণ সখিগো আমি সেই গৌর বলে ডাকি
যারে হেরিলে জুড়ায় দুই আঁখি ॥

www.pathagar.com

যদি কুমকুম চন্দন হইত তারে রাখিতাম অঙ্গে মাখিগো
মনে হেন লয় শুধু গৌর নয়
বুঝি রাইয়ের অঙ্গে ও আছে মাখামাখি গো॥

আমার মনে হেন লয় গৌর রাঙ্গা পায়
আমি জড়িত হইয়ে থাকিগো
আমারই মরণের কথা কাহারে কহিব গো
চিত্ত যেমন চোরায় চুরি করে
লোচন পিয়াস রাখে ঐ রূপ হেরিবারে গো॥
(সূত্র : সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমি কবি, পৃষ্ঠা ১৮০)

(শ্যামানন্দ দেবনাথ)

বানিয়াচং উপজেলার খুরানগর গ্রামে ১৯৬৬ সালে শ্যামানন্দ দেবনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ দেবনাথ। তিনি কিছু আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছেন। ০৪.১১.১১ তারিখে শাহ মুজাহিদ আলম তাঁর বাড়িতে গানগুলো গেয়ে শুনানোর পর লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান :

(এক)

কত পুণ্য ফলে উত্তম মানুষ কূলে জন্ম নিলে এই ভবে
চুরাশিলক্ষ জন্ম পরে এসেছিলে এ সংসারে
দুর্লভ মানব জনম কি আর সম্ভবে ॥

মাতৃগর্ভে যখন ছিলে, সপ্তম মাসের কালে গুরুমূর্তি সামনে দেখিলে
তখন পণ করেছিলে, ভুলবে না আর কোন কালে, জন্মমাত্র ভুলিলে সবে ॥

মায়াবিনী সঙ্গ পেয়ে, নিত্যবস্তু না চিনিয়ে,
কামেতে মজিয়া রহিলে।
এই ছয় জনার বশ হইয়া কামিনী কাঞ্চন লইয়া
রঙ্গরসে চিরদিন না যাবে ॥

শ্যামানন্দের কথা শুনে ওরে অজ্ঞান মন
শমনের ভয় তোমার না রহিবে।
জপ মধুর কৃষ্ণ নাম, যাবেরে বৈকুণ্ঠধাম
নইলে চুরাশি লাখ আবার ভ্রমিবে ॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

www.pathagar.com

(হরিপদ দাস)

হরিপদ দাস, পিতাঃ অক্কুর মনি দাস, মাতাঃ সুমঙ্গল দাস, গ্রামঃ হারুনি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এসএসসি। তিনি একজন বাউল শিল্পী ও গীতিকার। এ পর্যন্ত তিনি মরমি, আঞ্চলিক, ধামাইল, পল্লিগীতিসহ প্রায় ৫০০ গান লিখেছেন। বিটিভি, ইটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে তাঁর গান পরিবেশিত হয়েছে। তিনি একজন বেহালার বাদক ও বেহালা কারিগর। আঞ্চলিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর গান গুরুত্বের সহিত পরিবেশিত হয়।

(এক)

আমি প্রাণে মরিলাম – অজানা শিকারির খাঁচায় বন্দি হইলাম,
আমি না জানিয়া দারুণ বিষের বড়ি খাইলাম।

১

এই শিকারির দয়া-মায়া নাই,
দিবানিশি সরল প্রাণে কত কষ্ট পাই,
আমি একা বসে কেঁদে কেঁদে আকুল হইলাম ॥

২

এই পথে কেন আসিলাম,
এসে আমি তারই হাতে ধরা পড়িলাম,
আবার কোন জনমের অপরাধে বাঁধা পড়িলাম ॥

৩

বিনয় করি ওহে দয়াল সাঁই,
তুমি বিনে এ ভুবনে দরদি কেউ নাই,
কাঙাল, হরিপদ রায় নিদান সময় (তোমায়) স্মরণ করিলাম ॥ ঐ

(দুই)

আদর সোহাগ করে আমায় দে সজনী তোরা,
আগর চন্দন অঙ্গে মেখে দে।

১

বহুদূরে চলে যাব, ফিরে নাহি আর আসিব,
আমায় প্রভুর নামটি স্মরণ করে দে ॥ ঐ

২

বাঁশের একটা পালকি নিয়া,
তার উপর বিছানা করিয়া,
আমায় জন্মের মতো শুয়াইয়াদে ॥ঐ

৩

সবার কাছে করি মিনতি,
আমি ভুল যদি করে থাকি।
কাঙ্গাল, হরিপদরে ক্ষমা করে দে ॥ ঐ

www.pathagar.com

(মোস্তফা)

বাউল মোস্তফা মিয়া, পিতা আফতাব উদ্দিন, শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি, পেশা শিল্পী। তিনি ১৯৭৯ সালের ২০ই ফেব্রুয়ারী ইতানখানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাউল শিল্পীদের সঙ্গে গান করাই তার নেশা এ পর্যন্ত তিনি প্রায় দুশ ফোক গান লিখেছেন। নিজ বাড়িতে ১৬.১০.১১ তারিখে একতারা দিয়ে উল্লিখিত গানটি পরিবেশন করলে সেটা লিপিবদ্ধ করা হয়।

(এক)

বন্ধুর প্রেমে পড়িয়া গলায় লইলাম দড়ি,
মন উদাসী ও মন উদাসী
মায়া নাই বন্ধুয়ার মনে সুখ দিল না এ জীবনে
কে শুনিবে দুঃখের বারো মাসি ॥ ঐ

মায়ার বাঁধন সৃষ্টি করে আছে বন্ধু দূরে সরে
সব হারাইয়া খুঁজি আমি দিবা নিশি ॥ ঐ

ভিতরে জ্বালা বাহিরে জ্বালা,
পাগল মস্তফায় কয় ঐ মরণ বালা ॥ ঐ

(এ কে আজাদ)

শিল্পী এ কে আজাদের জন্ম ১৯৭২ সালের ১০ই মার্চ। পিতার নাম : সিরাজ উদ্দিন খান। গ্রাম : নন্দিপাড়া, বানিয়াচং, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ, পেশা : ব্যবসায়। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই গানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সংক্ষিত হন। বিভিন্ন টেলিভিশনে তাঁর গান পরিবেশিত হয়েছে। *হায়রে পিরিতি* নামে তার একটি অ্যালবাম সিডি ইতিমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। তাঁর লেখা গান নিজে গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

(এক)

আমি যদি যাই গো মরে
দেখবে না আর কোনেদিন
গানের মাঝে পাবে আমায়
খুঁজে নিও সেই দিন ॥

১

আপন করতে চাইলাম তোমায়
এ জীবনে পেলাম না
পাইনি বলে প্রেম কি মরে
প্রেম কোনদিন মরে না
গানকে আমি ভালবাসি
গেয়ে যাব চিরদিন ॥

www.pathagar.com

২

ঘুরি আমি রাস্তায় রাস্তায়
পাই না সুখের ঠিকানা
একতারাটা হাতে নিয়ে
হইলাম বাউল দিওয়ানা,
কেউ বলে– করি পাগলামি
বাঁচিব আর কতদিন ॥

(দুই)

বন্ধু ছাড়িব না তোমারে
পাইছি তোমায় বহুদিন পরে
আমায় পাগল বানাইলো বন্ধু তোমার পিরিতে ॥

১

জ্বলন্ত আগুনে আমার কলিজা আঙ্গার
নয়ন জুড়াইবো বন্ধু মুখ দেখে তোমার–
পাশরিবো সকল দুঃখ, কোলে লইয়া তোমারে ॥

২

দুই অঙ্গে এক অঙ্গ হইয়া, প্রেম খেলা খেলিয়া
আনন্দে নিশি কাটাইব হাসিয়া মাতিয়া–
মনস্বাদে প্রেমের মালা পড়াইব তোমারে ॥

(আখলাক হুসেইন খান খেলু)

বানিয়াচং পাঠানটুলা গ্রামে গীতিকার ও সাংবাদিক আখলাক হুসেইন খান খেলু ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা : মৃত জিয়াউল মহিত খান, মাতা : আমিনা খানম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। তিনি আঞ্চলিক, মরমি, ধামাইল, সারি, দেশাত্মবোধক ও আধুনিকসহ এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ গান লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন। হাওর গবেষণার সঙ্গেও জড়িত রয়েছেন। দুর্নীতি, অনিয়ম, নারী নির্যাতন, শ্রেণি বৈষম্য, দরিদ্রতা শোষণ ও বঞ্চনা সহ সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে গণমানুষের গান নিয়ে 'গণ গান' নামে একটি পাণ্ডুলিপিসহ জল ঢেউর দেশে, গীতি ভজনা, মনের বাগানে, পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ১৬.১০.১১ তারিখে তার বাড়িতে গানগুলো গেয়ে শুনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

হেসে খেলে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম,
পারি না ভুলিতে বানিয়চং গ্রাম।
যাত্রা পালা আর বাউল গানে

www.pathagar.com

আনন্দে মাতিতাম ॥
বৈশাখ মাস আইত নয়া ধানে গোলা ভরিত।
জ্যৈষ্ঠ মাসে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়িত।
আষাঢ়-শ্রাবণে (বর্ষা জলে) সাঁতার কাঁটিতাম
সাঁরি গাইয়া নাও দৌড়াইতাম ॥

ভাদ্র মাস আইত তালের রসে মা ক্ষীর করিত,
আশ্বিনে (বড়শিতে) মাছ শিকারের ধুম লাগিত।
কার্তিক অঘ্রাণে আমন ধান কাটিতাম
বানাইয়া চিড়া মুড়ি খাইতাম ॥

পৌষ মাস আইত সংক্রান্তির মেলা বইত
মাঘের (শীতে) রোদে বইয়া দাদু কিচ্ছা শুনাইত।
ফাগুন-চৈত্রে মাঠে (গোপাঠে) ঘুড়ি উড়াইতাম
দাড়া ঘুড্ডি কইট্টারানি নন্দাইড় খেলিতাম ॥

বানিয়াচঙের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বাংলা সনের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে এই গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়েছে।

(দুই)

আমি ভাব কইরাছি
আমি প্রেম কইরাছি
দয়াল চান্দের নামের সুধায়
পথ পাইয়াছি।
ঘাটে ঘাটে নাও ভিড়াইয়া
পাপের বোঝা বইয়া বইয়া,
সঙ্গের সাথি কেউ হইব না
এখন আমি বুইঝাছি ॥
দয়াল ...
পিপাসায় কাতর হইয়া ,
বিপথে ঘুইরা ঘুইরা,
জনে জনে হাত পাতিয়া
শূন্য হাতে ফিরাইয়াছি ॥
দয়াল...
ভবের মায়ায় মন মজাইয়া
দিনের দিন গোয়াইয়া,
পরপাড়ে পুঁজি বিনা
আন্ধা পথে চইলাছি।
দয়াল ....

www.pathagar.com

(তিন)

কারেন্ট লাগাইয়ারে দয়াল
ছাইড়া দিলা ভুবনে,
দিবা নিশি তোমার বাতি
জ্বলে জীবন মরণে॥

তোমার নামের পাওয়ারে
চলতাছে দেহ ইঞ্জিন,
দুইশ ছয়টি পার্টসে কেমন
করতাছে কাজ রাত্রি-দিন।
তেল মবিল বাড়াও কমাও
জব্দ কইরা নিয়া যাও
সুইচ তিনটা টিপ অতি যতনে ॥

অচিন পথে চলে গাড়ি
ম্যাপ চিনেছি কোরানে,
লাইটপোস্ট থাকবে জ্বলে
খুঁজলে দিলের নয়নে।
চেকপোস্টে করবে যাচাই
ভিসা ছাড়া পারাপার নাই-
আসল নকল নিবে চিনে ওজনে॥

সুর : আবু মোতালেব খান লেবু
গানটি স্থানীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

(চার)

মনটা আমার পাগলা ঘোড়া-২
পথ চিনে দৌড়য় না,
লাগাম দিয়াও তারে আমি
বশ মানাতে পারি না গো
বশ মানাতে পারি না ॥

বলি আমি রইব ওরে
বন্ধুর প্রেমের প্রার্থনায়,
সে লইয়া ছুটে
রঙের তামাশায়
রঙের তামাশায়।
কত তার ছল-চাতুরী-২
কত তার বাহানা ॥

www.pathagar.com

দিনে রাতে বুঝাই তারে
যাইব বন্ধুর দরবারে,
সে মোরে ফালাইয়া রাখে
রঙের বাজারে
রঙের বাজারে।
কত তার সাধ আহলাদ-২
কত তার কামনা ॥

(গীতিকার রাসেল)

২১.০৮.১১ সকাল ১০টার সময় বড়বাজার সংলগ্ন গীতিকার রাসেল আহমেদের বাড়িতে যাই। তিনি প্রায় ৪০০ গান লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ গানই বাউল, লোক, আধ্যাত্মিক। স্থানীয়ভাবে তাঁর গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন। বয়স প্রায় ৩১বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসা। তাঁর লেখা দুটি গান–

(এক)

তোমায় আমি ভালোবাসি ভাব দেখে বুঝ না
পাগল ও করিলে বন্ধু করিলে দিওয়ানা।
মুচকি মুচকি হাঁসো তুমি চোখ ফিরানো যায় না
আমার মনে জাগে সখি কামনা বাসনা ॥

কদম তলায় আইসো বন্ধু কেউ যেন দেখে না
অপেক্ষাতে থাকব বসে ওগো সোনা ময়না ॥

আমি কালা তুমি ধলা রঙ্গের মিল হইল না
এত মায়া লাগাইয়া দিছ নিদারুণ যন্ত্রণা।

সাত রাজার ধন মানিক রতন তুমি কাঞ্চা সোনা
তাই তো রাসেল আহমেদ করে তোমার সাধনা ॥

(দুই)

লোকে বলে কুলবিনাশী ঘরে থাকতে পারি না
কালা তোমার হাতের বাঁশি আর বাজাইওনা
কদমেরই ডালে বসে বাজাও যখন বাঁশি
সুর শুনিয়া কুলবধূ হয়ে যাই উদাসী
লোকে করবে হাসাহাসি কেন তুমি বুঝ না ॥

ললিতা বিশখা সখি শুনে যাও আসিয়া
কালা কৃষ্ণ বাজায় বাঁশি আমার নাম ধরিয়া
বল তোরা কী যে করি সে আমার দিওয়ানা ॥

www.pathagar.com

আজব যাদু আছে রে বাঁশিতে সই লুকাইয়া
বাঁশির সুরে প্রাণ পাখি যায়গো দেহ ছাড়িয়া
কয় রাসেল কোনো কাজে মন তা আর আসে না ॥

(সঞ্জয় রায়)

বানিয়াচং উপজেলার বিথঙ্গল গ্রামে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সঞ্জয় রায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ.। তাঁর পিতার নাম রথীন্দ্র চন্দ্র রায়। তিনি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সঞ্জয় রায় ছোটগল্প, কবিতা, ছড়া ও গান লেখেন। ০২.১০.১১ তারিখে হবিগঞ্জ শহরে তাঁর বাসায় দুটি গান গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

ভবের এই পাঠশালা থেকে সেই দিন হবে ছুটি।
যে দিন আসবে তার লিখা ঐ পরপারের চিঠি ॥

ভব পাঠশালায় ভর্তি হয়ে কাম-ক্রোধে মত্ত হয়ে
নকল সুখে মেতে রইলি লোভ সাগরে ডুব দিয়ে॥

বুঝলি নারে অবুঝ মন তুই আসল সুখ কোনটি।
পরপারে পরীক্ষাতে ডাকবে যখন তোমাকে
তখন তুমি থাকবে একা পাশে পাবে না কাউকে।
বুঝবি তুই কেমন ছাত্র যখন পাবে ফলটি ॥

(সমুজ মিয়া)

বানিয়াচং উপজেলার ইকরাম গ্রামে ১৯৫৯ সালে কবি ও বাউল সমুজ মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সোনা মিয়া ফকির। তিনি অনেক মরমিগান ও কাবিগান রচনা করেছেন। ০২.১০.১১ তারিখে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গেলে তিনি যে দুটি গান গেয়ে শোনান, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

এ দুনিয়ার নাই ভরসা ওরে আমার মন বেদিশা
শূন্য পিঞ্জর পড়ে থাকবে উড়ে যাবে বিহঙ্গ পোষা ॥

টাকা-পয়সা-জমিদারি, ভাই-বন্ধু-সুন্দর নারী
যেতে হবে সবই ছাড়ি, কাটবে না তোর রং তামেশা ॥

আজ মরলে কাল দুদিন হবে, সঙ্গের সাথি ভুলে যাবে
পলকে চলিয়া যাবে মিটবে না তোর মনের আশা ॥

www.pathagar.com

সময় থাকতে ডাক মৌলারে করজোড়ে বিনয় করে
ঠেকিবিরে তুই পরপারে ঘটবে রে সমুজ দুর্দশা ॥

(দুই)
বল বৃন্দে কী উপায়, শ্যাম শোকে প্রাণ যায়
আমারে করিয়া পাগল রইলো বন্ধু মথুরায় ॥

সখি গো মান কুলমান নিয়ে বন্দে, কোথায় রইল ওগো বৃন্দে
প্রাণ কান্দে সেই রূপ নিশায়
আমার কলিজা হইয়াছে আঙ্গার, কোনোদিন জানি ফেটে যায় ॥

সখিগো মন হইয়াছে উড়াল পাখি, কেমন করে গৃহে থাকি
বল সখি কী করি উপায়
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম বন্ধের দুটি রাঙ্গা পায় ॥

সখিগো জটিলা কুটিলার ডরে, সেবিলাম না প্রাণবন্দেরে
সেই দুঃখ রহিল হিয়ায়
দুঃখে দুঃখে জনম গেল করি আমি কি উপায় ॥
সখিগো শ্রীরাধিকার কান্দন শুনে, কান্দে বনের পশুগণে
আর কান্দে বৃন্দাবনে সবায়
জন্মে জন্মে রাধা দুঃখী কয়, পাগল সমুজ মিয়ায় ॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

(তিন)
প্রাণ সখিগো পুড়া দেহে আগুন দিয় না
ও আমি জ্বইলা পুইড়া হইলাম সারা
তবু কি শেষ হইল না ॥ ঐ

যে পুড়ে জ্বলিয়া মরি, কেউর কাছে না
কইতাম পারি গো, এগো সারা অঙ্গ
স্বর্পের চুম্বন, তোমরা কি তা জান না ॥ ঐ

পুড়তে যদি হয় আমারে
পুড়ো নিঠুর বন্ধুর ধারে গো
এগো সইব আমি আগুনের জ্বালা

www.pathagar.com

তবুও দেখিব রূপখানা ॥ ঐ
বন্ধের প্রেমের এত জ্বালা,
সোনার অঙ্গ হইল কালা গো
এগো সমুজ মিয়ার মরণ ভালা
প্রাণে ধৈর্য মানে না ॥ ঐ

(সাইফুল খান)

বানিয়াচং উপজেলার মন্দরী গ্রামে ১৯৮৩ সালে সাইফুল খান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম : মাতাব খান। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি। পেশা : ব্যবসা। তিনি মাঝে মাঝে মরমি গান লিখতেন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতেন। এক পর্যায়ে তা নেশায় পর্যবসিত হয়। ০৪.১০.১১ তারিখে দুটো গান গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)

নয়নে নয়ন লাগাইয়া আমায় দেখাইলে
প্রেম শেল মারিয়া গেলা এই বুকে ॥

আগে যদি জানতাম আমি এই ছিল তোর মনে
তবে কি আর প্রেম করিতাম তোমারও সনে ॥

ভুলে যাবে প্রাণবন্ধু তোমার মনে ছিল
তবে কেন হাত বাড়াইয়া হাতে হাত রাখিলে
এখন কেন প্রাণবন্ধু আমায় ভিন্ন বাস ॥

প্রাণ থাকিতে দিয় বন্ধু তোমার বুকে ঠাঁই
এই মিনতি বন্ধু আমি অধম তোমারে ॥

সয়ফুল মিয়া আছে বসে তোমারই আশায়
মরণকালে দিয়ো দেখা যদি মনে চায় ॥

(দুই)

আজ নিশিতে ঘুমের ঘোরে স্বপনে তোমায় দেখিতে,
বন্ধু তোমায় সব দিয়াছি সঁপে।
যদি আমি জানতাম বন্ধু এই ছিল তর মনে
তবে কি আর তোমার কাছে সব দিতাম সঁপে ॥

সেই জ্বালায় মরি তোমারই না পিরিতে। ঐ...
আমায় দেখে পাড়ার লোকে কত কথা বলে

www.pathagar.com

এইসব কথা শুনে আমার বুকে জ্বালা বাড়ে॥ ২

সব জ্বালা বুকে নিয়া থাকি তোমার ধ্যানে।ঐ...
এই সয়ফুল কাইন্দা ডাকে
তোমারই আশায় সারা জীবন থাকব বন্ধু
তোমারই আশে। ২
যদি তোমায় না পাই বন্ধু যাব আমি মরে। ঐ
বন্ধু তোমায় মন দিয়াছি সঁপে॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

(সুরেন্দ্র সরকার)

বানিয়াচং উপজেলার উত্তরসাঙ্গর গ্রামে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ২ অগ্রাহায়ণ সুরেন্দ্র সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম : নরেন্দ্র সরকার। তিনি শতাধিক আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন। ০২.১১.১১ তারিখে তিনি নিজেই তাঁর লেখা গান পরিবেশ করেন। সেটা শুনে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

তোমার লাগিয়া ভক্তগণ ডাকি মা মা বলে
করো আগমন, করো প্রেম বরিষণ ভক্তের হৃদয় মাঝে ॥

এসো ভোলা নাথও সাথে অস্ত্র নিয়ে হাতে
আবার ও অস্ত্রধারিণী সেজে।
মহিষ হতে অসুর হয় উৎপত্তি
তোমার হাতে মৃত্যু তুমি জীবের গতি,
মা সুরেনের হলো না ভক্তেরই সঙ্গ মাগো
দিন কাটালে বৃথা কাজে ॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

(আবদুল হামিদ সরকার)

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে ১৯৮১সালের ২ আগস্ট সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ছাতির মিঞা তালুকদার ও মায়ের নাম ছালেহা আক্তার। ০৬.১০.১১ তারিখে বানিয়াচং বাউল কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যালয়ে দেখা হলে তিনি দুটি গান গেয়ে শোনালে একটি লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

শ্যাম কালিয়া নিঠুর বন্ধুরে তুমি পিরিতি শিখাইয়া
কোন পাষাণে ছেড়ে গেলে আমারে কান্দাইয়া
বন্ধুরে পিরিতি শিখাইয়া॥
মুই রাধারে ভুলাইয়া রে বন্ধু মনপ্রাণ নিয়া

www.pathagar.com

কার বাসরে রইলা তুমি কলঙ্ক বানাইয়া
বন্ধুরে পিরিতি শিখাইয়া॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলে রে আমার মাথায় হাত রাখিয়া
এখন বুকে শেল মারিলে কার ছলনা পাইয়া
বন্ধুরে পিরিতি শিখাইয়া।
মোহিত শাহকে আপন আপন ভেবে রে বন্ধু মনপ্রাণ সব দিয়া
রই কলঙ্কি হামিদ এখন গোকুল জুড়িয়া
বন্ধুরে পিরিতি শিখাইয়া॥
(সূত্রঃ গৌতম চন্দ্র দাশ)

(আশিকুর রহমান)

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার সুনামপুর গ্রামে ১৯৭৪ সালের ১০ মে আশিকুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আবদুল বারিক এবং মায়ের নাম লাল বানু। তিনি প্রায় একশ গান লিখেছেন বলে জানান। ছাই বানু নামে তার একটি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। ১০.১০.১১ তারিখে তিনি গান গেয়ে শুনানোয়ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

নির্বাচিত গান

(এক)
নিশিরাতে ভাঙালে মোর ঘুম
বাঁশির সুরে কত জ্বালা কার কাছে বলুম
বন্ধু বাঁশরিয়ারে-তুই নিশিরাতে ভাঙালে মোর ঘুম ॥

গরু রাখ মাঠে থাক পিরিতের কি বুঝা
কুলবধূর মান মারিতে নাগর কানাই সাজ
কত আর সহিব আমি তোর প্রেমের জুলুম ॥

দরজা খুলিয়া আমি হই ঘরের বাহির
বুক ভরা বেদনা আমার করি না জাহির
ঘরের বাহির হলে পরেই বাঁশির সুরে মন হবে বেমাসুল ॥
জগৎ জুড়িয়া রাধা কলঙ্কিনী নারী
ফুকারিয়া এই আশিকে কইতে নাহি পারি
আমার সব বিরহের কথা মোহিত শাহর মালুম॥

(দুই)
মন তোর জীবনের হিসাব মিলা হিসাব মিলা
জীবনটা যে গেল তোমার করিয়া রঙের মেলা ॥

www.pathagar.com

জীবন কত গেল ভবের কাজ করে, কত গেল ঘুমের ঘোরে
কত গেল ইবাদত করে, কত করেছ কোমল্লা ॥

গুণধর নারী সঙ্গী করে, আপন ভাবিয়াছে তারে
মতদিয়া তার রূপের ধরে, চেয়ে রইলে সারাবেলা॥

মায়াজালে সবাই বান্ধা, চোখেতে লেগেছে আন্ধা
চেয়ে দেখ হলো সন্ধ্যা, ডুবে গেল আয়ু বেলা॥

হিসাব মিলা দামের ঘোরে, দম যে আসা-যাওয়া করে
কয় দম গেল নামটি ধরে, কয় দম বইছে একেলা॥

দেখছি আমি বিচার করে, আমার ভাগে শূন্য পড়ে
আশিকে কয় এ সংসারে, জীবন গেল করে হেলা।
(সূত্র: গৌতম চন্দ্র দাশ)

(মরিয়ম খাতুন)

বানিয়াচং উপজেলার যাত্রাপাশা মহল্লায় ১৯১৬ সালের ৬ নভেম্বর মরিয়ম খাতুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মোহাম্মদ সানাউল্লা। ১৯৯৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর গানটি হবিগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

নির্বাচিত গান

হৃদয় পুড়ে প্রেমানলে নিভে না যমুনার জলে
সোনার অঙ্গ ধরল ঘুণে হইল জর জর;
নিদয় কানু প্রাণটি নিয়া কোন পরানে ফাঁকি দিয়া
আমায় ফেলে চলে গেল মথুরানগর ॥

বিধি আমার বিরূপ হলো এ জীবনে কাজ কী বল
মরণ ছাড়া এখন আমি চাই না কিছু আর,
কমর চরণ পেলে বুকে মরতে পারি শান্তি-সুখে
বুকের খাঁচায় চাতকিনী করছে হাহাকার ॥

তবু আশায় চাইয়া থাকি চন্দন বলে অঙ্গে মাখি
পাড়ার লোকে গঞ্জনা আর মন্দ যত কয়
কৃষ্ণ যদি কাছে আসে আগের মতো ভালোবাসে
আমি মরিয়া বাঁচিব আবার জানিও নিশ্চয় ॥
(সূত্র : জাহান আরা খাতুন)

www.pathagar.com

(এস কামরুল হাসান সেলিম)

বানিয়াচং তকবাজখানী গ্রামে ১৯৮১ সালে সেলিম মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম : আবদুল রহিম খান। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি। পেশায় তিনি একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাউল গান গেয়ে ও লিখে আসছেন। ১২.১০.১১ তারিখে তার নিজ বাড়িতে দুটি গান গেয়ে শুনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

(এক)

যেদিকে যাও সাথে নিয় মুর্শিদ আমার
পায় ধরে মিনতি করি ওগো মুর্শিদ পরোয়ার ॥

সারা জাহানের বাদশা তুমি
তোমার পায়ে ধরে আছি আমি
দিয় তোমার চরণখানি চুম্বন করিতে একবার ॥

তুমি আমার নয়নমনি হৃদয়ে সোনার খনি
আল্লাহর নামের প্রতিধ্বনি শ্বাসে যতবার ॥

সেলিম মিয়া নাদানে চরণ সেবায় সঙ্গে তোমার
জিগির করি নাম মাবুদ ও আল্লাহ ॥

(দুই)

এই দুনিয়া রং মেলা বসাইয়াছে মালিক সাঁই
মানুষের মাঝে মানুষ মিলে যেমন তুমি মুর্শিদ তাই ॥

মুর্শিদ তুমি দ্বিতীয় গুরু তোমার কাছে জীবন শুরু
প্রাণ করে উড়ু উড়ু আমার মাঝে তুমি নাই॥

দিনে দিনে পথের দিশা আমি নাদান সর্বনাশ
মনে আমার একি আশা আত্মাতে বিরাজন সাঁই
কয় সেলিম পতি পদে করেছি ভুল তোমার কাছে
কেঁদে জীবন গেল আমি নাদান হাত উঠাই॥

০২.১১.১১ তারিখে সন্ধ্যায় বানিয়াচং মোহরের পাড়া গ্রামের উছমান উল্লা (৫৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা ব্যবসা চারটি গান গেয়ে শুনালে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়–

(আধ্যাত্মিক গান)

(এক)

জন্ম নিলেন আমেনার কোলে দ্বিন ইসলাম ফুল,
জন্ম নিলেন আমেনার কোলে শরিয়তের মূল॥

www.pathagar.com

বিধর্মীকে পথ দেখাইতা আল্লাহর রাসুল,
নবিজির জন্মদিনে মালাইকা ফিরিস্তা সবে,
চতুর দিকে বেষ্টন করে দুরুদে মাশগুল॥(ঐ)

খুশি হইলেন ধন্য হইল আসমান জমিন।
দুনিয়াতে আসিয়াছেন হাবিব ও রাছুল।
কবি কয় ফুলের আশে ঘুরিতেছে ভ্রমর হয়ে,
উম্মত জেনে দাও দেখা আমি যে আকুল॥ (ঐ)

(দুই)

মন তুমি ঘুমাইয়া রইলায় জাগন হইলায় না,
রহমতেরই সময় গেল খুঁজিয়া ধরলে না ।
অবশেষে খুঁজলে পরে রহমতের খাজনা পাবে,
নুরের খেলা চালিয়া যাইবে ভাবিয়া ভাবলায় না॥

রহমতেরই আশা নিয়ে পশু-পক্ষি ডাকে বইয়া।
তুমি তখন রইলায় শুইয়া জাগন হইলায় না।
আল্লা-নবি পাইতে হলে অন্তরের চোখ দেখবে খুলে,
দুনয়নে দেখতে পাবে নুরেরই খেলা।
কবি রহমতের আশে দুহাত তুলে রইলাম বসে,
দেও দেখা নইলে আমি প্রাণে বাঁচতাম না॥

(তিন)

ভবে আর নাই রে ধন,
মুশকিল কুশা নাম লও করিয়া যতন॥
আল্লা আলি মুশকিল কুশা চিনলায় নারে মন,
যে পাইয়াছে মুশকিল কুশা অমূল্য রতন॥

মুশকিল কুশার নাম লইলে হইবে আসান,
ইমাম হাসান হুসাইন বেহেস্তের কুশান॥

(চার)

মুর্শিদের চরণ করো ভরসা রে আশিক দেওয়ান ,
মমিন মুর্শিদের দিল কোরানেতে জানা॥

সেই দিলেতে বসত করে আলেক সাঁই রাব্বানা,
এই নামাজ রোজা এবাদত মক্কা মদিনা॥

www.pathagar.com

মুর্শিদ ভজিলে পাইবায় আরশের ঠিকানা,
মউত কবর ফুল সিরাত কামের ভাবনা॥

মুর্শিদের জিনিসের সামনে টিকতে পারবে না,
ঐ কাদিরিয়ায় তরিকাতে আছে সবার জানা॥

দম ফলকে সফাত দিদার মুর্শিদের করুণা,
আকবর আলির জীবন গেল হইল না ভজনা।

(আ. ছাত্তর মিয়া)

আ. ছাত্তর মিয়া (৬৫), পিতা : মৃত আ. গফুর, গ্রাম : নন্দীপাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে সিলেট বেতারে গান পরিবেশন করে আসছেন। অত্যন্ত গরিব এই বাউল শিল্পী বানিয়াচং থানার নৌকা শ্রমিক হিসেবে প্রায় বিশবছর ধরে কাজ করছেন। তিনি জানান যে, ১৫ বছর বয়স থেকেই তাঁর ওস্তাদ দেওয়ান আবু মিয়ার সঙ্গে বাউল গানের প্রতি আসক্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। ধন-সম্পদ টাকা-পয়সার প্রতি কোনো সময়ই তাঁর আগ্রহ ছিল না। এ জন্যই আজ দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। তিনি নিজেই তাঁর গান গেয়ে শোনানোর পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

(এক)

আমার বাড়ি আমার ঘর পড়ে থাকবে দুনিয়ায়
ভজলে না মন গুরুর পায়॥

টাকা-পয়সা-জমিদারি হবে না কেউর সঙ্গের সাথি
করলে ভক্তি পাবে মুক্তি
মরণকালে যারে পাওয়া যায়
ভজলে না মন গুরুর পায়॥
ঐ দুনিয়া পাকা বাড়ি যেদিন হতে যাইবে ছাড়ি
একা একা আন্ধাইর ঘরে কেমনে জনম কাটাইবায়
ভজলে না মন গুরুর পায়॥

আমারই মরণের দিনে সবাই কাইন্দা ভাব দেখাবে
ঝি পুত্র নয় রে কবরের সাথি স্ত্রী-পুত্র মালখানায়।
ভজলে না মন গুরুর পায়॥

গুরু আমার নায়ের মাঝি
উজান গাঙ্গে ধরলাম পাড়ি
চার রঙ্গের একটি নৌকা

www.pathagar.com

ছত্তর মিয়া বাইয়া যায়।
আমার বাড়ি আমার ঘর পড়ে থাকবে দুনিয়ায় ॥

(দুই)

ভাবনা তোর মনে চিন্তা নাই তোর দিলে বুঝিবে মরলে।
একদিন শুইয়া রাখবে অরুণ ও জঙ্গলে বুঝিবে মরলে,
ভাবনা নাই তোর দিলে॥

নামাজ বন্দি ছেড়ে দিয়ে ওরে গাঞ্জা-মদ খাইলে
চাইলে কী ধন দিবে সেদিন আজারাইলে নিলে।
ভাবনা নাই তোর দিলে॥

যারে লাইয়া রঙ্গে রসে এক বিছানায় শুইলে,
সেও ছাড়িয়া যাবে দুইচক্ষু মুজে, বুঝবে মরলে।
ভাবনা নাই তোর দিলে।
বাউল ছত্তর বলে ঠেকবে ফুল সিরাতের দিনে,
কাটিয়া কাটিয়া দিবা আল্লায় দুজখের আগুনে।
ভাবনা নাই তোর দিলে॥

(টেনু মিয়া)

(এক)

মুর্শিদ গো ...
হইল না মোর সাধন ভজন হেলায় গেল দিন
সঙ্গগুণে হারাইয়া পুঁজি ঘটিল দুর্দিন
রাখিও চরণের অধীন দেখাইও দিদার ॥ ঐ
মুর্শিদ গো ...
কী ধন আছে কী ধন দিয়ে সেবিব চরণ
মুর্শিদ পদে সঁপে দিলাম আমার আজীবন
কাঙ্গাল হইয়া মাগি চরণ চাই না কিছু আর ॥ ঐ
মুর্শিদ গো ...
টেনু মিয়ার নিদানকালে দরদি কেউ নাই
কাঙ্গাল ভজনে দিয় মুর্শিদ পাক পরানে ঠাঁই
মুর্শিদ নামে দয়া দোহাই হইয়া যাব॥

(দুই)

মুর্শিদ করি নিবেদন

আমারে শিখাইয়া দেও গো ইমান কেমন ধন॥
দূর করিয়া দেও গো আমার দুঃখময় জীবন॥ ঐ

www.pathagar.com

আমি অতি মূর্খ মতি জানি না সাধন
আমারে দেখাইয়া দাওগো পথের নির্দশন॥ ঐ

তোমারে চিনলাম না আমি করি কী এখন
সারা জীবন কইলাম শুধু আপন আর আপন
যারে লইয়া ঘুরি ফিরি সেইই দুশমন
এই বুঝি গো ছিল আমার কপালের লিখন
গোনার বোঝা মাথায় লইয়া কান্দে টেনুর মন
মরণ কালে পাই যেন গো ঐ রাঙ্গা চরণ ॥ ঐ

(কাঙ্গাল মঈন উদ্দিন)

০৫.০৯.১১ তারিখ সকালে শিল্পী তাঁর বাড়িতে গেয়ে শোনানোর পর তা খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। গানগুলো গাওয়ার সময় হাত তুলে মাথা নেড়ে চোখ বুজে কখনো বা এদিক ওদিক চেয়ে গান পরিবেশন করছিলেন। শিল্পী কাঙ্গাল মঈন উদ্দিন ছোটবেলা থেকেই বাউল গানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে একসময় মনের অজান্তেই তিনি গান লিখতে শুরু করেন। মঈন উদ্দিনের বয়স আনুমানিক ৪০, পিতার নাম ছুরুত আলী, গ্রাম : যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

চাই না ঘরবাড়ি, চাই না জমিদারি
চাই শুধু বন্ধুয়ার দরশন॥
কী করে পাব বন্ধুর মন, ও সখি রে (২)
বন্ধুয়ার আসার আশে
ঘুরি সদাই পাগল বেশে
কার বাসরে গিয়া সে দিল দরশন॥

আমি চাই বন্ধুয়ার মন।
বন্ধু চায় না কী কারণ
বন্ধু বিনে কারে দেখে জুরাইতাম নয়ন॥ ঐ

কাঙ্গাল মঈন উদ্দীন বলে
বন্ধু আমার ঘরে আইলে
সার্থক হবে আমার মানবও জীবন
না আসিলে প্রাণ ধন
ব্যর্থ হবে এ জীবন
আইলে বন্ধু রাখতাম কোলে।
করিয়া যতন॥ ঐ

www.pathagar.com

(দুই)
তোমার মায়া কি লাগে না রে বন্ধু
আমার মুখ দেখিয়া
সর্বহারা হইলাম আমি
তোর পিরিতে মন মজাইয়া॥ ঐ

তোমারে ভাবিয়া আপন
দিয়াছিলাম জীবন-যৌবন
আশা মনে নিয়া॥

এখন ঘটাইলে আমার লাঞ্ছনা।
কার মন্ত্রণা কানে লইয়া॥ ঐ

এই যদি তোর ছিল মনে
পিরিতি শিখাইলে কেনে
দুই দিনের লাগিয়া।
আমি জ্বালা বুকে লইয়া ঘুরি
শুধু তোমারে ভাবিয়া॥ ঐ

মাতা ছাড়লাম পিতা ছাড়লাম
আপন মানুষ পর করিলাম
তোমারও লাগিয়া
(এখন) মঙ্গন উদ্দীন মরে যাবে নাকি
তোর বিরহ বুকে লইয়া ॥ ঐ

(গিয়াস উদ্দিন)

১৫.১০.১১ তারিখে বাউল শিল্পী গিয়াস উদ্দিনের দেওয়া তারিখ অনুযায়ী তাঁর বাড়িতে যাই। তিনি ১৯৬৯ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি মোহরের পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম : মো. কালাই উল্লা। তাঁর ঘরে গানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন। দুটি গান নিজেই সুর করে আমাদের গেয়ে শোনালে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

কার কাছে কই মনের বেদনা,
প্রেম করিয়া শান্তি হইল না ॥

আমি বিশ্ব হেরি যেদিকে যাই,
শুধু লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা যে পাই।
প্রাণবন্ধুরে ভালোবাসি,

www.pathagar.com

জগতে হইলাম দোষী
গলে নিলাম প্রেমের ফাঁসি
মরিতেও পারি না হইলাম দোষী ॥

প্রাণবন্ধুর কথা হলে স্মরণ,
কত স্মৃতি ভাসে তখন।
চোখের জলে ভিজাই বসন,
বন্ধু এসে দেখনা।
অধীন শেখ গিয়াস বলে,
মনের আগুন মনে জ্বলে।
নিভে না আর জলে ॥

(দুই)

ইষ্টি কুটুম সব ছাড়িয়া হইলাম আমি ঘর ছাড়া,
কোথায় আছ প্রাণবন্ধু দিলা না আমায় ধরা ॥ ঐ
বিশ্বাস করে প্রাণবন্ধুরে, মন দিলাম তার চরণে,
আমারে ভুলিয়া প্রেম করে অন্যের সনে,
সহেনা আর কোমল প্রাণে, দুই চোখে বহে ধারা ॥ ঐ
জানি না রে প্রাণবন্ধু এত নিষ্ঠুর তোমার মন
মন-প্রাণ কাড়িয়া নিয়া দিলে কত জ্বালাতন
তুই বিনে আর নাই রে আপন, হইয়াছি দিশেহারা ॥ঐ
অধীন শেখ গিয়াস কয়, আসে যদি মনচোরা,
আমারে পাবে না বন্ধু সবকিছু হইল সারা,
মইরাছি পিরিতির মরা এখন বন্ধু দেয় না ধরা ॥ ঐ

(আবু ছালেক)*

মো. আবু ছালেক, পিতাঃ ছাইদুর রহমান, গ্রামঃ মজলিশপুর, তাঁর জন্ম ১৯৮৪সালে। পেশা : কৃষি ও গান করা। এ পর্যন্ত তিনি গান লিখেছেন প্রায় ৫০টি। ২২.১০.১১ তারিখে ১০টার সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে এই গানটি সংগ্রহ করা হয়।

যাইও না যাইও না রে বন্ধু আমারে ছেড়ে
আমার মনের তাজমহলে রাখব তোমারে বন্ধু
আমার মনের তাজ মহলে রাখব তোমারে বন্ধু ॥

সুন্দর তোমার দুটি নয়ন মায়াবী চেহারা
আমার কাছে তুমি আকাশেরই তারা
জীয়ন্ত হইমু মরা ভুলিস না আমারে ॥ বন্ধু

www.pathagar.com

চাঁদ রূপসী আউলা কেশি নিলে মন-প্রাণ
তোমার বিনিময়ে আমি সবকিছু দিলাম
আমি তোমার সাথি হইলাম যাব না ছেড়ে ॥ বন্ধু
তোমার অঙ্গে রূপের আলো দেখি সারা গায়
কী যে পাগল করলায় তুমি ছালেক পাগল রে ॥ বন্ধু

(কে আলম)

০৪.০৯.১১ তারিখে বিকালে বানিয়াচং তাম্বুলিটুলা গ্রামে গীতিকার কে আলমের সঙ্গে দেখা করে তিনটি গান সংগ্রহ করা হয়। তিনি গানগুলো গেয়ে শোনালে তা রেকর্ড করা হয়। গীতিকার কে আলম একজন তরুণ বাউল শিল্পী। বয়স প্রায় ৪৫। গান লেখা ও গাওয়া তার পেশা।

পঞ্চকাম আইকয়া ধর ছয় রিপুকে দূর কর
করিও না কিঞ্চিৎখানি ভুল, কেঁদে হও আকুল
মক্কাতে ফুটিল দীন ফুল॥ ঐ

১

ছিলেন নবী সেতারাতে আনা হলো আরশেতে ময়ূররূপে ছিলেন রাসূল,
হযরত আলী মাথার তাজ হাসান হোসেন কানের দুল (১)
মা ফাতেমা ছিলেন গলার ফুল॥ ঐ

২

নবী আমার পরশমনি যে পাইয়াছে সে হয় ধনী আমি পাপী কান্দিয়া আকুল
আবদুল্লাহর ঔরশে মা আমেনার গর্ভ হতে (২)
চলে এলেন মোহাম্মদ রাসূল॥ ঐ

৩

বাউল কে আলম তুমি অপরাধী পাপ করেছ লাখবধি, কেমনে করে পাবে তুমি কূল,
তোমায় দয়াল যদি দয়া করে একূল সেকূল দিতে পারে (২)
হাশরের দিন দিয় চরণে ধূল। ঐ

(দুই)

রাহমান ও রাহিম নামটি তোমার স্মরণ করিয়া,
ভব সাগরে ধরলাম পাড়ি নিও তৃরাইয়া। ঐ

১

তুমি আল্লাহ তুমি ঈশ্বর তুমি হও সর্বমহান,
তোমার খাইয়া তোমার পইড়া তোমারই গাই গুণগান (২)
তুমি আমার জানেরই জান বুঝাই কী দিয়া ॥ ঐ

২

আসমান জমিন চন্দ্র তারা সবই হয় তোমারই দান ,
আমি পাপী অপরাধী বাঁচাইয়া দিয় আমার জান (২)
তোমার দয়া না পাইলে যাব মরিয়া ॥ ঐ

www.pathagar.com

৩

তোমার নাম ধরিয়া যদি চলেও যায় আমার জান,
মরিয়াও শান্তি পাব হব প্রেমের অবসান (২)
বাউল কে আলম কইন চাইয়া বেহেশত তোমায় ভাবিয়া ॥ ঐ
বন্ধুর সনে প্রেম করিয়া সাজিলাম জংলার পাগল হইয়া

(হোসেন)

০৪.০৯.১১ তারিখে সন্ধ্যায় পূর্বের বড় বাজারস্থ বাউল কল্যাণ ফেডারেশনে গীতিকার হোসেন তিনটি গান গেয়ে শোনালে তা খাতায় রেকর্ড করা হয়। গীতিকার হুসেন বানিয়াচং তোপখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, বয়স প্রায় ৪৮। তিনি বর্তমানে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

কাজল মাখা চোখে আমার নজর দিয় না
নজর দিলে বুঝতে পারি সখি তোমার ভাবনা॥ (২)

যারে আমি খুঁজি গো মনে
তার কথাটা মনের কাছে রাখি কেমনে (২)
প্রাণের বন্ধু অনেক দূরে করি শুধু কল্পনা, নজর দিয় নাম॥ ঐ

নাকে নোলক কানে ঝুমকা দুল
সাজিয়াছ রূপের রানি জলের পদ্ম ফুল (২)
রূপে মজে হোসেন কাঁদে কেন বুঝে না, নজর দিয় না॥ ঐ

(দুই)

ও মন লইলে না রে খবর,
সবাই একদিন যেতে হবে কবরের ভিতর ॥

কবর হবে আসল বাড়ি
মনে নাই রে তর (২)।
অন্ধকারে পড়ে থাকব সারা জনম ভর (২)॥ঐ

এই দুনিয়ায় যা কইরাছ
সবই হবে পর (২)
নেকি-বদির হিসাব নিব কবরের ভিতর(২)॥ ঐ
ভাবিয়া হোসেন বলে
আপন হবে পর (২)।
এই কথাটা মনে পড়লে গায়ে উঠে জ্বর (২)॥ঐ

www.pathagar.com

(তিন)
আমার প্রাণ উড়িয়া যায়
দয়াল নবীর পাকরওজায়
হাশরের দিন সুপারিশে রাখিয় তোমারই পায় ॥ ঐ

মাথার উপর সূর্য আসবে
নফসি নফসি সবাই বলবে
কেউর কথা না কেউ শুনবে তখন হবে কী উপায় ॥ ঐ

হাশর মিজান পাড়ি দিতে
নবী যদি থাকেন সাথে
ভয় করি না ফুলসিরাতে প্রাণে শুধু তোমায় চায় ॥ঐ

হোসেন কয় ওগো নবী
তোমায় আমি না পাই যদি
আমি পাপী অপরাধী হবে আমার কী উপায় ॥ ঐ

১০. বাইদ্যার গান

হবিগঞ্জ অঞ্চলে বাইদ্যার কোনো আবাস বা ঠিকানা নেই। বানিয়াচং, আজমিরীগঞ্জ, লাখাই, নবীগঞ্জের ভাটি এলাকায় বাইদ্যারা নৌকার বহর নিয়ে আসে। এঘাটে ওঘাটে বিশেষত বড় বড় হাট-বাজার ও উপজেলা সদরে তারা নোঙর করে। বেশ কিছুদিন অবস্থান করে সাপের খেলা, বাইদ্যার গান, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি করে থাকে। তারা আমাদের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কিছুদিন পর আবার অন্য কোথাও চলে যায়। কোনো কোনো দলকে নৌকা থেকে সমতলে উঠে ক্ষেত বা বিছরায় অস্থায়ী ঝুপড়ি ঘর পলিথিন দিয়ে বেঁধে থাকতে দেখা যায়। বেদেনীরা গ্রামে গ্রামে দুই-তিন জনের দল বেঁধে 'ফুঁকখোয়াই, বাত খোয়াই, শিংগা লাগাই' বলে হাঁক ছাড়ে, এবং রোগী পেলে চিকিৎসা করে। তারা চিকিৎসার ফি বাবদ টাকা অথবা চাল অথবা তৈল-মশলাও নিয়ে থাকে। সন্ধ্যার আগেই নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে আসে। তাদের পুরুষ সদস্যরা ঝুপড়ি ঘরে থেকে গৃহস্থলি করে। লাকড়ি-জল সংগ্রহ করে। সন্তানকে দেখাশোনা করে সময় কাটায়।

আর একটি দল আছে যারা সাপের খেলা দেখায়, সাপ ধরার কাজ করে। ওঝারা মন্ত্র দ্বারা সাপ ধরে। সাপে কাটা রোগীকে চিকিৎসা করে। ব্যবসায়ী বেদেরা সাপের খেলা দেখাবার সময় টেনে টেনে সুর করে গান গায়। তাদের গানে কোনো কাহিনি থাকে না। কেবল বেহুলা-লক্ষীন্দরের করুণ অংশটুকু গেয়ে থাকে–

'আরে কী হইলো রে...
ওরে মরিলো লক্ষীন্দর-র-রে বিষর জ্বালায়
ওরে বিয়ার রাইতে যে গো হইল
রাঁড়ী গো, বেহুলা সুন্দরী-র-গো।'

www.pathagar.com

এই গান গেয়ে বাক্স বা ঝুড়ি থেকে বিষধর আলদ সাপ বের করে লেজে ধরে সাপের গায়ে হাতের আঙ্গুলের চাঁপ দেয়। আর সাপ রেগে উঠে ফণা তোলে– এরকম দুই-তিন বার করার পর অন্য একটি দারাশ সাপ ছেড়ে দেয়। এ সাপ দ্রুত দৌড়াতে থাকে, লেজ ধরে টেনে নেয়, তখন ভীত হয়ে দর্শকরা ছোটাছুটি করতে থাকে। কিছুক্ষণ সাপগুলোকে নাড়াচাড়া করে খেলা দেখাতে থাকে। আর লক্ষীন্দরের গান সরু ও উঁচু কণ্ঠে গেয়ে শোনায়। এই দুটি সাপ বাক্সে বা ঝুড়িতে রেখে এবার ছোট একটি বাক্স প্রদর্শন করে বলে, এতেই রয়েছে কালনাগ, যে সাপ বেহুলা-লক্ষীন্দরকে বাসরঘরে খেয়েছিল। এই সাপের খেলার মধ্যেই সাপের খেলা শেষ হবে। আপনারা যে যা পারেন দেন এই বলে ব্যবসায়ী বেদেরা টাকা ওঠাতে শুরু করে। দর্শকরা টাকা দিতে থাকে। বাক্স থেকে চিকন একটি ডোরাকাটা রঙের সাপ প্রদর্শন করে বেদেনী গান ধরে–

'খা খা খা বক্কিলারে খা
কৃপণেরে খা, পকেটে টাকা তৈইয়া, যে দেয় না
তারে ধইরা খা...
তার শাশুড়িরে খা...
খা খা খা বক্কিলারে খা'। ইত্যাদি

অনেকে টাকা দেয়, কেউবা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। বাইরাও একপ্রকার গীতিব্যবসায়ী। তারা গান গেয়েই সাপের খেলা দেখাইয়া থাকে।[১] নবীগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট, মাধবপুর, শায়েস্তাগঞ্জ এলাকায় কিছু বাইদ্যা দীর্ঘসময় নিয়ে বসবাস করছে। তারা সাপের খেলার চেয়ে শিংগা লাগানো, বিষবেদনার বাত খোয়া, দাঁত-চোখের ফোঁকার চিকিৎসা করতে দেখা যায়। হবিগঞ্জ শহরের কোর্ট প্রাঙ্গণে (নিমতলা) রাস্তায় প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আট দশজন বেদিনীকে ঝাড়-ফুঁকের কাজে বসে থাকতে দেখা যায়। আদালতে আসা গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস দাঁত-চোখের পোকা ওরাই ভালোভাবে খুলতে পারে। সেই বিশ্বাসে তারা এখানে চিকিৎসা নেয়। কেউ কেউ রস বাতের চিকিৎসা শিংগা দ্বারা করিয়ে থাকে। বাতের কালো রক্ত ওরা শিংগাতে বের করে। কেউ আবার তাবিজ কবজ নিয়ে থাকে। এসবই লোক বিশ্বাসের দ্বারা হয়ে থাকে।

যাযাবর জনগোষ্ঠী আমাদের প্রাচীন বাংলার সামাজিক ঐতিহ্যেরই একটি অংশ। আমাদের বাংলাদেশ হাওর-বাঁওড়ের দেশ, সাপের দেশ। প্রতিবছর বহু লোক সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। চিকিৎসার জন্য ওঝা খুঁজে বের হয়। বাইদ্যারা গান গেয়ে বীন বাজিয়ে রোগীর চিকিৎসা করে। কেউ বেঁচে যায়, কাউকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

গ্রাম বাংলার লোক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাইদ্যার গানের জনপ্রিয়তা এখনো অম্লান।

১১. বারমাসি গান

২৩.১১.১১ তারিখে সকাল ১০টার সময় রাশেদুর রহমান খান সাবাজ, পিতা : মৃত: আবদুল গফুর মিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ., পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : এড়ালিয়া পাড়া, বানিয়াচঙের কাছ থেকে বারমাসি গান সংগ্রহ করা হয়।

www.pathagar.com

আর। আল্লাহ-২ বল ভাই রে না রও গাফিলেতে,
হরদমে লও আল্লাহজির নাম ভাই আইতে যাইতে,

আর। অগ্রহায়ণ মাসেতে ভাই রে খেতে পাকা ধান,
করবে সরাই কাজ ভাই যত মুসলমান ।
ফরজ ও ওয়াজিবও পড় রসুলের সুন্নত।
তার পড়ে কর ভাই রে নফল এবাদত।

আর। পৌষ মাসেতে ভাই রে পৌষ অন্ধকার।
যে ভাই বন্দেগি করে পায় রে দিদার আল্লাহ।
আল্লারও পিয়ারা হইলে বেহেস্ত যাইব শুনি।
বড় নিয়ামত দিবা আল্লাহ কাউছারেরও পানি।
হুরও পরী দিবা আল্লায় খেদমতের লাগিয়া ।
বড় খুশি হইব রে বান্দা নিয়ামত পাইয়া ।

আর। মাঘ মাসেতে ভাই রে দিগুন বয়ে যার।
শিরিক বিদা যেও করে দুষমন ও আল্লার ।
আল্লার ও দুষমন হইলে দোজখে জ্বলিবে ।
দোজখের মালিকে ভাই রে আজাবও করিবে।
দোজখের আজাবের কথা বলা নাহি যায় ।
দোযখের আজাবের কথা কিভাবে বুঝায়।
খলের ইমামে দিব খনেরে আগুন ।
পিপাসা লাগিলে দিব আত্তরেরও পানি ।

আর। ফাল্গুনও মাসেতে ভাই রে বসন্তরেই বাও।
হালাল ও হারাম ভাই রে চিনিয়া যে খাও।
হালাল-হারামের কথা বলা নাহি যায়।
হালাল ও হারামের কথা কিতাবে বুঝায়।
হালাল ও হারামের কথা কিতাবে আছে।
না বুঝিলে বুঝো গিয়া আলিমের কাছে।
আলিমে যেই মতে কয় সেই মতে চলিবে।
তাদের হইয়া সকলই চলিবে।

আর। চৈত্রিক মাসেতে ভাই রে রুদ্রের বড় জ্বালা।
মা-বাপের খেদমত করলে আখেরাতে ভালা।
মা-বাপের খেদমতে কথা বলা নাহি যায়।
মা-বাপের খেদমতের কথা কিতাবে বুঝায়।
জরুল আরকা লইয়া ভাই রে খেদমতও করিও,
খানি কাপড় দিয়া ভাই রে খুশিতে রাখিও।

www.pathagar.com

মা-বাপের উপর যে আড় চোখে চায়,
আত্তই খারাম দিয়া চক্ষু টানিয়া খোয়ায় যে।
বে ইনসাফে আল্লায় তারে দোজখে জ্বালায়।

আর। বৈশাখও মাসেতে ভাই রে কিয়ানে বোনে ধান,
পাঞ্চকামে মুসলমান ভাই আল্লার প্রমাণ।
কলিমা, নামাজ, রোজা, হজ আর জাকাত,
পাঞ্চকামে জানি ভাই রে মুসলমানি ভালো।

আর। জৈষ্ঠ্য না মাসেতে ভাই রে ফলও গাছের জড়ে,
প্রথমে ঈমান আনি আল্লার উপরে।
দোছরা ঈমান আনো কোরান আর কিতাব,
তেছরা ঈমানও আনো ফিরিস্তা তামাম।

আর। আষাঢ় মাসেতে ভাই রে মেঘ ও পড়ে দারে,
যে স্ত্রী কসমে বানীর খেদমত নাহি করে।
সেই স্ত্রীর আজাবের কথা বলা নাহি যায়,
সেই স্ত্রীর আজাবের কথা কিতাবে বুঝায়।
আত্তসের জ্বিনজুল পায়ে দিব বেড়ি বিচ্চুয়ায় ধরিয়া আনব,
সর্পে কাইটা খাইব।
প্রাণের পতিরে না বুঝিল,
পতি বিনে অভাগিনীর কিবা গতি হইল।

আর। শ্রাবণ মাসেতে ভাই রে বাড়ির মা গম্ভীর,
উস্তাজের তাবিদার হইয়া চিনিয়া লইয়ো ভাই পীর।
পীরও ধরিলে ভাই রে পন্থের উদ্দেশ্য পাইবে,
আন্দারিয়া ঘরের মাঝে প্রকাশ মিলিবে।

আর। ভাদ্র না মাসেতে ভাই রে গাছের তালও ঝরে,
মুসলমান হইয়া যে জন নামাজ নাহি পড়ে।
তার সনে লেনাদেনা কিছু না করিয়ো,
তার সনে ভালোবাসা কিছুই না করিয়ো।
শুন রে ভাই বেনামাজি নৌকায় ঘুমান,
বেনামাজি যত দেখা হাওয়ানের সমান।
শুন রে ভাই বেনামাজি না ফিরাও রে মন,
বেনামাজির হাতের পানি পেমারের মতন।
শুন রে ভাই মমিনগণ কইছেবে স্বভাবে,
বেনামাজি যত দেখ তফাতে রাখিবে।

www.pathagar.com

আর। আশ্বিনও মাসেতে ভাই রে গাছে গুয়া কথি,
নামাজ পড়ো রোজা রাখো আখেরাতের সাথি।
একদিন উঠাইবায় বান্দা কবরও ফাটিয়া,
হাসরের ময়দানে আল্লায় খাড়া করবেন নিয়া।
হাসরের ময়দানে বান্দা ধূপের আগুনি,
নামাজে ধরিব ছায়া রোজায় দিব পানি।

আর। কার্তিকও মাসেতে ভাইরে ধানে বান্দে খিরার,
যত দেখ আল্লার বান্দা উম্মতও নবীর।
ভুখারে দিয়ো খানা পিয়াসীরে পানি,
মুরদারে দিয়ো কাফন বেহেস্তরও নিশানি।

বারো মাসের তেরো পদ ভাই লওরে গনিয়া।
কবিরও ঠিকানার কথা কইমু ভাঙ্গিয়া।
বানিয়াচুঙ্গ পরগণা যে, বানিয়াচুঙ্গ থানা।
পিতার নাম আবদুল গফুর নাম ও সাবাজ মিয়া।

৩০.১১.১১ তারিখ সন্ধ্যায় এই বারমাসিটি সংগ্রহ করা হয় সৈয়দ আলী (৬০), পিতা : মৃত অবদুল জলিল, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : কৃষি, গ্রাম : মোহরের পাড়া, বানিয়াচঙ, হবিগঞ্জের কাছ থেকে। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে এই বারমাসিটি শুনেছিলেন।

(শ্যামা)

আগনও মাসেতে গো শ্যাম
শ্যামা নিশ্চিন্তের মন্দিরে
শুইলে আসে না নিদ্রা
শ্যামার যৌবন রমের ভাড়
সইগো বন্ধুরে আনিয়া দে।

পৌষ মাসেতে গো শ্যামা
পৌষ আন্ধ করি
এ রূপ ও যৌবন কারে দিব ঢালি
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

মাঘও মাসেতে গো শ্যাম
শীতের বড় ডর
বিছানা বিছাও গো কন্যা
ঈঙ্গল মন্দির ঘর
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

www.pathagar.com

ফাল্গুনও মাসেতে শ্যামা বসন্তেরই বাও
ছাইড়া দে দেশ মন্দিরের তালা
শ্যামার জুড়াও সর্ব গাও
সই গো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

চৈত্রিকও মাসে শ্যামার গো রুদ্রের বড় জালা
বন্ধের লাগি ভাবতে ভাবতে শরীর করল কালা
সই গো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

বৈশাখও মাসেতে শ্যামা চাষে বুনা বীজ
আনগো কটরা ভরে খাইমো গরল বিষ
গরলও বিষ খাইয়া মরলে কাঁদব বাপ ও ভাই
আরোও না সে দিত বিয়া পরদেশির টাইন
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে শ্যামা গো গাছে পাকনা আম
আমও খাইতো, জামও খাইতো, খাইতো গাভীর দুধ
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

আষাঢ়ও মাসেতে গো শ্যামা নব দুর্গার পূজা
মাইনাল যুবতী কন্যা মাইনাল তোর পূজা
ছাগা দিলাম ছাগি দিলাম গোটা দশ গাই
মই আর মইশানি দিলাম লিখাজোকা নাই
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

শ্রাবণও মাসেতে শ্যামা গো শ্রাবইণা ধানের চারা
লাড়তে চাড়তে শরীর করলাম কালা
শরীর করলাম কালারে প্রাণ করলাম কালা
ভাদইয়া কুড়ার ডাকে শরীর করলাম কালা
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে ।

ভাদ্র মাসেতে শ্যামাগো গাছে পাকনা তাল
নারী হইয়া শ্যামার যৌবন রাখতো কত কাল
কেউ দেখে আইতে যাইতে কেউ দেখে বইয়া
আর কত দিন রাখি যৌবন লোকের বৈরি হইয়া
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

www.pathagar.com

আশ্বিনও মাসেতে গো শ্যামা
কার্তিক ও মাসেতে শ্যামাগো গাছে গোয়ার আংগি
আইতেছে শ্যামাগো কানদে দিয়া ছাত্তি
আইছো আইছো প্রাণের সাধু বস নিজ স্থানে
ঘরে আছে বৃদ্ধ মা জিজ্ঞাসি গিয়া তারে
কী কর গো বৃদ্ধ মা কী করো বসিয়া
কার খাইছলায় পান সন্দেশ
কার টাইন দিছলায় বিয়া
কষ্টে বুড়া-বুড়ি জামাই চিনতে গেল
সইগো শ্যাম বন্ধুরে আনিয়া দে।

০১.১২.১১ তারিখে সন্ধ্যায় আবুল কালাম (৬০), শিক্ষাগতা যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা : কৃষি, পিতা : তরিবত উল্লা কুতুবখানী, বানিয়াচং, হবিগঞ্জের কাছ থেকে এ বারমাসিটি গেয়ে শোনালে তা লিপিবদ্ধ করা হয়–

(কুকিলার বারমাসী)

আইলতো কার্তিক মাস ও ধানে বান্দে খির
তরও রূপ-যৌবন দেখিয়া প্রাণে না লয় স্থির
ও ওরে নবীন কোকিলারে...
শান্ত করো ওরে সাধু শান্ত করো মন
পাইলে যমুনার ঘাটে হবে দরশন
ওরে নবীন কোকিলারে...
রাজার দেওয়া সাগর দিঘি সানের বান্ধা ঘাট
কোকিল কন্যা জল ভরিতে কিসের চকিধার
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলো কইন্যা না ফুরাইল আউস
নব রং ছুরত ও লইয়া সামনে আগন মাস
আইলোত আগন মাসে দিত্তা উদয় চান
দেখা দিয়া শান্ত করো ওগো কইন্যা নাগরের পরান
ওরে নবীন কোকিলারে...
উজা না হয়, বাধ্য না অয়, মন্ত্র নাই যে জানি
কি দিয়া রাখমু আমি নাগরের পরানী
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলো কইন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত ও লইয়া সামনে পৌষ মাস
ওরে নবীন কোকিলারে...
আইলতো পৌষ মাসে খোয়ার বড় জোর
তর লাগি আনছি কন্যা আবের কান্তা জোর

www.pathagar.com

ওরে নবীন কোকিলারে...
আনছ আনছ ওরে সাধু ধরমু ছইমু
তরও মা-বোন লাগাল পাইলে থাক দিয়া বিলাইমু
ওরে নবীন কোকিলারে...
বিছানা বিছাওগো কন্যা ঈগল মন্দির ঘর
কোন দানবে উড়াইয়া নিল বিছানা সুন্দর
ওরে নবীন কোকিলারে...
তর আমার পন্থে দেখা মা-বোন কেন তোলো
ওরে নবীন কোকিলারে...
এত মাস বাড়াইলো কইন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত ও লইয়া সামনে মাঘ মাস
ওরে নবীন কোকিলারে...
আইলো মাঘ মাসে শীতে কম্প জ্বর
ওরে নবীন কোকিলারে...
জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিয়া ঢেউ
হাসিমুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই তর কেউ
ওরে নবীন কোকিলারে...
এত মাস বাড়াইলো কন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া সামনে ফাগুন মাস
আইলো ফাগুন মাস খেতে জালায় উড়া
তর ও ইন্দ্রে আছে কন্যা রসের ও কমলা
আছে আছে ওরে সাধু তইছি টামাইয়া
আপন সাধু বাড়িত আইলে খাইমু কমলা
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলো কন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া সামনে চৈত্রিক মাস
চৈত্রিক মাসে ভাই রে মাটি টন টন
তর সাধু মারা খাইছে নারায়ণগঞ্জের সর
মরছে না আছে কোন শহরে এই নামে মারা গেছে আরেক সওদাগর
যদি মরে যাইত আমার নিজ পতি
আওলাইতাম মাথার কেশ ছিঁড়তাম গজমতি
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলা কইন্যা না ফুড়াইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া সামনে বৈশাখ মাস
আইলো বৈশাখ মাস সুশাক ও নলিতা সকলে খায়
সকল সখি তুলছইন শাকরে কোকিলার মতো তিতা
রান্ধিয়া বাড়িয়া লইলো পাতে

www.pathagar.com

আপন সাধু বাড়িত নারে শাক ভাসাইমু জলে।
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস ফুরাইলো কইন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া সামনে জৈষ্ঠ্য মাস
জৈষ্ঠ্যও মাসে রৌদ্রের বড় জ্বালা
দেশে দেশে পাকে ফল রে আম কাঁঠাল কলা
আম খাইমো, কাঁঠাল খাইমো খাইমু গাভীর দুধ
পালঙ্কে বইয়া দেখমু আপন সাধুর চন্দ্র মুখ
আম খাইমু রসে রসে কাঁঠাল খাইমু কুষে
নয়া গাছের কলা খাইমু মনেরও বিলাসে,
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলা কন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত ও লইয়া সামনে আষাঢ় মাস
আইলো আষাঢ়ও মাসে গাঙ্গে নয়াপানি
চল চল কোকিল কন্যা খেলাইমু বাইছালি
তোমার নায়ে তুমি সাজ আমার নায়ে আমি
আপন সাধু দেশে আইলে খেলিবো বাইছালিরে
ওরে নবীন কোকিলারে...।
এত মাস ফুরাইলো কইন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া সামনে শ্রাবণ মাস
আইলত শ্রাবণ মাস গাঙ্গে বড় নিন
আজও রাত নিশিতে চুরি হইবো কোকিলার মন্দির
এমন সাধু স্ত্রী লয়ে ঘুমে কাতর
দোয়ারে বান্দিয়া রাখমু গজমতি হাতি
কোমরে পেছাইয়া রাখমু লোহার শিকল কাছি।
ঘরেতে জ্বালাইয়া রাখমু গোটাপঞ্চ বাত্তি
জাগাইয়া রাখমু আমার পাড়া-পড়শি
নবীন কোকিলারে ...
উড়াইয়া ফালাইমু তর গজমতি হাত্তি
তাপা দিয়া নিফাইমু তর গোটা পঞ্চ বাত্তি
কী করব তোর পাড়া-প্রতিবেশী
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলো কন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত ও লইয়া সামনে ভাদ্র মাস
আইলো ভাদ্র মাসে গাছে পাকনা তাল
নারী হইয়া রাখমু যৌবন কত কাল
কেউ দেখে আইতে যাইতে

www.pathagar.com

কেউ বলে কত কাল রাখব যৌবন লোকের বৈরীতে
ওরে নবীন কোকিলারে...
এও মাস বাড়াইলো কইন্যা না ফুরাইলো আউস
নব রং ছুরত লইয়া আইলো আশ্বিন মাস
আইলো আশ্বিন মাসে গাছে গুয়া কাত্তি
ঐ দেখা যায় কোকিলার কন্যা সাধু আসছে
আইছে আইছে ওরে সাধু বউরে ইরিস্থানে
ঘরে আছে বৃদ্ধ মা-বাপ জিজ্ঞাসিবে তারে
কই রইলায় গো বৃদ্ধ মাই বাপ
ঘরেতে বসিয়া কারো খাইছলায় পান সন্দেশ
কার টাইন দিছলায় বিয়া
ওরে নবীন কোকিলারে...
আগের বাটায় আগর চন্দন পাছের বাটায় তেল
ধীরে অস্তে বুড়াবুন্নি জামাই চিনতো গেল।
কোথায় তোমার বাড়ি বাবা কোথায় তোমার ঘর
হল দিয়া বাড়ি আমার জলদিয়া ঘর
মায়ের নাম কমলাবতী বাপের নামটি গঙ্গাধর
চিনিয়াছি চিনিয়াছি কোকিল কন্যা
এই জামাই তোর
মাথায় কেশ দুই ভাগ করিয়া
নমস্কার গিয়া কর
আসমানের চন্দ্র যেমন তারায় সফিয়া রইলো
ওরে নবীন কোকিলারে...
বারো মাসে তেরো পদ নাও ভাই গুনিয়া
এই গীত বান্দিয়াছে শ্রীধর বানিয়া।
শ্রীধর বানিয়ারে শ্রীকান্তের ও নাতি
এই গীত গাইতে লাগে আশ্বিন ও কার্তি।

(গর্ভে বার মাসী)

১০.১২.২০১১ তারিখে দিলোয়ারা বেগম (৫৫), শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা: গৃহিণী গ্রাম : মোহরের পাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জের কাছ থেকে এ বারমাসীটি সংগ্রহ করা হয়–

এক না মাসের কালে জানি কী না জানি
দুই না মাসের কালে কচু পাতার পানি
তিন না মাসের কালে লউয়ে বান্দে গোলা
চার না মাসের কালে হাড়ে মাংসে জোরা
পাঞ্চ না মাসের কালে পাঞ্চরিত ধরে
ছয় না মাসের কালে সর্ব লোকে জানে

www.pathagar.com

সাত না মাসের কালে নখ ও চুল উটে
আট না মাসের কালে অষ্ট অলংকার
নয় না মাসের কালে নব রঙের স্মৃতি
দশ না মাসের কালে পিঞ্জিরার বসতি
এগার না মাসের কালে কান্নাকাটি করে
বার না মাসের কালে পূর্ণ শিশু ঘরে।

(পার্বণ)

চৈত্রে চলিতা
বৈশাখে নালিতা
জৈষ্ঠে খৈ
আষাঢ়ে দৈ
শ্রাবণে শসা মিটা
ভাদ্রে তালের পিঠা
আশ্বিনে ওল
কার্তিকে কৈ-পুঁটির ঝোল
আগনে নবান্ন
পৌষে কাঞ্জি
মাঘে তেল
ফাল্গুনে গুড় আর বেল ।

তথ্যসূত্র

১. মো. সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরিঃ বাংলাদেশের লোক সংগীত পরিচিতি (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি ১৯৭৩, পৃ. ২৮৭
২. শামসুজ্জামান খানঃ বাংলার লোকসাহিত্য (বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১১৩
৩. জাহান আরা খাতুন : মরমি কবি শেখ ভানু (সুরমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৫৯
৪. নন্দলাল শর্মা : সিলেটের বারমাসি গান (বাংলা একাডেমি ২০০২), পৃষ্ঠ....
৫. তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল : সুফী দার্শনিক কবি শেখ ভানু (উৎস প্রকাশন ২০০৪), পৃষ্ঠা ১১০

শব্দার্থ : খেওয়ার নাও = খেয়া নৌকা, বন্ধুঈন = বন্ধুহীন।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে ২০১২ সালের ৮ এপ্রিল তথ্য প্রদান করেন মির্জা এনামুল হক (৫৬) শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচ এস সি, পেশা: চাকরি, পিতা: গোলাম মুক্তাদির, গ্রাম: কামাল খানী, বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ। তিনি গায়ক, সুরকার ও লেখক। তিনি নিজেও গানের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরি করে থাকেন। তিনি জানান যে, ষাটের দশকের দিকে উপজেলার গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা, ঢপ যাত্রা, ঘাটু গান, কীর্তন, ধামাইল, পালা গান প্রতি নিয়ত রাতে কোথাও না কোথায় অনুষ্ঠিত হতো। এসব গানের অনুষ্ঠানে যে সব বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা হতো তার মধ্যে ঢুল, ঢুলক, ঢপকী, বাঁশি, করতাল, একতারা, দোতারা, বুগলি, খুল, মোহন বাঁশি, সানাই বাঁশি, সারিন্দা, খঞ্জনি, চিরনীর বাঁশি, চট্টি ইত্যাদি দিয়ে উপজেলার গ্রাম অঞ্চলে শিল্পীরা গান বাজনা করত। অনেক বাউল শিল্পী আধ্যাত্মিক জগতের গান গেয়ে মানুষকে প্রেরণা যোগাত বলে শুনা যায়। উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে বাউল শিল্পী মৃত: আব্দুল গণি মিয়া একতারা বাজিয়ে গান করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাউল শিল্পী শাহ আবু মিয়া ও টেনু মিয়া ঢোল, ঢপকি, দোতারা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে সত্তর দশকে গান গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন বলে শুনা যায়।

নিম্নে দুটি আঞ্চলিক বাদ্যযন্ত্র বানানোর কলা-কৌশল উল্লেখ করা হল।

ক. বাঁশিওয়ালা

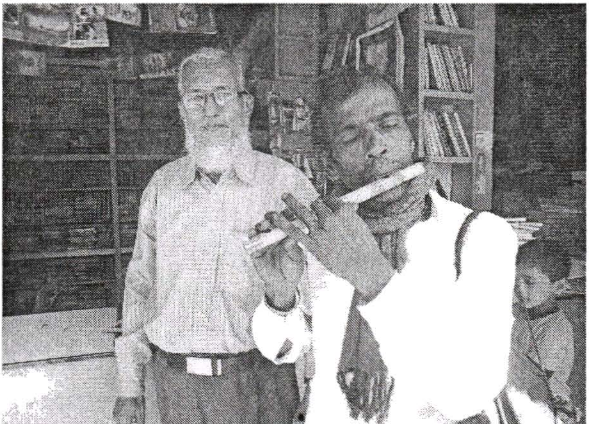

বাঁশিবাদকের সাথে প্রধান সমন্বয়কারী

www.pathagar.com

বাঁশিবাদক সুশীল চক্রবর্ত্তী, গ্রাম: ভাটিপাড়া, সুনারু, সুবিদপুর, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। বয়স: ৪৫ বছর, পেশা: বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা, ২৫ বৎসর ধরে এ ব্যবসায় জড়িত। ওস্তাদ: মনি গোপাল চৌধুরী। বাঁশি তৈরি করা হয় মুলি বাঁশ ও পাঁচটি রড দ্বারা। একটি বাঁশি ২০টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা যায়।

খ. একতারা

একটি পাকাপোক্ত বড় লাউ নিয়ে তার মুখ কেটে লাউয়ের ভেতরে বিচিও আঁশ জাতীয় জিনিষ ফেলে লাউকে প্রয়োজন মতো শুকিয়ে নিয়ে তার মুখে গরুর বা খাসির ঝিল্লি পর্দা দিয়ে আবৃত্ত করে দুই অথবা আড়াই ফিট লম্বা একটি বাঁশের টুকরো নিয়ে সংযুক্ত করে দেওয়া হতো। এবার বাঁশের উপর দিয়ে একটু ফেটু করে তার ভেতর দিয়ে একটি বাঁশের সরকা ঢুকানো হতো। এবার নিচের দিকে চামড়ার মধ্যখানে একটি কাঠের গুড়া বসিয়ে দেওয়া হতো তারপর উপরের সলকায় তামার তার প্যাঁচিয়ে তারকে লম্বা করে লাউয়ের নিচের দিকে বহির্ভূত বাঁশের দণ্ডটির সাথে বেধে দেওয়া হতো। এবার তারটিকে উপরের শক্ত সলকাটি ঘুরিয়ে টান করা হতো। তারপর আঙ্গুল দিয়ে ঠুকা দিলেই একতারায় শব্দ হতো।

গ. বুগলি

একটি বাঁশের মোঠা চুঙ্গঁ অথবা কাঠকে খুদাই করে বা মাঠি দিয়ে দুমুখ খোলা একটি চুঙ্গঁ তৈরি করা হতো। খাসির পিঠের ঝিল্লি চামড়া দিয়ে চঙ্গঁটি এক মুখ বন্ধ করে দেওয়া হতো। এবার চামড়ার মধ্যখানে একটি ছিদ্র করে শক্ত মোটা সুতা অথবা চিকন মোগা সুত বা সুতা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। এবার সুতার ওপর খোলা প্রান্তে একটি চিকন ছোট বাঁশের চুঙ্গঁ দেওয়া হতো, চিকন নারিকেলের ছোলা দিয়ে সুতলীটি টান করে বাড়ি দিলে বিভিন্ন প্রকারের তালের উৎপত্তি হতো। সুতলিটিকে টান ঢিল করে এবং নারিকেলের ছোলা কৌশলে ঘষা দিলে কণ্ঠের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে নেয়া হতো।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

ক. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

বাংলা বছরের প্রথম দিনটি পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নববর্ষের শুরু হয়। ঋতুচক্রের অমোঘ নিয়মে বছর ঘুরে ঘুরে আসে নববর্ষ, প্রত্যেক মানুষই চায় বৎসরের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনেও পরিবর্তন আসুক। বিগত বৎসরের দুঃখকষ্ট সব ভুলে গিয়ে জরা-জীর্ণ, গ্লানি সব মুছে দিয়ে নববর্ষ বয়ে আনুক আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। এই প্রত্যাশায় বাঙালি নববর্ষকে আনন্দমুখর উৎসবে পালন করে।

বাঙালির জন্য বাংলা সন একেবারেই স্বকীয়। এ সন দেশ ও জাতির নামে। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, বাংলা আমাদের মাতৃভূমি। জাতি-দেশ-ভাষা এই তিনের মিলনে বাংলা নববর্ষ আমাদের জনজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর নববর্ষ পালনে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পেয়েছে উৎসবপালনে সরকারি স্বীকৃতি। দিনটিকে সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। বলা হয় আমাদের দেশে 'বার মাসে তের পার্বণ' কিন্তু এসব পার্বণ বা উৎসব সবই ধর্মানুষ্ঠানে সঙ্গী। তাই এসবের চেহারা সাম্প্রদায়িক। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে চেহারা এক না হয়ে যায় না।[১] নববর্ষ ব্যতিত আমাদের অন্য কোনো সার্বজনীন উৎসব নেই। উৎসব সর্বজনের মিলনক্ষেত্র। বাঙালি জীবন যাত্রার সঙ্গে নববর্ষ বহুপূর্ব থেকেই জড়িত।[২]

প্রাচীনকাল থেকেই বর্ষবরণ বা নববর্ষ উদযাপন চলে আসছে। সকল জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত নববর্ষের ইতিহাস। তাই একেক দেশে একেক রীতিতে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ রয়েছে। বাংলা নববর্ষের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে বাংলা বর্ষের প্রবর্তন হয়, মুঘল সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর শাহী তখ্‌তে সমাসীন। তখন বাংলা ছিল মুঘল সম্রাটের করদরাজ্য।[৩] সম্রাট আকবর সম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তৎকালীন চালুকৃত সকল সনের পর্যালোচনায় বর্ষপুঞ্জিতে সংস্কার আনার আদের্শ দেন। সম্রাটের আদেশমতে বিখ্যাত জ্যোতিষবিজ্ঞানী ফতে আলী সিরাজী সৌরসন এবং আরবি হিজরিসনের উপর ভিত্তি করে নতুন 'বাংলা সন' প্রণয়ন করেন। প্রথমে এই সনের নাম 'ফসলীসন' পরে 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা সন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

'আইনি-ই আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ যে 'সম্রাট আকবর এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য আদর্শ হবে'।[৪] বাংলা সন প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্রাটের আশা পূরণ হয়েছে, ধর্মমত

www.pathagar.com

সর্ম্পকে সম্রাট আকবরের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতি উপকৃত হয়েছে। 'নববর্ষ' একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

১৫৮৪ খ্রি. ১০ বা ১১ মার্চ তারিখে বাংলা সন গণনা শুরু হলেও ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রি. তারিখ অর্থাৎ সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ থেকে বাংলা সন গণনা পদ্ধতি কার্যকর হয়। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের পদ্ধতি অতীতে ও বর্তমানে, শহর গ্রামে অর্থাৎ পূর্বাপর অঞ্চল ভেদে এক নয়। 'বাংলা নববর্ষে 'পুন্যাহ' নামক অনুষ্ঠানটি পূর্বে হতো জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী পুণ্যাহ, পূণ্য কাজের জন্য প্রশস্ত দিন। কিন্তু বাংলা অর্থে দাঁড়িয়েছে, 'জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরের খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিন'।[৫] বর্তমানে জমিদারী নেই, নেই খাজনা পরিশোধের প্রথা। তবে এখনো ভূমির সরকারি রাজস্ব বৈশাখ-চৈত্র মাস হিসেবে বারো মাসে বৎসর গণনায় আদায় হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এক বছরের লেনদেনের লাভক্ষতির হিসাব ও ক্ষেতে খামারে কৃষি কাজের জন্য বৈশাখে লাঙ্গল দেয়া এই নিয়মগুলো বাঙালি যথারীতি করে যাচ্ছে। এতে করে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলা সন শুধু টিকে থাকেনি বরং বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, যৌথ প্রধান বাঙালি সমাজকে দিয়েছে জাতীয় এবং গৌরব বোধের এক বিশেষ শক্তি।[৬]

পুন্যাহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বিলুপ্তীর পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। পুণ্য থেকে পুন্যাহ। পুণ্যের আশায় নববর্ষকে বরণ করার প্রস্তুতি নিয়ে শহর ও গ্রামগঞ্জে বাড়িঘর ধোয়েমুছে পরিষ্কার করা হয়। জামাকাপড় ধৌত করা হয়, কেউ কেউ নতুন পোশাক কেনে। বাড়ির আঙ্গিনা-উঠান লেপেমুছে সুন্দর করে আল্পনা আঁকে। গৃহপালিত গরু ছাগল ভেড়া মহিষগুলোকে পুকুর বা নদীতে স্নান গোছল করানো হয়। বিশ্বাসরোগবালাই হবে না। বাড়ির গৃহিণীরা রাত জেগে চালের গুরি বেটে পিঠা, সন্দেশ, নাড়ু, ক্ষির, পেরা, পায়েস, হাতের সেমাই ইত্যাদি খাবার নববর্ষ উপলক্ষে পরিবারের সদস্য ও অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য তৈরি করে। চৈত্র সংক্রান্তি পুরাতন বৎসরের শেষ দিন হিসেবে পল্লীগ্রামের লোকদের ব্যস্ততা এমনিতেই বেশি, তারপরও শেষ সন্ধ্যায় গৃহিনী এক হাড়িতে স্বল্প পরিমাণ আতপ চাল পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রেখে তৎমধ্যে একটি আমের কচিডাল ভিজিয়ে রাখেন। পরদিন পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ। ভোর বেলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঘুম থেকে সবাইকে জাগিয়ে গৃহিণী জলে ভেজা চাল সবাইকে খেতে দেন। একে একে বাড়ির সবাই খায়। পরবর্তীতে গৃহিণী হাড়িতে ভেজা আমপাতার ডাল দিয়ে সকলের গায়ে পানি ছিটিয়ে দেন। ধারণা-নতুন বছরের শান্তি নেমে আসবে পরিবারে।[৭] এ লোকবিশ্বাস। আতপ চাল খাওয়াকে কোনো কোনো গ্রামে 'আমানি' খাওয়া বলে থাকে। হবিগঞ্জ শহরে 'আমানি' খাওয়ার প্রচলন নেই। তবে বিশেষ খাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

নববর্ষ উৎসবের দিন। সবাই অতীত বছরের সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহবানে সারা দিয়ে উঠে। ঘরে ভাল খাবার খায়। বন্ধুবান্ধব আত্নীয়স্বজনের সাথে দেখা করে কুশল বার্তা বিনিময় করে। উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এগুলো সামাজিক প্রথা।

www.pathagar.com

নববর্ষের একটি বিশেষ বিষয় 'হালখাতা'। অত্যন্ত গুরুত্ব ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হালখাতা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। হালখাতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা সনের প্রথম দিবসে ব্যবসার জন্য একটি নতুন হিসাব খাতা খোলা। এতে নতুন বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত থাকবে। সকল প্রকারের ছোট বড় ব্যবসায়ী হালখাতা অনুষ্ঠান করে থাকেন। কেউ নির্দিষ্ট পহেলা বৈশাখে, কেউ সুবিধা মতো দিবসে। তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ী নববর্ষে হালখাতা করে থাকে।

হালখাতা অনুষ্ঠানের জন্য 'গন্ধেশ্বরী পূজা' হয়ে থাকে। হবিগঞ্জ কালিবাড়িতে নববর্ষের ভোরবেলা কালিমন্দিরের বারিন্দায় গন্ধেশ্বরী মূর্তি স্থাপনপূর্বক পুরোহিত যথানিয়মে পূজা অর্চণা সম্পন্ন করেন। ভক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ ব্যবসা কেন্দ্রের জন্য নতুন টালিখাতা, কলম, মিষ্টি, ফল-ফলাদি, বুট, মোমবাতি, ধূপবাতি, কিছু আতপ চাল ভোগ দেওয়া হয়। সে সাথে ইচ্ছানুযায়ী পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদানপূর্বক গন্ধেশ্বরীর আর্শীবাদ প্রার্থনা করে ব্যবসার সফলতা কামনা করা হয়। গন্ধেশ্বরী অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ। প্রায় সকল হিন্দু ব্যবসায়ী ব্যবসা কেন্দ্রে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছোট বা বড় মূর্তি রক্ষিত আছে। তিনি গণদেবতাও বটে। গন্ধেশ্বরী পূজায় আনা টালীখাতার মলাটে অথবা ভেতরের প্রথম পাতায় পুরোহিত সিঁদুর, সেত ও রক্ত চন্দন দিয়ে একে একে পাঁচটি কাঁচা টাকার চাপ বসিয়ে দেন। খাতার উপরের দিকে পুরোহিত তাঁর আঙ্গুলের পাঁচটি সিঁদুরমাখা টিপ দিয়ে দেন। জিজ্ঞাসায়[৮] জানা যায়, বাংলাদেশী এক টাকা অথবা পাকিস্তানী এক টাকার মুদ্রা ছাপকাজে ব্যবহৃত হয়। পূজায় নিবেদিত আমপাতায়ও সিঁদুরের টিপ দিয়ে খিলি তৈরি করে দেয়া হয়, এই আমপাতার খিলিগুলো সুতা দিয়ে মালা তৈরি করে ব্যবসাকেন্দ্রের মূল প্রবেশদ্বারের উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এসবই ব্যবসায়ের সফলতার উদ্দেশ্যে। এটিও লোক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই নববর্ষের দিবসেই দলে দলে ব্যবসায়ীবৃন্দ নিকটতম মন্দিরগুলোতে আসেন। পুরোহিত মহোদয় থেমে থেমে সারাদিনই গন্ধেশ্বরী পূজার মাধ্যমে হালখাতা অনুষ্ঠান করে খাতা শুদ্ধ করে দেন। ভক্তদের আশির্বাদস্বরূপ পূজার ফুল, বেলপাতা, আমপাতা দিয়ে থাকেন। হবিগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশন, কালি মন্দির, ইসকন মন্দির, শনি মন্দিরসহ উপজেলা সদর ও গ্রামগঞ্জের মন্দির আখড়াগুলোতে একই নিয়মে হালখাতা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানগুলোতে হালখাতা অনুষ্ঠানের জন্য কার্ড ছাপিয়ে ক্রেতাদেরকে ও খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে থাকেন। মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতাদেরকে দাওয়াত দিয়ে দোকানে মিলাদ পড়ান। গোলাপজল, আগরবাতি, আতরের সুগন্ধীয় পরিবেশে দুরুদ ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানো ব্যবসায়ের সফলতার জন্য। আগত মেহমানদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। এভাবেই হালখাতা অনুষ্ঠান হয়ে আসছে।

নববর্ষ উপলক্ষে হবিগঞ্জে, বিশেষত, ভাটি অঞ্চলের বাড়িতে নতুন চালের ভাত খাওয়ার প্রচলন আছে। 'আগুল ধান' অর্থাৎ আড়াই মাসের ফসল যে যে বাড়িতে আসে, পহেলা বৈশাখে এই নতুন চালের ভাত খেয়ে থাকে। যাদের নেই তারাও এ চাল ক্রয় করে অথবা কর্জ করে। বর্তমানে 'পান্তা ভাত ইলিশ' খাওয়ার যে আধুনিক প্রথা এটি হবিগঞ্জে ছিলনা। এখন অভিজাতরা এই 'পান্তা ভাত ইলিশ' খাওয়ায় অংশ

www.pathagar.com

নিচ্ছেন। যদিও মূলত নববর্ষের উৎসবের সূচিতে এই খাদ্য অন্তর্ভুক্ত নেই, প্রচলিতও ছিল না।

নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা নববর্ষেরই অনুষঙ্গ। আর এই মেলা মিনাবাজার নামকরণেমোঘলরা বর্ষসন 'নওরোজ' চালু কালে করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই মিনাবাজারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে মেলায় রূপ নেয়। বর্তমানে নববর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'বৈশাখী মেলা'। নববর্ষের আগের দিন (৩০ চৈত্র) ও পহেলা বৈশাখ এই দুই দিনে হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটবড় মেলা বসে। এর নাম বৈশাখী মেলা। নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠানের মধ্যে বার্ষিক এ মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক।

নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলার মধ্যে 'চুনারুঘাটের মেলা' বৃহৎ। প্রতি বছর ৩০ চৈত্র তারিখে এ মেলা বসে। এর নাম বৈশাখী মেলা। কবে থেকে এ মেলার প্রচলন হয়েছিল, প্রকৃত তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় যে, আসামের সুরমা উপত্যাকার খোয়াই নদীর পূর্ব পারে 'চুনারুঘাট' তরফ পরগনার অন্তর্ভুক্ত স্থান ছিল। ত্রিপুরা মহারাজার অধিনে সামন্ত রাজা আচক নারায়ণ ছিলেন তরফের রাজা। সেই সময় থেকে যে 'বারুনী' চালু হয়েছিল পরবর্তীতে এটি 'চুনারুঘাট মেলা' নামে পরিচিত। এই মেলায় নাগরদোলা, পুতুল নাচ, বায়ুসপ ইত্যাদি বিনোদনের জন্য এবং প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী, কৃষি উপকরণ, বাঁশ শিল্প, কাঠ শিল্প, মৃৎ শিল্প, শিশু খেলনা, মিষ্টি ও মিষ্টান্ন জাত খাদ্য, ফল ফসালী, শিমুল তুলা, ফলজ বনজ গাছের চারা, ধানের চারা, তৈজসপত্র, লোহালক্ষর, মুয়া-মুড়কিসহ সংসার কর্মের প্রয়োজনীয় সব কিছুই মেলায় পাওয়া যায়। বিস্তৃর্ণ মাঠে আয়োজিত এই মেলায় হবিগঞ্জজেলাসহ পাশের ব্রহ্মণবাড়িয়া ও শ্রীমঙ্গলের লোক প্রয়োজনীয় কেনা কাটার জন্য এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। মেলায় বিস্তর জনসমাগম হয়। হবিগঞ্জের কালিবাড়িতে ঐ তারিখেই মেলা বসে। শহর ও শহরতলীর শিশু কিশোরদের উপস্থিতি চোখে লাগার মতো। এছাড়া বানিয়াচং, নবীগঞ্জ, বাহুবল, মাধবপুর, চুনারুঘাট, লাখাই, আজমিরীগঞ্জ উপজেলা পরিষদসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। মেলাও এই কর্মসূচির অন্তভুক্ত। বৈশাখী লোক উৎসব ও মেলার আয়োজন হবিগঞ্জ পৌরসভা তার নিজস্ব প্রাঙ্গণে প্রতি বছর করে থাকে। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে লোকসাহিত্য আলোচনা লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিশেষত ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগী এই মেলায় বিকিকিনি হয়ে থাকে।

শুভ নববর্ষের সকালে হবিগঞ্জ শহরের স্থানীয় শিরিষতলা মাঠে 'বর্ণমালা খেলাঘর' এর উদ্যোগে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা, গান, নৃত্য, কবিতা পাঠ হয়ে থাকে। তারপর সুরবিতান সঙ্গীত বিদ্যালয়সহ অন্যান্য সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নববর্ষ উপলক্ষে দিনভর অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে সকল অতিথিদেরকে খৈ, মুড়ি, উকরা, বাতাসা, কদমা, কাঁঠলকুশি ইত্যাদি পরিবেশনে বৈশাখী খাবারে আপ্যায়ন করার রেওয়াজ চালু আছে। এরূপ অনুষ্ঠান বৈশাখের প্রায় প্রথম সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন আয়োজন করে থাকে। পূর্বে নববর্ষ উদযাপনে ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড় দৌড়, বানরের নাচ, মুরগের লড়াই এগুলো হতো। এখন আর এগুলো দেখা যায় না। এতদসত্বেও বৈশাখী মেলা নববর্ষের শর্তস্ফূর্ত স্বাক্ষর আর নববর্ষ বাঙালির সার্বজনীন উৎসব।

www.pathagar.com

খ. নবান্ন

'নবান্ন' অর্থ নতুন ভাত (নব + অন্ন)। নতুন ফসল ঘরে আসার খুশিতে কৃষক যে অনুষ্ঠান করে থাকে, তা-ই নবান্ন। নবান্ন মূলত ফসলের, ধান কাটার উৎসব বিশেষ। হবিগঞ্জ অঞ্চলে প্রধানত ইরি, আউশ, আমন এই তিন শ্রেণি ধান বছরের তিন মাসে কৃষকের ঘরে উঠে। বৈশাখে বুরো, ভাদ্রতে আউশ ও অগ্রাহণ মাসে আমন ধান। অঞ্চল ভেদে ফসলের উৎপাদন ও চাষাবাদ হয়ে থাকে। ভাটি অঞ্চলে বুরো ধান, উজান অঞ্চলে আউশ আমন ধানের খ্যাতি রয়েছে। নবান্নতে বুরো আর আমন ধান মৌসুম বৈশাখ ও অগ্রাহণ মাস। ভাদ্র মাসের আউশ ধানের নবান্ন হতে গ্রামগঞ্জেশোনা যায়নি।

গ্রাম অঞ্চলে নবান্নকে 'নয়া খাওয়া' বা নতুন খাওয়া বলে থাকে। কৃষক তার ক্ষেতের পাকা ধান কেটে এনে কয়েকগুছি ধান পৃথক করে রেখে দেয়। এই গুছিগুলো ধান ছাড়িয়ে ভাল করে শুকিয়ে নেয়। তারপর গৃহিণী ধান ভেঙ্গে চাল করে। এই প্রস্তুতকৃত চাল নতুন চালের ভাত খাওয়ার জন্য দিন তারিখ ঠিক করে। রান্না ঘর, হাড়িপাতি, উঠান অঙিনা ভাল করে লেপে মুছে পরিষ্কার করে। কাপড় চোপড়ও ধোয়া হয়। বাজার থেকে একটি বড় মোরগ অথবা তাজা একটি হাঁস কিনে আনা হয়। এই হাঁস মোরগের মাংস রান্না করে নতুন আতপ চালের (মিহিভাত) খাওয়া হয়। কেউ কেউ পুকুর থেকে মাছ ধরে অথবা বাজার থেকে মাছ এনে ভাজি মাছ খাবারের সঙ্গে রাখে। সে সাথে থাকে সুস্বাদু আরো কিছু খাবার।

মুসলমান কৃষক পরিবারে হুজুরকে দাওয়াত করে এনে সর্বাগ্রে তাঁকে খাওয়ানো হয়। তিনি খেয়েদেয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত ফসলের বরকতের জন্য দোয়া করেন। পরিবারের সকলে একত্রে নতুন ভাত খেয়ে থাকে। কেউ কেউ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। নবান্ন ভোজ খেতে দেয়, এতে নতুন চালের পায়েসও তৈরি হয়। আতপ চালের আধা ভাঙ্গা গুড়া, কুড়ানো নারকেল, কলা, গুড় ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি হয়ে নাড়ু, পাড়ার সকল ছোট ছেলেমেয়ের নিকট এই নাড়ু বিতরণ করা হয়। ছেলেমেয়েরা খুশিতে খেতে থাকে।

নবান্নে কিছু ধানের ছড়া দ্বারা একটি বেনি তৈরি করে ঘরের মাড়ইল বা সেলিং এ ঝুলিয়ে রাখে। কৃষকের এতে লক্ষ্মী ও মঙ্গল হবে এ হলো লোক বিশ্বাস। হিন্দু কৃষকের নবান্ন অনুষ্ঠানে পূজাপার্বণ রয়েছে। শিশু সন্তানের মাথার চুল কাটা, সে সঙ্গে নারিকেল ভাঙ্গা হয়। বাড়ির সকলকে স্নান করে নতুন বা পরিষ্কার জামাকাপড় পড়ানো হয়। কাকপক্ষিকে খাওয়ানোর জন্য নবান্নের কিছু চাল, কলা, নারকেলের নাড়ু বাড়ির উঠানে একপাশে রেখে দেয়া হয়। কাকপক্ষী এসে তা খেয়ে থাকে।

কেউ কেউ নতুন ভাতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধান্তে প্রসাদ গ্রহণ অনুষ্ঠান করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত আসেন। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। লক্ষ্মী পূজাও করা হয়। 'লক্ষ্মী ধনের দেবী। লক্ষ্মী দেবীর দুই হাত। এক হাতে নির্মলতার প্রতীক পদ্ম ফুল, অন্য হাতে ধনের প্রতীক শালি ধানের মঞ্জুরী'।[১] তাই শষ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীকে নবান্ন দিয়ে তবেই সবাই তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে থাকে। তারা পূজায় উলুধ্বনি দেয়, গ্রামে উলুধ্বনিকে 'জোকার' বলে। অনেক বাড়িতে নবান্ন উপলক্ষে নানারকম পিঠা

www.pathagar.com

তৈরি হয়। "নবান্ন উৎসবে" পুলিপিঠা করে হিন্দু গৃহিণীরা লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে নৈবেদ্য দেয়" ।[২] তরকারিতে নানারকম শাকসবজির সমাহার হয়ে থাকে।

এখন আর নবান্ন উৎসব আগের মতো হয় না। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হওয়ায় নানা জাতের ধান উৎপাদন হয়। এতে গ্রামীণ জনপদে পূর্বের মতো নবান্ন উৎসব উদযাপন করে না যদিও তবুও কিছু কিছু গৃহস্থ পরিবারে যথানিয়মেনবান্ন উৎসব হয়ে থাকে।

নবান্ন

আব্দুল মুকিত (৫৮), শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি, পেশা: কৃষি, শেখের মহল্লা, বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ। ১৪.০৯.১১ তারিখে সকাল ০৯ টার সময় তার নিজ বাড়িতে উক্ত বিষয়ে আলাপ করলে তিনি জানান যে, অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেতে ক্ষেতে নাড়া থাকিত। কেহ কেহ আবার ধান মাড়া দিয়ে বাতাসযোগে ধান উড়াইয়া গান গেয়ে হল্লা ও গরুর গাড়ি দিয়ে ধান বাড়িতে আনিত। ঐ নতুন ধান দিয়ে গুড়ের শিরনী করে বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। এছাড়া ও পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যেত, এই সময় বাড়ি বাড়ি যেসব পিঠা করা হতো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সিদ্ধ পিঠা, পাটিসাপটা চিতল পিঠা, মালপোয়া ইত্যাদি। মেহমানদের ও এ বাড়ির সে বাড়ির লোকদের ডেকে এনে পিঠা দিয়ে সকালের নাস্তা করানো হতো। এই সময় বাণিজ্যিকভাবে অনেক বাড়িতে নতুন ধান দিয়ে মুড়ি, নাড়ু, তৈরি করে শিশুদের মধ্যে বিক্রি করা হতো।

গ. ঈদ উৎসব

ঈদ' আরবি শব্দ, যার অর্থ খুশি, উৎসব। প্রতিবছর চন্দ্র-বর্ষ-পঞ্জি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে এক অনন্য আনন্দ বৈভব বিলাতে ফিরে আসে মুসলমানই পর্ব 'ঈদ'। প্রিয় নবী হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) সানন্দে ঘোষণা করেছেন। 'প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ উৎসব হচ্ছে ঈদ।'[১] বিশ্ব মুসলিম জাহানের ন্যায় বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের বড় উৎসব হচ্ছে ঈদ। এ উৎসবে আনন্দ আছে, আছে কল্যাণ। মুসলমানদের ঈদ দুটি। প্রথমে ঈদুল ফিতর, এক দিনের উৎসব। পরে ঈদুল আজহ, তিন দিনের উৎসব। 'প্রথমটি দান করার উৎসব, দ্বিতীয়টি ত্যাগ করার উৎসব[২]।

ঈদুল ফিতর

ঈদ অর্থ খুশি আর ফিতর অর্থ প্রবৃত্তি স্বভাব, উপবাস ভঙ্গ করা। রমযান মাসে দীর্ঘ এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনা ও ইবাদত বন্দেগীর পর বিশ্বমুসলিম জাহানে রোজা ভঙ্গ করে আল্লার এই বিশেষ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যে উৎসব পালন করে মুসলমানদের নিকট সেটিই 'ঈদুল ফিতর'। হবিগঞ্জের গ্রামগঞ্জের এই ঈদকে 'রোজার ঈদ' বলে। আবার কেহ কেহ 'শুকরিয়ার ঈদ' বলে থাকে। ঈদুল ফিতরের আনন্দ, উৎসব রোজা রাখার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। রমযানের একটি মাস ছোবহেছোদেক হতে আরম্ভ করে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার বর্জন করা, যথেষ্ট ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকা সত্বেও মুখে কিছু তুলে না দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা থাকার মাধ্যমে

www.pathagar.com

মুসলমানরা আল্লাহর নামে ত্যাগের যে নজির সৃষ্টি করে থাকে অর্থাৎ মাসব্যাপী যে সিয়াম সাধনায় ব্রর্তী হয়, এতে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে বলেন 'রোযা আমার জন্য এবং এর পুরস্কার আমিই দিব।'[৩] এ পুরস্কার ত্যাগেই পাওয়া যায়, ভোগে নয়। এ ত্যাগে শরীর মনকে পাকসাফ করে নেয়, তাই সুস্থ সবল সকল মুসলমানদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে। রমযানের এই মাসকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত করা হয়েছে, ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অপর অবর্তীণের মাধ্যমে, এ মাসেই রয়েছে হাজার মাসের চেয়ে সেরা বরকতময় রজনী-'লাইলাতুল কদর'-এ মাসেই রয়েছে শেষ দশ দিন। 'ই'তিকাফ' করে সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে বেশি বেশি পূর্ণ্য লাভের সুযোগ। মুখ্যত রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের অফুরন্ত নিয়ামত লাভে ধর্মপ্রাণ মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ মাসব্যাপী ধৈর্য, সহ্য করে ও সংযমের মাধ্যমে রোযা রাখে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই এই পবিত্র মাসটিতে সম্মানার্থে ধৈর্য, সহ্য ও সংযমের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা কোন ভিন্ন ধর্মালম্বীকে দেখা যায় না প্রকাশ্যে চা, পান, ধুমপান করতে। অন্য ধর্মালম্বীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল গুলোতে পর্দা ঝুলানো থাকে। পানাহারে থাকে সর্তকতা। সকলের শ্রদ্ধাবোধেই এমনটি হয়, পরস্পরের ধর্মের প্রতিশ্রদ্ধাবোধই সমাজের একতা ও শান্তির মূল।

এ মাসে ফিতরা, জাকাত, দান-খয়রাত করে নিজ নিজ ধনসম্পদের শুদ্ধিকরণে যে খুশি, পক্ষান্তরে সে খুশি ঈদের আনন্দ। বৃত্তবান মুসলমানদের উপর 'যাকাত' ফরজ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। অভাবগ্রস্ত আত্মীয়স্বজন, এতিম মিছকিন, পথিক, গরীব, দানপ্রার্থীকে আর্থিক সাহায্য করে যাকাত আদায়ের বিধান রয়েছে। সাথে সাথে ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে রোযার ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ রয়েছে। সদকাতুল ফিতর' নামের এই দানটি ঈদের পূর্বে পরিশোধের নির্দেশ রয়েছে। ফিতরা ও যাকাত দানে গরিব মিছকিনরা উপকৃত হয়। তারা দানপ্রাপ্ত হয় ধনীদের পাশাপাশি ঈদ উৎসবে সামিল হওয়ার সুযোগ পায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বৃত্তবান লোকেরা, তোমাদের অর্থ সম্পদের মধ্যে ভিক্ষুক ও গরীবের অংশ রহিয়াছে।[৪] এই হক আদায় করলেই ধনী-গরীব সকলে একসাথে ঈদউৎসব পালন করতে পারে। তাই ঈদুল ফিতরের আনন্দের মূলে রয়েছে বদান্যতা। তাইতো আমাদের জাতীয় কবি বলেন 'তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহেলিল্লাহ, দে যাকাত মূর্দা মুসলিমেরে আজ ভাঙ্গাইতে নিদ'[৫] । ইসলামের কোনো উৎসবই ছওয়াবশূন্য নয়। ঈদের শাওয়ালের চাঁদই ঈদের চাঁদ। চাঁদ আকাশে দেখা গেলে শুরু হয় ঈদের আনন্দ। পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখার যে নিরন্তন চেষ্টা এবং দেখার সঙ্গে যে আনন্দ সে এক অন্য রকম অনুভূতি। চাঁদ দেখতে আকাশ পানে ছেলে বুড়ো সবাই তাকায়, দুহাত তুলে পশ্চিম আকাশের দিকে, তাকিয়ে মোনাজাতে শুকরিয়া আদায় করে। এক মাসের সিয়াম সাধনার সফল সমাপ্তিতে এখানেও পূণ্য লাভ।

ঈদ উপলক্ষে ঘরে ঘরে খুশির ধুম পড়ে যায়। গৃহবধূরা পিঠা, পাপড়, সন্দেশ, চালের গোড়ার সেমাই ইত্যাদি তৈরির কাজে অর্ধেক রাত কাটিয়ে দেয়। এই ঈদ উৎসবের সামিল হয় গ্রাম বাংলার লোক বিশ্বাস যেমন ২৭ রমযানের রাতে মেয়েরা দুহাতে মেহেদি মাখে, ছেলেরা এক আঙ্গুলে, তাদের বিশ্বাস ঈদুল আজহা পর্যন্ত এই

www.pathagar.com

মেহেদির রং হাতে থাকলে পূণ্য হবে। আবার ঈদের জন্য 'পিঠা তৈরি কালে কোনো কোনো অবিবাহিত মেয়ে পিঠার উপর প্রজাপতি আঁকে, এই প্রজাপতি বহুকাল ধরে বাঙ্গালিদের বিয়ের প্রতীক, এটি একেবারে লোকজ উপাদান' [৬]

ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে ঈদের নামায ঈদগাহে আদায়ের প্রস্তুতি নেয় সবাই। প্রথমে গোসলের মাধ্যমেই দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ ঈদে নতুন জামা কাপড় ও পিঠা, পায়েস, সেমাই, কুর্মা-পোলাও, আদর-আপ্যায়ন, সালাম-শুভেচ্ছা, হৃদ্যতা-ভালবাসা বিনিময়ের উপর প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা ঈদ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। তাই নতুন জামা কাপর, টুপি পড়ে, আতর, সুগন্ধী মেখে, কেউ কেউ চোখে সুরমা দিয়ে ঘরে তৈরি চালের রুটি ও হাতের তৈরি সেমাই অথবা মিষ্টান্ন খেয়ে সকাল সকাল ঈদগাহের পথে রওয়ানা হয়।

হবিগঞ্জ শহরের প্রবেশ দ্বারে শাহী ঈদগাহটি অবস্থিত। বেশ বড় ঈদগাহ। প্রচুর লোক সমাগম হয়। তাই প্রতি ঈদে দুটি জামাত হয়। গ্রামেগঞ্জেও ঈদগাহ রয়েছে। রয়েছে বড় বড় মসজিদ, এগুলোতেও ঈদের নামাজ হয়। ঈদ উপলক্ষে ঈদগাহে গুলোকে ধুয়েমুছে রং দিয়ে সুন্দর করা হয়। গ্রামের ঈদের জামাতের স্থানটিকে রঙ্গিন কাগজের নিশান দিয়ে সাজানো হয়। সবত্রই ঈদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। নামাযের সময় পূর্বে ঘোষিত হয়েছে, সময়ানুযায়ী সকল বয়সের মুসলমানেরা ঈদের নামাযে যোগ দিতে দলে দলে পায়ে হেঁটে তকবীর পরে আসছে, এ যেন এক ধর্মীয় শুভাযাত্রা।

দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখার সফল সমাপ্তিতে শুকরিয়া আদায় হতে ঈদগাহে জমায়েত। ঈদুল ফিতরের নামাযকে শুকরিয়ার নামাযও বলা হয়। রোযা একটি এবাদত, ঈদের নামায আর একটি এবাদত। প্রথমটি ফরজ, দ্বিতীয়টি ওয়াজিব। একটি এবাদতের শুকরিয়া আদায় করা হলো আর একটি এবাদতের মাধ্যমে, উভয়টিতে পূণ্য লাভ।

উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব নির্বিশেষে ঈদগাহে সবাই এক কাতারে বন্দী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদের নামায আদায় করে দুহাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের পাপ সমূহের কথা স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে সবাই। পাপসমূহ পূণ্যতে ভর্তি হবার আশায়। অধিক আনন্দে একে অন্যকে সালাম শুভেচ্ছা বিনিময় করে কোলাকুলি করে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়, বুকে বুক মিলিয়ে পারস্পরিক হৃদ্যতার প্রকাশ ঘটায়। কারো সাথে বিদ্বেষ নয়, সবার সাথে হৃদ্রতা, ভালবাসা প্রকাশ করে।

ঈদগাহ থেকে নিজ গৃহে ফেরার কালে মৃত আত্মীয়স্বজনের কবর স্থান জিয়ারত করে মাগফিরাত কামনা করে। বাড়িতে এসে মুরব্বিদের কদমবুছি করে সামাজিক আচার পালনে বাড়ি বাড়ি বেড়াতে যায়, ঈদের পিঠা, সেমাই খেয়ে মিষ্টিমুখ করে। সম্প্রতি 'চটপটি' নামে টক-ঝালে ছানাবুটের মিশ্রনে একটি খাবার শহরের বাসা বাড়িতে ঈদের খাদ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটাকে রুচিবর্ধক বলে থাকেন কেউ কেউ।

ঈদের দিন পরিবারের সদস্যরা দল বেঁধে, বন্ধুবান্ধব, বান্ধবীরা পৃথকভাবে সারা দিন নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি সেজেগুজে বেড়ায়। মুরব্বিদের সালাম ও

www.pathagar.com

ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। ছোটরা ঈদ সালামি পেয়ে খুশিতে মেতে উঠে। ঈদের বিকেলে পাড়া-মহল্লার ছেলেরা সমবেত হয়ে রাস্তার মোড়ে অথবা সুন্দর যোগ্য স্থানে ব্যান্ডের গান বাজিয়ে আনন্দ করে। সন্ধ্যারাতে খোলা স্থানে অথবা হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। লোকজ সংস্কৃতির নৃত্যগীতে ঈদ উৎসব পালন করে এসব অনুষ্ঠানে মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের প্রতিবেশিরা উৎকৃষ্ঠ জামাকাপড় গায়ে আনন্দে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এতে ঈদ উৎসব হয়ে উঠে মহামিলনের এক উৎস।

ঈদুল আজ্হা

'ঈদ' অর্থ আনন্দ, 'আজহা' শব্দের অর্থ কুরবানি, আত্মত্যাগ। তাই আত্মত্যাগের ঈদ-কুরবানীর ঈদ-বকরা ঈদ-বড় ঈদ' ইত্যাদি নামে অবিহিত করা হয়েছে। গ্রাম গঞ্জের মানুষ 'বকরা ঈদ'কে 'বকরি ঈদ' বলে থাকে। বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন 'জমিদারদের তরফ থেকে গরু কুরবানী কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খালি বকরি (ছাগল) কোরবানি করা চলত। লোকেরা করিতও তা প্রচুর।[৬]

ঈদুল আজহা বা কুরবানি নিয়ে আমাদের দেশে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের নিপীড়নের কথা আমরা বই পুস্তকে পড়েছি। 'শ্রীহট্টের টোলটিঘরবাসী বোরহানউদ্দীন নামক এক মুসলমানের একদা নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গো হত্যা করেন তাহার দুভার্গ্যবশত একটি চিল একখণ্ড মাংস আনিয়া ব্রাহ্মণগৃহে (মতান্তরে রাজগৃহে) নিক্ষেপ করে। এ বিষয় রাজার গোচরীভূত হলে, রাজা ক্রুদ্ধ হয়া, বোরহানউদ্দীনের হস্ত ছেদন ও তদিয় শিশু পুত্রকে নিহত করেন।[৭] তরফ পরগনার ছিছিরকোট (কাজীর খিল) গ্রামে বাস করতেন কাজী নুরুদ্দীন নামে একজন মুসলমান। তাঁর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে তিনি একটি গরু জবেহ্ করেন। এতে ত্রিপুরার সামন্তরাজা আচক নারায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে কাজী পুত্রকে হত্যার আদের্শ দেন। আদের্শ কার্যকরী করা হয়।[৮] এতে দেখা যায় শ্রীহট্ট তথা বাংলাদেশে গরু কুরবানী দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 'বিশেষ করে হিন্দু জমিদার অঞ্চলে যেখানে গরু কুরবানি সম্পর্কে তারা বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন।'[৯] ১৩০৩ খ্রি. হযরত শাহজালাল (র:) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর থেকে ঈদুল আজ্হা উপলক্ষে মুসলমানরা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট আল্লাহর নামে কুরবানি দিয়ে যাচ্ছে। ঈদ উৎসবে সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের প্রতিবেশিদের সহযোগিতায় ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এ রীতিতে পরিণত হয়েছে। 'ঈদ এখন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।'[১০]

ঈদুল-আজহা ত্যাগের ঈদ। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর ত্যাগের স্বীকৃতি জানাতে প্রতিবছর মুসলমানরা পালন করে ঈদুল আজহা। দুনিয়ার সব মুসলমানের পালনের মাধ্যমে ঈদ এখন উৎসবে রূপ নিয়েছে। জিলহজ্জ চাঁদের দশ তারিখ অর্থাৎ ঈদুল ফিতর এর দুই মাস দশদিন পর ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হয়। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে পশু কুরবানির জন্য পূর্বথেকেই পশুর হাট থেকে সুন্দর সুস্থ পশু ক্রয় করে থাকে। বিশেষ যত্নে পালন করে পশুটির প্রতি মমতা স্থাপন করে, এই প্রিয় পশুকে ঈদুল আজহায় আল্লাহর নামে কুরবানিদেয় যারা গৃহপালিত পশুর

www.pathagar.com

কুরবানি করে তারা গোশালার সেরা পশুটি নির্বাচিত করে রাখে। ঈদের দিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে কুরবানির পশুটিসহ গোশালার সকল পশুকে গোসল করিয়ে, নিজেও গোসল করে সাধ্য অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পোষাক পড়ে আতর-খোশবু ব্যবহার করে ঈদগাহে রওয়ানা হয়। ঈদের নামাজের পূর্বে কিছু না খেয়ে থাকে। নামাজ শেষে যথা শীঘ্র সম্ভব পশু কুরবানি করে ঘরে তৈরি মিষ্টান্ন, সেমাই আহার করে। পশু কুরবানির মাংস বিধান অনুযায়ী বন্টন করতে হয়। আত্মীয়স্বজন ও গরীব মিসকিনদের নিকট সমপরিমাণ অংশ করে বিলাতে হয়। নিজের অংশের মাংস রান্না করে যথা শীঘ্র খেয়ে থাকে। কুরবানির মাংস পরবর্তী ঈদুল ফিতর পর্যন্ত জমিয়ে রেখে খাওয়াতে বিশেষ ফজিলত আছে, এ বিশ্বাসে অনেকেই গ্রামে হাড়িতে হলুদ দিয়ে মাংস সিদ্ধ করে রাখে শহরের মানুষ ফ্রিজে রেখে দেয়। এর দালিলিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কোনো ভিত্তি নেই। এটিও লোকবিশ্বাস।

ঈদুল আজহা তিনদিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের চাঁদের বারতারিখ পর্যন্ত বিনা অজরেই ঈদের নামাজ পড়া যায়, তবে এরূপ করা মাখরূহ। একা ঈদের নামাজ পড়া দুরুস্ত নয়। তিন দিন কুরবানি দেয়া যায়। 'মোল্লা'র কল্লা আর ধরুয়ার ঠ্যাং' গ্রামের এই প্রবাদটির বাস্তবতা এখন আর নেই। কুরবানিদাতা নিজে পশু জবাই করাই উত্তম। যদি কোনো আলিম হুজুর পশু জবাই করেন তবে থাকে হিস্যা দেয়ার বিধান নেই। পশু মালিকের অংশ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ মাংস স্বেচ্ছায় দেওয়া যায়। প্রবাদটি মুর্খতা ও কুসংস্কার হিসেবে প্রচলিত ছিল।

ঈদ উৎসব মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান ও এক সমাজে চলাফেরার কারণে বাঙালিদের মনমানসিকতার পরিবর্তন ঘটে উৎসব, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘঠনাপ্রবাহ ঈদ উৎসবের চরিত্রে এনেছে নানা পরিবর্তন। শুধু ধর্মীয় মুসলমান নয় কোটি কোটি মানুষের রুটি-রুজি, সংগঠন, সংযোগ, তৎপরতা, আনন্দ, পেশা, বহু কিছুর সঙ্গে এখন জড়িয়ে আছে ঈদ।[১১] ঈদ উৎসবে আনন্দ ভোগ করে 'যার আছে' এবং 'যার নেই' সবাই আনন্দের শরীক হয়। একে অন্যের শরীক সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। ঈদ উৎসবের সফলতা এখানেই।

ঘ. শারদীয় দুর্গোৎসব

শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালি সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপূজা রাজকীয় পূজা, এদেশের হিন্দু জমিদার শ্রেণি এ পূজার আয়োজন করতেন। গ্রাম গঞ্জের লোকজন দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসত পূজা দেখতে, ভক্তি জানাতে, আর্শীবাদ নিতে। সেই সঙ্গে পূজা উপলক্ষে মেলা, কবিগান, যাত্রাগান উপভোগ করত সবাই। এ পূজায় খরচাদি বেশি ছিল বলে সাধারণের পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব ছিলনা। প্রাচীন ধনী হিন্দুবাড়িতে 'চন্ডী মন্ডপ' নামে একটি ঘর আজো দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় কাঠের তৈরি স্থায়ী কাঠামো।

www.pathagar.com

হিন্দুরা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁদের বিশ্বাস, পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয় তখন পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য যুগে যুগে ঈশ্বর অবতার রূপে আবির্ভূত হন[১]। ঈশ্বরের মাতৃরূপেরই নাম দুর্গা। মা যেমন তাঁর সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, তেমনি দুর্গা দশহাতে দশ অস্ত্র নিয়ে মানবকে রক্ষা করে আসছেন। তিনি দুর্গতিনাশ করেন বলে দুর্গা, আবার দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন বলেও দুর্গা। দুর্গার মূল পরিচয় শক্তি দেবী হিসেবে। তিনি ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। বিশ্বের সকল শক্তির উৎস হিসেবে তাঁকে কল্পনা করা হয়।

প্রাচীন হিন্দু যুগে দুর্গা পূজা বাংলার প্রাচীন পর্ব ছিল। প্রাচীন গ্রন্থে প্রকাশ উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চণা উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসব হতো। শারদীয় দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিন 'শারদোৎসব' নামে এক প্রকার নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হতো।[২] এই পূজা হয়েছিল শরৎকালে। তাই এরই নাম শারদীয় দুর্গা পূজা[৩]। কৃত্তিবাসের রামায়ণে শরৎকালে শ্রীরামকে দিয়ে অকাল বোধন করিয়ে দুর্গা পূজা করানো হয়। আবার পুরাণে বসন্ত কালে রাজা সুরথ করেছিলেন দুর্গা পূজা, এখন সে পূজা 'বাসন্তী পূজা' নামে পরিচিত।[৪]

দুর্গাপূজা অতিপ্রাচীন পর্ব বলে গবেষকরা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেন, পৌরাণিক কাহিনী বরাবরই প্রতীক ও রূপক ধর্মী। দুর্গা পূজার কাহিনীও পৌরাণিক কাহিনী। শাস্ত্রে আছে, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করার কারণে দেবীর নাম দুর্গা, দুর্গম অসুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতি দেয়া, সেই দুর্গমকে বধ করেন যিনি জীব জগৎকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন তিনিই মা দুর্গা।[৫]

গবেষক ও পণ্ডিতরা মনে করেন, সম্রাট আকবরের চোপ্‌দার[৬] রাজা কংস নারায়ণ ষোড়শ শতকের দিকে বাংলার দেওয়ান হয়েছিলেন। তিনি চাইলেন, মহাযজ্ঞ করতে। রাজার পুরোহিত ছিলেন বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য বংশের রমেশশাস্ত্রী। মহাযজ্ঞ না করে দুর্গা পূজা করার পরামর্শ দিয়ে পূজার পদ্ধতিও লিখে দিলেন। রাজা প্রায় আট-নয়' লক্ষ টাকা খরচ করে মহাসমারোহে দুর্গা পূজা করেছিলেন।[৭] রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা হিসেবে পরিচিত রাজা কংসনারায়ণ এর শুরু করা সেই পূজা থেকেই বাংলায় দুর্গা পূজার প্রচলন শুরু হয়।

বর্তমানে যে মূর্তির মাধ্যমে দুর্গা পূজা হচ্ছে প্রাচীনকালে সে মূর্তি ছিল না। চারহাত, আটহাত বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমা ছিল। দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে ধাতুনির্মিত প্রাপ্ত দেবীমূর্তি দ্বাদশভূজা ছিল বলে দশহাত বিশিষ্ট দুর্গা প্রতিমার মহিষাসুর মর্দিনী রূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেন।[৮] দুর্গার কাঠামোতে এখন সাতটি মূর্তি, দেব-দেবীর বাহন রূপে পশুপক্ষীর ও দুর্গার প্রতীক রূপে 'কলাবউ' (শাস্ত্রীয় নাম 'নবপত্রিকা') পূজিত হয়ে থাকে। কাঠামোর মধ্য স্থলে দেবী দুর্গা, তার ডানে লক্ষ্মী, একটু নিচে গণেশ। বাম দিকে উপরে সরস্বতী নিচে কার্তিক। পদতলে একদিকে সিংহ অন্যদিকে অসুর। দেবী দুর্গার ডান পা সিংহ পৃষ্ঠে এবং বাম পা অসুরের স্কন্ধে স্থাপিত রয়েছে। এঁরা সবাই দুর্গার পরিবারভুক্ত। পূজারীবৃন্দ মনে করেন শারদীয় উৎসবে কন্যা স্থানীয় দেবী তিন দিনের জন্য স্ব-পরিবারে পিতৃগৃহে বেড়াতে আসেন।

www.pathagar.com

কৈলাশ থেকে দশভূজা দেবী দুর্গা এবার (প্রতিবছর) কিভাবে এই ধরায় আসবেন। সে কি নৌকায়! নাকি ঘোড়ায়, নাকি দোলায়, নাকি হাতিতে, নাকি পদব্রজে। এই নিয়ে পূজারী বৃন্দের আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে। মহামায়া দুর্গা দেবীর শুভাগমনে ধরণী শস্য সম্পদে সমৃদ্ধ হবে এবং তিনি জগৎবাসীকে ক্ষুধা-মন্দার হাত থেকে রক্ষা করবেন এই হচ্ছে চিরন্তন বিশ্বাস। দুর্গতিনাশিনী সকল দুঃখ-দুর্গতির অবসান করবেন। মা যেমন তার শিশুকে হে-পীযূষ দিয়ে রক্ষা করেন তেমনি।

দুর্গা পূজার মূর্তিগড়ার জন্য কারিগররা পূজার প্রায় দুই মাস পূর্বে মণ্ডপের ঠিকানায় চলে আসে। মূর্তি প্রস্তুত করার উপাদান সংগ্রহ করার পর কাঠামোতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি মূর্তি গড়ার কাজ কারিগর আরম্ভ করে। মণ্ডপের বাড়িওয়ালা বা পূজার আয়োজক কারিগরদের খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন। কারিগররা নিজেই রান্না করে খায় এবং কাঠামোঘরে নিদ্রা যায়। পূজার উপাদানে বেশ্যাদ্বারের মাটি থেকে দেবদ্বারের মাটি, পুকুরের জল থেকে সাগরের জল, লোহার বালা থেকে স্বর্ণালঙ্কার, পৌরাণিক মন্ত্রের সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রের মিলন ঘটায়, এই দুর্গা পূজায়। বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি কাঠামোতে নরম আঁঠালো কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে সুন্দর মূর্তির রূপ দেয়া হয়। শুকনা মাটির মূর্তির উপর শিল্পীর রংতুলির আঁচড়ে মূর্তি গুলো যেন জীবন্তরূপ নিয়ে অবতরণ করে এই মর্তে।

বাড়ি বাড়ি পূজা অনুষ্ঠান না হলেও ঘরেঘরে চলে পূজার প্রস্তুতি। বাড়ি-ঘর-আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, নতুন জামা-কাপড় কেনাকাটা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রন দেয়া ও সবাইকে পূজায় কাপড়জামা উপহার দেয়া ইত্যাদি কর্মে ও আগমনীর আগমন বার্তায় সকলের মন খুশিতে উৎসবের আমেজে ভরপুর করে তুলে। এসে যায় মহালয়া। মহালয়া তিথিতেই দেবতাদের তেজোরাশি হতে মা দুর্গার আর্বিভাবের সূচনা ঘটে। তারপর আরম্ভ হয় দেবীপক্ষ। আসে ষষ্ঠী তিথি, এদিনে দুর্গা কাঠামোর মূর্তি গুলোকে চক্ষু দান করা হয়। সন্ধ্যায় ষষ্ঠী পূজা বিভিন্ন উপচারে দেবীর আবাহন, উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি, ঢাক, ঢোলকের বাদ্যবাজনায় একটি সাত্ত্বিক নির্মল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এরই সঙ্গে পুরোহিত মহাশয়ের চণ্ডীপাঠ ও বিল্বষষ্ঠী পূজা। পূজা শেষে মণ্ডপে উপস্থিত ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ, পূজা মণ্ডপে বাদ্য বাজনার সুমধুর আওয়াজে মা দূর্গার পূজা আরম্ভের বার্তা ঘোষণা করছে। গ্রামবাসী ও দূর-দূরান্তের ভক্তবৃন্দ অতিসকালে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরে দুর্গা মণ্ডপে সমাবেত হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা-অঞ্জলি জ্ঞাপন করে ফলপ্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। কেহ বা দুপুরে অন্নব্যঞ্জন বা খিচুড়ি ডালনা উঠানে বসে কলাপাতায় নিয়ে খাচ্ছে। ধনী, গরিব, ছোটবড় একযোগে উঠানে লাইন দিয়ে বসে খাচ্ছে। যেন কোনো এক ভোজ সভায় সবাই সমাবেত। অন্য এলাকার আমন্ত্রিত অতিথিও আসেন মণ্ডপ পরিদর্শনে, তাঁদেরকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

পূজার একটি বিশেষ আকর্ষণ সন্ধ্যারতি। মণ্ডপের সম্মুখে বাঁশ দিয়ে আঁড় বেঁধে কিছু জায়গা খালি করে রাখা হয়। কোথাও সুতলি দিয়ে সংরক্ষিত থাকে। এই স্থানটিতে আরতি প্রতিযোগিতা হয়। বেশ কয়েকজন যুবক প্রতিবছরই আরতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাকালে দর্শকের ভিড় জমে। নিবন্ধকার নিজেও হবিগঞ্জের কালিবাড়ি ও দেয়ানত রাম সাহার বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত আরতি

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা ছাত্রাবস্থায় কয়েকবার উপভোগ করেছেন। সহপাঠী বন্ধু[৯]র মনোমুগ্ধকর আরতিনৃত্য আজো স্মৃতিপটে জেগে আছে, নারিকেলের ছোটছোট ছোলারমধ্যে ধূপে দেওয়া আগুন-ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ভরপুর মাটির তৈরি ধূপতী পাত্রটি মুখে ধরে নুপুর বাঁধা হাত-পা গুলো নৃত্য ভঙ্গিতে বাদ্যের সাথে সঞ্চালনে আরতি নিবেদন, যেন মা দুর্গার নিকট নিজেকে উৎসর্গ করার সামিল। সে বরাবরই প্রতিযোগিতায় প্রথম হতো।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিনই আরতি হয়ে থাকে। এই তিনদিনই মূল দুর্গা পূজা। এই দিনগুলিতে পাঁঠা বলি হয়, 'আড়গড়া' কালি মন্দিরে রয়েছে। সপ্তমীর দিন জাঁকজমকে প্রতিমা পূজা শুরু উলুধ্বনি ও পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে। অষ্টমীতে পূজার লোকসমাগম ও আনুষ্ঠানিকতার ধুম হয় সবচেয়ে বেশি। পূজা মণ্ডপগুলোতে পূজারীর দীর্ঘ লাইন ও কোলাহল থাকে বেশি। অষ্টমী-নবমী মিলন ক্ষণে যে পূজা হয় তাকে বলে 'সন্ধি পূজা'। এই সন্ধি পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা[১০]। সন্ধিক্ষণে দুর্গা চামুন্ডা নামে পূজিত হন। পুরোহিত মতে, সন্ধি পূজাতেই মহাদেবী পৃথিবীর অশুভশক্তি অসুরকে বধ করেন এবং শুভ শক্তির জয় নিশ্চিত হয়। শ্রী রামচন্দ্র অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করেন নবমীর এই দিনে। তাই নবমীর গুরুত্ব অপরিসীম।

দুর্গা পূজার অন্যতম অঙ্গ 'কুমারী পূজা'। দুর্গা পূজার অষ্টমী অথবা নবমী তিথিতে কুমারী পূজা হয়ে থাকে। তন্ত্রে কুমারীকে যোগিনী পরম দেবতা বলা হয়েছে, দেবীপুরাণেও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়ছে। একবছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অজাতপুষ্প (ঋতুময়ী হয়নি) এমনি অবিবাহিত মেয়েকে কুমারী পূজার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এই কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতিকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করা হয়[১১]। হবিগঞ্জে কুমারী পূজায় সাধারণত ৬/৭ থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়েকে কুমারী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কুমারী পূজা দর্শণে রামকৃষ্ণ মিশনের পূজামণ্ডপে সকাল থেকে নারীদের ভিড় চোখে দেখার মতো, তৎমধ্যে কুমারী মেয়েদের উপস্থিতি থাকে বেশি। বিয়েযোগ্য কুমারী মেয়েরা এ পূজা দর্শণে আগ্রহী বেশি, তাদের নিজ বিবাহ তরান্বিত হবে-এ লোকবিশ্বাসে। এর স্বপক্ষে শাস্ত্রে কোনো সমর্থন পাওয়া না গেলেও গ্রামগঞ্জে সাধারণের মধ্যে এ লোক বিশ্বাসটি সম্পর্কে ধারণা অবিচল রয়েছে[১২]। আবার গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ মনে করে 'কুমারী' বলে যে মেয়েটি পূজা করা হয় তার বিয়ে হয় না। সে দেবীতুল এই কুসংস্কার, কারণ দেখা গেছে কুমারী হিসেবে পূজিত হয়ে সেই মেয়েটি পরবর্তীতে বিয়ের পর মহাসুখেই ঘর সংসার করছে। এমতাবস্থায় কুমারী পেতে এখন আর অসুবিধা নেই।[১৩] মা দুর্গা সবই করতে পারেন, 'ইচ্ছামতির ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না'- এমনটি তাদের বিশ্বাস। শহরঘেঁষা উমেদনগর গ্রামের পশ্চিম হাটির স্বর্গীয় অতিন্দ্র লাল রায়ে বাড়িতে দুর্গা পূজা ও কুমারী পূজা হয়ে থাকে। ঐ গ্রামের মন্দির হাটির স্বর্গীয় লালমোহন দাশ এর বাড়িতে দূর্গা পূজা হয়, তবে এই মণ্ডপে কুমারী পূজা হয় না। এমনিভাবে পূজার তিনদিন আড়ম্বরে, মহাআনন্দে, মহানবমী চলার পর আসে দশমী। বিজয়া দশমীতে বিসর্জন।

বিসর্জনের দিনে পূজারীবৃন্দ দুর্গামণ্ডপে এসে সমবেত হয়। মহিলারা ধানদূর্বা, কড়ি, কাঁচা হলুদ, সিঁদুর ও মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যথারীতি আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা মা দূর্গাকে উলুধ্বনি দিয়ে ধানদূর্বা আর সিঁদুর মাখিয়ে দেয়। মিষ্টি হাতে দুর্গা ও

www.pathagar.com

অন্যান্য মূর্তিকে খাওয়ানোর ভাব প্রদর্শন করে আর্শিবাদ কামনা করে থাকে। এসময় মহিলাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। এযেন পিতৃগৃহ থেকে কন্যাকে বিদায় দেয়ার বাঙালির এক অনবদ্য চিরন্তন চিত্র। পরক্ষণেই মহিলারা আনন্দে মেতে উঠে। তারা একে অন্যের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়, পরস্পরের মুখে-গালে রং বা সিঁদুর মেখে হাসি তামাশা করে। দুর্গা প্রতিমা বির্সজনের পূর্বে এরূপ আনুষ্ঠানিকতা পালন বাঙালি সমাজের একটি চিরায়ত শাশ্বত চিত্র।[১৪]

প্রতিমা বির্সজনের সময় সমাগত। বিসর্জনের বাদ্য বেজে উঠে, বিদায়ের করুণ সুর মণ্ডপে মণ্ডপে। পাঁচদিনের আর্শিবাদ শেষে মহামায়া দুর্গা দেবী ফিরে যাবেন। পাড়ার ছোটবড় ছেলেরা প্রতিমার সামনে ধূপদানি নিয়ে আরতিতে বিভোর হয়ে পড়েছে। মন্ডপ থেকে দুর্গা কাঠামো বাহিরে আনা হয়। মা দুর্গা, মা দুর্গা বলে ১৫/২০ জনের শক্তিমান পূজারী শহরের স্থলে ট্রাকে, গ্রামে হলে নৌকায় তুলে নেয়। নৌকায় উঠানো মূর্তি কাঠামোকে খালে খালে বা নদী বেয়ে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে মা দুর্গার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে নদীর নির্ধারিত স্থানে বা গ্রামের বড় পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়ে থাকে। ট্রাকে উঠানো প্রতিমাগুলো শহরপ্রদক্ষিণ করে। পূজা উদযাপন কমিটির তত্ত্বাবধানে শহরের পূজা মণ্ডপগুলো একসাথে নিজনিজ মন্ডপের ব্যানারসহ সন্ধ্যারাতে প্রতিমা মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করে থাকে। মিছিলে গান, বাজনাসহ মা দুর্গার নামে জয় ধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। মিছিলে তরুণদের অংশগ্রহণ দিনদিন ব্যাপকভাবে বেড়ে চলছে। তারা নানা রকম আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে বিজয়া দশমীর মিছিলে অংশগ্রহণ করছে।[১৫]

শিশু তরুণ বয়স্করা মা দুর্গার মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে হবিগঞ্জ শহরের খোয়াই নদীর পৌরঘাটলায় সমবেত হয়ে একেএকে সকল প্রতিমার কাঠামো মা দুর্গার নাম উচ্চারণে, 'মা দুর্গাকি জয়' ধ্বনি তুলে প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল ছিটানোতে মেতে উঠে। এদের স্থির বিশ্বাস এ জলের পূণ্য পরশে দুঃখ দুদর্শা দূর হবে। বিজয়া দশমীর এই বিসর্জনে কৃপাময়ী মা ভক্তদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন কৈলাশে। এদিকে পূজারীবৃন্দ বাড়ির পুকুরে বা নদীতে ভালকরে স্নান করে মিলিত হয় শূন্য দুর্গা মণ্ডপে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সামনে দিয়ে শৃংঙ্খলার সাথে বসে পুরোহিত মহাশয়ের নিকট থেকে শান্তি সন্তায়ন গ্রহণ করে। পুরোহিত আমপাতা দিয়ে সকলের উপর ঘটের জল ছিটিয়ে দিয়ে শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নীরবে সবাই শুনে আর মা দুর্গার আর্শিবাদ কামনা করে। এরপর ধ্বজের কাপড়ে (হলুদ বর্ণের কাপড়) তৈরি 'রাখী' প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেয়া হয়। রাখী শান্তির প্রতীক হিসেবে যত্ন সহকারে দীর্ঘদিন শরীরে ধারণ করে। তারপর মিষ্টি বিতরণ ও একে অন্যকে আলিঙ্গনে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং ছোটরা বড়দের প্রণাম করে এবং বড়রা ছোটদের আশির্বাদ প্রদান করেন। এভাবেই হবিগঞ্জের শহর-গঞ্জ ও গ্রামে শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়ে আসছে।

দুর্গাপূজার সকল আনুষ্ঠানিকতাই উৎসবের সামিল, এ পূজা সকল শ্রেণী, জাতের মানুষের মিলন ঘটায় স্বতঃস্পূর্তভাবে। তাইতো এই পূজা বাঙালি হিন্দুদের সর্বজনীন দুর্গোৎসব। হবিগঞ্জ জেলায় পাঁচশতাধিক পূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

এ উৎসব আরো প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক করার জন্য পূজা উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে যাত্রা গান, কবি গান, নাটকসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই সকল লোক সংস্কৃতি উপভোগে হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসাথে চুটে আসতে দেখা যায়। তারা সবাই মিলে আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাঙালির মহান ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি রক্ষায় এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় হবিগঞ্জ জেলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস ও সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেলামেশা ও অংশগ্রহণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ মিলনকে সুদৃঢ় করেছে। তাই সকল উৎসবে উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ দেখা যায়। এজন্যই অতিসম্প্রতি বলা হয়ে থাকে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'।

দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় অনুভূতি নয়, দুর্গাপূজা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠতম লোক-উৎসব। এ ঐতিহ্যের লালন করে আসছে হবিগঞ্জ।

হবিগঞ্জের দুর্গামণ্ডপ

বৈশাখী উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

৬. বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা

বাংলাদেশের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর। দিবসটি জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষিত। বাংলাদেশের সকল জনগণ এ দিবসটিকে উৎসব হিসেবে গণ্য করে পালন করে থাকে। এ উৎসবের কারণ দীর্ঘ নয় মাস শত্রু পাকবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে বিজয় হওয়া। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই বিজয় হয়েছে। এ বিজয় আনন্দের, এ বিজয় উৎসবের।

১৯৭১ সাল বাঙালি ইতিহাসে এক রক্তঝরা বছর। এবছরে দীর্ঘ নয়মাস ধরেই চলছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল হানাদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বিপুল ভোটে জয়ী হলেও গণরায়কে উপেক্ষা করে পশ্চিমা পাক সরকার অবিসংবাদিত বাঙালি নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে দায়িত্ব দিতে রাজি না হয়ে বরং ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ গভীর রাতে হঠাৎ পাকসেনাবাহিনী দিয়ে বাঙালি নিধন শুরু করে। প্রাণের ভয়ে নিরীহ বিপুল সংখ্যক বাঙালি পাশের রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। বাঙালিরা রুখে দাঁড়াল, অস্ত্র হাতে নিল, গড়ে উঠল মুক্তি বাহিনী, সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধের লক্ষ ছিল দেশের স্বাধীনতা, তাই এ যুদ্ধের অপর নাম মুক্তি যুদ্ধ। এরই মধ্যে বর্বর পাকসেনা নিরীহ মানুষকে অত্যাচার বাড়িঘরে আগুন দেয়া দোকান ব্যবসায় কেন্দ্র লুটপাট, নারীনির্যাতনসহ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাতে লাগল। মানবতা বিরোধী এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে ভারত 'মিত্রবাহিনী' হয়ে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতায় এগিয়ে আসল। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। এরই মধ্যে গঠিত হল প্রবাসী 'বাংলাদেশ সরকার'। সরকার আন্তর্জাতিক মহলের কূটনৈতিক স্বীকৃতির আহব্বান জানাল। প্রতিবেশি ভারত সরকার বাংলাদেশকে সবার আগে 'সার্বভৌম রাষ্ট্র' বলে স্বীকৃতি জানাল। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণে ও আপামর বাঙালি জনগণের অসহযোগিতায় পাকবাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে 'পাকসেনা অধিনায়ক যুদ্ধ বিরতি দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আবেদনটি ঢাকাস্থ জাতিসংঘের প্রতিনিধির হাতে প্রদান করল'।[১] এদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী ঢাকা ঘেরাও করে পাক বাহিনীকে আত্মসমপণ করতে আহ্বান করল। এক পর্যায়ে পাক জেনারেল নিয়াজী আত্মসমপণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

এ সংবাদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুফ ক্যাপ্টিন এ.কে খন্দকার, ভারতীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা সহ ভারতের অপরাপর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিগণ ঢাকা অবতরণ করেন। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে ভারতের পক্ষ থেকে এককভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন।[২] যুদ্ধ বন্ধ হয়।

আত্মসমর্পণের দলিল তৈরিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করেন ভারতীয় ইস্টান কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জেকব ঢাকায় আসেন। এদিকে 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত বাংলাদেশ। জনবিরাণ পথ ঘাট ক্রমে ক্রমে জনাকীর্ণ হতে লাগল। মানুষের মুখে ফুটল হাসি খুশি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও চীফ অব স্টাফ যথাক্রমে

www.pathagar.com

জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী ও জেনারেল এম.এ রব বৃহত্তর সিলেট জেলার এই দুই কৃতি সন্তান।

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি বাহিনীর পক্ষে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এ.কে খন্দকার, এস ফোর্স অধিনায়ক লে. কর্নেল কে.এম. সফিউল্লা, মেজর এ.টি. এম হায়দার, টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। মিত্রবাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল জগজিৎ অরোরা ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিগণ। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজী উপস্থিত সকলের সম্মুখে ঐতিহাসিক আত্মসমপর্ণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বিজয় সাধিত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। বিজয় হয় বাংলার ও বাঙালির সেই থেকে ১৬ ডিসেম্বর এ দেশের বিজয় দিবসটি উৎসব দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই বিজয় দিবস উৎসবে উদযাপিত হয়। সরকার নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিজয় দিবস উদযাপন করে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিজয় মেলা হয়। জেলা প্রশাসন হবিগঞ্জ পাঁচদিনব্যাপী স্থানীয় নিমতলা মাঠে বিজয় মেলার আয়োজন করেন। উপজেলা গুলোতেও বিজয় মেলা হয়ে থাকে। হবিগঞ্জ পৌরসভা প্রতিবছর তিনদিনব্যাপী নানা কর্মসূচীতে বিজয় মেলা উদযাপন করে আসছে। মেলাগুলোতে বহুলোকের সমাগম হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। এতে বাউল গান, কবি গান, মালজুরা গান, পুঁথিপাঠ, লোকনৃত্য প্রভৃতি আয়োজনে অনুষ্ঠানসূচী ভরপুর থাকে। মেলায় লোক শিল্পের প্রদশনীসহ বইয়ের দোকান, খাবারের দোকান থাকে। মেলায় সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিতে মেলাটি মিলন মেলায় রূপ নেয়। প্রতিবছর হবিগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশাসন ও পৌরসভা থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা আলোচনায় দেশমাতৃকার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ঋণ স্বীকার করে তাঁদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা কেউ কেউ তাঁদের বীরত্বগাথাঁ অপারেশনের স্মৃতিচারণ করে থাকেন। এই নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবিগঞ্জের বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা উদযাপিত হয়ে আসছে।

চ. স্বাধীনতা দিবস

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিন বীর বাঙালি সশস্ত্র পাকসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয়মাস সময়ে বলতে গেলে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষই ছিল এই মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার। কতিপয় আলবদর, রাজাকার এর বিরোধিতা করেছে। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের হাতে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ শহীদ হয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য। এ স্বাধীনতা হঠাৎ করে আসেনি। এর একটা ইতিহাস রয়েছে। প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস বাঙালি জাতিকে তার গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক বৃত্তিতে বাংলা বিভাগ হয়। সাম্প্রদায়িকতার কারণে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে গেল 'ওরা' এবং 'আমরা'য়। ফলে বাংলা তথা ভারত বিভাগ অপরিহার্য করে তুলেছিল। 'ওরা-আমরা' রাজনীতির ফসল ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তি।[১] দিনটি ১৪ই আগষ্ট, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুটি অংশ নিয়ে পাকিস্তান। দুই অংশের ব্যবধান হাজার মাইলের উর্ধ্বে। ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিতে রয়েছে ভিন্নতা। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি, পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। মুসলমান সংখ্যায় বেশি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংখ্যায় কম। পাকিস্তান সরকার দুই অঞ্চলের ভাষাকে এক করে এক রাষ্ট্রের এক ভাষা 'উর্দু' করার চেষ্টা নিল। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ পেল এর মাধ্যমে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। শুরু হল 'মাতৃভাষা আন্দোলন'। আন্দোলনের ঢেউ সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের শহর নগর, গ্রাম সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। হবিগঞ্জও বাদ পড়েনি। গ্রেফতার হলো সারা দেশে অগণিত ছাত্রবৃন্দ। হবিগঞ্জে মানিক চৌধুরী, মুস্তফা শহীদ ছাত্র ঢাকায় অধ্যয়নরত শাহ এ.এস.এম কিবরিয়া, জাকারিয়া খান চৌধুরী গ্রেফতার হলেন।[২] ঢাকায় পুলিশ ছাত্রকে গুলি করে মারল। চিহ্নিত হলো বাঙালির ইতিহাসে '৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারি' তারিখটি। মাতৃভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত হল স্মৃতিস্থম্ভ 'শহীদ মিনার'। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'– রচিত হলো প্রভাত ফেরির গান। সারা দেশে শহিদ মিনার বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদি চেতনার প্রতীক হয়ে নির্মিত হলো। বাঙালি জাতির ঐক্য সুসংগঠিত হলো, মোহভঙ্গ হলো তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তির উপর। আন্দোলন বেগবান হলো ১১ দফা, ৬ দফা, ছাত্রনেতা আসাদ হল শহীদ, সার্জেন্ট জহুরুল হকের বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজোহা জনৈক সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হলেন । এই সমস্ত গঠনার ক্রমপুঞ্জিত প্রভাবে চলমান আন্দোলন আরো দুর্বার ও মারমুখী হয়ে ওঠল। আন্দোলনের চাঁপে পাকসরকার কথিত আগতলা ষড়যন্ত্রমামলা প্রত্যাহার করে নেয়। অন্যতম আসামী শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে মুক্তি পান। তৎসঙ্গে অন্যান্য আসামীর সঙ্গে হবিগঞ্জের মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী[৩] ও মুক্তি লাভ করেন।

পাক সরকার প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খানকে দায়িত্বে বসান কিন্তু কোনো ফল হলো না। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারল ঠিকই প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন ছিল কেবল নামের পরিবর্তন। ভেতরে রয়েছে সামরিকজান্ত্রার একই চেহারা ও পরিচয়। তাই ১৯৬৯ সালে গণঅভুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সরকারি অফিস ও রাজপথ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এতে প্রাদেশিক শাসন ভেঙে পড়ে।

এই রাজনৈতিক প্রবল আন্দোলনের গতিধারাকে অন্যপথে প্রবাহিত করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান তরিগরি করে ১৯৭০এর অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করে, সামরিক আইন আদেশের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্দেশ জারি করে। সুষ্ঠু নির্বাচন হলো।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ' এর নৌকায় বাঙালি এক জোটে ভোট প্রদান করে, নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনের জয়ী করে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্ধারিত ১৪০টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসনে জুলফিকার আলী ভট্টুর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল পিপুলস পার্টি জয় লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব দিতে ভুট্টু আপত্তি করে। এবং জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়, অধিবেশন স্থগিত হয়।

এ সংবাদে বাঙালির চলমান আন্দোলন দেশ জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। জনগণ পাকিস্তানের অধিনে আর থাকতে চায় না, 'জয় বাংলা' শ্লোগান ধরল। রাজধানী 'ঢাকা না পিন্ডি?' উত্তরে–'ঢাকা, ঢাকা'। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল এইসঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমারের উপর প্রবল চাপ আসতে থাকে। অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। এ প্রেক্ষিতে ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন 'এভারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' কিন্তু তখনও তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে তিনি যোগদান করেন যা ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত চলছিল। কিন্তু এ আলোচনা ব্যর্থ হয়[৪]।

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। হত্যা করল বুদ্ধিজীবীসহ অগণিত বাঙালিকে। অসহায় মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিল। এদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ফ্রন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার, পাক সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে অস্ত্র হাতে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। তারা ছাত্র জনতার সঙ্গে শ্লোগান ধরল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। শুরু হল যুদ্ধ। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাতৃভূমির এই যুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীর তদানীন্তন অব. জেনারেল মুক্তিযুদ্ধ সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম.এ. জি ওসমানীর সুযোগ্য নেতৃত্বাধীন সেনানায়করা হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে একত্র হয়ে দেশকে ১১টি ফ্রন্টে ভাগ করে দায়িত্ব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অসমসাহসিকতা, দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে দেশ শত্রুমুক্ত করল। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় সংগ্রাম, বীরত্বময় সাহসী যুদ্ধ ও জীবন ত্যাগের মধ্যেই অর্জিত হলো লাল সবুজের পতাকা।

পতাকার 'লাল বৃত্ত' সেই সব শহীদের লাল রক্ত, আর 'সবুজ অংশ' বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর। ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পাক সামরিক বাহিনী আত্মসমপর্ণ করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। সেই ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় উৎসবের দিবস। যথাযোগ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশের হবিগঞ্জবাসী উদযাপন করে আসছে। হবিগঞ্জের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রশাসন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সংগঠন উৎসবের আনন্দে পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে স্বাধীনতার মেলা হয়। মেলায় প্রচুর লোক সমাগত হতে থাকে।

www.pathagar.com

ছ. জন্মাষ্টমী

বাঙালি হিন্দু সমাজে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব জন্মাষ্টমী। বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাঙালি সকল হিন্দু সমাজ এ উৎসব ভক্তিতে, আনন্দে এবং আবেগের সঙ্গে পালন করে থাকে।

জন্মাষ্টমী হচ্ছে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। শ্রীকৃষ্ণ এই দিন পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাঝেই ভগবানের প্রকাশ সর্বাধিক বলে ভক্তরা কৃষ্ণকে অবতারের অবতার বা অবতরি বা ভগবান স্বয়ং বলেছেন (শ্রীভগবদ্গীতা)।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নিয়ে পৌরাণিক একটি কাহিনী আছে, সে কাহিনী ধরে কৃষ্ণের মামা রাজা কংস গর্ভবতী দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে মথুরা নগরের কারাগারে বন্দি রাখেন। এই কারাগারে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে গভীর রাতে কৃষ্ণের জন্ম হয়। জন্মের পরপরই পিতা বসুদেব নবজাতককে নিয়ে গোপনে যমুনার অপর তীরে গোকুলোনন্দঘোষের বাড়িতে নন্দঘোষের স্ত্রী যশোদার নিকট রেখে দেন। যশোদা স্নেহ আদরে গোপন আশ্রয়ে নবজাতক লালন করেন। এই শিশুই 'কৃষ্ণ' ছিলেন একজন কালজয়ী মহাসিদ্ধ পুরুষ। কালজয়ী ছিলেন বলেই তিনি হাজার হাজার বছর পরে আজো কত ঘটাকরে পালন হচ্ছে তাঁর জন্মোৎসব জন্মষ্টমী।[১]

ভাদ্র মাসের এই তিথি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অতি পবিত্র। তাদের স্থির বিশ্বাস এ মাসের ঐ বিশেষ দিনে উপবাস করলে সাতজনমের পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। স্নান ও পূজা করলে পূণ্যলাভ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ঐ দিনে কেবল করলেও একশ বছরের গায়াশ্রাদ্ধের মতো পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। জন্মাষ্টমী ব্রত পালনে সুপুত্র, সৌভাগ্য, জীবনের অতুলনীয় আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। পরকালেও স্বর্গ পাওয়া যায়।[২] যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাত ভগবান জ্ঞানে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত।

জন্মাষ্টমীর দিনে উপবাস থেকে রাতে কৃষ্ণপূজা করা হয়ে থাকে। শহর-গ্রামের সনাতন হিন্দু সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে শ্রীকৃষ্ণে জন্ম দিবস জন্মাষ্টমী ধর্মীয় উৎসবের ন্যায় প্রতিবছর পালন করে আসছে।

জানা যায় জন্মাষ্টমী পালনে প্রধান অঙ্গ ছিল জন্মষ্টমী শোভাযাত্রা। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ১৫৬৫ সালে ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে জাঁকজমকের সঙ্গে ঢাকা নবাবপুরে বর্ণাঢ্য ব্যবসায়ী কৃষ্ণ দাস বাসক মিছিল করেছিলেন। ঢাকার নবাব ১৯০৬ সালে ঢাকা জন্মষ্টমী মিছিলে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। মুসলমান গাড়োয়ানরা এসে সারা দিয়ে 'চৌকি' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাদের গাড়ি দিতে অস্বীকার করে। ফলে এই মিছিল দেখার জন্য সমবেত দশ সহস্র লোক হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।[৩] পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে সরকারি আদেশে মিছিল বন্ধ হয়ে যায়। দেশের স্বাধীনতার পর জন্মাষ্টমী উৎসব রূপে প্রকাশ পায়। বিশেষত জন্মাষ্টমীর শুভাযাত্রা শুরু হলেই উৎসবে রূপ নেয়। হবিগঞ্জের মহাপ্রভু আখড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম অন্যান্য মন্দিরগুলো এবং ইসকন প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর শুভা যাত্রা শহরের প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে আসছে। বর্তমান পূজা উদযাপন কমিটি জন্মাষ্টমীর মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। উপজেলাগুলোতেও উৎসব উদযাপনের মিছিল হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

জন্মাষ্টমী মিছিল বছরান্তে আরো জমকালো হয়ে উঠছে, মিছিলে নানা বয়সের বালক ও ভক্তদের রূপক শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নানা ভঙ্গিতে প্রদর্শন করা হয়। শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দুধের পাত্রে বসিয়ে বসুদেব মাথায় নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করা সহ কৃষ্ণের জীবন চরিতের বিশেষ দিক প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গে ব্যানার, বাদ্য ও শ্রীকৃষ্ণের জয় গানের শ্লোগান রয়েছে। মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছেন স্থানীয় গণ্য মান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মিশন ও মন্দিরের পুরোহিতবৃন্দ সম্প্রতি এই শোভাযাত্রায় স্থানীয় রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে জন্মাষ্টমী ধর্মীয় উৎসবটি সর্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে।

জন্মাষ্টমীর র‍্যালি

জ. মহরম

আরবি মহরম মাসের দশ তারিখ আশুরা পালন করা হয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিকট ঐ দিনটি এক হৃদয়বিদারক ও মর্মীস্পর্শী ঘটনা। ঐ দিন কারবালার ময়দানে ইয়াজিদ কর্তৃক ইমাম হোসেন সাহাদত বরণ করে, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদের এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে যান। সারা দেশের ন্যায় বানিয়াচঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও আশুরা পালন করা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বানিয়াচঙে কোনো শিয়া মুসলমান নেই। ঐতিহ্য হিসেবে এখানে আশুরা পালন করা হয়ে আসছে।

০৩/১১/১১ তারিখে সকাল ১০ টার সময় সাগর দিঘির পূর্বপাড় হায়দর শাহ (রঃ) মাজারে খাদিম জনাব এমরান উদ্দিন (৭০) [পেশাঃ খাদেম, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি] এর সাথে আশুরা নিয়ে আলাপ করলে তিনি জানান যে, সাগর দিঘির পূর্বপাড় হায়দার শাহ(রঃ) মাজারে প্রায় ১২০ বৎসর ধরে জাঁকজমকভাবে আশুরা পালন করা হচ্ছে। মহরম মাস আসার সঙ্গে সঙ্গেই হায়দর শারে মাজার ও মাজার এলাকাকে রঙিন কাগজ, কাপড়, বাঁশ ও ত্রিপোল দিয়ে সাজানো হতো। এখন আর তেমন সাজসজ্জা নেই। ভক্তদের লাঠি ও পুরনো দাগুলোকে ঘষামাজা করা হয়। মহরম মাসের

www.pathagar.com

প্রথম তারিখ থেকেই হায়দর শারে মাজারে মানুষ দলে দলে আসা-যাওয়া শুরু করে। কেউ কেউ মানতের জিনিসপত্র এনে মাজার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বা নিজেরা বিতরণ করে থাকেন। অনেক ভক্ত এখনও মহরম মাসের এক থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত রোজা রেখে থাকেন।

মহরম অনুষ্ঠানে তাবুত ও তাজিয়া তৈরি করা একটি আকর্ষণীয় বিষয়। তাবুত ও তাজিয়া তৈরি করা অনেক ভক্তকে পুণ্য মনে করেন। দুলদুল ঘোড়া, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি করে দলগতভাবে মাজারে উৎসর্গ করা হতো। মাজারে আগত ৮-১০টি দলে বিভক্ত হয়ে জারি, মর্সিয়া গেয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানে গোল হয়ে বসে ৩০-৪০ জন একসঙ্গে সারাদিন জারি গান গায়। এ জারি দশ তারিখ পর্যন্ত দলে দলে ভক্তি সহকারে ছেলেদের কয়েকটি দল মাজারের সামনে এবং মেয়েদের দল মোকাম বাড়ির ভেতরে। এই জারি গাওয়ার সময় কারবালার শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই সময় আশেপাশে অনেক বাড়িতেই কোরান তেলাওয়াত, কারবালার কাহিনি, বই, পুথি ইত্যাদি পড়া হয়। অনেক ভক্তই এ সময় খাটে না ঘুমিয়ে মাটির বিছানায় রাত্রি যাপন করেন। অনেকে পায়ে জুতা পরেন না, ভাল পোশাক অনেকেই পরিধান করেন না। জারি গায়কদের অনেকের থাকে আলাদা পোশাক। তারা লাল কাপড় পরে গলায় কালো কাপড় দিয়ে দলগতভাবে জারি গেয়ে থাকেন।

মররম দশ তারিখে অনেকেই চিল্লাতে বসেন, ভক্তরা মিলে সকাল থেকেই দোয়া-দরুদ পাঠ করে থাকেন। সকাল থেকেই দলে দলে বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা বিভিন্ন ধরনের জারি গেয়ে লাঠি, দা ও কাগজের ঘোড়া নিয়ে মাজার এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় জুতা পায়ে কাউকে দেখা যায় না। এ সময় দরগার খাদেম আগতদের পানি ছিটিয়ে দেন। এরপর দলগতভাবে শুরু হয় জারি ও বিভিন্ন ধরনের শোকের বাজনা। অনেকেই 'হায় হাসান হায় হোসেন' বলে বুকে হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে মাতম করতে থাকেন।

মাজারের বাড়িতে বসবাসরত সুরভি নামের এক ছাত্রীর সঙ্গে আশুরা নিয়ে কথা হয়। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই আশুরা উদযাপন দেখে আসছি। আমাদের বাড়ির ভেতরে মহিলারা দলে দলে এসে জারি গান গেয়ে, ইমাম হোসেনকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করেন। হঠাৎ করে হাসান, হোসেন বলে চিৎকার করে ওঠেন। আগতরা অনেকেই নামাজ পড়েন, দোয়া-দরুদ পড়েন ও রোজা রাখেন। অনেকেই মাজারে ইফতার করে মাগরিবের নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরেন।

বানিয়াচঙের যেসব এলাকায় মহরম অনুষ্ঠান পালন করা হয়– যাত্রাপাশা, মিনহাট, ভাদাউড়ি, নোয়াগাঁও, বেতকান্দি, গুনই, কাগাপাশা, ওমরপুর, কাউরাকান্দি, উত্তরসাঙ্গর, বিথলঙ্গ, পুকড়া, মুরাদপুর ও ইকরাম। এসব এলাকায় একটি মোকাম তৈরি করে ও খাদেম নিয়োগ করে দলগতভাবে একই নিয়মে অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মহরমের তাজিয়া মিছিল

ঝ. শব-ই-বরাত

'শব'-এর অর্থ হলো রাত এবং 'বরাত' শব্দের অর্থ হলো মুক্তি। অতএব শব-ই-বরাতের মূল অর্থ হলো মুক্তির রাত। মুক্তি কে না চায়। অভাব-অনটন, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, পাপ-তাপ, দুঃখ-অভিশাপ এসব থেকেই মানুষ তার স্রষ্টার কাছে মুক্তি চায়, চায় শান্তি। শব-ই-বরাতের রাত্রি আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানানোর রাত্রি। এ রাত্রিকে 'ভাগ্যরজনী'ও বলা হয়। এ রজনীতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আগামী বছরের ভাগ্য নিরূপণ করে থাকেন। সারা বছর ধরে কার জন্য ভাগ্যে কি ঘটবে, এই রাতে তা নির্ধারণ করা হয়। তাই মুসলমান সমাজে শব-ই-বরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। চন্দ্র বছরের শাবান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতই হচ্ছে শব-ই-বরাত।

ঘরে ঘরে শব-ই-বরাতের প্রস্তুতি চলে, ঘর, বাড়ি পরিষ্কার করা, কাপড়, চোপড় ধোয়া, টুপি-জায়নামাজ ধোয়া, আগরবাতি, আতর, গোলাপজল কেনা এবং রাতে ভালো খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়। গ্রামের মহিলারা চালের রুটি ও ময়দা গুড় নারকেল দিয়ে 'হালুয়া' তৈরি করেন। ফকির মিসকিন ও পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বন্টন করা হয়।

হবিগঞ্জ শহরের বেশিরভাগ মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয়, সারারাত ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। ছোট বড় সবাই পরিষ্কার কাপড় পরে টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে ও ওয়াজ শুনতে যায়। সারা রাত মসজিদগুলো খোলা থাকে, মসজিদের আসা যাওয়ায় জিগির আজগারের এ রাতে মসজিদ থাকে মুখরিত। রাতে কবরস্থান জিয়ারত করে নিকট আত্মীয়স্বজন মা-বাবার জন্য মাগফিরাতের উদ্দেশে আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়।

শব-ই-বরাতে নিজ নিজ ভাগ্যের সফলতা কামনায় নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজগার ও তেলাওয়াত-দানখয়রাত করা হয়।

পরদিন শব-ই-বরাত উপলক্ষে অর্থাৎ ১৫ই শাবান নফল রোজা রাখা উত্তম গণ্য করে মুসলমানরা রোজা রাখেন। এভাবে হবিগঞ্জে শব-ই-বরাত উদযাপন উৎসবে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

ঞ. রথউৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের আরো একটি বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব 'রথযাত্রা'। আষাঢ় মাসে এ উৎসব পালিত হয়। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যাত্রা এবং একাদশী তিথিতে হয়ে থাকে প্রত্যাবর্তন বা ফিরতি রথ। শাস্ত্র মতো সূর্যের বারো প্রকার যাত্রার একটি হলো রথযাত্রা।

রথযাত্রায় দেবতা গমন করেন। দেবতারা হলেন জগন্নাথদেব, বলরাম ও শুভদ্রা। লৌকিক সংস্কারে তাঁরা সহোদর-সহোদরা। কাঠের তৈরি প্রতিমূর্তিগুলোকে বিগ্রহ বলে। চার চাকা বিশিষ্ট সাধারণত নিম কাঠের তৈরি কারুকার্য সংবলিত রথটি চড়ে তাঁরা তিনজন যাত্রা ও ফিরাযাত্রা করে থাকেন। রথযাত্রা সূচনা করেছিলেন বৃন্দাবনের গোপীগণ। সংক্ষেপে সে কাহিনী হলো : একবার শ্রীকৃষ্ণ (জগন্নাথদেব), বলরাম ও সুভদ্রা দেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সেমন্তপঞ্চকতীর্থে স্নান করতে যান। সূর্যগ্রহণকালে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও সেখানে গিয়েছিল, স্নানের পর সকলে যে যার নিজ স্থানে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করেছেন। তখন ব্রজবাসীরা সংবাদ পেলেন কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আসছেন। শোনামাত্রই তাঁরা ছুটছেন কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের গোপীবেশের পরিবর্তে রাজবেশ দর্শন করে ব্রজবাসীরা সন্তুষ্ট হতে পারল না; কারণ তাঁরা কৃষ্ণের রাখালবেশ পছন্দ করেন; যে বেশে কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে বৃন্দাবনে লীলা বিলাস করেছেন। বিশেষ করে রাধারানির ভাব বুঝতে পেরে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের রথের দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বৃন্দাবনের দিকে। সঙ্গে বলরাম, বোন সুভদ্রা–তাঁকেও তাঁরা নিয়ে গেলেন। এই হচ্ছে রথযাত্রার ইতিহাস।(১)

উপনিষদে বর্ণিত যে, 'আত্মাকে রথি বলিয়া জানিও, শরীরকে রথ বলিয়া জানিও, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিও এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিও।' রথের একটি উৎকৃষ্ট শ্লোক।

রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের স্নানযাত্রা থেকে শুরু। যাত্রার শুরুর আগের দিন জল দিয়ে ভালোভাবে মন্দির মার্জন পরিষ্কার রথসহকারে। রথ যে স্থানে তিথিতে রাখা হয় সে স্থানটি গুণ্ডিচা মন্দির নামে অভিহিত। এই মন্দিরটি মূল মন্দিরের আঙিনায় অস্থায়ীভাবে তৈরি হয়ে থাকে। রথের উপরে বসানো তিনটি বিগ্রহ দেখতে তিন রঙের। জগন্নাথের রং কৃষ্ণ তথা কালো, বলরামের রং সাদা ও সুভদ্রা গৌড়ীয় রঙের। বিগ্রহের সাজ-পোশাক পরানোর পর ভোগ নিবেদন করা হয়। অতঃপর ধূপ আর ঘৃত প্রদীপের আরতি, সেসঙ্গে ফুলে ফুলে সজ্জিত রথটিকে ঘিরে ভক্তবৃন্দের ভিড় জমে। উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে উল্লাসের মধ্যে রথের মোটা পাটের দুটি রশি টেনে ভক্তরা মূল মন্দির থেকে রথযাত্রা শুরু করেন। শহরের প্রধান প্রধান জায়গায় নারীপুরুষ সবাই রথের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। রথ টানার জন্য দুই দড়িকে ধরার জন্য ভক্তবৃন্দ আকুল থাকেন। একটি দড়ি মহিলারা আরেকটি দড়ি পুরুষ ভক্তরা টেনে নিয়ে যায়। কোথাও আবার পুরুষ, মহিলা একাকার হয়ে রশি ধরে রথ টানতে থাকে। যারা রশি ধরতে পাচ্ছে না, তারা রথকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়। কেউ আবার চালু রথের সম্মুখে রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে থাকে। বড় একটি ঝাড়ু এ কাজে ব্যবহৃত হয়। ঝাড়ুটিও হাত বদল হয়।

www.pathagar.com

রথযাত্রাকালে ঢাক-ঢোল-করতালের বাজনা হয়। সঙ্গে ভক্তরা হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেন এবং সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার জয়ধ্বনি। খালি পায়ে শোভাযাত্রায় বিভিন্ন মৌসুমি ফল ছুড়ে দেওয়া হয়। ছুড়ে দেয়া ফল গ্রহণকালে ভক্তবৃন্দের প্রতিযোগিতা ও জটলার সৃষ্টি হয়– কাড়াকাড়ি এবং প্রাপ্তিতে তৃপ্তি। এসব কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রথে কলা লুট মুখ্য বিধায়, একটি প্রবাদ আছে, 'রথও দেখা, কলাও বেচা'-এর বাস্তবতা রথযাত্রাকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রথটি আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিত যাত্রা করে দূরে নিরাপদ স্থানে নয়দিন গুণ্ডিচা মন্দিরে রাখা হয়। 'লোকবিশ্বাস অনুসারে এ অবস্থান মাসির বাড়িতে'। (৩) দশদিন পরে আবার এই রথ একই নিয়মে ঢাক-ঢোল-করতাল বাজিয়ে ভক্তবৃন্দ রথ টেনে নিয়ে যায়। একে উল্টো রথ বলে। উল্টোরথ পুনরায় নিয়ে মূল মন্দিরে রাখা হয়। তারপর নৈমিত্তিক পূজা অর্চণার মাধ্যমে রথযাত্রা উৎসবের ক্রিয়া শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, রথ উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন ৫৬বার বিগ্রহকে ভোগ নিবেদন করা হয়। এরূপভাবে ৯ দিনই করা হয়ে থাকে।

হবিগঞ্জে রথযাত্রা ১২৫২ বঙ্গাব্দ থেকে মহাপ্রভু আখড়া সৃষ্টিকাল থেকেই পালন হয়ে আসছে। তারপর রাধাগোবিন্দ জিউর আখড়া, গোপাল জিউর আখড়া ও নৃসিংহ আখড়ায় রথযাত্রা হয়ে থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে হবিগঞ্জে কোনো শোভাযাত্রা হয় না। আখড়া প্রাঙ্গণেই ভক্তবৃন্দ রথযাত্রা ও উল্টো যাত্রা সীমাবদ্ধ রাখতেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) হবিগঞ্জের শ্রীশ্রী নৃসিংহ মন্দির স্থাপনের পর বগলা বাজারে তাদেরই উদ্যোগে রথযাত্রা বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে হয়ে আসছে। হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ, বাহুবল, মাধবপুর ও চুনারুঘাট উপজেলার বিভিন্ন মন্দির ও আখড়া থেকে রথযাত্রা হয়ে থাকে। তার মধ্যে নবীগঞ্জ রাধাগোবিন্দ জিউর আখড়া রথযাত্রা অতি পুরাতন ও ঐতিহ্যের অধিকারী। 'অতীতে নবীগঞ্জ রথযাত্রা উৎসব অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল'। (৪)

হবিগঞ্জের রথযাত্রা

www.pathagar.com

বানিয়াচং বিথলঙ্গ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আখড়া ও বানিয়াচং অনঙ্গ ভটের বাড়িতে রথযাত্রা অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। সে দিন বিরাট মেলা হয়। ঐ মেলা ও রথ যাত্রা অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই ঐ দিন মানতের জিনিসপত্র নিয়ে আখড়ার মহন্তের কাছে জমা দেন।

২৫.১০.১১ তারিখে বিথলঙ্গ গ্রামের সঞ্জয় কুমার রায় (৩৮), [শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ., বর্তমানে এফ আই বিডিভির থানা সমন্বয়কারীর সঙ্গে রথযাত্রা নিয়ে আলাপ করলে তিনি জানান যে, রথ যাত্রার আগে দিন পুরোহিতগণ অধিবাস করেন। অনেক ভক্ত উপবাস করে থাকেন। সকালে অনেক ভক্ত রথযাত্রার স্থানে একত্র হয়ে বিভিন্ন মানত সম্পন্ন করেন। এই সময় রথ সাজানো হয়। শ্রী শ্রী জগন্নাথের উদ্দেশে পূজা দেয়া হয়। রথের উপরে শ্রী শ্রী জগন্নাথের মূর্তি বা ছবি রথের উপরে তোলা হয়। ভক্তবৃন্দ নারী, পুরুষ মিলে রথের রশিতে টান দিয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়ে যান। এরপর ভক্তবৃন্দের নেয়া বাতাসা ও অন্যান্য ফল, মিষ্টি লুট দেওয়া হয়। পরে আবার তিনদিনের দিনে ফেরা রথের অনুষ্ঠান করে যথাস্থানে নিয়ে আসেন। এই অনুষ্ঠানটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলে আসছে। তবে আগের চেয়ে মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে। রথযাত্রার দিন আখড়ায় দেশবিদেশের গণ্য মান্য অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে দেশমুখ্য পাড়া অনঙ্গ ভট্টচার্যের বাড়িতে তাঁর বড় ছেলে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি জানান যে, আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখছি আমাদের বাড়িতে রথের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। কাঠের তৈরি এই রথটি আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগের। বাবার কাছ থেকে শুনেছি দাদা একজন পণ্ডিত ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা মোতাবেক বাড়িতে একটি মাণ্ডব ঘর তৈরি করে শ্রী শ্রী জগন্নাথের পূজা ও রথের অনুষ্ঠান করতেন যা এ পর্যন্ত একই নিয়মে প্রত্যেক বছরই আমরা করে আসছি।

ট. চড়কউৎসব

চৈত্রসংক্রান্তি

হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জাহানারা খাতুন (৫২), [পৈত্রিক নিবাস: বানিয়াচঙের যাত্রাপাশা গ্রামে]। তিনি একজন সুলেখক, এপর্যন্ত তিনি অনেক লোকগান লিখেছেন। কলেজের অফিস কক্ষে লোকসংস্কৃতির তথ্যউপাত্ত নিয়ে ২০.১০.১১ তারিখে আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি চৈত্রসংক্রান্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন সকালবেলা থেকেই বানিয়াচঙের অনেক হিন্দু বাড়িতে ধোয়া মোছার ধুম পড়ে যেত। ঘরের নিচ থেকে চালের উপর পর্যন্ত যাবতীয় আসবাব পত্র ধুতে দেখেছি। অনেক বাড়িতে ঘরের ডেগ ডেকচি থেকে শুরু করে যাবতীয় মসলা এমনকি পেঁয়াজ পর্যন্ত ধোয়া হতো। দোকানে দোকনে উৎসবের আয়োজন করা হতো। বিশেষ করে দোকানঘরগুলো ঝাড়ামোছা হতো। রঙিন কাগজ দিয়ে ঘর সাজানো হতো নতুন নতুন খাতা তৈরি করা হতো। কোনো কোনো দোকানে ঐ দিনই ক্রেতাদের মিষ্টি খাওয়ানো হতো।

www.pathagar.com

শ্যামাপদ বিশ্বাস (৫৫), [সহকারী শিক্ষক, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রাম: বিদ্যাভূষণ পাড়া, বানিয়াচং]। জানান যে চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিথলঙ্গের আখড়ার সন্নিকটে ভেড়ামোহনা নদীতে ও শ্যামবাউলের আখড়ার দেভাল দিঘিতে পুণ্য স্নানের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। পূণ্য স্নান সম্পর্কে অনেক ভক্তই মনে করেন যে গঙ্গায় স্নান করলে পুণ্য লাভ করা যায়, এখানেও স্নান করলে সমান পুণ্য হয়। অনেক হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে চড়ক পূজার আয়োজন করা হতো। চড়ক পূজা সম্পর্কে তিনি জানান যে, চড়ক পূজার স্থানে আগুন দেওয়া হয়, ঐ আগুনের উপর দিয়ে শিব ভক্তরা হেঁটে যায়। মাটি খুঁড়ে ভূমি সজ্জা ও জল সজ্জা করা হতো। শরীর দিয়ে লুহার শলাও ঢোকাতে দেখা গেছে। এখনও ভাটিপাড়া, বুরুজপাড়া, নোয়াপাড়ায় (জুয়েল মাঠে) চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সারা চৈত্র মাস শিবের গাজন গেয়ে পূজারিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত। এই সময় তারা লাল কাপড় পরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দেয়। গায়ে ব্রহ্ম মাখে, কেউ কেউ আবার মাথায় জটা রাখে। নিরামিষ ভোজন করে। দল বেঁধে মাগন মেগে বাড়ি বাড়ি গান গায়। এই গান বা গীত 'সন্ন্যাস গীতি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ঐতিহ্য এখন প্রায় অনেকটা বিলুপ্ত। চৈত্র মাসে ঘরের দরজায় গোবরের উপর ফুল বসিয়ে দিয়ে ঘাটা রেঁধে খাওয়ার নিয়ম ছিল। বিশ্বাস ছিল যে, এই ঘাটা করে খেলে রোগ বালাই ঘরে ঢুকতে পারবে না।

ঠ. গায়ে হলুদ

'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান মুসলমানদের ও 'অধিবাস' হিন্দুদের। বিবাহ মিলনের প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে বর-কণে উভয়ের নিজ নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রস্তুতি অনুষ্ঠানই গায়ে হলুদ বা অধিবাস। অধিবাস পূজা, বিবাহ ইত্যাদির আগে গন্ধাদির দ্বারা আচরিক মঙ্গলানুষ্ঠান। শুভ কর্মবিশেষ। এই অধিবাস দিন গাইল-চিয়া দ্বারা কিছু ধান ভেঙে আতপ চাল তৈরি করে নেয়র মাসহ ন্যূনতম পাঁচজন এয়োস্ত্রী (সধবা স্ত্রী)। তুষগুলো বাড়িতে রাখা হয়। পরদিন অর্থাৎ বিয়েতে মুখচন্দ্রিকার প্রদীপের পাতিলে ব্যবহার করতে। বর-কনের উভয় বাড়িতেই একই নিয়মে আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়।

দুপুরবেলা সধবা স্ত্রীরা ঢাকঢোল বাজিয়ে বর-কনেকে স্নান করার জল সংগ্রহ করে। নিজ নিজ বাড়িতে বর-কনের সারা গায়ে ভালো করে মেখে দিয়ে ঐ তোলা জলে স্নান করানো হয়। এই স্নানকে 'অধিবাসস্নান' বলা হয়। স্নানের স্থানটিকে রঙিন কাগজ ও চারটি কলা গাছ দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়। সম্মুখের মাটিতে আলপনা এঁকে দেয়া হয়।

ঐ দিন অনেক পরিবারে অধিবাস উপলক্ষে শক্তি পূজা (কালী পূজা) হয়ে থাকে। বিশেষ করে বর-কনের মা-বাবাসহ কনে ও বর শক্তি পূজা উপলক্ষে উপবাসে থাকে। তারা সকলেই ফল-ফলাদি, নিরামিষ, মিষ্টান্ন খেয়ে দিন কাটায়। গান-বাজনা ও কালী পূজায় রাত জাগরণ হয়। গভীর রাতের কোনো একসময় লোকচক্ষুর আড়ালে সাত

www.pathagar.com

ঘাটের জল সংগ্রহ করে থাকে সধবা স্ত্রীরা। ছোট ছোট ৯/১০টি ঘটি এবং বড় বড় কলসে এ জল সংগ্রহ করে রাখা হয়। পরের দিনের পূজার জন্য। সূর্য ওঠার আগেই নিকটবর্তী পুকুর ঘাটে দুটি ঘিয়ে চাটা বাতি জ্বালিয়ে জলে ভাসানো হয়। হবু বর-কনের আজীবন মিলনের মঙ্গল কামনাই এই মঙ্গল প্রদীপ গঙ্গার জলে ভেসে বেড়ায়। তারপর কনেকে শীতল পাটিতে বসিয়ে পুরোহিত শান্তি মন্ত্রের মাধ্যমে আর্শীবাদ করেন, খুবই আড়ালে বাটা সুন্দর টিপ দিয়ে থাকেন পুরোহিত। এটিকে 'অধিবাসের টিপ' বলা হয়। বরের বাড়িতেও একই নিয়মে অধিবাসের টিপ দেয়া হয়। অধিবাসের টিপ যখন তখন দেওয়া যায় না। শাস্ত্র মতে শুভ মুহূর্ত আছে। লগ্ন দেখে প্রথমে পুরোহিত তারপর পরিবারের গুরুজন টিপ দিয়ে থাকে। অধিবাসের প্রতিটি কার্যক্রমই সারাক্ষণ মেয়েলি গীত ও বাদ্যকারের বাদ্য-বাজনা হয়ে থাকে। উভয় পরিবারেই মাছ-মাংসসহ উন্নত মানের খাবার দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করা হয়।

গায়ে হলুদ মুসলিম পরিবারে বিয়ের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক একটি অনুষ্ঠান। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গোসলের পানি সংগ্রহের নিয়ম গায়ে হলুদে না থাকলেও বিয়ে পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গীত বর-কনের বাড়িতে শুরু হয়ে যায়। হলুদ বাটার জন্য মহিলারা দলবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে গীত গায়। অনুরূপভাবে হাতে মেহেদি দেয়ার জন্যও মেন্দি বাটার গীত হয়ে থাকে। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের কার্যক্রমের অংশগ্রহণের জন্য আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশিদের দাওয়াত দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে অতিথিরা উপস্থিত হয়ে আগে তৈরি করা গায়ে হলুদ মাখানোর মঞ্চে অথবা স্থানে বরকে বর পক্ষ কনেকে কনে পক্ষ হলুদ মেখে দেয়। উপস্থিত আত্মীয়রা এতে অল্প অল্প করে বর-কনেকে হলুদ মেখে দেয়। এভাবে সবাই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারপর বর-কনেকে ভালো করে গোসল করানো হয়। এই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বাড়ির লোকজন আগন্তক অতিথিরা নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আসে। পুরুষরা রঙ্গিন নতুন পাঞ্জাবি-পাঞ্জামা পরে, নারীরা হলুদ শাড়ি পরে, শিশুরাও হলুদ জামা ও হলুদ শাড়ি পরে। গায়ে হলুদ মাখা ও গোসল অনুষ্ঠানে অনেক বাড়িতে রং মাখা, কাঁদা মাখা, জল ছিটানো ইত্যাদি উৎসবের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এখন অনেক পরিবারে এ উপলক্ষে গেট বাঁধা বা প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে আগে চারটি কলাগাছকে বাড়ির উঠোনে গেঁথে একটি চৌকি ফেলে রঙিন কাগজের মালা ও নিশান দিয়ে মঞ্চ সাজানো হতো। মাইক গাছের উঁচু ডালে বেঁধে সারাক্ষণ কলের গান বাজানো হতো, বাজি-ফটকা ফুটানো হতো। মেয়েলি গানের সঙ্গে দামাইল নাচ হতো। পান-মিঠাই পরিবেশন করা হতো। এসব এখন আর নেই। তবে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও আনুষ্ঠানিকতা কমেনি বরং গায়ে হলুদ উপলক্ষে কনের জন্য শাড়ি, মেহেদি, গোসল সামগ্রী ও প্রসাধনি বরপক্ষ আগাম কন্যাপক্ষকে পাঠিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মুসলিম গায়ে হলুদ

হিন্দু গায়ে হলুদ

ড. বিয়ে

মানব জীবনে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিবাহ অনুষ্ঠান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক আবশ্যক একটি অনুষ্ঠান। এখানে ধর্মের অনুশাসনই মানা হয়, সে সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতিগুলোও পালন করা হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে হিন্দুরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মুসলমানরা মৌলভী-কাজী ডেকে ধর্মমতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। আর বাকি সাজসজ্জা, আনন্দ-স্ফূর্তি, গীত-বাদ্য, মাইক-লাইট, বাজি পুড়ানো ইত্যাদি লোকাচার।

বিয়ে আসলে একটি বন্ধন। ধর্মের বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে নর-নারীর বিবাহ অনুষ্ঠান হলে সম্পর্ক বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়, বাঙালি লোক-সমাজে রয়েছে এ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই দাম্পত্য প্রেমের ভিত রচিত হয়, সংসারজীবন স্থায়ী ও দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে। 'হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ 'চুক্তি' বিশেষ নয়। এটা হচ্ছে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধিকরণের জন্য দ্বিজাতির মধ্যে যে দশবিদ সংস্কার[১] আছে, বিবাহ তার মধ্যে শেষ ও চরম সংস্কার। এই সংস্কার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য

www.pathagar.com

সম্পর্ক স্থাপিত হয়'।[২]

পিতা কর্তৃক কন্যা সম্প্রদান এবং কন্যা কর্তৃক বর বরণের নাম বিবাহ, পক্ষান্তরে বর-কনে উভয়ের এজ্বিন (সম্মতি) দানের নামই বিবাহ। সংক্ষেপে এটা হলেও মুসলিম বিবাহে আরো কিছু জরুরি কার্যক্রম রয়েছে যেমন এজ্বিনের প্রস্তাবের সঙ্গে সাক্ষীদের উপস্থিতি, দেন-মোহর নির্ধারণ, কবুলে সম্মতি, আকদখানিতে খুদবা পাঠ, মোনাজাতে বিবাহকে সুন্নত কার্য সম্পন্ন গণ্য করে 'কাবিননামা' সম্পাদন করা। তেমনি হিন্দু বিয়েতে মন্ত্র পাঠ, সম্প্রদান, মালাবদল ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্তী হতে হয়। বস্তুত এই বিবাহ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে দুটি নর-নারী একত্রে বসবাসের নৈতিক ও সামাজিক সমর্থন লাভ করে এবং ধর্মীয় অনুশাসনে চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মুসলিম বিবাহের আচার অনুষ্ঠান থেকে হিন্দু বিবাহের আচার বিস্তৃত এবং অনেক লোকাচার পালিত হয়। তিনটি স্তরে সাধারণত লোকাচার বিয়ে উপলক্ষে পালিত হয়ে থাকে– বিবাহ পূর্ব, বিবাহ কালীন ও বিবাহ উত্তর। এই লোকাচার বা আচার অনুষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে– নব দম্পতির সুখ, শান্তি, আয়ু ও মঙ্গল কামনা। পাশাপাশি 'এই সকল আচার অনুষ্ঠানগুলোর একটি সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। বর-কনের মধ্যে যে বিবাহ ঘটেছে এবং সে বিবাহ যে অবৈধ নয় সাধারণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রকাশ করাও এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য'।[৩] শহরে বা 'নাগরিক জীবনে বিবাহ ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু পল্লি জীবনে এটা বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান'।[৪] বিয়ের সৌন্দর্য, আন্তরিকতা ও আচার অনুষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাংলার পল্লি গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হবিগঞ্জের পল্লি গ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। পাত্র-পাত্রী সংগ্রহে 'ঘটক' নামে এক পেশাজীবীর ভূমিকা আকর্ষণীয় ও উপকারী। সম্পর্ক স্থাপনে বার্তাবাহক ও মধ্যস্থতাকারী ঘটকের ঘটকালিতে বর-কনের সন্ধানপ্রাপ্তির পর উভয় পক্ষের দেখা শোনা শেষে পক্ষদ্বয় একমত হলে বর কনে পক্ষ নিজ নিজ গ্রামেও বিয়ের বার্তা পৌছানোর উদ্দেশে বাড়িতে বৈঠক করে। এই বৈঠকে গ্রামের মুরব্বি, সর্দারসহ বিশেষ জনেরা উপস্থিত হয়ে বিয়ের সংবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞাত হন এবং পান মিষ্টি খেয়ে থাকেন। এই বৈঠককে 'পঞ্চায়েত করা' বলে। তারপর বর-কনের নির্বাচন চূড়ান্ত ও তারিখ নির্ধারণের জন্য ঘটকসহ বরপক্ষ কিছু মিষ্টি ও পান সুপারি নিয়ে কনের বাড়িতে যায়। সেখানে বিয়ের তারিখ চূড়ান্ত হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'চিনি পান' বা 'পান চিনি' বলে। হিন্দু সম্প্রদায় পুরোহিত সহকারে পঞ্জিকায় টিকা দিয়ে দিন, ক্ষণ, তারিখ নির্ধারণ করে। এটা 'আর্শীবাদ অনুষ্ঠান' হিসেবে পরিচিত। এভাবে হিন্দু মুসলমান বিবাহের লোকাচারগুলো আনুষ্ঠানিকতা ও আমোদ-স্ফূর্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বলে বিবাহ একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠান।

হিন্দু বিয়ে

১০.০৬.১২ তারিখে মোহরেরপাড়া গ্রামের ননীপদ দেবের ছেলেমেয়ে পছন্দ হওয়ার পর, প্রথমে ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষের বাড়িতে মিষ্টি, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে মেয়েকে

www.pathagar.com

আশীর্বাদ করে। ঐ আশীর্বাদের দিনই বিয়ে এবং মঙ্গলাচরণের দিন তারিখ ধার্য করা হয়। মঙ্গলাচরণের দিন ছেলে বাড়ি থেকে ছেলের আত্মীয়স্বজন এবং গুরুজনরা মেয়ের বাড়িতে যান। তারা মেয়ের জন্য নতুন শাড়ি, জুতা, কসমেটিকস এবং মেয়ের বাড়ির চাহিদা অনুযায়ী মিষ্টি নিয়ে যান। এরপর প্রথম স্নান উভয়ের বাড়িতেই দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর বিয়ের পূর্ব দিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় স্নান ও অধিবাস দেওয়া হয়। এরপর থেকে চলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। এই সময় বিয়ের গীত ও বিভিন্ন পূজা করা হয়ে থাকে। বিয়ের দিন পাত্রপাত্রী উভয়ই উপোস থাকে। একটি বাঁশের ঢালা বা চালুনের মধ্যে ফুল, খৈ, ধান দূর্বাসহ ঘিয়ের পাঁচটা বাতি দিয়ে এবং পেছনে কয়েকজন এ ও কলসের মুখের মধ্যে ঘিয়ের বাতিসহ বিভিন্ন বাজনা উলুধ্বনি গীতসহ নতুন জামাইকে বরণ করে। গেইটের মধ্যে নতুন জামাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয় তারপর গেইটের টাকা দাবি করা হয়। দধিমঙ্গল শাশুড়ি নতুন বরের মুখ না দেখে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে সোনা রূপা মিশ্রিত আংটি বরের বাম হাতে পরিয়ে দেন। তারপর বিয়ের আগে ছেলেকে বরণ বাক্সি দেওয়া হয়– তার মধ্যে নতুন কাপড় যেমন ধুতি, পাঞ্জাবি, জুতা ইত্যাদি দেওয়া হয়; এগুলো পরে নতুন জামাই বিয়ে করতে বসে। সাত পাকের প্রচলন ছিল। সাত পাকের সময় কুঞ্জের মধ্যে কাঠের চৌকি ব্যবহার করা হতো, চৌকির ওপর সাত পাক অনুষ্ঠিত হতো। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর ঐ যজ্ঞে কন্যার ছোট ভাই খই বাটত। স্নান করানোর জন্য মহিলারা গীত গেয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সাত ঘাটের পানি এনে একসঙ্গে স্নানের ব্যবস্থা করে। বিয়ের দিন বিকালে মেয়ের মা ইষ্টি কুটুম আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে সোহাগ মাগে। মেয়ের মা নতুন কাপড় পরে কাপড়ের কোনায় টোটকা জাতীয় জিনিস বেঁধে মাটিতে ছেছড়িয়ে মাথায় কুলা নিয়ে কুলার মধ্যে থাকা সিঁদুর, তেল, দূর্বা, আদা, চিনি, হলুদ থাকে। আত্মীয় এবং প্রতিবেশিদের বাড়িতে যান। ঘরের দুয়ার বা চালের সামনে বসার জন্য একটা পিঁড়ি দেওয়া হয়। ঐ বিপরীতে মেয়ের মা বসেন। কুলা রাখেন আসনের ওপর। তারপর ঐ বাড়ির লোক চালসহ বিভিন্ন উপকরণের অর্ধেক দিয়ে অর্ধেক নিয়ে যাবে। বাড়ি ত্যাগ করার সময় মহিলারা উলুধ্বনি দেবে। মাগা সোহাগ নিয়ে মেয়ের বসার স্থানে রেখে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন মেয়ের বাবা তার পূর্বপুরুষের উদ্দেশে ষোড়শ প্রচারী দ্রব্য দেবে। বাবা কন্যাকে উপবাসের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। বর্তমানে বাড়িতে আলোকসজ্জা করা হয়, বিয়ের কুঞ্জ তৈরি করা হয় খুব খরচ করে। এখন আর কাঠের চৌকি ব্যবহার করা হয় না। কুঞ্জের মধ্যে নতুন জামাইয়ের বসার জন্য চেয়ার ব্যবহার করা হয়। সাত পাকের সময় মেয়েকে সাহায্য করার জন্য নতুন বউয়ের সঙ্গে আরোও চার পাঁচজন মেয়ে বা মহিলা কুঞ্জের মধ্যে ওঠে। তারা মেয়েকে সাত পাক দিতে সাহায্য করে। বিয়ের পর দিন সকালে সাত ঘাটের পানি এনে ছেলেমেয়ে এবং অন্যদের স্নান করানো হয়। এরপর বাজনা গীত ও ধামাইলের সঙ্গে সাত পাকের মাধ্যমে বাসি বিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মেয়ে বিদায়। মেয়ের বাড়ি থেকে মেয়েকে মেয়ের বাবা সামর্থ্য অনুযায়ী স্বর্ণের জিনিস এবং কাঠের ফার্ণিচার এবং ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়। সঙ্গে ছেলেকে সোনার আংটি এবং চেইন দেওয়া বাধ্যতামূলক।

www.pathagar.com

হিন্দু বিয়ে অনুষ্ঠান

মুসলমান বিয়ে

১০.১২.১১ তারিখে বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন দিলারা বেগম (৪৮), [শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশাঃ গৃহিণী, স্বামী মাসুক মিয়া, মোহরের পাড়া, বানিয়াচঙ, হবিগঞ্জ] এবং রহিমা বেগম (৫৫), [শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশাঃ গৃহিণী, নোয়াপড়া, বানিয়াচঙ, হবিগঞ্জ]। তারা জানান যে, ছেলে বা মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য্য হলে ঐদিন থেকেই বিয়ের দিন পর্যন্ত উভয়ের বাড়িতেই চলত বিয়ের গীত ও দামাইল। বিয়ের একদিন আগে কন্যাকে ও ছেলেকে গোসল করানো, গায়ে হলুদের সঙ্গে অঙ্গ বিভিন্ন জাতের মশলা দেওয়ার নিয়ম ছিল। অনেকে কলের গান ও মাইক বাজিয়ে আনন্দ করত। অনেকে বিয়েতে লাঠিখেলার ব্যবস্থা করা হতো। গীত গেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীরা সাত ঘাটের পানি এনে ঐ পানি দিয়ে গোসল করাতেন। পানি আনার সময় মহিলারা সঙ্গে করে পাখা, পান-সুপারি, ধূপ, ধান এবং কাচি নিয়ে পুকুরঘাটে গিয়ে ছেলে বা মেয়ের নাম ধরে পানি কেটে কলস ভরে বাড়িতে নিয়ে এসে ঐ পানি গোসলের জন্য আসত। বিয়ের দিন সকাল থেকেই চলত রং ও কাদা ছোড়াছুড়ির খেলা। জামাই নিয়ে রওয়ানা দেয়ার সময় এবং বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে নারায়ে তাকবির–আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয়ার বিধান ছিল। তখন বিয়েতে কাজির পরিবর্তে মৌলভি এনে কাবিন ছাড়াই বিয়ে পড়ানো হতো। অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিশেষ করে দশ থেকে পনেরো বছরের মেয়েদেরই বিয়ে হতো বেশি। মেয়ে এজিন দিতে দেরি করলে তার মুরুব্বিরা ছেলে পক্ষের কাছে বলত লজ্জার কারণে মুখ দিয়ে বলতে পারবে না তাই বিকল্প হিসেবে পানের বাটা এনে মেয়ের কাছে দিয়ে বলা হতো যে বিয়েতে মতো থাকলে ঐ বাটা হাত দিয়ে ঠেলা দেয়ার জন্য, মেয়েরা তাই করত। এতে বোঝা যেত বিয়েতে মেয়ের সম্মতি আছে।

বরপক্ষ কনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে কনেপক্ষের মুরুব্বি না আসা পর্যন্ত বরকে ঘরে ওঠানো হতো না। এই সময় পানের বাটা ও মিষ্টি দিয়ে জামাই আসার সংবাদ পাঠানো হতো। এছাড়াও কলাগাছের তৈরি গেটে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত টাকা না পেলে বরকে ঘরে তুলে আনা হতো না। তখন জামাইয়ের মাথায় ছাতি ও মুখে রুমাল দিয়ে রাখতেন। জামাই তেলা, গেটে টাকা দেয়া নিয়ে বেশিরভাগ বিয়ে বাড়িতেই

www.pathagar.com

ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হতো। বরযাত্রীদের ভালো খাবারের পাশাপশি মোরব্বা, চাটনি, ডাল দেওয়া হতো। বেশি রাতে বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কারণে অনেকেই বসে সারা রাত কাটিয়ে সকালে বধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। বধূকে সোয়ারি বা নৌকায় নিয়ে আসা হতো। ধনাঢ্য পরিবারের বিয়েতে বর্ষার দিনে পানসি নৌকা ব্যবহার করা হতো। বরের সঙ্গে তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা বরযাত্রী হিসেবে গেলেও মহিলাদেরকে নেয়া প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কনে ও বর পক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণব্যাপী চলত পালটাপালটা শ্লোক। যে যাকে হারাতে পারত তারা অতিরিক্ত মিষ্টি /বাতাসা দাবি করত। বর ও কনেকে পৃথক পৃথকভাবে আস্ত মোরগ দিয়ে থাল সাজিয়ে খাবার দেওয়া হতো। এই খাবার বরকে মার্জিতভাবে দেওয়া হতো যাকে বলা হয় জামাইর থাল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে জামাইকে ঘরে নিয়ে নববধূর সঙ্গে আর একজন খেয়ালি মহিলাসহ একসংগে বসানো হতো। তখন জামাই নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা চলত। এখানে উল্লেখ যে মেয়েকে স্বর্ণ ও যে কাপড় দেওয়া হতো তার মধ্যেও একটা বিচিত্র ভাব ছিল। ধনী পরিবারের ছেলের বাবা নববধূকে সিন্তি, সাত দানা বিশিষ্ট কাঁকন, গলার হাঁসুলি হার, হাতের বাজুবন্ধ, পায়ের গোল খারু, পাও পাতা, নাকের নথ, কানের ঝুমকা ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে ঘরে তুলে আনতেন। স্বর্ণগুলো বিয়ের পরে মেয়ে তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে জমা দিয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে বাবার যত ছেলে থাকত প্রত্যেক ছেলের বিয়েতেই ঐ স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে অনুষ্ঠান করা হতো। কনে তুলে আনার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরের বাড়িতে আনন্দ-ফূর্তি করা হতো। এর আগে কনের ভাই জামাইয়ের বাড়িতে এসে জালি বেত দিয়ে ঘরের দরজার চৌকাঠে শক্ত করে বান দিত, রেওয়াজ ছিল। এবং কলাগাছ এনে জামাইয়ের বাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হতো। বউভাতের আয়োজন করা হতো। বউভাতের আগে কনেকে একঘরে থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'কাল রাইত' বলা হয়। বিয়ের পর জামাইয়ের বাড়িতে বউভাতের আয়োজন করা হয়। বউয়ের বাড়ি থেকে চাল, কলা, মসলা ও খাসি দেওয়ার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। দুতিন দিন পর কনেকে তার বাপের বাড়িতে নাইয়র করানো হয়। এই সময় বর বাজার থেকে শালা-শালীদের চাপে ঘন পাতির মাছ কিনে এনে দিয়ে শুধু মাংস খাওয়া থেকে মুক্তি পায়। বর্তমানে এসব নিয়ম অনেকটাই উঠে গেছে। রাত্রে এখন আর বিয়ের অনুষ্ঠান হয় না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কমিউনিটি সেন্টারে এখন বিয়ে অনুষ্ঠানে যে যেমন পারে খরচ করে অনুষ্ঠান করে থাকে।

মুসলিম বিয়ে

www.pathagar.com

ঢ. রাখাল বন্ধুদের উৎসব ইত্যাদি

হবিগঞ্জের হাওর অঞ্চল বিশেষত আজমিরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, লাখাই উপজেলায় বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর হেমন্তের শুকনা মৌসুমে মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের বিস্তৃর্ণ এলাকায় প্রচুর গোঘাস হয়। ভাটি অঞ্চলে গরু ছাড়াও উজান অঞ্চল থেকে মোট তাজাকরণের জন্য আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে গরু পাঠানো হয়ে থাকে। রাখাল মাঠে মাঠে গরুর পাল চড়ায়, পালবদ্ধ গরু সারাদিন মাঠে ঘাস খাওয়ানোর পর সন্ধ্যায় নিজ নিজ বাড়িতে জমা দেয়। এই পদ্ধতিতে মাঠে গরু চরানোকে 'গরুর বাড়ি' বলে। গরুর বাড়ি মাঠে চরাতে গিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ও অন্যগ্রামের রাখালের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে থেকে হয় বন্ধুত্ব।

গাভী প্রসব হওয়ার নয় দিন থেকে একুশ দিনের মধ্যে হাওর অঞ্চলে 'রাখাল বন্ধু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গরুর দুধের সঙ্গে খৈ, উকরা, গুড়, কলা, নারিকেল ও অন্যান্য মৌসুমি ফল দিয়ে খাবার তৈরি করা হয়। বাড়ির সবাই খায়। বাড়িতে রাখাল-বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়া হয়। আবার কে না বন্ধুর খাবার কলাপাতায় বেঁধে গামছা দিয়ে ঢেকে মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে গাছের ছায়ায় বসে বন্ধুকে খাইয়ে থাকে।

গাভী প্রসবের পর দুধ দোহানো শুরু করলে গাভীর প্রথম দুধ দিয়ে খির বা পায়েস তৈরি করে অল্প অল্প করে পাড়াময় বিতরণের নিয়ম রয়েছে। এ লোকবিশ্বাসে যে গাভী সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত প্রচুর দুধ দেবে। তবে এর কোনো লোকজ নাম নেই।

হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক আচারে এ উৎসব উদযাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। তাদের বিশ্বাস, এতে গোয়ালের গরু সুস্থ থাকবে এবং গাভী দুধ প্রদানে সক্ষম থাকবে। এ বিশ্বাসে গাভী প্রসবের ১৭ থেকে ২১ দিনের মধ্যে যে কোনো বেজোর দিনে ব্রত করা হয়ে থাকে। গোয়ালের প্রতিটি গরুকে ভালো করে হয়। উৎসব বাড়ির সবাই স্নানকাজ সম্পন্ন করে। উঠানে সারিবদ্ধভাবে খেতে বসে। কলাপাতায় রাখা প্রসাদ সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। প্রসাদে খৈ, দই, নারিকেল, কলা, গুড় ও নানা ফল থাকে। প্রসাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীরা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে।

রাতে উৎসব-বাড়িতে পাঁচালি গানের ও আসরও বসে। এতে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলে অংশগ্রহণ করে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে। পাঁচালি শেষে দিনের অবশিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করে প্রসাদের মাটির পাতিলটি সঙ্গে সঙ্গে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

www.pathagar.com

লোকমেলা

অষ্টমী স্নানের মেলা

শুক্ল অষ্টমী তিথিতে হবিগঞ্জ জেলার রাজিউরা ইউনিয়নের অন্তর্গত চাদপুর গ্রামে সুতাং নদীতে অষ্টমী স্নান হয়। এবং নদীর পাড়ে এ উপলক্ষে মেলা বসে।

স্থান পরিদর্শনকালে দেখা গেল, একটি মাঠের কিনারা ঘেষা সুতাং নদী মাঠটিকে দুই দিক থেকে ঘিরে প্রবাহিত হচ্ছে। এই দুই দিকেই স্নানের জন্য দুটি ঘাটলা অষ্টমী তিথিতে জনসাধারণের জন্য আয়োজকরা বেঁধে দেন।

দিবসটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা বয়সের নারী-পুরষ, ছেলে-মেয়ে, ভক্তবৃন্দ নদীর ঘাটে স্নান করতে নামেন। এটি তাদের পুণ্যস্নান। বিগত জীবনের পাপ তাপ এই পুণ্য স্নানে ধুয়ে নতুন জীবন সন্ধানের আশায় নদীর ঘাটে সবাই ভিড় জমায়। তারা নদীতে সিন্দুর, তৈল ঢেলে দেয়, কেউ কবুতর পাখিকে খরস্রোতা নদীর জলে স্নান করিয়ে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ নানা পূজা-পার্বণে দীর্ঘ সময় জলে কাটায়। বহুলোকের আগমনে স্বচ্ছ জল ঘোলাটে হলেও পুণ্যতা হ্রাস পায় না- এ বিশ্বাসে ভক্তরা বারবার নদীতে স্নান করে আর স্রষ্টার নাম জপ করে।

এদিকে নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে মেলা বসে। এ মেলায় মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প এবং কৃষিজাত সরঞ্জামসহ নানান খাবারের দোকান দেখা যায়। ছোট ছেলে মেয়েদের হাতের খেলনা, গ্যাস ভর্তি বেলুন ও বাঁশির পোঁ পোঁ শব্দে মাঠ-ঘাট একাকার হয়ে যায় এ যেন একটি লোকউৎসব।

এলাকাবাসী এ অষ্টমী স্নান উপলক্ষে মেলার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। শিশুরাও মেলায় খরচের জন্য টাকা জমাতে থাকে। গৃহিণীরাও অপেক্ষায় থাকে তাদের পছন্দের জিনিস কেনার জন্য। অষ্টমী স্নান হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত থাকলেও এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় সকল সম্প্রদায়েরই অংশগ্রহণে মিলন মেলায় রূপ নেয়। এই মেলাকে এলাকাবাসী 'সমশ্বরীর' মেলা বলে থাকে।

এছাড়া লাখাই উপজেলার করাব ইউনিয়নের অন্তর্গত বেলেশ্বরীর স্নান ও মেলা বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। দোল পূর্ণিমার তেরো দিনের দিন অর্থাৎ ত্রৈদশীর তিথিতে বেলেশ্বরী স্নানে ঐ সুতাং নদীতে স্নান হয়। 'দুলে বান্যে তেরো দিন' হিসেবে এই তিথির স্নানে এলাকার বহু নারী-পুরুষের সমাগম ঘটে। নদীর পাড়েও মেলা বসে। গ্রামীণ এ মেলা উৎসবে রূপ নেয়। এখানেও পূজা-পার্বণ পুরোহিত মহাশয় সম্পন্ন করে থাকেন। নানান গৃহস্থালি, কৃষি, মৃৎ, বাঁশ, বেত-কাঠের আসবাবপত্র মেলায় বিক্রি হয়ে থাকে। বেলেশ্বরী মেলায় বেল ও খিরা বিশেষভাবে বিক্রি হতে দেখা যায়।

রথমেলা

রথযাত্রা উপলক্ষে হবিগঞ্জের ঘাটিয়া বাজারে অবস্থিত প্রাচীনতম মহাপ্রভুর আখড়া ও নবীগঞ্জের রাধাগোবিন্দ জিউর আখড়ার সামনের রাস্তায় নয় দিন মেলা বসে।

www.pathagar.com

বর্তমানেও এই দুই স্থানসহ ইসকন মন্দিরের সামনে মেলা বসে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নবীগঞ্জের কৃতীমানুষ অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী লিখেছেন, 'নবীগঞ্জের প্রসিদ্ধ রথযাত্রা মেলায় গিয়েছি, লোকেল বোর্ডের সড়ক দিয়ে পায়ে হেঁটে।'[৫] এই মেলাগুলো এ নিবন্ধকার বহুবার দেখেছেন। হবিগঞ্জের মহাপ্রভু আখড়া ও নবীগঞ্জের রাধাগোবিন্দ আখড়া মেলায় সকল শ্রেণির মানুষ ও সম্প্রদায়ের উপস্থিতি বহুকাল আগে থেকে হয়ে আসছে। চিড়া, দই, উকড়া, জিলাপি, মিষ্টান্ন, কদমা, বাতাসা, মুরালি, খাজা এসব খাবারের দোকান বসে। মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও কলসসহ নানা ধরনের খেলনা, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মেলায় পাওয়া যায়। আখড়ার সম্মুখস্থ রাস্তার দুই কিনারায় আয়োজিত মেলায় দোকানপাট বসে যাতায়াতের অসুবিধা হলেও উক্ত মেলায় হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের গ্রামীণ জনপদের উপস্থিতি হয়ে থাকে। রথমেলাটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি লোকজ উৎসবে পরিণত হয়। এই মেলা আমাদের সামাজিক, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

ওরস ও মেলা

এ দেশের ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সুফীবাদের আবির্ভাব। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি একেশ্বরবাদ। এই একত্ববাদ প্রচারে সুফীগণ নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাদের করছে আল্লাহ প্রেমাস্পদ। আল্লাহকে পেতে হলে প্রেমিক হতে হবে। ঐশীপ্রেমই পারে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে। সুফী আল্লাহর পথের প্রেমিক, প্রেমের পথ প্রদর্শক এই মুর্শিদের নামই সুফী, পীর, আউলিয়া, দরবেশ।[১]

হযরত শাহজালাল (র.) এবং তাঁর অনুসারী ৩৬০ আউলিয়া সিলেটে শুভাগমনের পরে সিলেট তথা এ দেশে প্রবাহিত হয় শান্তি আর সাম্যের সুশীতল বাতাস, ফলে সিলেট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিকতার এক মিলন স্থান। রাজধানীর এই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জন্ম নেওয়া পীর, দরবেশ, আউলিয়ারা প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য খানকা ও মাজার। এই মাজারগুলোতে প্রতিবছর ওরস উদ্‌যাপিত হয়। সেই সঙ্গে বসে লোকজ মেলা।

মেলা মানে মিলন, মেলবন্ধন। এই মিলন মানুষে মানুষ, এক স্থানের মানুষের সঙ্গে অন্য স্থানের মানুষের, এক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মিলন হয়ে থাকে। মূলত ধর্মের ব্যানারে মেলা হলেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মেলা সর্বজনীন রূপ ধারণ করে।

হবিগঞ্জে অনেক পীর-ফকির-আউলিয়া-দরবেশের মাজার রয়েছে। ওরস উপলক্ষে এক থেকে তিন দিনের মেলা বসে। বিশেষ কয়েকটি ওরস ও মেলার বিবরণ দেওয়া হলো।

মুরারবন্দের ওরস ও মেলা

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন মুরারবন্দ একটি প্রাচীনতম তীর্থ স্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। সিলেট ও তরফ বিজয়ী সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন (র.)

www.pathagar.com

হযরত শাহজালাল (র.) এর ৩৬০ আউলিয়ার সাথি ছিলেন। সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন (র.)সহ ১১০ জন খ্যাত আউলিয়া দরবেশের মাঝার এই মুরারবন্দে রয়েছে। হযরত শাহজালাল (র.)-এর হুকুমে তিনি তরফ বিজয়ে নেতৃত্ব দেন। তার পশ্চিমে মাজারটি এই মুরারবন্দে অবস্থিত। কুতুবুল আউলিয়ার নাম অনুসারে এই দরগা 'কুতুবের দরগা' নামেও পরিচিত। খোয়াই নদীর পশ্চিম পাড় ঘেঁষা পূর্ব-পশ্চিমের প্রায় দেড় কিলোমিটার জায়গা নিয়ে মাজারের অবস্থান এখানে অসংখ্য জাম গাছ রয়েছে। জাম গাছের সুশীতল ছায়ার নিচে দেহান্তরিত অসংখ্য হুজুর-আউলিয়া, দরবেশের রুহানি ফয়েজ লাভে প্রতিদিনই ভক্তবৃন্দের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবছর পৌষ মাসের ২৮,২৯,৩০ তারিখে মুরারবন্দ দরগায় ওরস উদ্‌যাপিত হয়। ওরস উপলক্ষে মাজার সংলগ্ন মাঠে মেলা বসে। মেলায় বিনোদনের জন্য পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা আসে। হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশশিল্পসহ গৃহস্থালি ও খাদ্য সামগ্রীর সমাহার ঘটে। ওরস উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভক্তবৃন্দের পৃথক পৃথক কাফেলা বসে জিকির-আজগারে, মরমি সংগীতের আসর বসে। প্রতিদিন প্রত্যুষে হয় দোয়া মাহফিল। শেষ দিবসে হয় আখেরি মোনাজাত-প্রতিদিনই শিরনির ব্যবস্থা থাকে।

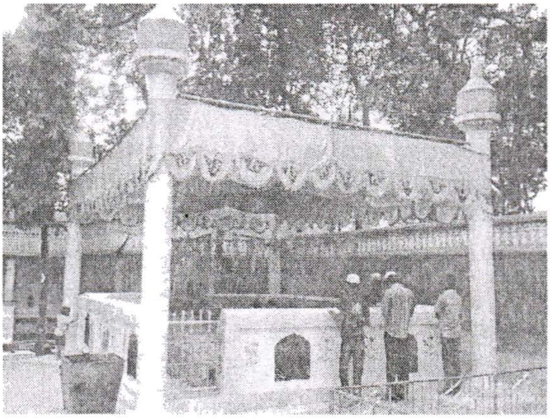

মুরারবন্দের মাজার

ফতেহ্ গাজীর ওরস ও মেলা

মাধবপুর উপজেলার ১১ নম্বর বাঘাসুরা ইউনিয়নের অন্তর্গত ফতেপুর গ্রাম। সিলেট-ঢাকা রেললাইনের একটি স্টেশন শাহজিবাজার। শাহজিবাজার ও ফতেপুর গ্রামের নামকরণ হয় হযরত শাহ সুলতান ফতেহ্ গাজীর (র.) এর নাম থেকে। শাহ সুলতান থেকে 'শাহজিবাজার', ফতেহ্গাজী থেকে 'ফতেপুর'।

হযরত শাহজালাল (র.)-এর আদর্শে যে বারোজন আউলিয়া সিলেট থেকে যাত্রা করে সামন্ত রাজা আচক নারায়ণকে পরাভূত করে তরফ জয় করেন, শাহ ফতেহ্গাজী (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৩] 'বারো আউলিয়ার মুলুক' তরফ বিজয়ের পর দরবেশগণ বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র নির্ধারণ করে বাসভূমি গ্রহণ করেন। শাহ্ সুলতান

www.pathagar.com

ফতেহ্ গাজী (র.) রঘুনন্দন পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে খানকা করে সাধনায় মগ্ন হন। তিনি আজীবন মজর্রদ তাপস ছিলেন। আহম্মদ গাজী ও মসউদগাজী নামে দুজন ভক্ত সহচরসহ ঐ স্থানে ফতেহ্গাজী (র.) একত্রে বাস করতেন।[৪] সাধনা করতে করতে তারা মারা যান। রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে ফতেহ্গাজী (র.) মাজার বিদ্যমান। অগণিত আশেকান আউলিয়ার রুহানিফয়েজ লাভের উদ্দেশে মাজার জিয়ারত করে থাকেন। প্রতিবছর এখানেও তিন দিন ওরস ও মেলা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ ওরস উপলক্ষে ফতেপুরে আসে জিকির আজগার, মরমি সংগীত, মিলাদ দোয়া মাহফিলে যোগ দিতে। পাশের মাঠে পথে মেলা বসে।

শেখ ভানুর ওরস ও মেলা

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলাধীন বামৈ ইউনিয়নের ভাদিকারা গ্রামের মুন্সি নাছির উদ্দীনের একমাত্র পুত্র শেখ ভানু। মরমি সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ বা তত্ত্বকথার দার্শনিক উদ্ভাবন করে বাংলা মরমি সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন শেখ ভানু। তাঁর কাব্য ও জীবন দর্শন বিকশিত হয়েছিল ধর্মীয় প্রত্যয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। তিনি কোরআন-হাদিসের আলোকে সকল বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন পূর্বক মানুষকে হেদায়েত করেছেন, দেখিয়েছেন মুক্তির পথের সন্ধান। তিনি শরিয়তের ধারা মেনে পরে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হয়ে সফল হয়েছেন। তাঁর পীর কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের উঁচু মানের সাধক মিরান শাহ্ তাতারীর খেলাফত লাভে পীরের প্রতি অবিচল আস্থা ও তরিকা মতে একনিষ্ঠ এবাদতে আত্মনিয়োগ করে বুজুর্গি অর্জন করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শেখ ভানুকে মূল্যায়ন করে লেখেন 'আমাদের সিলেটের বুকে এমন একজন মহাপুরুষ জন্ম হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়নি।'[৫]

শেখ ভানু একজন সাধারণ ধান ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে তিনি নৌকা যোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে এক মৃত মানুষের দেহে ওপর বসে একটি কাক তার দুটো চোখ তুলে খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তার হৃদকম্প রোগের উৎপত্তি হয়। 'সোনার তনু জলে ভাসে কোথায় গেল দম।' এটা জানতে ব্যাকুল হয়ে পড়লে শরীয়তি মৌলানার সাক্ষাতে তিনি ভালো হয়ে ওঠেন।[৬] এই শেখ ভান অসংখ্য মরমি গান, কালাম, পুঁথি রচনা করেছেন। তাঁর লেখার মূল্যায়ন করেছেন দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত লেখক-গবেষকগণ। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল-এর 'সুফি দার্শনিক কবি শেখ ভানু' (২০০৪), 'অধীনও শেখ ভানু বলে' (২০০৫), মো. বদিউল আলম-এর 'শেখ ভানু শাহ্'র কালাম ও বিশ্লেষণ (২০১১) ও জাহান আরা খাতুনের 'মরমী কবি শেখ ভানু' (২০১৩) উল্লেখযোগ্য। 'নিশীথে যাইও ফুল বনেরে ভ্রমরা, নিশিথে যাইও ফুলবনে'– শেখ ভানুর কালজয়ী এই গানটি অপূর্ব ভাবগৌরবে গৌরবান্বিত।[৭] শেখ ভানু ১৯১৯ সালে ইন্তেকাল করেন। আত্নীয়স্বজন, এলাকাবাসী ও ভক্তবৃন্দ প্রতি ১৪ পৌষ ওরস উদ্‌যাপন করেন। মাজার সংলগ্ন স্থানে ঐদিন বিরাট মেলা বসে। মেলার ব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে। হবিগঞ্জের বিদগ্ধ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ-পণ্ডিত ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে শেখ ভানুর জীবনকর্মের ওপর আলোচনা করেন। শিল্পীরা শেখ ভানুর মরমি সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। মেলায় লোকজ জিনিসের কেনাকাটা হয়। ওরস উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ সারা দিন রাত জিকির-আজগার, বাদ্যযন্ত্রবিহীন মরমি সাধকের গান ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরিবেশন করে থাকেন।

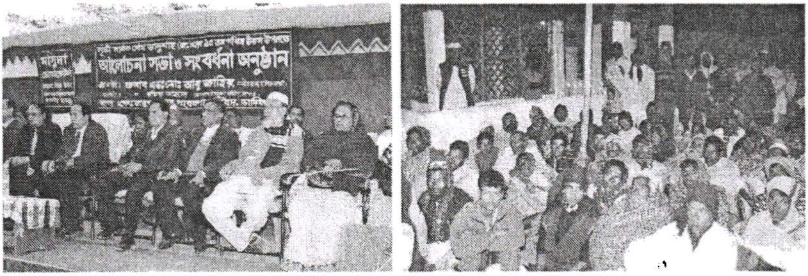

শেখ ভানুর মাজার, আলোচনা সভা ও ওরসে উপস্থিত ভক্তবৃন্দসহ প্রধান সমন্বয়কারী

চণ্ডচড়ির ওরস ও মেলা

বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের 'চণ্ডচড়ি' একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। হযরত সৈয়দ শাহ্ ইলিয়াস কুদ্দুস (রা.) ওরফে 'কুতুবুল আউলিয়া'র মাজার মুরারবন্দ দরগা-শরিফে অবস্থিত। তিনি যুবক বয়সে বাড়ি থেকে বের হয়ে নির্জন স্থান খুঁজে সেখানে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করেছিলেন। এক রাতে আকাশ প্রান্ত থেকে এক উজ্জ্বল আলোক রশ্মি এসে, সেই নির্জন স্থানটির অন্ধকারকে আলোকিত করে দিয়েছিল। সেই থেকেই স্থানটি 'চণ্ডচড়ি' নামে খ্যাত।[১] এই গ্রামের অলি সৈয়দ শাহ্ অছিউল্লাহ্ ওরফে শাহ্ ডুমন চিশতী (রা.)। ছিলেন একজন উঁচু মাপের আধ্যাত্মিক সাধক। রুহানি শক্তি সম্পন্ন এই কামেল সাধকের আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় দখল ছিল। ফারসি ভাষায় তিনি অনেক বই রচনা করেছেন। সেইসঙ্গে অনেক আধ্যাত্মিক সংগীতও রচনা করেন তিনি। তাঁর সময়ে চণ্ডচড়ি গ্রামের সুনাম বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর ১০ পৌষ থেকে তিনদিনব্যাপী ওরস উদ্‌যাপন হয়। অগণিত ভক্ত, মুরিদ ও আশিকান উপস্থিত হয়ে দোয়া-প্রার্থনা করেন। বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে অনুষ্ঠিত মেলায় গ্রামীণ জনপদের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী পাওয়া যায়। অনেক লোকের সমাগম হয়।

এই বংশেরই অধস্তন সাধক সৈয়দ শাহ্ ইজহার আলী চিশতী ওরফে ছানা উল্লাহ্ (রা.)। তিনি বাল্যকাল থেকে ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। নামাজ, রোজা, তসবিহ্ তেলওয়াতে সর্বদা মগ্ন থাকতেন। শেখ ইজহার আলী আল্লাহর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে 'জজবা' হালতে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে 'পাগলা সাহেব' বলে ডাকত যেমন, তেমনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল প্রচুর। সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীর প্রসিদ্ধ জমিদার ও মরমি কবি হাছন রাজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। হাসন রাজার পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজা পাগলা সাহেবের মুরিদ ছিলেন। সিলেটের ধরাদরপুরের প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি আরকুম শাহ্ পাগলা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চণ্ডচড়ি অনেকবার এসেছেন। এই কামেল অলির ওরস প্রতিবছর ১৪ই জৈষ্ঠ্য তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান

www.pathagar.com

থেকে ভক্তবৃন্দ আশেকান ওরসে উপস্থিত হয়ে দোয়া, শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওরস উপলক্ষে দুই দিনের মেলা বসে। মৌসুমি সবজি থেকে শুরু করে ঘর-সংসারের জিনিস দ্রব্য, কৃষি উপকরণসহ মিষ্টান্ন বেচাকেনা হয়ে থাকে। ওরস উপলক্ষে এলাকায় উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। মেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তরফ অঞ্চলের মূলা সবাইকে মূলা–ক্রয় করতে দেখা যায়।

সৈয়দ শাহ্ নূরের ওরস ও মেলা

নবীগঞ্জ উপজেলার জালালসাপ গ্রামে ঊনবিংশ শতাব্দীর সিদ্ধ পুরুষ আধ্যাত্মিক দরবেশ, মরমি সাধক ও লোককবি সৈয়দ শাহ্ নূর (রা.) চিরনিদ্রায় শায়িত। 'শাহ্ নূর একজন উঁচ্চ মার্গের তত্ত্বজ্ঞ লোককবি ও দরবেশ ছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে খোদার ইশ্‌কে মশগুল হয়ে যে সকল গান রচনা করেন এবং ভাবাবেগে বিভোর হয়ে গান গাইতেন, শিষ্যগণ তা অমূল্য সম্পদ মনে করে আয়ত্ত করত।'[১] সৈয়দ শাহ্ নূর ১২৪ বছর দীর্ঘ জীবনকালে আল্লাহর নাম জপতে জপতে সংসারত্যাগী হয়ে বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় চিল্লায় বসে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিলেন। তাঁর রচনায় 'ইষ্টি নাই কুটুম নাই, নাই দেশ খেশ, লাহুতে বসতি করি নানান দেশ দেশ'। মাঝে মধ্যে বাড়িতে এলে গ্রামের পাশে হিন্দু চাড়ালপাড়া আশা নাথের বাড়িতে গোয়াল ঘরে বসে সময় কাটাতেন। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতে যেতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে পীর জেনে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। বাড়িতে একটি মোরগ পুষতেন তিনি। রাত থাকতে মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি আল্লাহর ধ্যানে নামাজ-জিকিরে মগ্ন হতেন। তিনি মোরগের উপকার বর্ণনায় বলেন, 'কইন ফকির শা' নূরে মুর্শিদ চিকন কালা, শাবাস শাবাশ মোরগা শা' নূর থাকি ভালা।'

সৈয়দ শাহ্ নূর খোদার ইশ্‌কে মশগুল হয়ে অনেক বই রচনা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'নূর নছিয়ত' নাগরী লিপিতে রচিত। প্রতিবছর ৭ মার্চ জালালসাপে্ সৈয়দ শাহ্ নূর (রা.) এর বার্ষিক ওরস উদ্‌যাপন হয়। এ উপলক্ষে মেলা বসে ও মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।

পীর বজলু মিয়া চিশতীর ওরস ও মেলা

সূফি তত্ত্বের গুণাবলিতে অনেক ধর্মভীরু মানুষ আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে নিজেকে আল্লাহর পথে নিবেদন করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ পীর মুরিদি করে ভক্তবৃন্দকে হেদায়েতের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। এমনি এক সাধক পীর বজলু মিয়া চিশতী। চুনারুঘাট উপজেলার ৮নম্বর সাটিয়াজুরী ইউনিয়নের দেউলগাঁও গ্রামের সাহেববাড়ি খ্যাত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া পীরসাহেব নিজবাড়ির আঙ্গিনায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

মুরারবন্দ দরগা শরিফের খাদেম পীর কামেল সাঈদ আহমেদ চিশতীর বেলায়েত প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর উদ্দেশে ঘর ছাড়া হয়ে খ্যাতনামা ওলির মাজারে মাজারে, পাহাড় জঙ্গলে নির্জনে চিল্লা সম্পন্ন করেন। রোজা-নামাজের প্রাবন্ধি

www.pathagar.com

থেকে শরিয়তের ধারা মেনে মারিফতের সন্ধান করেন। জিকির-আজকার করে তিনি সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। পীরের প্রতি অবিচল আস্থা ও আল্লাহর প্রতি ভয়ই ধীরে ধীরে তাঁকে সফলতা দিকে নিয়ে যায়। অগণিত ভক্ত ও মুরিদ জোটে। এমনিভাবে বজলু মিয়া চিশতী পীর সাহেব হিসেবে এলাকায় পরিচিত হন। এক সময় নেত্রকোণার মদনপুরে হযরত শাহ্ সুলতান কমরউদ্দিন (রা.)-এর দরবারে আস্তানা করেন। এখানেও বেশ পরিচিত হন। মদনপুরেই তিনি বিবাহ করেন। পরবর্তীসময়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ১৯৯৬ সালের ১৩ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লালপুর গ্রামে এক ভক্তের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ভক্তবৃন্দতাঁর মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে এসে দাফন কার্য সম্পন্ন করেন। প্রতিবছর ২৮ আশ্বিন লালপুর (ভৈরব) এবং ২৯, ৩০ আশ্বিন নিজ বাড়িতে ওরস উদযাপন হয়। ওরস উপলক্ষে মাজার সংলগ্ন মাঠে মেলা বসে। ওরস ও মেলায় প্রচুর লোকসমাগম হয়। মেলায় লোকজ সামগ্রী বেচাকেনা হয়ে থাকে।

আলহাজ্জ শাহ্ সুফি খাজা হাফিজ সৈয়দ ইসাক চিশতী (র)

১৯০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আজমিরীগঞ্জের সরাফত মিয়ার বাড়িতে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে অগণিত ভক্ত সৃষ্টি হয়। আজমিরীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন স্থানে তাঁর মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ২১ চৈত্র তাঁর ওরস পালিত হয়। মাজারের বর্তমান খাদেম জানান যে, মাজারের সামনে পুকুরে তাঁর মৃত্যুর পর পরই বড় বড় গজার মাছ ভাসতে দেখা যায়। কোথা হতে, কখন, কিভাবে এই মাছ পুকুরে এসেছে তা কেউ জানে না।

শাহ্ বরকত (র)

জলসুখা গ্রামের মধ্যখানে শাহ বরকত (র) মাজার রয়েছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের ১৫ তারিখ তার ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

শাহ ক্বারী আবদুল হক

ক্বারী মোহাম্মদ আবদুল হক (র) ৬৫ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মরণে নয়ানগর রাজার বাপের বাড়িতে প্রতি শুক্রবার মিলাদ মাহফিল ও জিগির হয়। এছাড়াও প্রতি বছর ১২ চৈত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হজরত শাহ সৈয়দ হামিদুর আলকাছ ভাণ্ডারী (র)

১৯২১ সালে হজরত শাহ সৈয়দ হামিদুর আলকাছ ভাণ্ডারী (র) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও মরমি গানের লেখক। ১৯৯৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার স্মরণে প্রতি বছর নিজ বাড়ির মাজার সংলগ্ন স্থানে ১৭ মাঘ ওরস পালন করা হয়।

ছাওয়াল ফকির (র)

আজমিরীগঞ্জের আজিম নগর গ্রামে ছাওয়াল ফকির স্মরণে ১০ মাঘ ওরস পালন করা হয়। তাঁর জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

শাহ্ মোহাম্মদ আলী (র)

পিটুয়াকান্দি গ্রামে শাহ মোহাম্মদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তার স্মরণে প্রতি বছর ২০ মাঘ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

ফকির শাহ্ সৈয়দ আলী (র)

আজমিরীগঞ্জে নয়ানগর গ্রামে ফকির সৈয়দ আলী শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মরমি গানেরও লেখক। তাঁর স্মরণে প্রতি বছর ১৩ অগ্রহায়ণ ওরস পালন করা হয়।

ওরস

বানিয়াচং উপজেলায় ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও ইসলামি চিন্তা-চেতনার মানুষের সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু মানুষ পীর-মুরিদানের ভক্ত থাকায় তারা ওরস উদযাপন করে থাকে। আগে ওরস কম হলেও এখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্যায় জর্জরিত কিংবা সন্তানহীন মহিলাদের বিভিন্ন মাজারে মানত করতে দেখা যায়। অনেক প্রখ্যাত আলেম বানিয়াচঙে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাজ উদ্দিন কোরেশি

কুরশা খাগাউরা গ্রামের ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন ঘটে। তিনি হজরত শাহ জালাল (র)-এর সাথি। তাঁর নামানুসারেই এই গ্রামের নাম কুরেশী খাগাউড়া থেকে বর্তমান অপভ্রংশ কুরশা খাগাউড়া হয়েছে। এখানে তার চিল্লাখানা বা আসন বিদ্যমান। এই চিল্লাখানা বা আসনকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ১৩ মাঘ ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মাজারের বর্তমান খাদেম ডা. উসমান গনি শাহ। এ গ্রামে ইসমাইল শাহ্ নামে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন আরেকটি মাজার গড়ে উঠেছে। একই তারিখে ওরসের আয়োজন করা হয়।

সৈয়দ ওয়াজিদ উদ্দিন (র)-এর মাজার

প্রায় ১৭ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নরপতি থেকে এসে বানিয়াচং রাজবাড়িতে বিয়ে করে বর্তমান মিরমহল্লা বসতি স্থাপন করেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। অতীতে মাজার সংলগ্ন স্থানে প্রতি বছর দুই ফাল্গুন ওরস উদযাপন করা হতো। এখন আর ওরস হয় না। তার বংশের সৈয়দ আলী ইমাম জিনের শিক্ষক ছিলেন। তার অনেক জ্বিন ছাত্র ছিল। জ্বিন ছাত্রের মাধ্যম একটি কাঁঠাল গাছ এনে বাড়িতে রোপণ করেছিলেন। গাছটি প্রায় ১০০ বছরের অধিককাল ধরে ফল দিয়ে আসছে। প্রখ্যাত ডাক্তার সৈয়দ গোলাম রহিম (ময়না মিয়া) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক খ্যাতনামা লেখক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম এ বংশেরই উত্তর পুরুষ।

মাহবুব রাজা (র) ও মাজার শরিফ পরিচিতি

বানিয়াচং রাজ পরিবারের সন্তান মাহবুব রাজা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও মজনুন। তিনি আই-এ পর্যন্ত লেখাপড়া করে ব্যাংকে চাকরিও করেছেন। এক পর্যায়ে পারিবারিক মান-অভিমানের কারণে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ শুরু করেন। এর পর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন খাল, বিল, নদী ও পুকুরের পানিতে। এক

www.pathagar.com

স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে নিরিবিলি সময় কাটাতেও দেখা গেছে তাঁকে। তিনি টাকা-পয়সা নিয়ে বা কেউ স্বেচ্ছায় দিলে পুড়িয়ে ফেলতেন। গালি দিয়ে কথা বলতেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁর ভক্ত ছিল। তারা তাঁর দ্বারা রোগে, শোকে, বিপদে, আপদে উপকৃত হয়েছে বলে জানা যায়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী উমেদ নগর শিল্প এলাকায় ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ওরস উপলক্ষে বৃহৎ মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার ভক্তরা মিলাদ-মাহফিল, তসবিহ ও কোরান তেলাওয়াতের আয়োজন করে থাকেন। বাৎসরিক ওরসে দেশ বিদেশের অনেক লোক টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে ওরসে শরিক হয়। মাজার পরিচালনা কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে সরকারি কর্তৃপক্ষ এর আর্থিক তত্ত্বাবধান করে আসছেন। মাজারে রয়েছে বিরাট আকারের দুটি পিতলের ডেকচি। মাহবুব রাজার স্মৃতি বিজড়িত অনেক জিনিসপত্র ও ধুনি জ্বালানোর স্থান রয়েছে। মাহবুব রাজার বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর ২০০৯ সালে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন দেওয়ান মাসুদুর রহমান চৌধুরী ও আবু সালেহ্ আহমদ।

হায়দর শাহ্ (র)

বানিয়াচ সাগর দিঘির পূর্ব পাড়ে হায়দর শাহ্র মাজার রয়েছে। ৮৭ বছর বয়সে ১৪৪৯ বঙ্গাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন হাফেজ ও মুনশি ছিলেন। হঠাৎ করে কথাবার্তায় ভারসাম্য হারিয়ে নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি বিয়ে করেননি। বাড়ির সামনে বর্তমান মাজার সংলগ্ন স্থানে বসে বসে দিন কাটাতেন। তাঁর কথা শুনতে লোকজন সব সময়ই তাঁর কাছে আসত। ফাল্গুন মাসের এক ও দুই তারিখে তাঁর স্মরণে ওরস হয়।

ছামির শাহ্ (র)

বানিয়াচঙের তাম্বুলী টুলা গ্রামে হজরত ছামির শাহ্ (র)-এর মাজার রয়েছে। জানা যায়, তিনি বাগদাদ শহর থেকে এসে ঐ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। হজরত শাহজালালের সফর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার বংশধর বলে দাবি করা হয়। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তাঁর স্মরণে পৌষ মাসের পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখ দুই দিনব্যাপী ওরস হয়। মাজারের কাছে পশ্চিম দিকে ছোট একটি পুকুর রয়েছে। ঐ পুকুরের পানি খেয়ে অনেকেই রোগমুক্ত হয়েছেন বলে লোক মুখে প্রচারণা আছে।

হজরত গরীব উল্লা (র)

হজরত গরীব উল্লা কোথায়, কখন থেকে এ এলাকায় এসে বসবাস করেন তার কোনো সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। তিনি একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। বানিয়াচং শরীফখানি গ্রামে তাঁর মাজার রয়েছে। হজরত কারী জব্বার উল্লা তাঁরই বংশের লোক। প্রতি বছর সাতই মাঘ ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ তিনি তাঁর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।

হজরত মাওলানা আবদুল আহাদ (র)

বিজয়পুর গ্রামের কৃতী সন্তান আবদুল আহাদ একজন পরহেজগার লোক ছিলেন। তাঁর অনেক মুরিদ বা শিষ্য রয়েছে। মানুষ তাঁর কাছে গেলে তিনি নামাজ, রোজা ও তসবিহ

www.pathagar.com

কালাম পড়ার নির্দেশ দিতেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের নয় তারিখে মাজার সংলগ্ন স্থানে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

কেরাম শাহ্ (র)

হজরত মাওলানা কেরাম শাহ্ মুরাদপুর ইউনিয়নের লালপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার স্মরণে ছাব্বিশ মাঘ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

পীরে কামেল এখলাস শাহ্

ইকরাম পূর্ব পাড়ায় বিশে পৌষ একদিনব্যাপী মাজার সংলগ্ন স্থানে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মাজারের বর্তমান খাদিম ফকির মোক্তার হোসেন।

দারাশাহ

খাদিম আবদুল মালিক (৬০)-এর কাছে জানা যায়, দারা শাহ ওরফে তৈয়ব আলী শাহ একজন পীরে কামেল দরবেশ ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর ধরে কাগাপাশা গ্রামের পশ্চিমে তার মাজার সংলগ্ন স্থানে প্রতি বছর মাঘ মাসের ১৩ তারিখ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

হোসাইন কারী (র)

তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। প্রায় সত্তর বছর বয়সে ১৯৯০ সালে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। বানিয়াচং লামাপাড়া গ্রামে ২২ শে মাঘ তাঁর ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

কাজি খনকার

সাগর দিঘির পশ্চিম পাড়ে কাজী খনকারের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ৩০ ভাদ্র ও ৩০ ফাল্গুন ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মাজারের সন্নিকটে অনেক পাথর রয়েছে। ঐ পাথরে দুধ দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায় বলে অনেকেই মনে করেন।

আলাই মুনশি (র)

আলাই মুনশি ঢালি মহল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। তাঁর স্মরণে ২০ ভাদ্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

ফুরকান শাহ্ (র)

প্রতাপপুর গ্রামে ফুরকান শাহ্ একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তাঁর স্মরণে প্রতি বছর ২০ মাঘ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

হজরত মেনদি শাহ্ (র)

মুরাদপুর গ্রামে মেনদি শাহের মাজার রয়েছে। পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে ওরস হয়ে আসছে। ওরসে অনেক ভক্ত আগে দিন থেকেই মাজারে ভিড় জমান। প্রতি বছর ১৫ ফাল্গুন ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

হজরত সোলতান শাহ্ (র)

বানিয়াচঙের যাত্রাপাশা গ্রামে সোলতান শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসের ২ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

লঙ্গর শাহ্ (র)

বানিয়াচং তারাসই গ্রামে লঙ্গর শাহের স্মরণে প্রতি বছর ১৬ অগ্রহায়ণ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ নুরা শাহ্ (র)

তারাসই গ্রামে শেখ নুরা শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

কমুদ আলী শাহ্ (র)

বানিয়াচং দুয়াখানি গ্রামের কমুদ আলী শাহ্ একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি অনেক আধ্যাত্মিক গান লিখেছেন। নিজ বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর মাঘ মাসের ৯ তারিখ ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মাজারের সন্নিকটে খনন করা একটি কূপও রয়েছে।

আখল ফকির

বানিয়াচঙের কালিকাপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছোটবেলা থেকেই তিনি দেওয়ান মাহবুব রাজার একজন ভক্ত। মাহবুব রাজার নির্দেশ মতে, নিজ ঘরে একটি আসন করেছেন। প্রতি বছর তাঁর বাড়িতে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

কালা শাহ্ (র)

সাগর দিঘির পূর্বপাড়ে কালা শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ১১ চৈত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

ফকির আরজত শাহ্

ঠাকুরাইন দিঘির পাড় নিজ বাড়িতে ফকির আরজত শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ২৬ ফাল্গুন ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

রাজা শাহ্

বানিয়াচঙের প্রথম রেখ গ্রামে রাজা শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসের ১৫ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

আনফর আলী ফকির

বানিয়াচঙের খন্দকার মহল্লায় আনফর আলীর মাজারে প্রতি বছর চৈত্র মাসের ৬ তারিখ ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

রজব আলী

বানিয়াচঙের মোহরেরপাড়া গ্রামে মাহবুব রাজার একজন ভক্ত। রজব আলী প্রতি বছর নিজ বাড়ির সামনে তাঁর পীরের নির্দেশ মতো ১৬ পৌষ ওরসের আয়োজন করে থাকেন। এতে প্রচুর লোকের সমাগম হয় এবং গান-বাজনা অনুষ্ঠিত হয়।

শাহ্ মুজিবুর রহমান সুরেশ্বরী (র) ওরফে মজনু শাহ্

কুরশা খাগাউড়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার খান পাড়ে তাঁর মাজার রয়েছে। তিনি একজন কামেল পীর ছিলেন। প্রতি বছর ৪ ও ৫ ফাল্গুন ২ দিন ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

কুলিন শাহ্ (আছরব মুন্সি)

কুলিন শাহ ১৯৭১ সালে ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যাত্রাপাশা গ্রামে তাঁর মাজার রয়েছে। ১৫ ফাল্গুন ও ৫ অগ্রহায়ণ প্রতি বছর ওরস হয়। তিনি জীবিত থাকাকালীন পানিপড়া, তাবিজ দিয়ে অনেক মানুষের উপকার করেছেন।

সুলতান শাহ্

প্রায় ৮০ বছর সুলতান শাহর ওরস অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। তিনি পাণ্ডব শাহের শিষ্য ছিলেন। পৌষ মাসের ৯ তারিখে যাত্রাপাশা গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে ওরস হয়ে আসছে। তাঁর কথামতো মৃত্যুর পর তার লাশ পাওয়া গেছে হাওরের মধ্যখানে। প্রতি বছর এখানে মাদার লুট দেওয়া হয়।

কাঞ্চন শাহ

বানিয়াচঙের গুনই গ্রামে শাহ কাঞ্চন (র)-এর মাজার রয়েছে। তাঁর স্মরণে প্রতি বছর মাঘ মাসের ৩০ তারিখ ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে।

আবদু রহিম শাহ

দেশ মুখ্য পাড়া গ্রামে আবদু রহিম শাহের স্মরণে প্রতি বছর ১ চৈত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

ফিরোজ আলী শাহ

বানিয়াচঙের সিলাপাঞ্জা গ্রামে ফিরোজ আলী শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাউল। অনেক আধ্যাত্মিক গানের লেখক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার লোক ছিলেন। টাকা পয়সার প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। সব সময়ই খালি গায়ে থাকতেন। ২০০৪ সালে মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর মাজারে জিগির ও গান-বাজনা করা হয়। ১৮ অগ্রহায়ণ ওরস পালিত হয়।

চান্দ উল্লা শাহ

বানিয়াচঙের ভাদাউড়ি গ্রামে চান্দউল্লা শাহের মাজার রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসের ১৫ তারিখ বার্ষিক ওরস হয়।

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

www.pathagar.com

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়ক পূজা

৩০ চৈত্র, চৈত্র মাসের শেষ দিন। এ দিনটি চৈত্রসংক্রান্তি। এই চৈত্রসংক্রান্তি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব ও পূজার দিন। এই দিন কেবল চৈত্র মাসের শেষ দিনই নয় বাংলা বছরের শেষ দিন। তাই দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য পৃথক আয়োজনের অংশরূপে তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। এই মেলা চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। মেলার শেষে তিনদিন শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।[১] শেষ তিনদিন হবিগঞ্জ জেলায় মেলা না হলেও দুই দিনের আয়োজনে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৯ চৈত্র 'আড়ুবিশু' ও ৩০ চৈত্র 'মহাবিশু' পূজা হয়। মূলত এ শিব সাধনা। 'জয় শিব শংকর/বম্‌ বম্‌ হরে হরে'/ 'হর পার্বতি, শিব গৌরী', মন্ত্রে পূজা করা হয়। হবিগঞ্জ অঞ্চলে চড়ক পূজার আগে দিনের পূজাকে 'কালিকাহ' পূজা বলে। এ পূজায় আগুন জ্বালিয়ে ভক্তরা শিব ও কালি রূপে সেজে আগুনের উপর নেচে থাকে। এ পূজা যেহেতু শিবের পূজা তাই স্বাভাবিকভাবে মা শ্রীদুর্গা জড়িয়ে আছে এ পূজোয়।[২]

এ উৎসবের মূলে চড়ক পূজা। যে মাঠে চড়ক পূজা হয় সে মাঠে বা আশপাশে মেলা বসে। সকল শ্রেণির হিন্দু এ মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং পূজায় যোগদান করে। মুসলমানেরাও চড়ক পূজা দেখতে উপস্থিত হতে দেখা যায়।

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে হয়ে আসছে। তার মধ্যে চুনারুঘাটের মেলা জেলার সর্ববৃহৎ মেলা। লোকে 'চৈতমাইয়া বান্নি' বলে। সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক এক কিলোমিটার জুড়ে অনুষ্ঠিত মেলায় প্রয়োজনীয় সাংসারিক কেনাকাটা করে থাকে। দূরদূরান্ত থেকে দোকানিরা আগেরদিন থেকে মেলায় এসে হাজির হয়। মেলায় খেলনা, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসাশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, কাঠশিল্প, কৃষিসামগ্রী, লোকপ্রযুক্তি দ্রব্য, লোহাজাত শিল্প, মাছ-গাছ, তরিতরকারি, তুলা, ফল-ফসালি, পিঠা, খৈ-মুড়ি, মিঠাই-মণ্ডসহ বিচিত্র জিনিসপত্রের কেনা-বেচায় উৎসব জমজমাট হয়ে ওঠে। চৈত্রসংক্রান্তির আলোচিত মেলা 'চুনারুঘাটের চৈতমাইয়া বান্নি'।

এই উৎসবের চরম প্রকাশ ঘটে বাংলা বৎসরের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিনে, যখন ভক্তি বিহ্বল ভক্তগণ বিশেষভাবে তৈরি ধারালো পেরেক বসানো কাঠের তক্তার উপর শয্য গ্রহণ করে, একে 'কন্ঠক শয্যা' বলে।[৩] কিছু কিছু পূজারি সন্ন্যাসীকে দেখা যায়. গ্রামের মন্দিরে অথবা একটি বড় গাছের নিচে 'থান' তৈরি করে শিবের আসন বসিয়ে চারপাশে লোহার পেরেক গেঁথে মাঝে একটি ত্রিশূল গেঁথে রাখে। উৎসব সময় তেল-সিঁন্দুর মাখিয়ে পাট বা সিংহাসন বসায়। এই আসন বা সিংহাসন মাথায় নিয়ে গ্রামের হিন্দু বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। নেচে-গেয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চৈতপূজার গান গায়।[৪]

চড়ক পূজা

হিন্দু দেবতাদের মণ্ডলীতে স্বীকৃত মহাদেব বা শিব ঠাকুর। চৈত্রসংক্রান্তিতে নীল রূপী শিবের পূজা উপলক্ষে আদিম তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিকৃত অনবলুপ্ত রূপ বিশেষ 'চড়ক পূজা' অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা, বিশেষত মেয়েরা ঐ দিন সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

উপবাসী থেকে শিবের ভজনা করেন।[৫] সন্ন্যাসী এ উপলক্ষে আগের দিন সংযম করে ধূরাল পূজা অর্থাৎ লাকড়ির দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করে শিবের সাধনা করেন।

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট লম্বা শাল বা গজারি গাছ সংগ্রহ করে ডালপালা ছেঁটে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। কাঁদা-জলে দীর্ঘ সময় থাকায় গাছটির মূল রং বদলে গিয়ে গাঢ় কালো রং ধারণ করে। এ গাছটি 'চড়কগাছ' বলে চিহ্নিত। কেউ এ গাছটি অন্য কাজে কখনো ব্যবহার করে না। চৈত্রসংক্রান্তির সকালে সন্ন্যাসী গাছটিকে পূজারিদের সহযোগিতায় পুকুর থেকে উঠিয়ে মাঠে এনে ভালোভাবে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে। তারপর দুধ-তেল ঘি দিয়ে গাছটিকে আবার ধোয়া হয়। পূজার নির্ধারিত স্থানটি লেপে মুছে রাখা হয়। এই স্থানে গর্ত করে মাটিতে গাছটি কিছু অংশ পুঁতে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, দৈব শক্তি বলে মন্ত্রের সাহায্যে। এই গাছের নিচে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসে ঘট বসিয়ে শিব পূজা করেন। তারপর সন্ন্যাসী পূজা দেন এবং বন্দনা করেন– 'আসন বন্দি বাসন বন্দি/ মাঠের চার কোনা বন্দি/ যদি আসন লড়ে চরে/ ঈশ্বর মহাদেবের জটা/ ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে'/ তখন পূজারিবৃন্দ গাছের গোড়ায় ঘি-তৈল, ফল-মূল, দুধ, দই, সিঁদুর, কলা, আতপ চাল, কবুতর ইত্যাদি এমনকি পাঠা বলি দিয়ে ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করে থাকেন। পূজা স্থানে গান হয় ঢাক-ঢোল-কাসা বাজিয়ে- শিব ঠাকুরের জীবনগাঁথা কীর্তন সুরে গীত হয়ে থাকে, তবে বাদ্য-বাজনাই বেশি হয়।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও ভীষণ আত্মপীড়নের অভাবনীয় দৃশ্য হাজার হাজার দর্শক ভক্ত উপভোগ করেন, যখন এই গাছটির সম্মুখভাগের আগায় একটি শক্ত বাঁশ মাঝামাঝি বেঁধে বাঁশটির দুই প্রান্তে মাটির প্রায় দুই হাত উপরে মাপের লম্বা নাইলনের দুটি রশির মধ্যে একাধিক লোহার বড়শি বেঁধে দেওয়া হয়। এই বড়শি দুই বা চার জন লোকের পিঠের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়। অন্য বড়শিগুলো কোমরে বা বুকে গামছা প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা থাকে। কাউকে আবার কোমরে বাঁধা গামছায় বড়শির হুক বাঁধা থাকে। এ অবস্থায় গাছটিকে ঘোরানো হলে বড়শি গাঁথা লোকগুলো শূন্যে সাত চক্কর ঘুরতে থাকে। লোকগুলো এতে ভীত নয়, বরং আনন্দিত। তারা গাছে থেকে কলা লুট দিয়ে থাকে। হাত-পা নেড়ে সকলকে অভিবাদন জানায়। জীবন্ত কবুতরের মাথা ছিঁড়ে রক্ত খায়।[৬] এসব লোক সাহসী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রশংসিত হলো তাদের আত্মপ্রত্যয়। তখন মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। সমবেত পূজারিগণ 'হর গৌরী প্রাণনাথ, মাথার উপর জগন্নাথ/ এই বার উদ্ধার কর হে/ শিব বম্ বম্ ভোলা নাথ'। এই বলে সমসুরে স্লোগান দিয়ে থাকে।

চড়ক পূজা সাধারণত আদিবাসী লোকদের পূজা। অনার্যদের কাছ থেকে চড়ক পূজা গৃহীত হয়েছে। তাই এই প্রথা আদিম তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিকৃত অনবলুপ্ত রূপ বিশেষ।[৬]

তথ্যপঞ্জি

১. রথযাত্রা উপলক্ষে আর্শীবাণী : শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ। অমৃতের সন্ধানে (ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২ (অতিরিক্ত), পৃ. ২০

www.pathagar.com

২. প্রমথ সরকার, ঘাটিয়া, হবিগঞ্জ। প্রবন্ধ 'শ্রীশ্রী জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন'। (প্রতিদিনের বাণী : ২৮ জুন ২০০৬), পৃ. ০২
৩. খন্দকার রিয়াজুল হক, 'বাংলাদেশের উৎসব', বাংলা একাডেমি, পৃ. ২১
৪. কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী, জীবন স্মৃতির কিছু কথা (১৯৮৯), পৃ. ১৩
৫. কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী, প্রবন্ধ 'নবীগঞ্জের আধ্যাত্মিক জীবনধারা', ম্যাগাজিন 'পারাবত', (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ সমিতির বার্ষিকী, ১৯৮৭), পৃ. ২৯

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২ ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা), পৃ. ৩১৯
২. প্রফেসর নিখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য, নিসর্গ পুরাতন হাসপাতাল সড়ক, হবিগঞ্জ (সাক্ষাৎকার–১৮.১০.২০১৩ তারিখের আলাপচারিতা)
৩. শচীন্দ্র লাল ঘোষ : পশ্চিম বঙ্গ (ন্যাশনাল বুক স্ট্রিট, নয়াদিল্লি, ১৯৮০), পৃ. ১০১
৪. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব (বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ১৮
৫. শচীন্দ্র লাল ঘোষ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৬. রবীন্দ্র সন্ন্যাসী (৬০), যশেরআব্দা, হবিগঞ্জ। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চড়ক পূজা করে আসছেন। ০৫.১১.২০১৩ তারিখে বিবেকানন্দ বস্ত্রালয়, চৌধুরী বাজার, হবিগঞ্জে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. গর্ভদান, পুংসবন, সীমাতোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ অবশ্যপালনীয় এই 'দশবিদ সংস্কার'।
২. ড. অতুল সুর : ভারতের বিবাহের ইতিহাস : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা (১৩৮০) পৃ. ৬৬
৩. ঐ, পৃ. ৮৭, ৮৮
৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস (১৯৬২), পৃ. ৩০৪

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল ফজল : প্রবন্ধ 'নববর্ষের বাণী', বাংলাদেশের উৎসব : নববর্ষ। সম্পাদক : মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমি (১৪১৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩৬
২. আলী আনোয়ার : উৎসব নিয়ে ভাবনা (ঐ), পৃ. ১৪৩
৩. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎস, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৭
৪. Abul Fazal : Akbar Nama –Vol 1, Page No. 32
৫. আবু তালিব : প্রবন্ধ 'বাংলা সনের জন্ম কথা', বাংলাদেশের উৎসব : নববর্ষ, বাংলা একাডেমি (ঐ), পৃ. ৬৬
৬. শামসুজ্জামান খান : বাংলা সন ও তার ঐতিহ্যানুসন্ধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৮
৭. [নিবন্ধকার নিজে ছোটবেলা দাদুর হাতে নববর্ষের সকালে খালিপেটে 'আমানি' খেয়েছিলেন। তবে আমের ডালের পানি ছিটানোর বিষয়টি মনে নেই। নতুন জামা পরে বাড়ির মুরব্বিদের সালাম করেছিলেন। তাঁরা সবাই মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেছিলেন। লুকিয়ে কচি আমের চুঙ্গা ভর্তা খেয়েছিলেন বন্ধুদের নিয়ে।]
৮. কালিবাড়ির পুরহিত শ্রী রঞ্জিত ভট্টাচার্যের সঙ্গে ২১.০৮.২০১৩ তারিখ রাত ৮-৩০ মিনিটে কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে হালখাতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি নবান্ন

১. নিখিল ভট্টাচার্য্য : চিন্ময় চিন্তন, পৃ. ১৩৪
২. ড. ওয়াকিল আহম্মদ : বাংলার লোক সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪, পৃ. ৫৯

তথ্যপঞ্জি ঈদ

১. বুখারী ও মুসলিম শরিফ।
২. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১০
৩. আল হাদীস
৪. আল কুরআন
৫. কাজী নজরুল ইসলাম
৬. মুনতাসীর মামুন : বাংলাদেশের উৎসব (ঈদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৬
৭. অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শ্রীহট্টের ইতিহাস (পূর্বাংশ), ১৯১০ (পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ ২০০৪, উৎস প্রকাশন), পৃ. ২১৪
৮. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমি (১৯৮৩), পৃ. ৯৫
৯. মুনতাসীর মামুন : বাংলাদেশের উৎসব (ঈদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩০
১০. মকছুদুল মো'মেনীন (সংকলন : আলহাজ্ব মাওলানা শামছুল হক, সুলেমানীয়া বুক হাউজ), পৃ. ২২৪
১১. শামসুজ্জামান খান : ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর, আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৪৫

তথ্যনিদের্শ শারদী

১. ড. নজরুল ইসলাম : বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, (মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, ১৯০৪ বাংলা), পৃ.৭১
২. রামেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যোগ), জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৩৭৭ বাংলা), পৃ. ২০২
৩. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১৬
৪. মুনতাসীর মামুন : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৮১
৫. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১৫
৬. ছোপ্‌দার অর্থ-রাজ-রাজড়ার আঁশা-সোঁটা-বাহক বিশেষ (ব্যবহারিক শব্দকোষ, কলিকাতা), পৃ. ৩২৯
৭. মুনতাসীর মামুন : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩
৮. রজত সিংহ রায় (প্রবন্ধ : প্রশ্নতাত্ত্বিক উৎসে দেবীদুর্গা), শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বানিয়াচং (১৪১৯ বঙ্গাব্দের স্মরণিকা), 'অঞ্জলি', পৃ. ২১
৯. সুখেশ চন্দ্র দাশ, পরবর্তীকালে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে চৌধুরী মনিরুজ্জামান হয়েছেন।
১০. খন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১৭
১১. নিখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রবন্ধ : কুমারী পূজাতত্ত্ব, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বানিয়াচং (১৪১৯ বঙ্গাব্দের স্মরণিকা), 'অঞ্জলি', পৃ. ১০
১২. আলোচনায় জানা যায়
১৩. মিসেস রত্না ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। তার সঙ্গে ০২.০৮.১৩ তারিখে আলোচনা

www.pathagar.com

১৪. শ্রী নিবাস দে : আমার জীবন কথা, নিউ ন্যাশন লাইব্রেরি, সিলেট (১৪১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৭

তথ্যপঞ্জি

১. সেরাজম মুনিরা মিতা, অধরা : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বীর শ্রেষ্ঠগণ, (দি স্কাই পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩), পৃ. ১৫৯

২. ঐ

তথ্যপঞ্জি

১. নিখিল ভট্টাচার্য্য : চিন্ময় চিন্তন (প্রবন্ধ জন্মাষ্টমী ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৮

২. ঐ, পৃ. ৭৮

৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক : বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২২

৪. জন আর ম্যাকল্যান্ড, বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮

৫. মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশের উৎসব, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৬৯-৭০

www.pathagar.com

লোকাচার

শ্রী মনসা দেবীর পূজা বা বিষ হরির পাঁচালী

বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পূজা পার্বণের সঙ্গে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য জড়িত। এমনি একটি শ্রী মনসা দেবীর পূজা বা বিষ হরির পাঁচালী। এই পূজা প্রতি বছর নাগ পঞ্চমী তিথিতে নাগ মাতা শ্রী মনসা দেবীর নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মনসা শিবের কন্যা, অযোনি সম্ভবা তিনি, তাই তিনি পদ্মাবতী। তিনি নাগ মাতা বা বিষ হরি। মনসা মঙ্গল কাব্য গাঁথা নাগ মাতাকে ঘিরেই। বাংলা হাওর জঙ্গলায় সাপের বাস, তাই প্রাচীন কাল থেকেই সাপের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্পদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে প্রতি রাতে বাঙালি হিন্দু পরিবারে পদ্ম পুরাণ ও মনসা মঙ্গল অথাৎ বিষ হরির পাঁচালী গীত হয়ে আসছে।

বিষহরি পূজা, রতন বর্মনের বাড়ি, পুরাতন হাসপাতাল রোড, হবিগঞ্জ।

প্রতিমা তৈরি

নাগ পঞ্চমীর ২০/২৫ দিন পূর্বে পাঠের খিলির মাধ্যমে পূজার সূচনা হয়। দেবীর গায়ের রং অগ্নিবর্ণের পদ্মফুলে বসে সেতহংস বাহনে অষ্ট নাগ সহিত প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। প্রতিমার আকৃতি দুর্গা প্রতিমার আকৃতির প্রায় কাছাকাছি।

শ্রী মনসা দেবীর প্রতিমার সঙ্গে মহাদেবের প্রতিমা ও নেতা দেবীর প্রতিমাসহ পূর্ণাঙ্গ মনসা দেবীর পৃথক পৃথক প্রতিমা স্থাপন করে পূজা করা হয়।

পূজার সূচনা

শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমি তিথিতে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার আগের দিন পরিবারের সকলকে নিয়ম অনুযায়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় থেকে স্নানান্তে নিরামিষ ভোজন করে সংযম পালন করতে হয়। নাগ পঞ্চমীর পূর্বের রাতে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস দেয়া

www.pathagar.com

হয়। অধিবাসের সময় দেবীকে শাস্ত্র মোতাবেক পূজা দিতে হয়। পূজার এ অধিবাসে মহিলারা কুলা চার অনুযায়ী গান পরিবেশন করেন :

ও এস ত্বরা ও গো মা মনসা
এবার ভরসা মাগো তোমার
কার বাড়ি এসেছ মা গো
কে করেছে পূজা,
ও মাগো তোমার শিরে শোভে
রক্ত চন্দন পাদে রক্ত জবা।
এবার ভরসা মা তোমার ॥
মেষ ও দিলাম মহিষ ও দিলাম
আরও দিমু কি?
সোনার ও মুকুট দিমু যদি প্রাণে বাঁচি
আপনি পাগল, প্রতি পাগল
আরেক পাগল আছে
পাগল হয়ে রমানন্দ দুহাত তুলে নাচে ॥

এরপর শ্রী মনসা দেবীর গুণকীর্ত্তন করার জন্য দ্বীজ বংশী দাসের লেখা বিষ হরি পাঁচালী বা পদ্ম পুরাণ পাঠ করা হয়। পাঁচালী পরিবেশনের জন্য মূল গায়েন একজন থাকেন। গায়েনকে সহযোগিতার জন্য আসরে একাধিক মহিলা ও পুরুষ পাইক থাকেন। এই পাইকরা যন্ত্রীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। পাঁচালীর শুরুতে আসর বন্দনা করা হয়। বিভিন্ন দেব দেবীর নামে প্রার্থনা করে আসরের চারদিক বন্দনা করা হয়। তারপর মনসা মঙ্গল পাঠে পদ্ম পুরাণ বা বিষ হরির পাঁচালী সুর করে গাওয়া হয়। এক মাস সময় লাগে এই পাঁচালী শেষ করতে। পূজা যেদিন শেষ হয় সেই দিনই পাঁচালীও শেষ হয়। হবিগঞ্জ শহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাসরত এলাকা বা গ্রামের বাসা বাড়িতে প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্যন্তসময়ে মনসা পূজা উপলক্ষে বিষহরি পাঁচালী হয়ে থাকে। এ বছর হবিগঞ্জ পুরাতন হাসপাতাল সড়কের দিগন্ত পাড়ার রতন বর্মনের বাড়িতে মনসা দেবীর পূজাকালে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পূজায় পুরোহিত্য করেন মোহিত ভট্টাচার্য্য ও মতিলাল ভট্টাচার্য্য। বাদল চক্রবর্তী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ পূজায় অসংখ্য নর নারীর উপস্থিত ছিল। দেখা যায়, পূজার জায়গাটিতে বড় করে একটি আলপনা আঁকা রয়েছে। এ মঙ্গল ও সুন্দরের প্রতীক হিসেবে আঁকা এ আলপনাটি শিল্পীগুণে অঙ্কিত। পদ্মফুল ও পদ্ম পাতার নকশা। এ স্থানেই মনসা দেবীকে বসিয়ে পূজা করা হচ্ছে। পাশে তুলসী গাছ, বাতাসা, পান সুপারী, মঙ্গল বাতি, আম পাতা, জলঘট ইত্যাদি রয়েছে।

নাগ পঞ্চমীর তিথিতে পঞ্চমীর মধ্যে সুরষ উপচারে দেবীর পূজা শুরু হয়। দেবী পূজায় বলিদান প্রচলিত থাকায় ছাগ বলিসহ পঞ্চবলি দান করা হয়। বলির পর ছাগ মাংস পাক করে অন্ন ভোগ নিবেদন করা হয়। পরে যজ্ঞ দ্বারা পুনাহোতি প্রদান করে পূজার সমাপ্তি করা হয়। পূজার সমাপ্তিতে ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহাপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এ রাতেই আবার দেবীকে শাস্ত্র মোতাবেক পূজা করা হয়। এটাকে রাতের

www.pathagar.com

পূজা বলে। রাতে সুজি ও লুচি দ্বারা ভোগ নিবেদন করা হয়। পরে আরতি করা হয়। পূজার দিন সারা দিন রাতব্যাপী পদ্ম পুরাণ পাঠও মায়ের নিবেদনে গান পরিবেশন করা হয়। বেশ রাতে হরি লোটের মাধ্যমে রাতের পূজা সমাপ্ত করা হয়।

নাগ পঞ্চমীতে পূজা সমাপন করা হয়। এবং ষষ্ঠ তিথিতে নৌকা পূজাসহ দেবীকে যথারীতি পূজা করে ভোগ নিবেদন দিয়ে বিসর্জনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেবীকে ভক্তি নিবেদন করে তার চরণে ধান দূর্বা দিয়ে আর্শিবাদ প্রার্থনা করে বিদায় জানানো হয়। উলুধ্বনি ও ঢাকের বাদ্যে দেবীর বিসর্জন হবিগঞ্জ শহরের কোর্ট উত্তরের পুকুরে শুভাযাত্রা করে বির্সজন দেয়া হয়। তখন এই বিদায় ঘিরে ভক্তদের মধ্যে সিন্দুর খেলা খেলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। তারপর ভক্তরা ঐ পূজার ছাগ বলির প্রসাদসহ অন্ন ভোজন করে থাকে। বিসর্জনের সময়ে জলপূর্ণ ঘট পুনরায় পরের বছরের জন্য পূজার সংকল্প স্থাপন করে সংরক্ষণ করা হয়।

১. মানসিক (মানত)/শিরনি

কোদালী খানা বা চল্লিশা

আঃ মালিকাহ (৫৫) (শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি, পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ গরীব হুসেন, বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ) থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর কবর দিতে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে তাদের জন্য আলাদা করে খাবারের আয়োজন করার নিয়ম ছিল যা কোদালী নামে পরিচিত। এছাড়াও মৃত্যুবরণকারীর আত্মার মাগফেরাতের জন্য চল্লিশ দিনের দিন ইকু, খই ও বিভিন্ন ধরনের ফল দিয়ে এ শিরনী করা হয়। কেউ কেউ ভাতেরও ব্যবস্থা করে থাকেন। চল্লিশ দিনের দিন এ অনুষ্ঠান করা হয় বলে একে চল্লিশা বলে।

খতম বা ছদকা

গিয়াস উদ্দিন (৪০) (শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৭ম শ্রেণী, পেশা: কৃষি, পিতা: কালাই উল্লা, গ্রাম: মোহরের পাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ) জানান যে, যে কোনো ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বাড়িতে হাফিজ বা মৌলানা এনে বিভিন্ন ধরনের খতম ও দোয়া দুরুদ পড়ানো হতো । কোনো কোনো স্থানে মেয়েরা দল বেঁধে বিভিন্ন তসবিহ পড়ার আয়োজন করতেন। শিরনী করে খাওয়ানো ও টাকা পয়সা বিতরণ করতে দেখা যেত। অনেকে আবার গরু–বাছুর, ছাগল–ভেড়া গরীব মানুষ এতিম বা মসজিদে দান করতেন। উন্নত যোগাযোগ ও চিকিৎসার কারণে এসব প্রথা অনেকটা কমে গেছে।

২. সাধভক্ষণ

গর্ভবতী মাকে নয় মাসের সময় শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, মা-বাবা বিশেষ উপহারসহ বিশেষ খাবার (মাছ, মাংস, শাকসবজি, পিঠা, মিষ্টান্ন, সন্দেস, ফল ইত্যাদি) দিয়ে থাকেন।

প্রথমে গর্ভবতীর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি খাবার ও উপহার দিবেন, তারপর মা-বাবা দিবেন। তারপর পরিবারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনেরা দিয়ে থাকেন। সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান কেবল হিন্দু

www.pathagar.com

সম্প্রদায়েই চালু আছে। কোনো কোনো পরিবার সাধভক্ষণ কালে রূপসীব্রত করে থাকেন। কমপক্ষে পাঁচজন এওস্ত্রী (সধবা নারী) উপবাস করে পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং পূজা শেষে গর্ভবতীকে নিয়ে পূজার প্রসাদ ও বিশেষ খাবার খেয়ে থাকে। সাধভক্ষণ সম্পূণ একটি সামাজিক রীতি যা অনাদিকাল থেকে সমাজে চালু হয়ে আসছে এবং বর্তমানেও বিরাজমান রয়েছে।

আমাদের সমাজের বদ্ধমূল ধারণা জন্মে আছে যে, গর্ভের নবম মাসে সাধভক্ষণ অবশ্যই কর্তব্য। এ মনে ভেবেই হিন্দু সম্প্রদায় শাস্ত্রসম্মতভাবেই এ অনুষ্ঠান করে থাকে।

লোক বিজ্ঞানী প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ 'ফসলী জমিতে সার প্রয়োগ, গর্ভবতী মহিলাকে সাধ খাওয়ানো ইত্যাদি লোকাচার কর্মের পেছনে ক্ষেতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও নারী সন্তানধারণ একই দৃষ্টিতে আদি মানুষ করে আসছে' বলে ধারনা পোষন করেন (লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ, পৃষ্ঠা-৭৬)।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হাদা' খাওয়ার রেওয়াজ আছে। আভিজাত্য পরিবারে 'স্বাদা' খাওয়ানো বলে থাকে। এই 'হাদা' এবং 'স্বাদা' একই অনুষ্ঠান। জীবনকে স্বাদ যুক্ত করা, আগন্তুকের শুভ কামনা ও কুমারী জীবনের অবসানের শুভ বার্তায় মিষ্টিমুখ করার অনুষ্ঠানই মূলত 'হাদা' অথবা 'স্বাদা'।

সাত মাসের গর্ভবতীকে ঘরে তৈরি পিঠা, মিষ্টি, মন্ডাই ও উন্নতর খাওয়া পরিবেশন করে থাকে, বিশেষত গর্ভবতী মহিলার মা-বাবার পক্ষ থেকে বোন-ভাবী সম্পর্কীয় নিকটজনেরা এই 'হাদা' বা 'স্বাদা' বরের বাড়িতে কন্যের উদ্দ্যেশেই নিয়ে আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধিসহ আত্মীয়তার বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয় বলে সামাজিকভাবে এর গুরুত্ব রয়েছে।

সাধভক্ষণকৃত মা

www.pathagar.com

৩. অন্নপ্রাসন (মুখে ভাত)

অন্নপ্রাসন

রাজেশ সরকারের (পিতা: রাজেন্দ্র লাল সরকার, ঘাটিয়া আ/এ, হবিগঞ্জ) সাথে আলাপ আলোচনার পর তিনি জানান যে, গরীব, ধনী প্রত্যেক হিন্দু পরিবারেই ছেলে বা মেয়ের ছয় মাস হতে আট মাসের ভেতর দন্ত উঠার পূর্বে এটা পালন করা হয়। ছেলের বেলায় যুগ্ম মাস এবং মেয়ের বেলায় বেযুগ্ম মাসে এই অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। অন্নপ্রাসনের আগের দিন অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ধনী পরিবারেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে এবং ঐদিন বিভিন্ন ধরনের গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সারা রাত মহিলারা গীত পরিবেশন করে এটি বিয়ের অধিবাসের মতোই সাধারণত করা হয়। ধনী পরিবারের বাড়িতে গেট দিয়ে বিয়ে বাড়ির মতো বাড়িকে সাজানো হয়ে থাকে। অন্নপ্রাসনের দিন সকল আত্মীয়স্বজনদের এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে দুপুরে খাওয়ানো হয়। অন্নপ্রাসনের দিন সাধারণত নিরামিষ রান্না করা হয়। প্রথমে পূর্ব পুরুষের নামে অন্ন দান করে, তার পরপূজা শেষ হলে ছেলে বা মেয়ের মূখে তার দাদা বা দাদু সম্পর্কিয় লোকেরা অন্ন পূজার প্রসাদ এবং অন্ন স্পর্শ করান। অন্ন প্রাসনের পরের দিন ঐ ছেলে বা মেয়ের মামার বাড়ির লোকেরা রাগ ভাঙানোর অনুষ্ঠান করে থাকেন। ঐ দিনের সমস্ত খরচ মামার বাড়ির লোকেরা বহন করেন। ঐ দিনে মাছ মাংস বা অন্যান্য ধরনের খাবার পরিবেশন করা হয়।

অন্নপ্রাসন (মুখে ভাত)

৪. খৎনা বা মুসলমানি

খতনা

২১.০৯.১১ তারিখে আব্দুর রউফ খলিফা (৪৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি, পেশা: কবিরাজি চিকিৎসা, পিতা: মৃত: আঃ বারী খলিফা, গ্রাম: গরীব হুসেন, মহল্লা বানিয়াচং

www.pathagar.com

(হবিগঞ্জ) সাথে খতনা নিয়ে আলাপ আলোচনার পর তিনি জানান যে, মুসলমান সমাজে শিশুদের খতনা করার রেওয়াজ পূর্ব কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। স্থানীয় ভাষায় খতনাকে অনেকেই সুন্নত আবার কেউ কেউ মুসলমানী কাজ ও বলে থাকেন। জানা যায়, অতীতে খতনার আগেরদিন থেকেই বাড়িতে মাইক এনে গান বাজনা শুরু করা হতো। খতনার দিনে সকালথেকেই শুরু হতো রান্নাবান্নার আয়োজন। আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করা হতো, তারা সুন্নতকারীর জন্য নগদ টাকা, কাপড়,ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। দলবেধে ৪০-৫০ জন পর্যন্ত এক সাথে এনে সুন্নত করানো হতো। সুন্নতকারীদের সকালে গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পড়ানো ও মেহেদি পড়ানো হতো। ছেলের মা ছেলের হাতে রুপার আংটি, সরিষা, কাচা হলুদ পরিয়ে দিতেন।

একসময় আমাদের মুরুব্বিরা খলিফা বা আজম এনে খতনাকারীকে খতনার ঘন্টা দুয়েক পূর্বে তেতুলের এক গ্লাস শরবত খাওয়াতেন। বিভিন্ন ধরনের টোটকা করে খতনা করাতেন। খতনা করানোর সময় একটি নতুন পাতিল এনে চাকু বা খোর ধৌত করে ভাংতি পয়সা দাবি করতেন। সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা পারে পাতিলে পয়সা দিতেন। খলিফা পুরাতন সুতি শাড়ির টুকরা নিয়ে ব্যাণ্ডেস করে এতে পটাস দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিতেন। খতনার সাত দিনের দিন চৌদল দিয়ে খতনাকারীকে এলাকা ভ্রমণ করানো হতো। এইসময় লাঠি খেলোড়ার ও বম (ফটকা) ফুটানো হতো। বাড়িতে মাইক বাজানো হতো। ৭ দিনের দিন খলিফা পুনরায় বাড়িতে এসে খতনাকারীর ব্যাণ্ডেস খুলে দিতেন তখন তাকে নতুন কাপড় দেওয়া ও সম্মানী দেওয়া হতো। এখন আর এসব নিয়মের কেউ ধার ধারে না। এখন ছোট থাকতেই এককভাবে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই খলিফা বা ডাক্তারের মাধ্যমে খৎনার কাজ শেষ করেন।

৫. ষষ্ঠী

নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুর নাম রাখা হয়। এ উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে থাকেন। মুসলমান সম্প্রদায়েও সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে শিশুর নাম রাখে। এর নাম ছইট্টা বলে থাকে। মুসলমানরা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও সুখ, শান্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। এবং সুন্দর একটি অর্থবহ ইসলামী নাম রাখে। সাধ্যমতো অতিথি আপ্যায়ন করে থাকে আগন্তুক অতিথিবৃন্দ সন্তানের মঙ্গল কামনা করে উপহার প্রদানের রেওয়াজ রয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায় ষষ্ঠীদেবীকে সন্তান দানকারিণী ও শিশুদের পালনকর্ত্রী দেবতা মেনে নবজাতকের নাম রাখার অনুষ্ঠানকে 'ষষ্ঠি অনুষ্ঠান' বা 'ষষ্ঠী পূজা' বলে থাকে। তারা বলে থাকে 'মা ষষ্ঠির কৃপায় এবার একটি ছেলে হয়েছে'।

প্রসূতির ঘর পরিষ্কারপরিচ্ছন করার পর নবজাতকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে একটি সজ্জিত পিড়ি অথবা জল চকিতে মা কোলে বসিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে সন্ধ্যায় ষষ্ঠি দেবীর পূজা করে। পূজা বিধি পালনে সন্তান দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। এ মানসে শিশুকে তালবৃন্তে (তালের পাকায়) অল্প সময়ের জন্য রেখে শান্তির আর্শিবাদ প্রার্থনা করা হয়। পূজার আসনে ঘরের মেঝে দুই বা অধিক প্রদীপ জ্বালানো হয়। ঘি/তেলের

www.pathagar.com

এই প্রদীপগুলোর নিচে কতকগুলো নাম দেয়ার নিয়ম রয়েছে। প্রজ্বলিত এই প্রদীপ গুলির মধ্যে যে বাতিটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল সেই প্রদীপটির নিচে রক্ষিত নামেই শিশুটির নাম রাখা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনকালে সমবেত নারীরা শুভসূচক উলুধ্বনি সমস্বরে দিতে থাকে। কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রজ্বলিত প্রদীপের নিচে বড় বট পাতায় শিশুর মঙ্গল কামনায় সংস্কৃতি ভাষায় পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র লিখে দেয়া হয়। শিশুর কপালের এক পাশে কাজলের টিপ দেয়া হয়। কেউ কেউ কোমরে লোহার কবচ বেঁধে দেন। এ সবই লোকাচার। মূল লক্ষ শিশুকে ডাইনির নজর থেকে বাঁচানো।

ঐ দিনের আনুষ্ঠানিকতায় নবজাতকের মামার উপস্থিতি ও গুরুত্ব অপরিসীম। আপন মামা না থাকলে ধর্মীয় সম্পকিত মামা সম্বোধন করে নতুন রুমাল, গায়ের জামা ও কালো তাগির উপহার নেওয়া হয়। নতুন তাগিটি কিছুক্ষণের জন্য মামা তার নিজ কোমরে বেঁধে রেখে পরবর্তীতে নবজাতক ভাগনা/ভাগ্নির কোমরে নিজ হাতে বেঁধে দেয় 'মামা-ভাগনে যেখানে, আপদ নাই সেখানে' এই লোক বিশ্বাসে।

অতিথিদের খাওয়া দাওয়ার পর রাতে ঘুমানোকালে আতুরঘরের সামনে মাটির পাতিলে আগুন জ্বালিয়ে বউল (বকুল ফুল) পাতাকে পুড়ে ঐ ধোঁয়া মামা আতুরঘরে হাত বা পাকা দিয়ে ঠেলে দেয়। তারপর একটি পিঁড়িতে নতুন খাতা কলমসহ একটি ঘি প্রদীপ জ্বালিয়ে আতুর ঘরের এক কোণে রেখে দেয়া হয় যাতে সারা রাত প্রদীপটি জ্বলে আলো দেয়। নবজাতকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ও বিদ্যাজ্ঞানের জন্যই এই প্রথাটির চালু আছে। আরো প্রথা রয়েছে যে, ষষ্ঠীর দিনের মামা বস্ত্র উপহারের পূর্বের পাঁচদিন শিশুটি সেলাই করা কোনো কাপড় গায়ে ব্যবহার করবে না, এমনকি কোনোরূপ তাগা বা গুনছিও ব্যবহার করবে না। নবজাতক ছেলে হলে মামার দেয়া কালো তাগা কোমরে বাঁধবে আর মেয়ে হলে কোমরে ও দুই হাতে অলংকার বিশেষ গণ্যে বেঁধে থাকে।

মুসলমানের আতুড় ঘরে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি মাটির পাতিলে আগুন জ্বালিয়ে সর্বদা মূল দরজার পাশে রাখা হয়। জানালাগুলোতে নিমপাতা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নির্মল বাতাসের আশায় ও বিশুদ্ধ পরিবেশের জন্য উভয় সম্প্রদায়ই আগুন ও নিম পাতা ব্যবহার অনেক অঞ্চলেই আজও করে থাকেন। মামার কোমরের কালো তাগার গুরুত্ব ও নবজাতকের জন্য আবশ্যিক ব্যবহারের প্রাচীন রীতির প্রভাব আজও সমাজে রয়েছে। এসবই লোকাচার।

নব জাতকের জন্ম ও ছইঠ্যা বিষয়ক

২০/০৯/১১ সকাল দশটার সময় নব জাতকের জন্ম ও ছইঠ্যা (ষষ্ঠি) সম্পর্কে লালেমা বেগম, বয়স প্রায় ৬৫, গ্রাম: মোহরের পাড়া, বানিয়াচঙ্গ, দিলারা বেগম (বয়স: প্রায় ৭০, গ্রাম: মোহরের পাড়া, বানিয়াচঙ্গ) এবং বেলী রাণী বণিক (বয়স: ৭৫, পেশা: গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, গ্রাম: মোহরের পাড়া, বানিয়াচং, (হবিগঞ্জ) এর সাথে প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী আলাপআলোচনার পর তারা জানান যে, বাচ্চা প্রসবের দিন থেকেই প্রসূতি মাকে সন্তান প্রসবের জন্য ঘরের ভেতর মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে আলাদাভাবে রাখা হয়। বাহিরে আশা যাওয়া নিষেধ। বেশি বেশি কাজ করানো হতো। শিশুর জন্ম লাভের পর বাশেঁর বেলুকা দিয়ে শিশুর নাভী কাটার প্রচলন ছিল ও

www.pathagar.com

আযান দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। ঘরে দরজার উপরে জাল ও নিম পাতা রাখা, নিচে লোহার শিক ও ছিয়া রাখা হতো। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে এ নিয়ম প্রচলিত আছে। শিশুকে সাথে সাথে ধোয়ামোছার ব্যবস্থা করা হতো। তারপর বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র দেওয়া হতো। আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে মিষ্টি, খই, চিড়া বিতরণ করা হয়। শিশুর মুখে মধু দেওয়ার প্রচলন ছিল। আতুর ঘরে গেলে পায়ে ধোয়া লাগিয়ে ঘরে ঢুকতে হতো। সারা রাত আতুর ঘরে বাতি জ্বালানো রাখা হতো। নবজাতকের শিয়রে (কাছে) দোয়াত কলম রাখার প্রচলন ছিল। মাকে চিড়া, হলুদের ভাত ও চাল ভাজা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ৬দিনের দিন প্রসূতির ঘর মাটি দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে মৌলভী ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করে এনে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা হতো যা এখনও প্রচলিত আছে। মৌলানা সাহেব দোয়া ও মোনাজাতের পর বাচ্চার নাম রাখা হয়। ঐদিন বাচ্চাকে নতুন কাপড় পরানো হয়। ৬ দিনের দিন এই অনুষ্ঠান করা হয় বলে এটাকে আঞ্চলিক ভাষায় ছইট্যা বলা হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর অনেকটা মিল পাওয়া যায়। তারা ষষ্টি বা ছইট্যার দিন আম পাতা ফুল দুর্বা ইত্যাদি সহ প্রসূতির ঘরে ঘট পূজার আয়োজন করে থাকেন। ঘরের ভেতর কলা পাতা বিছিয়ে তাতে নতুন জামা কাপড় রাখা হয় এবং শিশুকে তা পরানো হয়। ঐ দিন নবজাতকের কোমরে মামার দেওয়া গামছা পরানো ও নাম রাখা হয়। সামর্থ অনুযায়ী পাড়াপ্রতিবেশীদের মিষ্টি, বাতাসা, পান ইত্যাদি খাওয়ানোর রীতি এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে আবার ভাতের ও আয়োজন করে থাকেন। হিন্দু রীতিতে এটাকে ছইট্যা বা ষষ্টি বলে থাকে।

৬. আকিকা

শিশু জন্মের সাত দিনের দিন পিতা তার সন্তানের আকিকা করে থাকে। আকিকা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান পিতার কর্তব্য কাজ হিসেবে আকিকা গণ্য। তাই জন্মের সপ্তম দিবসে সন্তানের ভূমিষ্টকালীন মাথার সম্পূর্ণ চুল কামাইয়া ফেলে। দ্বিতীয়ত, চুলের ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে শিশুদের জন্য দোয়া চাওয়া হয়। তৃতীয়ত, সন্তানের একটি ভাল নাম রাখা হয়, যাতে শিশুটি নামের গুণে জীবন শুভ ও মঙ্গল হয়। এই অর্থবহ নামটি একজন আলেমকে দাওয়াত করে পাড়াপ্রতিবেশিদের ডেকে দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে নাম রাখা হয়। এই দোয়ায় আত্মীয়স্বজনরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। অতপর উত্তম খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্পূর্ণ কার্যক্রম আকিকা সম্পৃক্ত হলেও মূল আকিকা হলো, সন্তান ছেলে হলে দুটি ছাগল বা খাসি জবাই করতে হবে। সন্তান মেয়ে হলে একটি করলে চলবে। ছাগল বা খাসি জবাইয়ের পরিবর্তে গরু জবাই করার বিধান আছে। আকিকার মাংস আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশি ও গরীব দুঃখীর নিকট কেউ কেউ বন্টন করে থাকে, বৃত্তবান বাবারা জবাইকৃত আকিকার মাংস রান্না করে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশি ও গরীবদুঃখীকে খাইয়ে থাকে। তাদের আকিকা অনুষ্ঠান অনেকটা জমজমাটে পরিণত হয়। সমাজের গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে যথাযত সহযোগিতা করাতেই আকিকার সফলতা রয়েছে।

www.pathagar.com

৭. চেহ্‌লাম

'চেহলাম' আঞ্চলিক অর্থে 'চল্লিশা সিন্নী'। মুসলমানরা মৃতের নামে আল্লাহর নামে দোয়াদরুদ পড়ে, দানখয়রাত করে মৃতের আত্মার, গোরের ও দোযখের আজাব থেকে মুক্তির জন্য। সন্তানাদি বা নিকট আত্মীয় চল্লিশ দিনের দিন 'চল্লিশা সিন্নী' বা 'চেহলাম' করে থাকে।

মুসলমানরা স্থির বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর কবরে ছওয়াল-জওয়াব হবে। 'মুনকার-নাকীব' নামে দুই ফেরেশতা ছওয়াল-জওয়াব করবেন। নিস্পাপ নেক-আমলদার ব্যক্তির কোনো রূপ কষ্ট বা আজাব হবে না। পাপি গোণাহগার ব্যক্তি কবরে কঠোর শাস্তিভোগসহ কবরে বিষণ চাপের সম্মুখীন হতে হয়। গোণাহগার পাপী ব্যক্তিকে দোযখের আজাব অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

এই সকল আযাব, শাস্তি বা যন্ত্রনা মার্জন বা ক্ষমা করার আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি পারেন তাঁর মানুষকে ক্ষমা করে নিস্পাপ ঘোষণা করার আর মানুষ যখন মারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আমল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তখন মৃত ব্যক্তি জীবিত বংশধর, আত্মীয়স্বজনরা মৃতের জন্য দোয়া খয়রাত করে আল্লাহ তালার খাছরহমত প্রার্থনা করে থাকেন। মহান আল্লাহ এই উছিলায় প্রার্থনা মঞ্জুর করে মৃতের আত্মার শান্তি দিতে পারেন। দিলের এই মকসুদ নিয়ে মৃতের বংশধর ও আত্মীয়রা 'চেহলাম' করে থাকেন।

মৃত্যের চল্লিশ দিনেই যে চেহলাম অনুষ্ঠিত হতে হবে, এমনটি নির্ধারণ এখন আর নেই। এখন স্বজনদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী চেহলামের তারিখ নির্ধারণ হয়ে থাকে। এ জাতির আচার অনুষ্ঠানে 'কুলখানি' নামে আরো একটি লোকাচার আছে। 'কুল-গোষ্ঠী' 'খানি'-খাওয়ানো। এই অর্থে, কুল খানি-গোষ্ঠীর খাওয়ানো। মৃতের নিকট গোষ্ঠীরাই আয়োজন করেন তাদের সকল ইষ্টি-গোষ্ঠীদেরকে খাওয়ানোর জন্য। 'কুলখানি' ও 'চেহলাম' এর মধ্যে অর্থ ও উদ্দেশ্যগত কোনো পার্থক্য নেই, মৃত্যের আত্মার তুষ্টি সাধন ও মঙ্গল প্রার্থনাই এই আচারের উদ্দেশ। তবে যৎ সামান্য আনুষ্ঠানিকতায় তফাৎ রয়েছে, আয়োজনে ছোট-বড় হিসাবে। 'কুদালী খাওয়ানী' নামে আর একটি ছোট আকারের আচার রয়েছে হবিগঞ্জ অঞ্চলে। মৃতের তিন দিনের দিন যারা কবর খনন কাজে যোগদান করেছিল তাদেরকে বাড়িতে এনে ভাল করে ভুড়িভোজন করানো হয়ে থাকে। এই ভুড়িভোজন 'কুদালী খাওয়ানী' নামে পরিচিত।

'কুলখানী'তে নির্ধারিত দাওয়াতি ও আয়োজন পরিমাণমত। আর 'চেহলাম' বেশি সংখ্যক দাওয়াতি ও সকলের জন্য উন্মুক্ত, আয়োজন পরিমাণে বেশি হয়ে থাকে। এসব আচার অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে ভোজনের দাওয়াত দেয়া হয়। বিরাট বিরাট গরু, খাসি জবাই করে রান্না করা হয়। উঠান বা মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে সারাদিন আগতদেরকে ভুড়িভোজন করানো হয়। গরীব-মিসকিন-ফকির সারিবদ্ধভাবে তৃপ্তিমত খেয়ে থাকে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়। খাওয়া পর্ব শুরুর পূর্বে কুরআন পাঠ খতম হয়, তসবিহ্, অজিফা পাঠ হয়, মিলাদ শেষে মৃতের জন্য দোয়া হয়। 'চেহলাম' অনুষ্ঠান গ্রামগঞ্জের একটি উৎসবে রূপ নেয়।

www.pathagar.com

৮. শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধার সহিত দান। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য শ্রদ্ধাবিধি অনুসারে মৃত্যের উত্তরাধিকারীগণ শ্রাদ্ধ করে থাকেন। বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা নির্দিষ্টকাল অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করে থাকেন। শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া সম্পাদনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র বর্ণের হিন্দু সমাজ যথাক্রমে ১০,১৩,১৫,৩০ দিন অশৌচ পালনের পরের দিন শ্রাদ্ধকর্ম সম্পাদন করেন।

আজকাল অবশ্য সর্ব বর্ণের দশ দিন, অশৌচ পালনের মতো বিজ্ঞ পণ্ডিতরা দিয়ে থাকেন। সে মতে শ্রাদ্ধ পালিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক বর্ণের হিন্দুরা পৌরাণিক রীতি পালনেই শ্রাদ্ধ করে থাকেন বলে জানা যায়।[১]

মৃত্য ব্যক্তির উত্তরাধিকারী শ্রাদ্ধ বিধি অনুসারে তার সামর্থ অনুযায়ী শ্রাদ্ধ কর্ম করে থাকেন, এজন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিধান দিয়ে থাকেন। প্রথম শ্রাদ্ধকে 'আদ্য শ্রাদ্ধ' বলে। আদ্যশ্রাদ্ধ সবার জন্য অবশ্যই কর্তব্য। এছাড়া বৃষোৎসর্গ, মহাঅন্নদান, পঞ্চাঙ্গদান সাগর ইত্যাদি শ্রাদ্ধে উল্লেখ আছে।

প্রথম জ্যেষ্ঠ্য পুত্র শ্রাদ্ধের মালিক। তার অভাবে ক্রমানুসারে শ্রাদ্ধের মালিক নির্ধারিত হয়। মৃত্য ব্যক্তির পুত্র সন্তানকে মৃত্যুর দিন থেকে অশৌচ ভোগ করতে হয়। এটি শোক পালনের নামান্তর। এই সময়ে সন্তান সকল প্রকার ভোগ-বিলাসিতা, আনন্দ ত্যাগ করে থাকে। তাকে অশৌচকালে হবিষ্যান্ন ভোজন করে থাকতে হয়। অর্থাৎ লবণ মরিচ বিহীন ঘৃতভাত, দুধ, ফল খাওয়া যাবে কিন্তু কোনো মাছ, মাংস বা আমিষ খাদ্য ভোজন করা যাবে না। সাদা বস্ত্র পরিধান এবং ভূমিতে শয়ন করতে হবে। এতে লেপ-তোষক, চৌকি-খাট ইত্যাদি আরামদায়ক বিছানা, বেশ-ভূষা, সুগন্ধি ব্যবহার অর্থাৎ সর্ব প্রকার সম্ভোগ পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে অশৌচান্তে মাথা মুণ্ডন করার পর স্নান সম্পন্ন করে বেদমন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যাদি দান এবং পিন্ডদান করতে হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশি সর্বোপরি যারা মৃত্য ব্যক্তির সৎকারে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল তাদেরকে নিমন্ত্রণ করে অন্ন ভোজন করাতে হয়। এছাড়া শ্রাদ্ধের মূলে রয়েছে, শ্রদ্ধার সহিত দান করা। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিন্ড দানের জন্য আতপ চালের গুড়ি, ঘি, মধু, চিনি ও পাঁচ প্রকারের ফল, ডাল, চাল, হাড়ি, পাতিলসহ সকল প্রকার রন্ধন সামগ্রী। ঘুমানোর জন্য লেপ, তোষক, বালিশ, মশারি, পাটি, ছাতি, জুতা, শাড়ি কাপড় ইত্যাদি অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনকালে যেসব সামগ্রী প্রয়োজন তা সবই দান করতে হয়। গরু দান, ভূমি দান, স্বর্ণ-রৌপ্য দান, অর্থ দানেরও প্রচলন রয়েছে। কিন্তু এসব দান সকল মৃতের সন্তানের জন্য প্রযোজ্য নয়। সামর্থ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

শ্রাদ্ধ মূলত মৃতের আত্মার শান্তি কামনার অনুষ্ঠান। সন্তানের শাস্ত্র বিধি পালনে পিতা মাতার আত্মার সদগতি প্রার্থনা করা। সেই সাথে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশির সঙ্গে ভাব প্রীতি বিনিময়ে শ্রাদ্ধের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

টিকা

১। শংকর অধিকারী, পৈল হবিগঞ্জ। ১৮/০৯/১৩ তারিখের আলোচনা।

www.pathagar.com

৯. পূর্জা-পার্বণ, ব্রত

ব্রত

বানিয়াচঙের আদি রাজা কেশব মিশ্র ছিলেন কান্যাকুজাগত। ধর্মের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল বলে তিনি বাণিজ্য ব্যাপ দেশে আগমণ কালে নৌকায় করে একটি কালী মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। পূজার প্রয়োজনে তিনি স্থল ভূমির অভাববোধ করলে দৈব ক্রমে সন্ধার পূর্বে হঠাৎ তিনি একখণ্ড ভূমি দেখতে পেয়ে সেখানে দেবী মূর্তি স্থাপন করে পূজা সমাপন করেন। পূজার পর ঐ স্থান হতে তিনি কালী মূর্তিটি উত্তোলন করতে ব্যর্থ হন। এইকে দৈব কারণ বিবেচনা করে তিনি এই এলাকায়ই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন (হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩০১)। তার পরবর্তী বংশধরেরা বানিয়াচঙে বিভিন্ন বংশীয় ব্রাহ্মণ স্থাপন করে যান। বানিয়াচং অধিপতি কতৃক নিমন্ত্রিত হয়ে এক বা বহু পণ্ডিতে সমাগম হয়েছিল। রাজা তখন তাদেরজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে বহুতর ব্রহ্মত্র প্রদান করেন এবং মন্ত্র গ্রহণ করেন। রাজা তার গুরুর সম্মানার্থে এই নিয়ম প্রচার করলেন যে, উৎসব উপলক্ষে যথায় দধি চিড়া ভোজনের আয়োজন হবে। এবং এই বংশীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য সেই স্থানে অন্য ব্যাঞ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাকা মিষ্ঠান্নের আয়োজন করলে পৃথক পাকে দিতে হবে। তার এই মতবাদ দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের আখড়া বিথলঙ্গ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি বিভিন্ন পূজা পার্বণে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

বানিয়াচঙের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে বা বাড়িতে যে ব্রতগুলো পালন করা হয়ে থাকে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

সূর্যের ব্রত, শিব চতুর্দশী, সাবিত্রী ব্রত, পূর্ণিমা, বিপদ নাশিনী, মঙ্গল চণ্ডী, বিপদ তারিনী, লোকনাথ, জন্মাষ্টমি, সন্তোষী ইত্যাদি। এসব ব্রত সম্পর্কে ০৪/১১/১১ তারিখে তথ্য প্রদান করেন বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামাপদ বিশ্বাস, বানিয়াচঙ্গ স্বাস্থ কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী গোবিন্দ্র লাল (৪৮) পিতাঃ মোহন লাল দাস, মশাকলি বানিয়াচঙ্গ হবিগঞ্জ। ও অফিস সহকারী ঝিনুক ভট্টাচার্য (৩৪) স্বামীঃ দিপক ভট্টাচার্য, নয়ন দেব (২২) পিতাঃ ননীপদ দেব, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি, মোহরের পাড়া, বানিয়াচং। তাদের সাথে ব্রত নিয়ে আলাপ করলে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

সূর্যের ব্রত

মাঘ মাসের যে কোনো রবিবারে এই পূজা করা যায়। ভোরে উঠে স্নান করে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হাতে প্রদীপ রেখে সূর্য উঠার পর, আগে বেদিতে প্রদীপ রেখে পূজা শুরু করা হতো। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূজাকারী উপবাস থেকে এবং কোথাও না বসে বা ঘরের চালের নিচে না গিয়ে, ভক্তিমূলক গীত পরিবেশন করে পুরোহিত এনে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে পূজা শেষ করতেন। এই ব্রত পালনকারী মহিলারা সকাল থেকেই বাড়িকে আলাদাভাবে লেপামোছা করে থাকেন। বাড়ির মধ্যে একটা আনন্দভাব বিরাজ করতে দেখা যায়। আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রন করে নিয়ে আসা হয়।

www.pathagar.com

শিব চতুর্দশী ব্রত

প্রাপ্ত বয়স্ক প্রায় ৯৫% পুরুষ মহিলাই এই ব্রত পালন করে থাকেন। কালী বাড়ি, শিব বাড়ি, বুড়া শিব বাড়ি ও বিভিন্ন পুরোহিতের বাড়িতে শিবের নামে ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরে শিবকে দুধ বা ডাবের জল দিয়ে স্নান করানো হয়ে থাকে। সারাদিন উপোস থাকার পর রাতে পূজা শেষ করে প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করা হয়।

সাবিত্রী ব্রত

শতকরা ৯৫ জন সধবা মহিলাই এই ব্রত পালন করে থাকেন। পারিবারিক শান্তি ও পতির মঙ্গল কামনা, আয়ু বৃদ্ধির জন্য এই পূজা করা হয়ে থাকে। একাধারে তিনদিন এই পূজা করা হয়। ব্রতকারিণী স্বামীর পূর্বে যাতে তার মৃত্যু হয় এই কামনায় সাবিত্রী ব্রত করে থাকে। পূজা পালনকারী খাওয়া খাদ্যের অনেক নিয়ম মেনে চলেন।

বিপদ নাশিনী

বিপদআপদে পরলে মহিলাদের ধারনা বিপদ নাশিনীর ব্রত করলে যে কোনো বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধারণত বৃহস্পতিবারে এই ব্রত করা হয়ে থাকে। উপবাস থেকে ঘরে ঘট আথবা মূর্তি বানিয়ে বিপদ নাশিনীর পূজা করা হয়। অনেকে আবার বিপদ নাশিনীর পূজা প্রতি বছরে একবার বিরাট আকারে করে থাকেন। এবং অনেকে ঘরের মধ্যে ঐ মূর্তি স্থাপন করে প্রতিদিন তার উদ্দেশে পূজা দিয়ে থাকেন।

বিপদ তারিনী

বিপদ নাশিনীর পূজার মতো বিপদ তারিনীর পূজাও অনেকে করে থাকেন। সাধারণত গ্রামের বেশিরভাগ মহিলারাই এই পূজা করে থাকেন।

রূপসী ব্রত

বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর ২১/৩১ দিনের দিন ঐ ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। প্রসূতি আতুর ঘর পরিত্যাগ করে। আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে ও শীল এনে শিশুর চুল নখ এবং প্রসূতীর নখ কাটানো হয়। ব্রাহ্মনের দ্বারা এই ব্রত করা হয়। প্রসূতী ব্রতের দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উপবাস থেকে পূজা শেষে রূপসী গাছ তলায় ঢালী দিয়ে বাড়িতে এসে ফলমূল ভক্ষণ করার নিয়ম প্রচলিত আছে।

সন্তোষী মা ব্রত

বিশেষ করে ছেলে মেয়েরাই এই ব্রত বেশি করে থাকে। সাধারণত প্রতি শুক্রবার এই ব্রত করা হয়। উপবাস থেকে সন্তোষী মায়ের পাঁচালি পড়ে এই পূজা করা হয়। এই দিন ব্রতকারীরা কোনো ধরনের টকজাতীয় ফল খাবে না, খেলে ঐ ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে। পাড়াপ্রতিবেশী অনেককেই নিমন্ত্রণ করে এই ব্রতের প্রসাদ দেওয়া হয়।

১০. বৃষ্টির জন্য মোনাজাত ও ব্যাঙের বিয়ে

০২.০৯.১১ বৃহস্পতিবার সকালে সালেহা বেগমের [(৮৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা: গৃহিণী, মোহরের পাড়া, বানিয়াচং হবিগঞ্জ] সাথে উক্ত বিষয় নিয়ে

www.pathagar.com

আলাপকালে আলোচনার সময় তার বড় ছেলে ছুফি মিঞা বয়স [(৬২) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি, পেশাঃ কৃষি, তিনিও ঘরে ছিলেন। তারা জানান যে, খড়াপীড়িত এলাকায়, বিশেষ করে, চৈত্র মাসে যখন বৃষ্টির অভাবে বোর ফসল নষ্ট হয়ে যেত তখন মুসলমান সম্প্রদায় এড়ালিয়া মাঠে তসবিহ্, দোয়া, মোনাজাত ও ইসতিকফার নামাজ পড়ার জন্য জমায়েত হতেন। বানিয়াচঙের এড়ালিয়া মাঠ ছাড়াও বিভিন্ন পাড়া, মহল্লায় এবং দূরবর্তী গ্রামেও এসব করা হতো। হিন্দু সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধরনের পূজা, ব্রত, যজ্ঞ, উলুধ্বনির আয়োজন করত।

বৃষ্টির জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিলে ব্যাঙের ঝিয়ের বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। ছেলেমেয়েরা কলাপাতা ও কলাগাছ দিয়ে অনেকে আবার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চারকোনার ঘর তৈরি করে ঐ ঘরে একটি গর্ত করে, গর্তে ব্যাঙ বেঁধে আসর বসাত। তারা একটি মেয়েকে বউয়ের মতো করে সাজিয়ে কুলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপকরন যেমন হলুদ, মরিচ, চাল, ফুল, আদা, লবণ, ইত্যাদি নিয়ে দল বেঁধে গীত গেয়ে মাগন মাগতে বের হতো। যে বাড়িতে তারা যেত ঐ বাড়ির মানুষ কুলা বা শরীরে পানি ঢেলে দিত এবং চাল, টাকা পয়সাসহ বিভিন্ন উপকরণ দিত। মাঘন মাঘা চাল-ডাল ও মসলাজাতীয় জিনিস এনে ছেলেমেয়েরা খিচুড়ি পাকিয়ে নিজেরা খেত এবং অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিত। ছেলেমেয়েদের এরকম অনুষ্ঠান এখন আর দেখা যায় না, ব্যাঙের ঝির বিয়ে অনুষ্ঠানে তারা যে গানটি গাইত তা নিম্নরূপ ঃ-

ব্যাঙ্গাঁই ঝির বিয়া ষোল মঠুক দিয়া
ব্যাঙ মেঘ আন গিয়া ॥
অতি আদরের ব্যাঙ বিয়ার সময় মেলে ঠ্যাং,
খালে নাই পানি বিলে নাই পানি,
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ।
আদা খান দেও গো আদরী হইতাম,
হলুদ হান দেওগো রঙ্গিন ছঙ্গিন হইতাম ,
মরিচ হান দেওগো জইল্যা পুইরা মরতাম ॥
ব্যাঙ বড় রশিয়া ব্যাঙ বড় খাসিয়া রে ॥
বিয়ার হালা মেলে ঠ্যাং শাদির হালা মেলে ঠ্যাং,
ব্যাঙ বড় রশিয়া রে।
হাল জুয়াল বাইন্দা গিরছ মরে কাইন্দা
ব্যাঙ ভাই মেঘ আন গিয়া ঐ।
এই দেশেতে মেঘ নাই লাঙ্গল ধইবার পানি নাই
এইদেশেতে মেঘ নাই জোয়াল ধইবার আশা নাই
ও মেঘের দাদা ভাই এক ছিনাই পানি দেও,
মেঘে ভিইজ্যা যাই।
ব্যাঙ বড় রশিয়া ব্যাঙ বড় খাসিয়া রে ...ঐ॥

www.pathagar.com

উপনয়ন লগ্নন বা পৈতা

০৪.০৯.১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টার সময় শিল্পী তাপস কৃষ্ণ মহারত্নের (৬৫), শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ., পেশা : শিল্পী, বাড়িতে উক্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করলে উল্লিখিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়। সাত বৎসরের সময় থেকে পনেরো বৎসরের মধ্যেই সাধারণত হিন্দু ব্রাহ্মণদেরকে পৈতা দেওয়া হয়। পৈতা অনুষ্ঠান লগ্ন দেখে তারিখ ঠিক করা হয়। অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন শেষ রাতে পুকুর থেকে স্নান করার জন্য জল এনে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। যাকে পৈতা দেয়া হবে তার মাথার চুল কেটে ফেলা হবে। এরপর স্নান করতে হবে। পুরোহিত এসে পৈতাকারীর তিন পুরুষের উদ্দেশে জল দান করবেন। তারপর পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়ে নির্ধারিত ঘরে নিয়ে পৈতাকারীকে আরও তিন দিন মন্ত্র দীক্ষা দিবেন। পৈতা গ্রহণকারী (দণ্ডি) এক বেলা ভাত দেওয়া হবে। তিনি বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। তিনদিন পর সন্ন্যাসী বেশে ঘর থেকে বের হবে তখন তার থলিতে আত্মীয়রা ভিক্ষা প্রদান করবে এরপর দেবালয়ে যাবে। এক-দুই দিন আত্মীয়স্বজনের দেওয়া খাবার খাবে। এরপর ব্রাহ্মণ সমাজসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। যে যা পারে পৈতাকারীকে আশির্বাদ করে। এক বৎসর তাকে বিশেষ নিয়মে চলতে হয়।

ভোলাভূলির অনুষ্ঠান

বাসুদেব বৈষ্ণব [(৫০) গ্রামঃ যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ] হবিগঞ্জ একজন শিল্পী ও শ্যাম বাউল আখড়ার মহন্ত। তিনি জানান যে, কার্তিক মাসের শেষ দিনে ভোলাভুলির অনুষ্ঠান করা হয়। খড় ও বাঁশ দিয়ে ভোলার প্রতিকৃতি তৈরি করা হতো। সন্ধ্যায়, বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরিকৃত প্রতিকৃতিতে মালা পড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং কীর্তন পরিবেশনের মাধ্যমে ঐ প্রতিকৃতি পুড়ানো হয়। মানুষের ধারনা ছিল যে, ঘরের যাবতীয় খারাপ বা মন্দ জিনিস পুড়াইয়া দেওয়া হয়ছে। সন্ধ্যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলাগাছের ডাটা দিয়ে খেয়ালিদেরকে (নান, নানি, দাদা, দাদি, ভাবি, ইত্যাদির) ভোলা ছাড় ভুলি ছাড় বলে শরীরে মৃদু (বারি) দিত। অনেক শিশুরা পাট শোলার কাটিতে বা কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে এ বাড়ি সে বাড়ি দৌড়ে বিভিন্ন ধরনের ছড়া বলত। ছড়ার মধ্যে ছিল–ভালা আয়, বুরা যায়, মশা মাছি পোড়া যায়।

মুসলমান সমাজের ছেলে মেয়েরাও অনুরূপভাবে খেয়ালিদের সাথে আমোদফূর্তি করে এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে ভোলা ছাড় ভুলি ছাড় ছড়া বলে মানুষকে কলার ডাটা দিয়ে সারা শরীরে বারি দিত। গরু বাছুরগুলোর ও অনুরুপভাবে ভোলা ছাড়ানো হতো। গরুর কপালে মেহেদি দেওয়া হতো। ঐ দিন এড়ালিয়া মাঠে, আমবাগান মাঠে, বন বথুরা মাঠে ষাড়ের লড়াই হতো। অনেকেই পিঠা তৈরি করত। যার ষাড় জয়লাভ করত সে এলাকার মানুষকে উৎসব করে খাওয়াত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা কার্তিক মাসকে নিয়মের মাস হিসেবে পালন করত। এই সময় প্রতিদিন স্নান করে মঙ্গল আরতি কীর্তন করা এবং দেবতাকে ভোগ দেওয়া হতো। শেষ দিনে ভোলা সংক্রান্তিতে ভোলা পোড়া হতো। ভোলা পোড়া আগুনে

www.pathagar.com

জলপাই বা কাঁচা তেঁতুল পোড়ে খাওয়া হতো। ভোলা পোড়ার পর ঘরের দরজায় লাঠি ঠোকা দিয়ে সমবেতভাবে ছড়া বলা হতো।

মশা মাছি বাইরও
টাকা পয়সা ঘর ল
সংসারের জঞ্জাল দূর-হো
মানুষকে ভোল ছাড়ানোর সময় বলা হতো।
ভোলা ছাড় ভুলি ছাড়
বার মাইয়া পিছা ছাড়।
ভাত খাইয়া লড়চড়
পানি খাইয়া পেঠ ভর ।
খাইয়া না খাইয়া ফুল
হাজার টাকার মূল।

ঐদিন (কার্তিক মাসের শেষ দিন) হিন্দু সম্প্রদায়ে বাড়ি বাড়ি কার্তিক পূজা পালন করা হয়ে থাকে। অনেক বাড়িতে বাড়ি ঘর সাজানো ও ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

দাঁত গুয়া

দাঁত গুয়া (সুপারি) ও পারা পিঠা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন ছালেহা আক্তার (৭৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, পেশা: গৃহিনী, স্বামী: মৃত সুনা মিয়া, সাং হলিমপুর বানিয়াচং হবিগঞ্জ।

দাঁত গুয়া অনুষ্ঠানটি সাধারণত নয় মাসের সময় শিশুদের দাঁত উঠারকালে করা হতো। এই সময় বাড়ির মহিলারা ধামাইল ও গীতের আয়োজন করতেন। নানা নানির নিয়ে আসা পান ও গুয়া (সুপারি) সমবেত মহিলাদের মধ্যে বন্টন করে আমোদ ফূর্তি করা হতো। এসব অনুষ্ঠান এখন আর করতে দেখা যায় না।

পারা পিঠা

শিশু হাঁটার সময়, (পারা দেওয়ার) বা মাটিতে পা রাখার সময় পিঠা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এই সময় আত্মীয়স্বজনকে ও দাওয়াত দেয়া হতো। শিশুর নানা নানিরা পিঠাও নতুন কাপড় নিয়ে আসতেন। রাত দিন দামাইল ও গীতের আসর অনুষ্ঠিত হতো।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

বানিয়াচং উপজেলায় ধান গমের পাশাপাশি যে রবি শস্য চাষ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, আলু, মরিচ, হলুদ, আধা, ধনিয়া, ডাল। এছাড়াও বিভিন্ন জাতের সবজি চাষ করা হয়। উল্লিখিত খাদ্যগুলো ভাতের পাশাপাশি করে মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যা নিজেরাই বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ ও উৎপন্ন করে থাকে। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ১৬/০৫/১২ তারিখে মোহাম্মদ আলী মোমিন (৫৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ. গ্রাম: যাত্রাপাশা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ তিনি বর্তমানে ৪ নং দক্ষিণ পশ্চিম ইউ.পি পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক। তিনি জানান, এই খাদ্যগুলো বানিয়াচঙে একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে।

শালুক

বষাকালে পানিতে লতা জাতীয় এক প্রকার গাছে শালুক জন্মে। এটি কাল রঙের গুটা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ যা সেদ্ধ করে খেতে হয়। কয়েক ধরনের শালুক বাজারে দেখা যায়। হুন্দাই জাতীয় শালুক-র চাহিদা প্রচুর। বর্তমান বাজারে এটি ৭০-৮০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি করা হয়। বানিয়াচঙের পশ্চিম হাওরে, মকা, কাগাপাশা, ঝিলুয়া হাওরে প্রচুর শালুক পাওয়া যায়। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক-এই তিন মাস কয়েক হাজার শ্রমিক এটি উত্তোলন করে বিক্রি করে থাকে। ষাটের দশকের পর থেকে এর চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। বর্তমানে দেশে বিদেশে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

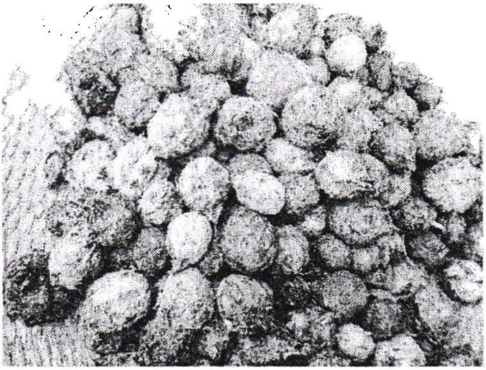

শালুক

কুই

ভাতের বিকল্প হিসেবে কুই, শালুক, সিংরা প্রভৃতি জলজ ফলমুল হাওরে প্রচুর পরিমানে জন্ম নিত যা খেয়ে অনেকেই ভাতের অভাব মিটাতে পারত। কুই থেকে প্রাপ্ত আটা সদৃশ রুটি বানিয়ে খাওয়া হতো। কুই শালুকের মতই পানির নিচে লতা জাতীয় গাছে জন্মে।

www.pathagar.com

ছিকর

বানিয়াচঙের বেশ কিছু পরিবার দিনারপুরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এঠেল জাতীয় মাটি এনে এক প্রকার আহার্য্য সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি লব্দ অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। মাটিকে ভিজিয়ে নরম করে রুটির মতো করে ছোট ছোট টুকরো করে বিশেষ পক্রিয়ায় শুধু মাত্র আগুনের দোয়া দিয়ে পুড়ানো হতো। যা এ অঞ্চলের গ্রামগুলোতে ছিকর নামে পরিচিত। গর্ভবতী মহিলাদের কাছে এটি একটি পছন্দনীয় সুস্বাদু খাদ্য ছিল। তাদের ধারনা ছিল এটি খেলে বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে বেঁচে থাকা যাবে। বিভিন্ন জিনিস পত্রের সাথে এটি ফেরি করে নগদ টাকা পয়সা ও চাউল দিয়ে বিক্রি করা হতো। অনেক মৌলভী ও হুজুর মাটি খাওয়াকে হাড়াম বলে প্রচার করতেন। চতুরঙ্গ রায়র পাড়া গ্রামের স্বর্গীয় গোপাল পালের স্ত্রী শান্তি রানী পাল (৫৫) এখনও এ পেশার সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি জানান, তাহার ছেলেমেয়েদের ছোট রেখে তাদের বাবার মৃত্যুর পর, মেয়ে শিল্পি রানী পাল ও ছেলে গুপন পাল, স্বপন পাল ছোঠ বেলায় থেকেই বড় বাজারে নিয়ে বিক্রি করার পাশাপাশি তারা লেখাপড়াও চালিয়েছে। এখন এর চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে ছিকরের পাশাপাশি খই, মুড়ি, নারু, তৈরি করে বিক্রি করে আসছেন।

কঁচু ও মুখি

বানিয়াচঙে কচু চাষের প্রচলন দীর্ঘ দিনের। বাড়ির সামনে খালে, বিলে, ঝিলে ও নিচু জমিতে কচু রোপন করা হতো। সাধারণত কঁচু কার্তিক মাসে রোপন করা ও বৈশাখ মাসে তোলা হয়। কচু প্রায় ৮-৯ প্রকারের্ মুড়া জাতীয় কচু যাকে বানিয়াচঙের আঞ্চলিক ভাষায় জাইত কচু বলা হয় এ মুড়া প্রায় এক থেকে দেড় হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। মুড়া জাতীয় কচু থেকে লতা পাওয়া যায়। লতা সাধারণত মাটির উপর দিকে ২-৩ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এটি খুবই সুস্বাদু খাদ্য। ২০ বছর পূর্বেও কচুর চাষ করে নৌকা ভর্তি করে পার্শ্ববর্তী থানা দিরাই, সাল্লা, হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ এলাকায় বিক্রি করা হতো। ভাটি অঞ্চলে কচু চাহিদা থাকায় নৌকা বোঝাই করে বর্ষাকালে ধান চালের মাধ্যমে বিক্রি করা হতো। বর্তমানে খাল বিল ভর্তি হওয়ার কারণে ও মানুষ বিভিন্ন পেশায় আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ করে রবি শস্যের প্রতি মানুষের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন অনেকেই কচু চাষ করে না।

চানাচুর, নাড়ু, মুড়ি

বানিয়াচং উপজেলার প্রায় কয়েকশ পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত। ইদানিং চানাচুর, নাড়ু, মুড়ি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে মহিলারা বিক্রি করে থাকেন। আমিরখানী গ্রামের আব্দুল্লা মিয়া (৫৫), মিনহাট গ্রামের শংকর (৬০) এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, ত্রিশ বৎসর ধরে তারা এই পেশার সঙ্গে জড়িত। তারা বিশেষ পক্রিয়ায় ধানকে দুবার সিদ্ধ করে মুড়ির চাল তৈরি করতে হয়। মুড়ির জন্য ধান, নাড়ু র জন্য মরিচা গুড় বৎসরের প্রথম থেকেই তারা কিনে রেখে দেন।

www.pathagar.com

শুটকি মাছ

বানিয়াচঙের বাধাউড়ি, মিনহাট ও খাগস্রী গ্রামে কয়েকশত বছর ধরে শুটকি মাছ তৈরি করা হয়। এই পেশার সঙ্গে প্রায় ১০০টি পরিবার জরিত। শুটকি তৈরি করার জন্য এই অঞ্চলের শুকনা পুটি মাছ ও বাঁশপাতি মাছ আমদানি করে মঠকাতে ভাঁজ করে ভরে মাছের তেল দিয়ে বিশেষ পক্রিয়ায় এটি তৈরি করা হয়। যুগ যুগ ধরে এটির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে এটি বাজারে বিক্রি করলেও ইদানিং বেশকিছু মহিলারা বাড়ি বাড়ি গুড়ে ধান, চাল ও নগদ টাকা দিয়ে বিক্রি করে থাকেন। খাগড়ী গ্রামের তালেব আলী (৭৫), আখল আলী (৬০) ভাদাউড়ি গ্রামের শমসের মেম্বার (৫৫) সিরাজ মিয়া (৬০) দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সাথে জড়িত থেকে প্রচুর শুটকি উৎপাদন করে আসছেন।

ছিকর

ছিকর হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে নিম্নবৃত্ত সমাজে প্রচলিত এক বিশেষ আহার্য। ক্ষিধা নিবারণের জন্য নয়, বরং এক ধরনের অভ্যাসের বশে লোকজন তা খেয়ে থাকে। ছিকর হচ্ছে একধরনের পোড়া মাটি। পাহাড়ি টিলায় গর্ত খুড়ে লম্বা বাঁশের সাহায্যে গভীর থেকে তুলা হয় একধরনের মিহি মাটি। তারপর তা মাটিয়ে খাই বানিয়ে ছাঁচে পেলে প্রথমে তৈরি করা হয় মন্ড। তারপর তা পছন্দ মতো কেটে টুকরো করা হয়। পরে বিশেষ এক পদ্ধতিতে সেই টুকরো পুড়ানো হয় আগুনে। এভাবে তৈরি হয় ছিকর। ছিকর বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। কোনটি দেখতে বিস্কুটের মতো কোনো কোনো ছিকর আছে ললিপপের মতো লম্বা আবার কোনো ছিকর ছোট লজেন্সের মতো।

বিভিন্ন এলাকার ছিকর বিভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। কোনো এলাকার ছিকরে খাই মাখানোর সময় গোলাপজল, আদার রস ইত্যাদি মেশানো হয় যা মাটির সাথে পুড়ানোর পর ভিন্ন এক স্বাদের জন্য দেয়। স্থানীয় কুমার সম্প্রদায় বা মৃৎ শিল্পীদের কেউ কেউ ছিকর তৈরি করে বাজারজাত করে থাকে। দিনে দিনে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় ছিকর এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।

নবীগঞ্জ উপজেলার দিনারপুরে পাহাড়ি টিলা থেকে একসময় বিভন্ন এলাকা কুমারা এসে মিহি মাটি সংগ্রহ করত। কিন্তু আজ কাল কেউ আর মাটি সংগ্রহ করতে যায় না বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। উক্ত টিলা ছাড়াও বানিয়াচং, বাহুবল ও মাধবপুরের বিভিন্ন জায়গায় ছিকরের উপযোগী মাটি আহরণের ক্ষেত্র আছে। হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রাম্য বাজারে ঘুরে ছিকরের সন্ধান মিলেনি। এ ব্যাপারে নবীগঞ্জ উপজেলার সৈয়দপুর বাজার ও মাধবপুর উপজেলার নারায়ণপুর ও ঘোমটিয়া গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে কথা বলে সবার কাছ থেকে প্রায় একই রকম বক্তব্য পাওয়া গেছে। দুস্প্রাপ হওয়ায় ছিকর খাওয়া এখন ভুলে গেছেন তারা। তবে সদর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লস্করপুর ইউনিয়নের কটিয়াদি বাজারে মোঃ হুসাইন উল্লা নামক এক ছিকর বিক্রেতার খুঁজ মিললে তার সাথে কথা বলে জানা যায় ছোটবেলা থেকে তিনি ছিকর বিক্রি করে আসছেন । আগে মানুষ ছিকর কিনত এখন খুব কম লোকই কিনে। মূলত আধুনিক শিক্ষিত মানুষরা ছিকর খাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর ও রুচি বিরুদ্ধ বিবেচনা করার কারণে ছিকর এখন বিলুপ্তির পথে।

www.pathagar.com

বুকনাই

বুকনাই হবিগঞ্জ অঞ্চলের এক ব্যতিক্রমী আহার্য। কারণ তা ব্রাহ্মবাড়িয়া, কুমিল্লা, নরসিংদীসহ অন্যান্য অঞ্চলে পরিচিত নয়। বুকনাই একধরনের জাউ বিশেষ যা তৈরি হয় ধানের বিজাঙ্কুর থেকে। তৈরির প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও প্ররিশ্রম সাধ্য। প্রথমে ধানের বীজ বিজিয়ে রেখে তা অঙ্কুরদগম করা হয়। অঙ্কুর উন্মেষ ঘটলে সেই ধান করা রৌদে উত্তম রূপে শুকিয়ে তা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে গুড়ো করা হয়। পরে তা থেকে খোশার গুড়ো বা তুষ কুলা দিয়ে ঝেড়ে পৃথক করা হয়। অবশিষ্ট থাকে তখন শুধু চাল ও অঙ্কুরের গুড়ো। এবার সেই গুড়ো নিয়ে বসানো হয় চুলায় হালকা আগুন দেওয়া শুরু হয় জাল। একটানা চলতে থাকে সাত থেকে আট ঘণ্টা এক পর্যায়ে তা হয়ে উঠে খাবারের উপযোগী ও মানসম্মত। বুকনাই তৈরিতে চিনি, গুড় বা মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছুই মেশানো হয় না। শুধুই চাল ও অঙ্কুরের গুড়ো। কিন্তু খেতে তা কড়া মিষ্টি লাগে।

গ্রামের সব মহিলারা বুকনাই তৈরি করতে পারেন না। যারা পারেন বুকনাই পিয়াসুদের কাছে তাদের বেজায় কদর। বুকনাই তৈরিতে পারদর্শি সদর উপজেলার চরহামুয়া গ্রামের এমন এক গৃহিণীর যার সাথে কথা বলে জানা যায় বুকনাই তৈরির পর তা সময়ে সময়ে যত বেশি জাল দেওয়া হবে মিষ্টি ততই বাড়বে। বুকনাই হবিগঞ্জ অঞ্চলের ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ এক লোক খাদ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. যাত্রা

এক সময় যাত্রা গান গ্রাম বাংলার একমাত্র বিনোদন মাধ্যম ছিল। গভীর রাতে শুরু হয়ে ভোর রাত অবধি গ্রামের মানুষ উপভোগ করত যাত্রা গান। যাত্রা হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে ধীরে ধীরে তা লোকজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ রূপকার পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে 'যাত্রার পূর্বকথা' নামের একটি গ্রন্থে লিখেছেন 'ঠিক কোন সময়ে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, এই আত্মভোলাজাত সেই ইতিহাস রাখেনি। তবে, সে যে শ্রী গৌরাঙ্গের জন্মের বহুপূর্বেই, তাতে সন্দেহ নাই। দেব দেবী প্রতিমা নিয়ে রাজপথে যে শোভাযাত্রা বেরুত, তার মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠের গান ও বিভিন্ন ব্যক্তির নাচের অনুষ্ঠান হতো। এই শোভাযাত্রাই একসময় পথথেকে উঠে এল মাঠে, বাগানে বা ধর্মীয় প্রাঙ্গণে। শোভাযাত্রাই একসময় 'যাত্রা'য় নামান্তরিত হয়'[১]।

যাত্রার আভিধানিক অর্থ গমন করা। এই গমনকেই আদিকালে যাত্রা বলত। শুভযাত্রা, শোভাযাত্রা'র সঙ্গে নৃত্যগীত সংযোগ হয়ে 'শুভ' শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। ধর্মীয় নামকরণে এসেছে কৃষ্ণ যাত্রা, ভাষাণ যাত্রা, ঢপযাত্রা, রথযাত্রা, দোলনযাত্রা, সংযাত্রা ইত্যাদি।

যাত্রাকে পালাও বলা হয়। উভয়কে মিলিয়ে 'যাত্রাপালা' বলা হয়ে থাকে। সুকুমার সেন পালা গানকে 'যাত্রাগানের আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন'[২]। আমরা গ্রামগঞ্জে এই দুটি শব্দকে একই বিষয়ে ব্যবহৃত হতে দেখি, মেলা-হাটে যখন যাত্রা আসে তখন বলতে শুনি 'যাত্রা গান' এসেছে। আজকের 'যাত্রা পালা' রূপবান। এখানে দলের নাম 'যাত্রাদল', পরিবেশনের নাম 'যাত্রাগান' ও পরিবেশনকৃত পালার নাম 'যাত্রাপালা'। লেখকের নাম পালাকার, ম্যানেজারের নাম অধিকারী।

প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা বাংলাদেশে চালু ছিল। তখন যাত্রার মধ্যে সংগীতের একাধিপত্য, গীতাভিনয়ের মধ্যে সংগীত ও সংলাপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা থাকলেও সংলাপ অপেক্ষা সংগীতই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে[৩]। এপর্যায়ে যাত্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এ নাচ-গান প্রবর্তিত হয়। 'নাচতে গিয়ে ঘোমটা কেন'? এ ফলশ্রুতিতে বিনোদনের উছিলাধরে অশ্লীল নৃত্যগী প্রবেশ করে রুচির দিক দিয়ে বিকৃত করে তোলে। শিক্ষিত মন তখন হতেই যাত্রার প্রতি বিরুপ হয়ে উঠে। তখন আমাদের দেশে একটা প্রবাদ জন্ম নেয় 'যাত্রা শুনে ফাতরা লোকে, কবি শুনে ভদ্র লোকে'।

এই প্রবাদে টনক নড়ল সুধী সমাজে। তারা লক্ষ্য করলেন লোকজ সংস্কৃতির যাত্রা আসরেই দর্শকের উপস্থিতি থাকে সর্বাধিক এবং প্রচন্ড শীতের মধ্যে সারা রাত জেগে সবাই উপভোগ করে। এমনি একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দেয়া যায়

www.pathagar.com

না। প্রাচীন এই শিল্প মাধ্যমের শিল্পগুণ, আখ্যান সংলাপ নির্ভর চরিত্র তৈরি, মধ্যবর্তী বিরতি, বিরতি কালে নাচ, গান, কৌতুকে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় ক্রমশ উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করা হলো। এ লক্ষ্যে যাত্রায় যুক্ত হলো আলোকিত মানুষের জীবনী ভিত্তিক কিছু পালা, শ্রী চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের আখ্যান অবলম্বনে রচিত হলো 'নিমাই সন্ন্যাস', 'সীতার বনবাস', 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'সোরাব রুস্তাম', 'নবাব সিরাজদ্দৌল্লা', 'সাধক রামপ্রাসাদ', 'ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসী' ইত্যাদি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শারদোৎসব ও ফাল্গুনী নাটকে যাত্রার কথা উল্লেখ করলেন, তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'রঙ্গ মঞ্চ' নামক প্রবন্ধে যাত্রা গানের প্রশংসা করে লিখলেন 'আমাদের দেশে যাত্রা আমার এজন্যই ভাল লাগে, যাত্রার অভিনয় দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ স্বহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, সেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারদিকে দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে'[৪]।

যাত্রা সম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস সাহিত্যমান সম্পন্ন পালা ও সংলাপ প্রধান পালা মঞ্চায়নকারী দলকে 'যাত্রাদল' বলেছেন[৫]। যাত্রা জীবন্ত এক সাহিত্য। এই যাত্রা পালা মুক্ত মাঠে বাঁশ ও কাঠের খুঁটিতে সামিয়ানা-পাল টাঙ্গিয়ে আঙ্গিনা থেকে কয়েক হাত উঁচুতে চৌকি পেতে মঞ্চ বানিয়ে, হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে যাত্রা শিল্পীরা অভিনয় করে। মঞ্চের চর্তুদিকে পাটি, ধারি কিংবা শুকনা খড় বিছিয়ে দর্শকদের বসার স্থান করে দেয়া হয়। অভিজাত শ্রেণীর জন্য পেছন দিকে চেয়ার থাকে। শিল্পীরা যথাসাধ্য উঁচুস্বরে সংলাপ বিনিময় করে। যাত্রা শুরুতে নারী চরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করত। ধীরে ধীরে নারীর চরিত্রে নারীরা এসেছে। ধর্মীয় রীতির পালার সঙ্গে ঐতিহাসিক পালা সংযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, সামাজিক, লোক কাহিনী ও কল্প কাহিনী বিষয়ক পালা সন্নিবেশিত হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলায় বিশ শতকের প্রথম দিকে যাত্রাগানের প্রচলন খুব বেশি ছিল। বৃহত্তর সিলেট জেলার মধ্যে হবিগঞ্জেই একাধিক যাত্রাদল থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যচিত্র :

ক্র. নং	স্বত্বাধিকারী	ঠিকানা	প্রতিষ্ঠাকাল	রকম	খ্যাতযাত্রার নাম
১	কৃষ্ণ মল্লিক, মল্লিক অপেরা	ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ	১৯২২খ্রি.	সৌখিন	হরিশচন্দ্র
২	জ্যোতি দত্ত, (নাম পাওয়া যায়নি)	মিরাশী, চুনারুঘাট	১৯৩৪খ্রি.	সৌখিন	পঞ্চ মাণ্ডপ
৩	বঙ্কবিহারী দাস, রাধা গোবিন্দ অপেরা	ঘাটিয়া বাজার	১৯৩৫৬খ্রি.	সৌখিন	ভুলিনাই
৪	ননী গোপাল বিশ্বাস, মিরাশী নাট্যদল	মিরাশী, চুনারুঘাট	১৯৪০খ্রি.	পেশাজীবী	চন্দ্রহরণ ও সিরাজউদ্দৌল্লা

www.pathagar.com

ক্র. নং	স্বত্বাধিকারী	ঠিকানা	প্রতিষ্ঠাকাল	রকম	খ্যাতযাত্রার নাম
৫	যতিন্দ্র লাল দাস, গোবিন্দ অপেরা-২	ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ	১৯৪৫খ্রি.	পেশাজীবী	চাষার ছেলে
৬	যতিন্দ্র লাল দাস, ঘাটিয়া অপেরা	ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ	১৯৪৮খ্রি.	পেশাজীবী	চাঁদের মেয়ে
৭	মোঃ লিপাই মিয়া, কোহিনুর অপেরা	লিপাইগঞ্জ বাজার, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	১৯৭২খ্রি.	পেশাজীবী	ভাউয়াল রাজা সন্ন্যাসী
৮	হারুনুর রশীদ খান, হারুন অপেরা	তিতখাই, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।	১৯৭৩খ্রি.	পেশাজীবি	আধারে মুসাফির ও সাধক রামপ্রাসাদ
৯	দেলোয়ার হোসেন, আদি সবুজ অপেরা	হরিণবেগ, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।	১৯৭৫খ্রি.	পেশাজীবি	গলি থেকে রাজপথ
১০	মোঃ আজগর আলী, খোয়াই অপেরা	উবাহাটা, শায়েস্তাগঞ্জ।	১৯৯৮খ্রি.	পেশাজীবি	রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা
১১	শামসুল হক ইংরেজ, হবিগঞ্জ সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী	পাথারিয়া, হবিগঞ্জ	২০০০খ্রি.	সৌখিন	অশ্রুদিয়ে লেখা

হবিগঞ্জ শহরে অবস্থিত পৌরএলাকাধীন ঘাটিয়া গ্রাম। এ গ্রামটি একসময় খোয়াই নদীর পূর্ব পাড় ঘেঁষা ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস ছিল মূলত। নদীর একটি ঘাট ছিল এখানে। এই ঘাটকে কেন্দ্র করে ঘাটিয়া গ্রাম হয়। এই ঘাটিয়াটিতে পুরাতন খোয়াইনদীর বাঁন্ধে বাজার জমে ছিল। তখন থেকে ঘাটিয়া বাজার হিসেবে পরিচিত হয়। বাজারটিতে বিশেষত কাঠ, জালি বেত, গল্লা বেত, ও নারিকেলের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা তৈরি করে বাজারটির রূপ পরিবর্তন করে। রূপ পরিবর্তিত হয়ে কাঠের ফার্নিচারের বাজার হয়ে উঠে। বর্তমানে কাপড় ও কাঠের ফার্নিচারের বাজার হিসেবে খ্যাত আছে। এই গ্রামে এখনও হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে বেশি। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষায় গ্রামটি এগিয়ে আছে। যদিও একসময় এ গ্রামের মধ্যে সংস্কৃতি কর্মীর বসবাস ছিল হবিগঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ঢপ যাত্রা, সং যাত্রা কীর্তন, পালা, বাউল গান, নাটক, যাত্রা শিল্পী ছিল ঘরে ঘরে। ছিল যন্ত্র শিল্পী ও মেরামতের কারিগর। এ গ্রামের ধনাঢ্য সৌখিন ব্যক্তিরা গড়ে ছিলেন যাত্রাদল। বাবা থেকে ছেলে, ছেলে থেকে নাতি, বেয়াই থেকে পুত্রা এভাবে স্বত্বাধিকারীর হাত বদল হয়ে যাত্রাদল বহুবছর টিকে ছিল। এখন আর তেমন নেই।

www.pathagar.com

কেউ হয়েছেন মহাজন, কেউ বা কর্মচারী, কেউ শিক্ষক, কেউ বা শিক্ষার্থী, কেউ বা সাধু, কেউ বা সন্ন্যাসী কেউ আর এখন আর অভিনতা শিল্পী নন। 'ঘাটিয়া দল' বলে যে সাংস্কৃতিক পরিচয় ছিল তা আজ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত। তবুও পুরাতন দিনের কথা শুনলাম। কৃষ্ণ মল্লিক প্রথমে গঠন করলেন দেশ বিদেশের অভিনেতা সমন্বয়ে মল্লিক অপেরা। কলিকাতা থেকে কিনে আনলেন যাত্রার পোশাক ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। চালালেন বহু বছর দাপটের সঙ্গে। সুনাম কুড়ালেন অনেক। তাঁর একমাত্র কন্যা বিলাশ মনি দাসকে বিবাহ দিলেন ঐ গ্রামেরই বিপিন বিহারী দাস এম.এল.এ বাবুর নিকট। তাঁর সহোদর ভাই বঙ্কবিহারী দাস পিতার নামে রাঁধা গোবিন্দ অপেরা দল গঠন করলেন। বঙ্গবিহারী দাস চালালেন দলকে সুনামের সঙ্গে। অনেক পালা অভিনীত হল। তাঁর বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পুত্র যতীন্দ্র লাল দাস দলের দায়িত্ব নিলেন। তিনি রাধাগোবিন্দ অপেরা-২ নামে আরেকটি দল গঠন করে দুটি অপেরা চালাতে লাগলেন। মূল অপেরারা দায়িত্ব নিজে রাখেন ২ নম্বর অপেরার জন্য। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া থেকে যতীন চক্রবর্তীকে ম্যনেজার পদে নিয়ে আসেন। মহাসমারোহে যতীন্দ্র বাবু ও যতীন বাবুর পালা মঞ্চস্থ হতে লাগলেন। এরই মধ্যে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে হঠাৎ করে সংগঠিত হয় ভয়াবহ কলকাতার দাঙ্গা। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙালি জীবনে এক কালো অধ্যায়।[১] এ দাঙ্গার ঢেউ সারা বাঙালি সমাজে জড়িয়ে পড়ল তখন যতীন্দ্র লাল দাসের রাধাগোবিন্দ অপেরার দুটি দলই ময়মনসিংহে বায়নায় ছিল। দাঙ্গায় যাত্রা প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানের মিলিত যাত্রা দলের হিন্দু অভিনেতার সংখ্যা বেশি ছিল। এসব যাত্রা শিল্পী ও কর্মীরা দীর্ঘ একমাস ময়মনসিংহের একজন সৌখিন, দয়ালু, লোকহিতৈষী মুসলমান ব্যক্তির ব্যবস্থাপনায় থাকার পর দাঙ্গা স্থিমিত হলে নিজ নিজ ঠিকানায় নিরাপদে শিল্পীরা চলে আসে। সেই থেকে রাধা গোবিন্দ অপেরা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাত্রা শিল্পের নিবেদিত ব্যক্তি যতীন্দ্রলাল দাস হবিগঞ্জের সৌখিন শিল্পীদের সমন্বয়ে 'ঘাটিয়া অপেরা' নামে নতুন একটি দল গঠন করেন, এই দলে সুনীল দাস (বাল্লা মধুপুর), যতীন্দ্র দস (নয়াহাটি), জ্যোতিময় দাস, সুবিনয় দাস, গোবিন্দ সরকার, দশরথ সরকার, মহেন্দ্র সরকার (ঘাটিয়া), চাঁন্দ আলী (নাতিরপুর), ইংরেজ (নয়াহাটি), প্রবীর দাস (সুনারু), দীণেশ দাস (কবিরপুর), প্রমুখ অভিনেতারা ছিলেন। এসময় তারা বায়না নিয়ে দুর্গা পূজায় হবিগঞ্জের বিভিন্ন চা বাগানে যাত্রা মঞ্চস্থ করেছিলেন। আর্থিক সংকটের কারণে পরবর্তীতে দলটিকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি সেই থেকে ঘাটিয়া গ্রাম যাত্রা শূন্য হয়ে যায়।

হবিগঞ্জের পেশাজীবী যাত্রাদল কোহিনুর অপেরা ও হারুন অপেরা মালিকের সঙ্গে এই নিবন্ধকারের পরিচয় ছিল। উভয় অপেরার পরিবেশিত একাধিক যাত্রা দেখার সুযোগ তার হয়েছিল। কোহিনুর অপেরার মালিক মরহুম মোঃ লিপাই মিয়া। এক বিরাট দেহী বড়মাপের সৌখিন লোক ছিলেন। অনেক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে মননশীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। হারুন অপেরার মূলমালিক আরেক সৌখিন ব্যক্তি মরহুম আনোয়ার আলী খান। দলের স্বত্বাধিকারী হারুনুর রশীদ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। বর্তমানে তিনি প্রবাসী। জনাব আনোয়ারআলী খানের মাছ শিকার ও তামাক খাওয়াতে খুব শখ ছিল। উভয়ই শখবশত যাত্রা দল গঠন করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়

www.pathagar.com

ঢুকে পড়েন। হারুন অপেরার স্বত্বাধিকারীর বড় ভাই জাহাঙ্গির খানের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত হারুন অপেরা বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলাতেই যাত্রা পরিবেশন করেছে। বিশেষত উভয় পেশাজীবী দলের যাত্রা উত্তরবঙ্গে বেশি পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের ৭ নভেম্বর আনোয়ারউদ্দিন খান মারা গেলে অপেরার লাইসেন্স আর নবায়ন করা হয়নি। একই নিয়মে হবিগঞ্জের স্বাধীনতার পর গঠিত দলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে আর কোনো পেশাজীবী যাত্রাদল হবিগঞ্জে গঠিত হয়নি। হারুন অপেরা যাত্রা দলে হবিগঞ্জ জেলার অভিনেতারা সংযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যন্ত্র সংগীতে রঞ্জুখান, সংগীতে নির্মল খান, তবলায় শ্রীতেশ চন্দ্র দাস, ক্ল্যারিওনেটে ফজর আলী মিয়া, নৃত্যে অনিতা বিশ্বাস, মালতি বিশ্বাস, তপতী সেন, অভিনয়ে মালতি বেগম, নিরেশ চক্রবর্তী, আবু আহমেদ রাজা, মোঃ মেহেবুব, আবুল বারেক, দীনেশ দাস, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, কানাই দাস কানু, মনীন্দ্র দাস, জ্যোতিকা রানী দাস, সেফালী রানী দাস, লক্ষ্মী রানী দাস এর নাম উল্লেখযোগ্য[৭]। হারুন অপেরা ১৯৭৯-৮০ কালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল[৮]। তারা 'মা ও ছেলে যাত্রা' মঞ্চস্থ করে[৯]। বর্তমানে আজগর আলীর 'খোয়াই অপেরা পেশাজীবি যাত্রাদল হিসেবে কার্যরত আছে। হবিগঞ্জ নিমতলায় অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী লোকজ অনুষ্ঠানে 'রূপবান ও নবাব সিরাজদ্দৌলা' যাত্রা মঞ্চায়ন করে। নারী পুরুষের সমন্বয়ে এই যাত্রা দল হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

লোকজ সংস্কৃতির শক্তিশালী এ মাধ্যম যাত্রা শিল্প আজো গ্রামবাংলার জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এই যাত্রাকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন নতুবা আধুনিক বিনোদনের নানাবিধ মাধ্যমের ভিড়ে এই লোকরঞ্জনের জনপ্রিয় যাত্রা ক্রমেই হারিয়ে যাবে।

হবিগঞ্জের যাত্রার একটি অংশ

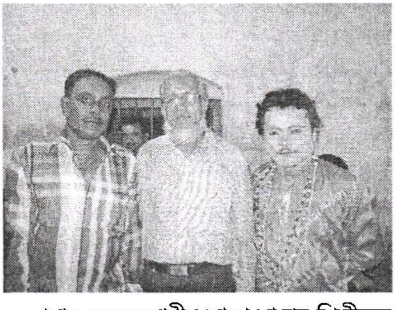

প্রধান সমন্বয়কারীর সাথে যাত্রার শিল্পীবৃন্দ

যাত্রা ও নাট্যাঙ্গণ

উপজেলায় পূর্বের এত অভাব ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ, বিভেদ দলাদলি ছিল না। মানুষ দল বেঁধে গান, যাত্রা, পালাপর্বণ, নাটক ও খেলাধুলায় বেশিরভাগ সময় মগ্ন থাকত। বর্ষাকালে নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশ হতে প্রচুর লোক সমাগম হতো। হেমন্তের বিকালে মাঠে মাঠে ক্রীড়ামোদী কিশোর ও যুবকেরা ফুটবল, ভলিবল, হা-ডু-

www.pathagar.com

ডু. চম্পা, দাড়া, দৌড় খেলিত। ৪০ শতকের প্রথম দিকে উপজেলার গ্রামে গ্রামে মানুষ যাত্রা ও নাটকে এগিয়ে আসে। এসময় প্রতি মহল্লায় স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হতো পালা, যাত্রাসহ বিভিন্ন ধরনের গান। বানিয়াচঙের দেওয়ান পরিবার নিয়ে মুনসুর বয়াতীর রচিত 'আলাল দুলাল' এর পালাটি প্রতিনিয়ত যাত্রাভিনয় করে গাওয়া হতো। এতে প্রচুর লোকের সমাগম হতো। কাহিণী শুনে গ্রাম্যমাহিলাদের চোখে জল এসে যেত। পালাটি বর্তমানে দেশ বিদেশে নাটক, যাত্রা, গল্প, প্রবন্ধর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ও সমাদৃত হয়ে উঠে। এছাড়াও দেশের ঐতিহাসিক যাত্রাগুলো প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মহল্লায় প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

যাত্রা সম্পর্কে ০৫.১১.১১ তারিখে তথ্য প্রদান করেন বিশিষ্ট লেখক, সাবেক উপসচিব, ডঃ শেখ ফজলে এলাহী (৬৫)। স্থায়ী নিবাস দেওয়ান দিঘির পাড়। তিনি জানান যে, ১৯৭৫ সালে ধানকুড়া মাঠে যুব সমাজের উদ্যোগে মাসব্যাপী যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডাঃ প্রসন্ন কুমার দাস, বিজিত পাল সরকার, সুকুমার দাস, দুখিয়া বাবু, টোনু বাবু, সুনীল সরকার প্রমুখ। তখন হাজার হাজার দর্শকের কড়তালিতে এলাকা মুখরিত থাকত। সেসময় যেসব যাত্রা প্রদর্শিত হতো তন্মধ্যে 'টিপু সুলতান', 'নবাব সিরাজউদ্যোল্লা', 'জল্লাদের দরবার', 'একটি পয়সা' উল্লেখযোগ্য। ৬০ শতকের প্রথমার্ধে উপজেলা চত্বরে যুব সমাজের উদ্যোগে প্রদর্শিত হয় 'শেরশাহ্ যাত্রা'। এতে যারা অভিনয় করেছিলেন তন্মধ্যে ছিলেন তৈয়ব মিয়া, নবীবুর রহমান, ফিরোজ মিয়া, বাদশা উল্লা প্রমুখ। এই দশকে এল. আর. উচ্চ বিদ্যালয়ে ও অনেক যাত্রা প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে 'টিপু সুলতান', 'নাবাব সিরাজউদ্যোল্লা' যাত্রাটি এখন ও অনেক মানুষের মনে দাগ কাটে। এসব যাত্রায় অংশগ্রহণকারী যাদের নাম পাওয়া গিয়েছে তারা হলেন, নাজিউর রহমান, আহসান উল্লা, খুকুমনি, পার্শ্বনাথ, দুলু প্রমুখ। ৬৫ সালের প্রথমার্ধে সতীশ চন্দ্র ও আবুল হোসেন ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে 'সিন্ধুর মালা' ও 'টিপু সুলতান' যাত্রা বিভিন্ন মহল্লায় প্রদর্শন করেন। এতে যারা অভিনয় করেছিলেন নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিয়া হোসেন, আব্দুল জলিল, আব্দুল খালেক প্রমুখ। এই সময় গ্রামে গ্রামে যাত্রা প্রদর্শিত হতো। বানিয়াচঙের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় বিশেষ করে গরীব হোসেন, চান পাড়া, মোহরের পাড়া, রায়ের পাড়া, মহারত্ন বাড়ি, মজলিশপুর, আমিরখানী, বাগ, চতুরঙ্গ রায়ের পাড়া, তোপখানায় নিয়মিত যাত্রা ও রিহার্সেল প্রদর্শিত হতো। বড়ইউড়ি, খাগাউড়া, হারুনি, মাকালকান্দি, কাগাপাশা, সেকান্দরপুর, হলিমপুর গ্রামে বানিয়াচঙের যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই অংশগ্রহণ করতেন। এই সব গ্রামে ম্যানেজার নির্দেশনা ও ফ্রম মাষ্টারের দায়িত্বে যারা থাকতেন তারা হলেন, রাজা উল্লা, আবুল হোসেন, সিতু রায়, তাহের মিয়া, আবু মিয়া প্রমুখ। এসময় মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ব এতই প্রবল ছিল যে, যাত্রায় অংশগ্রহকারী কেউহ বিপদে পড়লে তাকে প্রচুর সাহায্য করা হতো। এমনকি প্রচুন ধান চাল সংগ্রহ করা হতো। কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা হতো না। একে অন্যের বিপদে ছুটে যেতেন। যাত্রার রিহার্সেল গুলোতেও প্রচুর লোকের সমাগম হতো। যারা যাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন তারা দিনে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করতেন। এতে করে পরিবারের লোকজন খুশি হতেন। রাত্রে রিহার্সেল বা যাত্রায় অংশগ্রহণ করলেও কাজে বা লেখাপড়ায় বিন্দুমাত্র

www.pathagar.com

ক্ষতি সাধন হতো না। যাত্রার রিহার্সেল থেকে শুরু করে যাত্রা প্রদর্শিত সময় পর্যন্ত কোনো চুরি, ডাকাতি যাতে না হয় সেদিকে সকলের সুদৃষ্টি থাকত। কোন ধরণের অপরাধ যাতে সংগঠিত না হয় সেদিকে ম্যানেজারের কড়া নির্দেশ থাকত। মহিলা চরিত্রে ছেলেরা অভিনয় করলে তাদেরকে আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো।

৭০ দশকের যাত্রায় বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তির কারণে বিভিন্ন মহল্লা থেকে যাত্রা উঠে এসে এল. আর. হাই স্কুলে যাত্রা প্রদর্শন করা হতো। তখন যেসব যাত্রা প্রদর্শিত হতো তন্মধে 'জল্লাদের দরবার', 'একটি পয়সা', 'দাতা হরিশ্চন্দ্র', 'পলাশী', 'দলমাদল' ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারী যাদের নাম পাওয়া যায়, তারা হচ্ছেন নুরুন গনি, শেখ ফজলে এলাহী, আব্দুল মতিন, নূর হোসেন, ঋষিকেশ, খুকু মনি, মিয়া হোসেন, আব্দুল জলিল, আব্দুল খালেক, হামিদুর রহমান খান, কালিকেশ প্রমুখ। ঐ দশকে স্বাধীনতা স্মরণে ও উপজেলা প্রশাসন চত্বরে যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আরও দুটি নাটক বিজয় নিশান, জল্লাদের দরবার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এতে যারা অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন, আব্দুল জলিল, আব্দুল খালিক, মিয়া হোসেন, খুকুমনি প্রমুখ। ঐ সময়ে শেখ ফজলে এলাহী ও আমীর হুসেন এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য।

৭০ দশকের প্রথম দিকে বানিয়াচঙ মহারত্ন বাড়িতে নিয়মিত যাত্রা নাটক গান অনুষ্ঠিত হতো। জানা যায় বিজয় মহারত্ন শ্রী শ্রী জগৎদ্ধাত্রী মাতার মন্দির নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে ঐ বাড়িতে ঐ মাতার বার্ষিক পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন যাত্রা ও পালার আয়োজন করা হতো। ঐ দশকে যেসব যাত্রা প্রদর্শিত হয় তন্মধ্যে 'রাজ সিংহাসন', ভিখারীর ছেলে', 'ভাওয়াল সন্ন্যাস', 'কালোয়ার ডাকাত', 'গুরুদক্ষিণা', 'লোহার জাল', 'সাগর ভাষা', 'বাইশ বৎসর পর', 'হিংসার পরিণাম' ইত্যাদি। এতে যারা অংশগ্রহণ করতেন তারা হলেন–বিদ্যুৎ মহারত্ন, নির্মল মহারত্ন, তাপস কৃষ্ণ মহারত্ন, রবি মহারত্ন, মনোরঞ্জন সরকার, বাদল বিশ্বাস, বাদল মহাপাত্র, শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস প্রমূখ।

৮০ দশকে শরীয়ত বিরোধী কমিটির বিশেষ ভূমিকার কারণে নাটক ও যাত্রার অনেকটা ভাটা পড়ে যায়। এই সময় নবারুন সাহিত্য চক্র, জাগ্রত সংসদ, নিবেদন সংস্কৃতি পরিষদ, বাসনা শিল্পী গোষ্ঠী, যুব সংঘ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে নাটক ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। জনাব আলী কলেজে তোফায়েল আহমেদ ও আবু মুতালেব খানের উদ্যোগে নাটক প্রদর্শিত হতো। ঐ দশকে স্কুল, কলেজ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি নাটক প্রদর্শিত হতো। জাগ্রত সংসদ মঞ্চায়িত করে 'পলাশ দিঘির চড়', 'আদিল চাচা খুন'। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাহাউদ্দিন, আব্বাছ আলী খান, মির্জা এনামুল হক, মুতি মিয়া প্রমূখ।

৯০ দশকের বিভিন্ন সময়ে উপজেলা প্রশাসন, এল. আর হাই স্কুল, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, জাগ্রত সংসদ বানিয়াচং থিয়েটারের উদ্যোগে মঞ্চায়িত হয় নাটক 'এ লজ্জা রাখি কোথায়', 'বকুল ফুলের স্বাধীনতা', 'জ্যান্ত মানুষের কবর', 'ভুলের প্রায়শ্চিত্ত', 'বিজয় নিশান', 'ফেরারি', 'জমিদার দর্পণ', 'মায়া কানন', 'ডাকাত', 'মহাবিদ্যালয়', 'বর্ণচোর' ইত্যাদি। এতে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন বাহাউদ্দিন, মতিউর রহমান, আবু মোতালেব খান, গোলাম রব্বানী, মোছাদ্দেক আলী আলী আছগর, এ. কে

www.pathagar.com

আজাদ, এম. এ ওয়াহিদ, এসি কাওছার, আব্দুল মজিদ, জাবিদ হাছান, জাহির, জমির, সেতু প্রমূখ।

বর্তমানে শতাব্দীর প্রথম দিকে বানিয়াচঙের নাটাঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও তখন নিবেদন, বাসনা, স্মরণিকা শিল্পী গোষ্ঠী বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে সংস্কৃতি অঙ্গনকে মাতিয়ে রাখে। ইদানিং ইমদাদুল হোসেন খান-এর নেতৃত্বে উদীচি শাখা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা নাটক মঞ্চায়িত হয়ে আসছে। ১৪১৩ বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে উদীচি আয়োজন করে নাটক 'মায়াকানন'। সর্বশেষে তারা শহীদ মিনার চত্বরে প্রদর্শন করে 'দড়ির খেলা'। এতে হবিগঞ্জের জীবন সংকেত নাট্যদল অভিনয় করে। মৌলবাদী তৎপরতা দ্বিতীয়ত বিভিন্ন মিডিয়ায় ঘরে বসে মানুষ বিভিন্ন ছবি, নাটক যাত্রা দেখার সুযোগ পাওয়ার কারণে বর্তমানে নাট্যাঙ্গন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন ছাড়া একটি এলাকার তথা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে সকলের সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়েজন।

২. পালাগান
৩. আলকাপ
৪. সংযাত্রা ইত্যাদি

খ. লোক নৃত্য

আমাদের লোকজ সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম লোকনৃত্য। গ্রামীণ সমাজের লোকজ ভাবনুভূতি আচার অনুষ্ঠানে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করাকেই লোকনৃত্য বলা হয়। এতে রয়েছে দৈহিক গতিভঙ্গিমা, সেই সাথে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট সাজ-ভূষণও। যে বিষয়ে নৃত্য হবে সে ভাবেই পোষাকের সাজ নিতে হয়। সঙ্গে বিষয় ভিত্তিক দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, মুদ্রাবিন্যাস ও ছন্দ। এই ছন্দ বাদ্যযন্ত্রে সুর, তাল ও লয়ে হবে। নৃত্য শিল্পী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সূক্ষ্ম কলাকৌশলে দেহকে নানা অঙ্গভঙ্গিতে ছন্দের দোলায় নাচিয়ে তোলে, তার পোশাক, রূপ সজ্জা, মুদ্রায় অভিব্যক্তি প্রকাশ এই সব মিলিয়ে নৃত্য লোকরঞ্জনে সক্ষম হয়।

পণ্ডিতগণ নাচের উদ্ভব-রহস্য অনুসন্ধান করে বলে, "আদি যুগে মানুষের যখন ভাষা ছিল না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করত।"[১] "ভাষা হারা মানুষের ভঙ্গির দ্বারা জীবনের ঘটনা, মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টার মাধ্যমে নাচের আদি জন্মসূত্র থাকতে পারে"[২]। পরমপরাগতভাবে নৃত্য বাঙালি সমাজে উদ্ভব হয়ে স্থায়িত্ব নিয়েছে চিন্তা চেতনায়, কর্মের অবসরে, রুচি বোধে। তাই নৃত্য শিল্প মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। নৃত্য দুই প্রকারের 'শাস্ত্রীয় নৃত্য' যা নৃত্যের ব্যাকরণ শিখে নাচতে হয়, অপরটি 'লোক নৃত্য' যা নাচতে নাচতে ব্যাকরণ শিখে নিতে হয়। মূলত 'ক্লাসিক নৃত্য লোকে শিখে নাচে, আর লৌকিক নৃত্য নেচে শিখে'[৩]। নৃত্য শরীর, মন এবং মস্তিকে স্ফূর্তি এবং উল্লাসের সঞ্চার করে।

www.pathagar.com

বাংলার লোকনৃত্যের দুটি ধারা বিরাজমান। প্রথমটি কেবল যন্ত্র সংগীত নির্ভর, দ্বিতীয়টি কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে যেমন জেলে নৃত্য, কৃষাণ নৃত্য, জংলীনৃত্য, চা চয়ণ নৃত্য, লাঠি নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য ইত্যাদি। কণ্ঠ সংগীত ব্যতীত কেবল যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে নৃত্য হয়ে থাকে। আবার এ জাতীয় নৃত্যেরই আড়াল থেকে বা সম্মুখ থেকে কণ্ঠ সংগীতের সঙ্গেও নৃত্য হতে পারে। লাঠি নৃত্যে ঢোল, সাপুড়ে নৃত্যে বীণ বাজানো হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বাউল নৃত্য, কীর্ত্তন নৃত্য, জারি নাচ, ফকিরি নাচ, ঘাটু নাচ ইত্যাদিতে বাদ্য যন্ত্র সংগীত ও কণ্ঠ সংগীতের সমন্বয়েই নৃত্য হয়ে থাকে। গানের সঙ্গে নাচের সমন্বয় দর্শক চিত্তে অনেক প্রফুল্লতা আনয়নে সক্ষম হয়।

হবিগঞ্জে যে সকল লোক নৃত্য হয়ে থাকে তার মধ্যে– ১. জেলে নৃত্য, কৃষাণ নৃত্য, জংলী নৃত্য, শিকারী নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, চা চয়ণ নৃত্য ইত্যাদি। এই সকল লোক নৃত্যগুলো এক বা একাধিক নৃত্য শিল্পীর দ্বারা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সঙ্গে সংগীতের কোনো প্রয়োজন নেই। অভ্যন্তরীণ যন্ত্র সংগীতের তালে লয়ে শিল্পীর পোষাক ও উপকরণেই তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয় যেমন জেলে নৃত্যে এক জেলে আরেক জেলেনি থাকে, জেলে সেজে শিল্পী মাছ ধরার জাল কাঁধে নিয়ে মঞ্চে আসে। জলাশয় খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ মাছ দেখে সে খুশি হয়ে যায়। হাতের জালটি তৈরি করে জলাশয়ে ছুঁড়ে মারে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে জালটিকে টেনে কাছে আনে জেলেনি একটি বাঁশের তৈরি ডোলা বা খলুই নিয়ে মাছ গুলিকে তুলে নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরে যাবে। এখানে জাল, মাছ, ডোলা সবকিছুই বাস্তবে অনুপস্থিত। নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে এগুলো অঙ্গভঙ্গিতে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ২. কৃষাণ নৃত্যে কয়েকজন কৃষাণ সেজে মঞ্চে ধানের গোছা (হালি) রোপণ করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে মাথার ঘাম হাত দিয়ে মুছে নেয়, কেউ কেউ তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করে কেউ বা একটু বিশাম করে তামাক খেয়ে নেয়। অবার কেউ বসে গামছা নিয়ে অথবা মাথার ছাতা দিয়ে শরীরে খানিকক্ষণ বাতাস করে। এরই মধ্যে কেউ হালির গোছা মাথায় করে কাজে জোগান দেয়। এসবই বাস্তবে অনুপস্থিত। সবই নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ৩. সাপুড়ে নৃত্যেও একই নিয়মে একজন সাপুড়ে সেজে বীণ কোমরে বেঁধে মঞ্চে এসে সাপের খুঁজ করে, মঞ্চটিকে একটি জঙ্গল অনুমান করে। হঠাৎ সে সাপের সন্ধান পায় তখন সে প্রস্তুতি নেয়, জরি মন্ত্র পাঠের পর বীণটি বাজাতে থাকে। একপর্যায়ে একটি প্লাস্টিকের সাপ অপর প্রান্ত থেকে মঞ্চে প্রবেশ করে। এই সাপের মুখের সামনে বীণ বাজাতে বাজাতে হঠাৎ টিপে ধরে কাঁধে রাখা ঝুলানো ব্যাগের মধ্যে থাকা বাক্সে আনন্দে সাপটিকে রেখে দেয়। এক্ষেত্রে নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমেই এ অভিনয় হয়ে থাকে। ৪. জংলী নৃত্যে একক বা দলবদ্ধভাবে মঞ্চের আয়তন অনুযায়ী নৃত্য শিল্পীরা এই নৃত্যে সেজেগুজে অর্থাৎ জংলী হয়ে মঞ্চে এসে মঞ্চকে জঙ্গল ভেবে দৈহিক বল প্রদর্শন করে, এদের মধ্যে বলিষ্ঠ জন রাজা হয়। জঙ্গলময় রাজত্ব দেখাশুনায় ক্লান্তি অনুভব করে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, পথিমধ্যে প্রাপ্ত বাধাগুলো তারা একত্রে কৃত্রিম যুদ্ধের ভঙ্গিতে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগে

www.pathagar.com

শত্রুর মোকাবিলা করে সফল হয়। এতে তারা আনন্দ প্রকাশ করে করে গন্তব্যে ফিরে যায়। এখানে শত্রুপক্ষ অনুপস্থিত কেবল নৃত্যাভিনয় ও যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে জংলী নৃত্য হয়ে থাকে। ৫. শিকারী একক নৃত্য, শিকারী সাজসজ্জায় তীর ধনু নিয়ে মঞ্চে আসে শিল্পী। জংলায় সে শিকার খুঁজে বেড়ায় পাখির কুজন, জীব জন্তুর হাক ডাক শুনতে পায়। যেমনি সে ভয় পায় তেমনি সে আনন্দিতও হয়। যেহেতু সে শিকারি তাই নিজেকে তৈরি করে নেয়। একজন পাকা শিকারীর ন্যায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে ধীর পদে শিকারের উদ্দেশে এগুতে থাকে যেন সে শিকার দেখে ফেলেছে। এরই মধ্যে তার একটি শিকার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। সে মনে কষ্ট পায় আবার সে চেষ্টা চালায় শিকার করতে। তার একটি তীর বিদ্ধ হয়ে যায় একটি হরিণ শাবকের উপর। এবার সে আনন্দিত হয়ে শিকারটি কাঁধে নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরে। এনৃত্যেও কোনো সংগীত (গান) নেই, কেবল যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় রয়েছে। এই নৃত্যে হবিগঞ্জের শিল্পী ছিলেন রওনক শাহীন মিঠু, কাওসার জাহান জনি, নির্বান আচার্য্য প্রমুখ। এসব লোক নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রয়াত নৃত্য শিক্ষক ওস্তাদ শংকর সরকার। তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে নৃত্য শিক্ষক হিসেবে নিবেদিত আছেন গৌতম আচার্য্য, গৌতম দাস সুমন।

বাউল নৃত্য, কীর্ত্তন নৃত্য, জারি নৃত্য, ফকিরি নৃত্য, লাঠি নৃত্য, ঘাটু নৃত্য ইত্যাদি নৃত্যও হবিগঞ্জে চর্চা রয়েছে। এগুলো লোকনৃত্যেরই আওতাভুক্ত। বাউল নৃত্যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অর্থাৎ বাউলারা করে থাকে। বাদ্যযন্ত্র একতারা হাতে নিয়ে, কেউ বা কোমরে বা গলায় ঝুলিয়ে নেয় তবলার 'বাঁয়া'। তাল যন্ত্র বাউলেরা হাতের দ্বারা লয়ে বাজিয়ে থাকে, সে সাথে তারা নৃত্য করে। তাদের একক নাচে ছন্দ ভঙ্গি নেই। ভাবাবেগে পরম সাঁইয়ের সন্ধানে গানে, নৃত্যে, ছন্দের সৌন্দর্য্য অনুপস্থিত যদিও তবু বিচিত্র ভঙ্গিতে দেহের গতিবিধিতে নৃত্য মার্ধুয্যতা পায় বলেই গ্রামবাসী বাউল নৃত্য দেখতে ভীড় জমায়। ফকিরি নৃত্য আমাদের পীর দরবেশদের মাজার আস্তানায় হতে দেখা যায়। বিশেষত উরুছ উদ্‌যাপনে শিষ্য ভক্তরা মাজারে মোমবাতি আগর বাতি জ্বালিয়ে মরমি গানের সঙ্গে নৃত্য করে থাকে। ফকিররা মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের। রাতে মাজার বা পীর মুর্শিদের আস্তানায় বৃত্তাকারে দর্শক শ্রোতারা বসে থাকে, মধ্যে ফকির তার হাত পা নাড়িয়ে গান বাদ্যের তালে তালে নাচতে থাকে। বাউল ও ফকিরি নৃত্যে যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল বা প্রণালী থাকার কথা, তা থাকে না। তবে উভয়ের নাচের অঙ্গভঙ্গিতে ভক্তিভাব প্রকাশ প্রায়। জারি নৃত্য প্রধাণত পবিত্র মহরমের সময় হয়ে থাকে। জারিগানই মূলত বিষয়ের মধ্যে অতি উৎসাহী কিছু তরুণ এই শোকাবহ জারির সঙ্গে নৃত্য করে থাকে। জারি গানে নিয়োজিত ব্যক্তিরা নাচে অংশগ্রহণ করেন না, নাচে অন্যরা। তারা ধুতিতে সেলোয়ারের মতন কুঁচি দিয়ে পড়ে। গায়ে নিমা, শার্ট বা পাঞ্জাবী। হাতে রুমাল বাধা, কোমরে বা পায়ে নূপুর থাকে, কারও বা থাকে না। এভাবেই তারা জারি নাচ করে থাকেন। জারি গানের সুর ছন্দে বাদ্যের তালে তালে

www.pathagar.com

হাত দুলিয়ে মাথা দুলিয়ে হাতপা নেড়ে তারা শোকার্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে এই নাচে। হবিগঞ্জের মহরম উদ্‌যাপনের স্থানগুলোতে জারি গানের সাথে জারি নৃত্য হয়ে থাকে। সারি নৃত্য ভাটি অঞ্চলে নৌকা বাইচের সময় সারি গানের সঙ্গে সারি নৃত্য দেখা যায়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া নৌকাগুলো বৈঠার টানে এগিয়ে চলে। তাদেরকে উৎসাহিত করা জন্য নৌকায় গান নাচের ব্যবস্থা থাকে। ৩০-৪০ হাত নৌকার পাঠাতনে বসে জারি গান গায় আর একদুজন ব্যক্তি নানা সাজে সাজিয়ে দাঁড়িয়ে নৌকার পাঠাতনের উপর ঘুরে ঘুরে নাচে। অন্যরা সঙ্গে গান গায়। বৈঠার তালে তালে নাচ, গান, ঢোল ও কাসার ঝান বাজতে থাকে। নৌকা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। গানের ভাবের সঙ্গে নাচের কোনো মিল এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এযেন নাচের জন্য নাচ। নিছক আনন্দউল্লাসই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি হবিগঞ্জ প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আজমিরীগঞ্জে অনুষ্ঠিত নৌকা বাইচে নিবন্ধকার সারি গানের সঙ্গে সারি নৃত্য প্রত্যক্ষ করেছেন। ঘাটু নাচ অল্প বয়সের সুন্দর বালককে ঘাটু হিসেবে নাচানো হয়। ঘাটে ঘাটে নাচ করে বলেই ঘাটু। হবিগঞ্জ আজমিরী উপজেলাধীন জলসুখা গ্রামে প্রায় দুশ বৎসর পূর্বে ঐ গ্রামের বৈষ্ণব আখড়ায় ঘেটু গানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাটি অঞ্চলে বর্ষার জলে জলাবদ্ধতায় অলস জীবন কাটানো কালে লোকমনোরঞ্জনের নিমিত্তে এই ঘাটু নাচের আয়োজন হতো। বড় নৌকার পাটাতনের উপর এই নাচের আসর বসত। ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে পেশাজীবী দল এ নাচ গান করত। গান ও নাচের বিষয় ছিল 'হিন্দুদের পৌরাণিক রাধা কৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলা'[১]। ঐ সময়ে ঘাটু নাচ ভাটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিনোদনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এখন এ নাচ বিলুপ্ত। লাঠি নাচ বা লাঠি খেলা একই দৈহিক বল ও কৌশল প্রদর্শন হয়ে থাকে, যন্ত্রের তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে অধিকাংশ লাঠি নাচে বয়স্করা অংশ নিতে দেখা যায়। তাদের নাচ উপভোগ্য হয়। লাঠি নাচের ঢুলির ভূমিকাই বেশি। অন্যকোনো বাদ্যযন্ত্র না থাকলেও এককভাবে ঢুলির দ্বারা লাঠি নাচ চলতে পারে। দক্ষ ঢুলি কেবল বাজিয়ে নয়, সেরসিক দক্ষ হিসাবে নিজেও নেচে থাকে। লাঠিয়ালদের নাচের গতি, ছন্দ, লয়, ঢোলের তালে তালে সংকেত অনুযায়ী চলে ও পরিবর্তিত হয়। লাঠির নাচে লাঠির কসরত প্রদর্শিত হয় ঢোলের তালে তালে। লাঠি নাচ সাধারণত মহরম উপলক্ষে গ্রামগঞ্জে নানান ভঙ্গিতে লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শারীরিক কসরত করতে দেখা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন আয়োজনে লাঠি নাচের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এই লাঠি নাচ খুবই উপভোগ্য।

তথ্যসূচি

১. কালের কণ্ঠ, ২০.০৯.২০১২ পৃ. ১২।
২. ব্রজেন্দ্র কুমার দে : যাত্রা একাল সেখাল, কলিকাতা, (উদ্বৃতিঃ বাংলাদেশের যাত্রা গান; তপন বাগচী, বাংলা একাডেমী ২০০৭) পৃ. ৮১।
৩. সুকুমার সেনঃ বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস (১ম খন্ড, আনন্দ পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃ. ৩৪)।
৪. শামসুজ্জামান খান, সম্পাদনা : বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য (১৯৮৫), বাংলা একাডেমী, প্রবন্ধকার আলঙ্গীর জলিল, পৃ. ২৩৩।

www.pathagar.com

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ বিচিত্র প্রবন্ধ; সম্প্রদনা : এম. এল. হোসেইন (কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৫৪।
৬. তপন বাগচীঃ বাংলাদেশের যাত্রাগান, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১০২।
৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাসঃ উজান গাং বাইয়া (অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯০), পৃ. ২০-২১।
৮. নন্দলাল শর্মাঃ প্রত্যয় (হবিগঞ্জ সাহিত্য পরিষদ এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, প্রবন্ধ হবিগঞ্জ জেলার বিলুপ্ত প্রায় অচলমান লোকজ সংগীত এর প্রচার প্রসার ও উন্নয়ন) পৃ. ৫৯-৬০। ও সিলেটের জনপদ ও লোকমানস পৃষ্ঠা-৭৭।
৯. সাক্ষাতকার, এডঃ মনোরঞ্জন দাস তারিখ ১৭.০৯.২০১৩, ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ।
১০. সাক্ষাতকার, যতিময় দাস, ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ, তারিখ ১৯.০৯.২০১৩
১১. সাক্ষাতকার, জাহাঙ্গির খান, শ্যমলী আ/এ, তারিখ ১৫.০৯.২০১৩

তথ্য

১. ড. ওয়াকিল আহমেদ : বাংলা লোকসংস্কৃতি (লোকনৃত্য), বাংলা একাডেমী, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

দেশাত্ববোধ, শৃংখলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা গুনাবলী অর্জনে খেলাধুলা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলাধুলাকে পূর্বে নেশা হিসেবে নিলেও কেউ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। খেলাধুলাকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ক্রীড়ামোদী দল খেলার মাঠকে মাতিয়ে রাখতেন। এই মাঠগুলোতে এখন ক্রীড়ামোদীরা খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে পড়ছে। চল্লিশ দশকে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে আমেজ গড়ে উঠত। অঞ্চলের খেলোয়াড়রা দেশবিদেশে খেলে সুনাম অর্জন করেছেন। লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আনন্দ নিহিত ছিল। গ্রাম বাংলার বিনোদন হিসেবে লৌকিক খেলাধুলা অন্যতম। বিশেষ করে শুকনো মওসুমে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা করে আনন্দে মেতে উঠত। খেলাধুলা করে বানিয়াচং বাসির কাছে যারা এখনও অম্লান হয়ে আছেন তাদের মধ্যে সাগর দিঘির পাড়ের সাখাওয়াত হোসেন খান, চৌধুরী পাড়ার গিরীন্দ্র চন্দ্র দেব, অমলেন্দ্র দেব ভানু, অমৃত লাল ভট্টাচার্য, অনিল চন্দ্র দেব, সাগর দিঘির পুব পাড়ের কবির আহমদ, মকবুল আহমদ খান, হামিদুর রহমান আরজ, সেন পাড়ার পরেশ চন্দ্র ধর, শেখের মহল্লার সিরাজুল ইসলাম, মহিউস সুন্নত ইমরান,এছাড়ায় ভুপেন্ড চৌধুরী, আব্দুজাহের, নেপাল চন্দ্র রায়, বাদশা মিয়া, তোতা মিয়া, সামছুল হক প্রমূখের নাম। বানিয়াচঙ্গ বাসী শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরণ করে থাকে।

লৌকিক খেলাধুলা সম্পর্কে ০৪/১২/১১ তারিখে তার নিজ বাড়িতে তথ্য প্রদান করেন আব্দু সালাম লস্কর (৪৮) [শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণী, পেশা: ফুটবল খেলোয়ার, গ্রাম: চাঁন পাড়া বানিয়াচং হবিগঞ্জ।]

১. নৌকা বাইচ

নৌকাবাইচ : নদী মাতৃক বাংলাদেশে নৌকাবাইচ একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। আবহমান কাল ধরে এ খেলাটি আমাদের ভাটি বাংলায় নিছক আমোদ-প্রমোদের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এটি একটি প্রতিযোগিতা; যা শ্রম, শক্তি ও কৌশল দ্বারা জয় করতে হয়।

ভাটি বাংলার বর্ষা কালে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হতো। বড় বড় গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সমাজপতিরা শখবসত দৌড়ের নৌকা তৈরি করতেন। খেলাটি একটি এলাকা, গোষ্ঠীর বা গ্রামের সমষ্টির খেলা রুপে গণ্য হয়ে পক্ষ সমর্থিত হতো। তাই প্রতিযোগিতা জমে এক আনন্দঘন উৎসবে পরিণত হতো।

হবিগঞ্জের ভাটি এলাকা আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই এর হাওর ও বিলে বর্ষাকালে যখন জল থৈ থৈ তখন নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো। হবিগঞ্জে শহরঘেষা

www.pathagar.com

খোয়াই নদীতে ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা প্রবন্ধকার প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্ষার সময়ে ভাটি অঞ্চলের জনজীবন কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাই তারা তাদের প্রাণ চঞ্চল গতিকে ধরে রাখতে আয়োজন করে নৌকা বাইচের মতো আকর্ষনীয় প্রতিযোগিতা। আর এতে অলসতার ভারে নুয়েপড়া জনজীবন যেন আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়।

বর্ষাকালে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত না থাকলেও পূর্বে আমাদের জাতীয় দিবস উদযাপনের কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ছিল আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য এই নৌকা বাইচ। মহকুমা ও থানা প্রশাসন এর আয়োজক ছিলেন। আজ আর তেমনটি হতে দেখা যায় না।

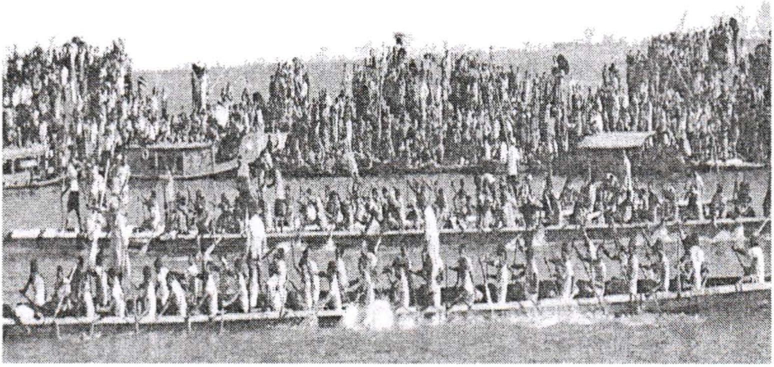

আজমিরীগঞ্জের হাওরে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

আমাদের ভাটি অঞ্চলে সাধারণত শাওন সংক্রান্তির দিনটিতে আবার কোনো এলাকায় ১ ভাদ্র মনসাপূজার দিনটিতে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হতো বলে জানা যায়। ঐ প্রতিযোগিতায় এ এলাকার নৌকা ছাড়াও সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব থেকে নৌকা অংশগ্রহণ করত। তাছাড়া নেত্রকোনা জেলার 'আড়ং' নামক একটি স্থানে মেলা হতো। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাই মেলার মূলে ছিল। হবিগঞ্জের অনেক সৌখিন নৌকার দল সেই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়ী হয়েছিল বলে আজো জনশ্রুতি রয়েছে।

বাইচের নৌকাগুলো ৪০-৫০ হাত লম্বা সাধারণত থাকলেও কোনো কোনো নৌকা একশ থেকে সর্বোচ্চ দেড়শ হাত লম্বা ছিল বলে জানা যায়। আজমিরীগঞ্জ এলাকায় সর্বোচ্চ লম্বা নৌকার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে বর্তমানে এত বড় লম্বা নৌকার প্রচলন নেই বললেই চলে। বর্তমানে উপজেলাওয়ারি পরিসংখানে বাইচের নৌকা ৫টির অধিক নয় বলে জানা যায়। কিন্তু অতীতে এ জাতীয় নৌকার সংখ্যা থানা বা উপজেলাওয়ারি ২০ এর উর্দ্ধে ছিল।

বাইচের নৌকাগুলো প্রায় একই ডিজাইনের বা ধরনের হলেও নৌকার গলুই, তলদেশের রঙ এবং বৈঠার কারুকার্য দ্বারা নৌকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ভরপুর ছিল।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক ভাষায় এ নৌকাকে 'দৌড়ের নাও' বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি নৌকায় ২০-৪০ জন সৌখিন ও পেশাদার মাঝিমাল্লা দুই দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করত। একদল 'বাচেলদার' তারা বৈঠা বায়, অন্য দল 'শারিদার' তারা নৌকায় বসে অথবা দাঁড়িয়ে বাদ্য বাজায় ও সমস্বরে গান করে। নৌকার পেছনে সজ্জিত গলুইয়ে দাঁড়িয়ে দলনেতা সুসজ্জিত লম্বা একটি বৈঠা হাতে নৌকার নিশানা ও কৌশল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা একই রঙের আঁট-সাঁট জার্সি পরে ঢোল, কর্তাল, মন্দির ইত্যাদি যন্ত্রের তালে তালে গান করে বৈঠার দাড়ে শক্তি জুগিয়ে থাকে। প্রতি নৌকায় একই পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন গান হয়, গান ও বাজনার তালে তালে বৈঠার প্রতি ক্ষেপ তাল মিলিয়ে নৌকা বাইচের ক্ষীপ্রতাকে বেগবান করে। এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যা দুপাড়ে দণ্ডায়মান হাজার হাজার দর্শক উপভোগ করে থাকে। বাইচে তিনটি নৌকা বিজয়ী হয়, ১ম, ২য় এবং ৩য় নৌকাকে আয়োজক পুরস্কৃত করেন। খাসি, ভেড়া, রাজহাস পুরস্কার পেয়ে বিজয়ী দল আনন্দে বাদ্য বাজিয়ে গান করে বাড়ি ফেরে এবং প্রাপ্ত পুরস্কারের প্রাণীকে জবাই করে সবাই মিলে খেয়ে আনন্দ করে। পরবর্তী ধরন বদলে গিয়ে শিল্ড, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রাদি পুরস্কার হিসেবে স্থান পায়। বর্তমানে প্রতিযোগিতা নেই, পুরস্কারও নেই। লুপ্তপ্রায়ই বলা চলে।

নৌকাবাইচে যে সকল গান হতো সেগুলো নৌকাবাইচের গান বা নৌকা দৌড়ের গান বলে এলাকায় পরিচিত। গ্রাম বাংলার প্রাচীন লোকদের মুখে আজো এই গান শুনা যায়।

১। আমি পাইলাম নারে বাও, মনাই সাধুর নাও,
পবনেতে ভর করিয়া নৌকা বাইয়া যাও ॥ (ধুয়া)

হেইয়াহু .... হেইয়াহু........ হেইয়াহু...........

আটাইশ গিরা নৌকাখানি বত্রিশ গুড়া তার
ভেদ করিয়া চাইয়া দেখা জোড়া যে নাই তার।
আব আতশ খাক বাদ, চারি তক্তা দিছে,
মধ্যখানে মনা রায় মাস্তুল খেচিছে ॥
পবণেতে ভর করিয়া বৈঠা মার ভাই

ইয়াহু ইয়াহু ছাড়া জানার কিছু নাই ॥
না ছুতে লাইলাহা ইল্লালাহু কুঞ্জি,
দুওমে মালকুত সাগর ইল্লালাহু পুঞ্জি ॥
তৃতীয়া জবরুত জ্ঞান খাস নাম ধরি,
চারমে লাহুতের খেওয়ার হুহু নাম তরী ॥
একে একে চারি খেওয়া শেষ কর ভাই,
মনাই সাধুর নৌকা বাইতে ভয় আর নাই ॥
জহুরুল হুছেনে কয়, মুর্শিদ বড় ধন,
সেই বাজারে গেলে মিলে অমূল্য রতন ॥
কথাঃ সৈয়দ জহুরুল হোছেন, সাং মধুপুর,বাহুবল, হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

২। পাক পানি চিনিয়া নাও বাইওরে, হায় রে আমার আউশের নাইয়া
ও মন মাঝিরে পাক পানি চিনিয়া নাও বাইও (ধুয়া)
হেইয়াহু .... হেইয়াহু........... হেইয়া.............
আড়ি কোনায় করল সাজ, ঈশানিয়া বাও,
দক্ষিণা বাতাসে মারল, ময়ুরপঙ্খী নাও ॥
উজান গাঙের মুরামুরি টেক কাটিয়া বাইও
শরীয়তের লম্বা বাঁকে, নাও খানি দৌড়াইও ॥
আগা ডুবিল পিছা ডুবিল, ডুবিল নায়ের মাঝা,
ডুবতে ডুবতে সবই গেল, খালি মাস্তুলের চূড়া ॥
সৈয়দ শাহ নূরে কইন চাড়াল পাড়াত বইয়া,
সাবধানে চালাইও নৌকা নইলে যাইব মারা রে ॥
...হেইয়াহু........হেইয়াহু.....হেইয়া......
কথাঃ সৈয়দ শাহ নুর, জালালসাপ, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

এই সকল গানের বিষয়বস্তু আধ্যাতিকতায় ভরপুর, তাই মাঝিমাল্লারা নৌকাবাইচের সংকেত পাওয়া মাত্রই বদরপীরের নাম নিয়ে বৈঠা টেনে যাত্রা শুরু করে। এই বদরপীর হবিগঞ্জের তরপ বিজয়ী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালারের সঙ্গী বারো জনের একজন। তিনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত বদরপীর নামে খ্যাত।

স্থানীয় কোন ঘটনা বা কাহিনীর ভিত্তিতে গান রচনা হয়েছে যা তালে ভাবে ও সুরে নৌকা বাইচের গান। হবিগঞ্জের বাটি অঞ্চলে এই গানগুলো বেশি গীত হয়ে আসছে।

১

ঠাকুর দাদার বউ গো, তেতই গাছে টিয়া,
টিয়ায় যে খাইল ধান, দেখছো নারে চাইয়া
টিয়া উড়াইয়া দেও গিয়া ॥
আমি কি বিয়া করলাম
মাউগের ছল্লায় শ্বশুর বাড়ি গেলাম।
শশুড়বাড়িত যাইতেরে ভাই চিপা চাপা পথ
আধা পথ গিয়া দেখি, ব্যাঙে দৌড়ায় রথ। কথাঃ সংগ্রহ

মুখরোচক আরো অনেক গান রয়েছে। গানগুলো নৌকার শারিদাররা সুর ও তালের পরিবর্তন করে গেয়ে উঠে-

২

জামাইর মুখের মাছ ইলিশারে
জামাই আইছইন হউর বাড়ি
পাইতলা ভরা মুখি,
এই কথা হুইন্যা হউর, খিলায় হুরু ঝি।
কিল খাইয়া হুরু শালী, ডাকে বুয়াই বুয়াই
জামাই কয় শালী তুই, পিঠা বানাছ নাই।

www.pathagar.com

খা কিল খা কিল বেশ মজারে
জামাইর মুখের মাছ ইলিশারে ॥ কথাঃ সংগ্রহ

৩

অধর মারিল তোরে কে? দারোগা জিজ্ঞাসে
অধর মারিল তোরে কে ॥
অধর,অধর কোন অধর চিনিতে না পারি
খালের পারে টিনের আতুকোরা বাড়ি।
অধর দারোগা জিগাইছে।
হেইয়াহু.......হেইয়াহু.....হেইয়া..
অধরের বড় ভাই, জয় গোবিন মাষ্টার
থানায় গিয়া এজাহার দিল, দম নাই তার।
অধর দারোগা জিগাইছে।
হেইয়াহু.......হেইয়াহু...হেইয়া....
অষ্টমীর বারুনীত যাইতে, বানিয়াচুঙের গড়,
পাইজুন কিইন্যা বাড়িত যাইতে, যমে ধরল তর।
হেইয়াহু.....হেইয়াহু......হেইয়া..........
কি দিয়া মারছেরে অধর কি দিয়া মারছে,
কিল লাথি মাথায় বারি, লাঠি দিয়া বাইরাইছে।
অধর দারোগায় জিগাইছে।
হেইয়াহু......হেইয়াহু.....হেইয়া.....কথাঃ সংগ্রহ

এককালের জনপ্রিয় এ নৌকাবাইচ এখন লুপ্তপ্রায়। সেই সাথে নৌকাবাইচের গানগুলো ও হারাতে বসেছে। লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এ গান গুলোকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

নৌকা বাইচ ভাটি এলাকার একটি জনপ্রিয় খেলা। বর্ষার দিনে যখন চারদিকে পানিতে প্লাবিত হয় তখন এ খেলায় মানুষ মেতে উঠে। বিশেষ করে হিন্দুদের মনসা পূজার পরের দিন, কিংবা শ্রাবণ সংক্রান্তি হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের সোমবার সুনারু খালে, যাত্রা দিঘি, শুটকি নদি, মাখালকান্দির হাওর, ধানকুড়া, মশাখলি, ইত্যাদি স্থানে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হতো। যাত্রা দিঘি হতে নৌকা দৌড়ের নৌকা যাত্রা করত। একসাথে ৪/৫টি নৌকা অংশগ্রহণ করে, অনেক দূর দূরান্ত থেকে নৌকা প্রতিযোগিতায় এসে অংশগ্রহণ করত। যে বা যারা প্রথম ও দ্বিতীয় হতো তাদেরকে নগদ টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র কিংবা জীব যন্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। এছাড়া ও যে নৌকা বিজয়ী হতো তারা যে কোনো বাড়ির ঘাঠে নৌকা ভিড়িয়ে টাকা বা হাঁস মুরোগ দাবি করত। চারদিকের অনেক গ্রাম হতে নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ছোট ছোট নৌকা দিয়ে মানুষ ভিড় জমাত। দৌড়ের নৌকাগুলো সাজিয়ে পাইকদের মাথায় গামছা কিংবা অনেকে আলাদা ড্রেস তৈরি করে নৌকা দৌড়ে নৌকা নিয়ে অংশগ্রহন করত। সে সময় শেখের মল্লার হাজি নানু মিয়ার নৌকা, হলিমপুরের কার্তিক দাসের নৌকা, কাগাপাশার চৌধুরী বাড়ির নৌকা, কুতুবখানির বারু উল্লা সর্দারের নৌকা, প্রায়ই প্রথম স্থান অর্জন করত।

www.pathagar.com

২. দাড়িয়াবান্ধা খেলা

দাঁড়িয়া বান্ধাকে নন্ধাইর খেলা বলা হয়। এ খেলা ছেলেদের খুব জনপ্রিয় খেলা। খেলার মাটে কয়েকটি কোটা বানিয়ে সর্বনিম্ন দুজন থেকে শুরু করে দশ জনের দলে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে খেলা হয়। একদল দাঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদল দাড়ি টপকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দাড়ি পাড় হতে পারলেই বিজয় লাভ করা হয়।

৩. গোল্লাছুট খেলা

গ্রামের জনপ্রিয় খেলা গোল্লাছুট। ছোট ছেলেমেয়ে থেকে যুবক যুবতীরা এ খেলা করে। বয়সের দিক থেকে ছয় বৎসর থেকে ১৬ বছরের মধ্যে ছেলে মেয়েরা খেলে থাকে। দশ বছরের ঊর্ধ্বে হলেই ছেলেমেয়েরা পৃথক দলবদ্ধ হয়ে খেলে তার নিচের বয়সেরা একত্রে খেলে। কখনো আবার ঊর্ধ্ব বয়সের যুবকদের খেলায় অংশ নিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বয়স বাঁধা দেয় না, ইচ্ছাই বড় হয়ে উঠে। দুটি পক্ষ উন্মুক্ত স্থানে বা মাঠে এ খেলা করে থাকে। উভয় পক্ষে পাঁচজন করে সমান সংকেত খেলোয়াড় থাকবে। মাঠের একপ্রান্তে বৃত্তের মতো একটি চিহ্নিত স্থান (গোল্লা)। অপর প্রান্তে চিহ্নিত স্থান সীমানা। একপক্ষ বৃত্তের মধ্যে অপর পক্ষ মাঠে। বৃত্ত পক্ষের মধ্যে একজন দলনেতা এই দলনেতা গোল্লা। গোল্লার হাত ধরে দলীয় অন্যান্য খেলোয়াড়গণ বৃত্তের চারপাশে ঘুরে হাত দিয়ে অপর পক্ষের যাকে ছুঁতে পারে সেই মরা (বাতিল)। খেলার শুরুটা এভাবেই। এরই মধ্যে গোল্লা দলের একজন খেলোয়াড় দল ছেড়ে আঁকাবাঁকা দৌড়ে বিপক্ষ দলকে পাস কাটিয়ে অপর প্রান্ত চিহ্নিত স্থানে নিরাপদে পৌঁছে যাবে, তখন সে বিজয়ী। এভাবে একে একে সবাই আবার হঠাৎ করে সুযোগ বুঝে গোল্লা বৃত্ত থেকে বের হয়ে দৌড়ে বিপক্ষ দলের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে সীমানায় পৌছে গেলে জিত হয়। এভাবে ফলাফল গুণে গোল্লাছুট খেলা হয়। মেয়েরা বাড়ির বাইরে না খেলে বাড়ির প্রসস্ত উঠোনে খেলে থাকে।

৪. বৌচি খেলা

এটা মেয়েদের খেলা, বৌকে ঘিরে রাখে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা। বৌয়ের পক্ষের খেলোয়াড়গণ দম নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে নেয় এবং ছুঁতে চেষ্টা করে। এ ফাঁকে বৌ তার দলের খেলোয়াড়দের সংগে চলে আসে।

৫. গুলি খেলা

বর্ষাকালেই সাধারণত এ খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এটা যুবকদের একটি প্রিয় খেলা। মার্বেলকে গুলি বলা হয়। বর্ষাকালে উচু জায়গাতে এই খেলা বেশ জমে উঠত এখনও এই খেলার কিছুটা প্রচলন আছে। মেয়েদের প্রিয় খেলার মধ্যে রয়েছে কানামাছি, কুতকুত, গুঠি খেলা, লুডু খেলা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৬. লাঠিম খেলা

লাঠিম খেলা এ অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল। যুবক ছেলেরা কাঠের লাঠিম তৈরি করে, নিজের তৈরি লাটিম দিয়ে এবং অনেকে আবার বাজার থেকে কিনে এনে লাটিম খেলত। এ খেলার একটি আকর্ষণ ছিল যে, যে হারবে তার লাটিম বিজয়ীকে দিয়ে দিতে হবে।

৭. কানা মাছি

শিশুদের মধ্যে এই খেলা সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। দলের একজনকে গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় খেলার সদস্যরা দৌড়ে এসে তার মাথায় বা শরীরে আঘাত করে পালিয়ে যায়, ঐ সময় দলের চোখ বাঁধা ব্যক্তি যদি থাকে ধরে ফেলতে পারে তখন সে পরাজিত হয়। এবং তাকে চোখ বেঁধে দেয়া হয়।

এছাড়া বানিয়াচঙে যেসব খেলা অনুষ্ঠিত হতো বলে জানা যায় তার মধ্যে, লুকুচুরি, কুত কুত, হুমালি, লাফা-লাফি, বাশের বল্লম উড়ানো, গুড়ি উড়ানো ইত্যাদি খেলা অনুষ্ঠিত হতো।

৮. কুতকুত খেলা

কুতকুত খেলা দুপ্রকার হয়। একটি দৌড়ে গিয়ে ছুঁতে হয় অন্যটি একটি ছক বান্দা নির্দিষ্ট স্থানে খেলতে হয়। খেলার যোগ্য বয়সী ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়ির উঠোনে কুতকুত খেলা করে। বিকেলে এ বাড়ির ওবাড়ির ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে গোলাকার করে 'গোল্লা' চিহ্নিত করে। দলপতি সে খেলার নিয়ম সবাইকে বুঝিয়ে দিবে। তারপর কে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে খেলা শুরু করবে ঘোষণা দিবে। ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রথম খেলোয়াড় "গোল্লা" চিহ্নিত স্থানে এসে দাঁড়াবে। চর্তুদিকের সীমানা বলে দিয়ে কুতকুত কুত কুত বলে এক দমে দৌড় যে কোনো এক সঙ্গি খেলোয়াড়কে ছুতে চেষ্টা করবে। দম রেখে যদি অন্য কাউকে ছুতে পারে তবে ঐ খেলোয়াড় 'মরা'। সে খেলা থেকে নেমে যাবে অর্থাৎ খেলোয়ার সংখ্যা কমে যাবে। আর যদি দম ভেঙ্গে যায় সে দ্রুত নিরাপদে 'গোল্লায়' ফিরে আসে, কেউ তাকে আটকাতে বা ছুতে পারে নি তবে সে জয়ী হয়ে নাম্বার প্রাপ্তি হলো। এভাবে একে একে দম রেখে দৌড়াবে, অন্যকে ছুতে চেষ্টা করবে, অন্য খেলোয়াড় নিরাপদে থাকতে চেষ্টা করবে এবং দম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছুতে বা আটকাতে চেষ্টা নিবে। এভাবেই নাম্বার প্রাপ্তি ও খেলোয়াড় 'মরা' মধ্যেই কুত কুত খেলা হয়ে থাকে। মেয়েরাই এ খেলা বেশি খেলে থাকে।

৯. কানামাছি খেলা

কানামাছি ছোটদের জনপ্রিয় খেলা। বিকেলে বাড়ির উঠোনে মেয়েরা একত্র হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন প্রথম 'কানা' কে হবে এর জন্যে হাতের একটি আঙ্গুলকে খেলুয়ার সর্দার মনে মনে চিহ্নিত করে বলে, আমার হাতের আঙ্গুল ধর, তখন সাথি

www.pathagar.com

খেলোয়াড়রা একে একে আঙ্গুল ধরে। সর্দার এ থেকে তার চিহ্নিত আঙ্গুলটি যে ধরেছে তাকে 'কানা' বলে ঘোষণা দিয়ে রুমাল বা গামছা দিয়ে দু চোখ বেঁধে দেয়। এভাবে খেলা শুরুর ১ম 'কানা' নির্বাচন করা হয়। কানা তখন তার চারপাশে ভুঁ-ভুঁ করা মাছি স্বরূপ সাথিদের ছুতে চেষ্টা করে। সবাই 'কানা মাছি ভুঁ-ভুঁ যাকে পাবে তাকে ছুও'- এই ছড়া বাক্যটি বলে উত্যক্ত করে থাকে। চোখ বাঁধা কানা হাত বাড়িয়ে অপরকে ধরতে চেষ্টা করে আর মুখে বলে, 'কানা আন্দা ভাই, যাকে ছুই তাকে ধরি, আমার দুষ নাই'। এভাবে ধরে নাম বলতে পারলেই সে মুক্ত। ধরা পড়া সাথিটি কানা হবে। এভাবে কানামাছি খেলায় চিত্ত বিনোদন হয়ে থাকে।

১০. লুকোচুরি খেলা

গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট এ খেলাটিও জনপ্রিয়। এ খেলা একজন প্রধান হয়। পদবীতে সে রাজা। রাজা একজন 'পুলিশ' খুঁজে বের করে লটারির মাধ্যমে। খুঁজে নেওয়া খেলোয়াড় পুলিশ। আর বাকিরা চোর। রাজা পুলিশের চোখ দুটি বন্ধ করে ধরে রাখে। চোর সকল আত্মগোপন করে যে যেদিকে পারে লুকিয়ে থাকার পর এক চোর 'কুউ' বলে শব্দ করে। রাজা শব্দ শুনে বলে, পুলিশ কুন হু ? পুলিশ বলে- হাম? রাজা বলে, যাও চোরকে পাকড়াও। তখন পুলিশের চোখ ছেড়ে দিল। পুলিশ খুঁজে চোরকে ধরতে চেষ্টা করে। এরই ফাঁকে চোর যদি দৌড়ে নিরাপদে রাজাকে এসে ছুঁয়ে ফেলে বা স্পর্শ করে, তবে পুলিশ পুনরায় চোখ বন্ধ করে লুকোচুরি খেলতে হবে। আর যদি পুলিশ কোনো চোরকে রাজা স্পর্শ করার পূর্বে ধরতে বা ছুঁয়ে ফেলে তবে সে চোর লুকোচুরির পুলিশ হবে। এভাবে পালাক্রমে খেলা চলতে থাকে।

১১. পাঁচগুটি খেলা

গ্রামের মেয়েদের খেলা গুটি খেলা। পাঁচটি ঘুটি বা পাথরের টুকরা বা ইটের টুকরা (কনক্রিট সম) দ্বারা মেয়েরা এ খেলা করে থাকে। পাঁচটি গুটি একত্রে গণহাতের মোটায় ধরে মাটিতে ফেলে। সাথিরা সবাই গুলাকার হয়ে বসে খেলার প্রতি দৃষ্টি রাখছে। যে ফেলছে সে, "ফুলফুল ফুনটি, একেতে দুলটি, তারজম তারজম তারজমটি, একেতে দুতারজমটি এভাবে ছড়া বলে একহাতে মাটির পাঁচটি গুটি উঠিয়ে নেয়, তারপর আবার একত্রে মাটিতে ফেলে এবার দুটি লুকালুকির মাধ্যমে উঠিয়ে দেয়। এসময় কোনো গুটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। এই প্রক্রিয়ায় পালা বদলে খেলা চলে থাকে।

১২. দারাগুটি

ডাংগুলি গ্রামের যুবকদের প্রিয় খেলা দারাগুটি একটি দারা আর একটি গুটি দারায় একহাত পরিমাণ লাটি আর গুটি ছোট ছয় ইঞ্চি পরিমাণ একটি কাঠি উভয়টি গাছের ডালের অংশ দিয়ে তৈরি। মাঠই এ খেলার জন্য উপযুক্ত স্থান। মাঠের অভাবে রাস্তার ফাঁকা ও পতিত জায়গায় খেলা হয়। মাঠে গরু চরানো কালে অথবা বিকেলের অবসরে যুবকরা এ খেলা খেলে থাকে। মাঠের মধ্যভাগে একটি ছোট গর্তের আকারে স্থানকে

www.pathagar.com

মূল কেন্দ্রবৃন্ধ স্থির করে তথায় গুটিকে বসিয়ে বাহুবলে খেলোয়াড় দারা দিয়ে জোড়ে আঘাত করে ছুড়ে দেয় গুটি। তখন বিপক্ষ খেলোয়াড় ক্রিকেট বলের ন্যায় গুটি লোপে নেয়। লোপে নিতে না পারলে মাটিতে গুটি পড়ে গেলে বিপক্ষ দলের একজন গুলোর গর্ত লক্ষ করে গুটি ফেরত ছুড়ে মারে। গর্তের উপর পাতানো ডান্ডাটিকে যদি স্পর্শ করে তখন ডান্ডাদারী দান হারায় আর না স্পর্শ করলে ডান্ডাদারী তখন এই গুটিকে উপরে তুলে ডান্ডা দিয়া। সজোড়ে আবার আঘাত দিয়ে যতটুকু সম্ভব দূরে পাঠিয়ে দেয়। মাটিতে গুটি পড়ার পর গুটি সমমাপ দিয়ে গুনে হিসাব রাখে এই পদ্ধতিতে দারগুটি খেলা হয়।

১৩. দাড়িয়াবান্দা খেলা

হবিগঞ্জের কোনো কোনো এলাকায় দাড়িয়াবান্দা খেলা নামে একটি খেলা চালু আছে। ছোট ছেলেমেয়েরা এ খেলা বিকেল বেলায় বাড়ির উঠোনে আয়োজন করে থাকে। দুই জন থেকে দশজন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে একত্র অথবা ভিন্নভাবে এ খেলা করে থাকে। মাটে বা উঠানে দাগ দিয়ে কয়েকটি কোটা বানিয়ে এই খেলা হয়।

১৪. কাবাডি বা হা-ডু-ডু খেলা

কাবাডি বা হা-ডু-ডু খেলা শক্তি ও কৌশলের খেলা। এ খেলা গ্রামের যুবকদের খুব জনপ্রিয়। অল্প বয়সের বালকরাও হা-ডু-ডু খেলতে পারে 'কপাটি' খেলা বলেও থাকে অঞ্চল ভেদে। হা-ডু-ডু খেলা দুই নিয়মে খেলা হয়। প্রথমটি 'কোর্ট বন্দি'। এ খেলায় নির্দিষ্ট মাপের দৈর্ঘ ও প্রস্থ নির্ধারণ করে কোদাল দিয়ে সরু করে দাগ কেটে অথবা চুন দিয়ে দাগ দিয়ে কোট তৈরি করে দুই পক্ষকে সমান ভাগ করে দেয়া হয়। এর মধ্যে নয় থেকে এগার জন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে খেলে। কোটের মধ্যে দাগটি দুই পক্ষের ভাগের ও পারম্ভিক সীমানা দাগ। খেলোয়াড়কে সর্বাস্থায় কোটের মধ্যে থেকে একে অপরকে ঘায়েল বা পরাস্থ করতে হয়। ২য়টি কোনো কোট থাকবে না। কেবল দুভাগের মধ্যে দাগ থাকবে, চারপাশে সীমানা নেই। প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ খেলায় দর্শকের ভির জমে। উভয় পক্ষ জার্সি ব্যবহার করে। খেলায় একজন রেফারি ও সহকারী আমপায়ার থাকে। রেফারির কোটের মধ্যদাগ বরাবর থেকে খেলা বাঁশি বাজিয়ে পরিচালনা করে। সহকারীরা কোটের পেছনে থেকে খেলোয়াড়ের ক্রটিগুলো দেখে থাকে। ত্রিশ মিনিটের খেলার মধ্যে দশ মিনিট বিশ্রাম থাকে। বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় পাঁচমিনিট বিশ্রাম নেয়া হয়। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের একজন অন্য পক্ষকে মাঝ দাগ থেকে শ্বাস বন্ধ করে কাবাডি বা হা-ডু-ডু বা কপাটি বলে ছুয়ে মারতে ধেয়ে আসবে। তখন কাবাডি ছড়া সে বলে 'চল কাবাডি বৃন্দাবন, ঘড়ি বাজে টনটন.........." এই বলে এক শ্বাসে অপর পক্ষের কাউকে স্পর্শ করতে পারলেই সে মারা যাবে। অর্থাৎ খেলোয়াড় কমে যাবে। আর যদি এই ছড়া কাটা খেলোয়াড়কে সবাই ধরে কোটে আটকে রাখতে পারে তবে ডাকে আসা খেলোয়াড় মরে কমে যাবে। এ নিয়মে খেলে যার খেলোয়াড় মারা যায় বেশি এবং দল শুন্য হয়ে যাবে সেই দল পরাজিত হবে। হা-ডু-ডু খেলার লক্ষনীয় দিক হল দ্বিপক্ষের খেলোয়াড়কে

www.pathagar.com

মোর স্বপক্ষের মরা খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে 'জীবিত' করা অর্থাৎ খেলায় উঠানো হয়। দৈহিক শক্তি মনোবল ও কৌশল প্রয়োগের মধ্যে এ খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে।

হা ডু ডু খেলা

১৫. লাঠি খেলা

লাঠি ব্যবহার বাঙালি পূর্ব থেকেই করে আসছিল। বিশেষত আত্মরক্ষার জন্য। জমিদারগণ লাঠিয়াল দল রাখতেন যুদ্ধ হিসেবে। তীতমিরের বাঁশের খেল্লার ইতিহাস আমরা জানি। এই লাঠির ব্যবহার বাঙালির আনন্দ উৎসবে খেলা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। তাই গ্রাম বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী খেলা লাঠি খেলা। এটি শক্তি ও কৌশলের খেলা। হবিগঞ্জে তিন প্রকারের লাঠিখেলা হতে দেখা যায়- (১) চিত্ত বিনোদনমূলক লাঠি খেলা (২) প্রতিযোগিতামূলক লাঠি খেলা (৩) আশুরা মিছিলে অগ্রভাগে লাঠি খেলা।

(১) **চিত্ত বিনোদনমূলক লাঠি খেলা :** বিভিন্ন জাতীয় দিবস বা কোনো বিশেষ উপলক্ষে লাঠি খেলার আয়োজন হলে এ খেলা চিত্ত বিনোদনমূলক নেহায়েত আনন্দের জন্যেই হয়ে থাকে।

(২) **প্রতিযোগিতামূলক লাঠি খেলা :** এক এলাকার দল অন্য এলাকা দলের সঙ্গে অথবা এক উপজেলার দল অন্য আরেকটি উপজেলা দলের সাথে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে খেলা করলে সেটি প্রতিযোগিতা মূলক হয়। বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

(৩) **আশুরা মিছিলে অগ্রভাগে লাঠি খেলা :** আমাদের এলাকায় মহরম মাসের দশ তারিখ আশুরার দিনে মোকাম বাড়িতে অথবা মঞ্জিল মিছিলের অগ্রভাগে লাঠি খেলা হয়। এটি ধর্মীয় ভাবগম্ভিরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে লাঠি খেলার চেষ্টা থাকে বলে 'এদেশে মহরম উৎসব প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে এ প্রথা চলে আসছে বলে ধরে নেয়া যায়। মহরমের লাঠি খেলায় যে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়, তা সহজেই বুঝা যায়'।[১]

www.pathagar.com

হবিগঞ্জের প্রতিটি উপজেলায় লাঠি খেলার একাধিক দল রয়েছে। যুবক ও বয়স্ক লোকেরা এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। লাঠি খেলায় বিভিন্ন ধরনের খেলা রয়েছে। তৎমধ্যে আড়খেলা, ঘড়িখেলা, লাঠিঘুরানো খেলা ইত্যাদি। এসব খেলা নিয়ে একক বা দলগতভাবে যেমন ইচ্ছা তেমন 'ফ্রি-ফাইট' খেলা করে। এতে লাঠির নানা কসরত দেখানো হয়। দ্বিতীয় খেলাতে ছোট লাঠি নিয়ে একা কসরত দেখানোর পর একে অন্যকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে নানা ভঙ্গিতে। এখানে ক্ষিপ্রতার সাথে লাঠি ঘুরানোর দক্ষতা প্রকাশ পায়। তৃতীয় খেলাতে লম্বা লাঠি একটি অথবা জোড়া লাঠি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণে লাঠি নিয়ে লাঠিয়াল আক্রমণ করে। এই খেলায় ঠাস ঠাস লাঠির শব্দ শুনা যায়। এ যেন কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া।

লাঠি খেলার ছবি (৮.৯.১৩)

১৬. তইতই খেলা

ভাটি অঞ্চলের অথৈই জলে এই তইতই খেলা হয়ে থাকে। হবিগঞ্জের ভাটি অঞ্চল হিসাবে আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, নবীগঞ্জের কিছু অঞ্চলকে বুঝায়। এছাড়া গ্রীষ্মকালে পুকুর বা নদির পানি কমে গেলে উজান অঞ্চলেও ছেলেরা এ খেলা করে থাকে। পুকুর বা জলাশয়ে বালকরা নেমে কোমর পানিতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এক বালক একটি বাসন্ত ফল পানিতে ছুড়ে দিলে সবাই কাড়াকাড়ি শুরু করে সবাই ফলটি কেড়ে নিতে চায়। হৈ-হুল্লুর করে পানির ঢেউ এ ফলটি ভেসে ভেসে স্থান পরিবর্তন করে যদিও তবু ফলটি ধরে একে অন্যেকে হস্তান্তর করতেই আনন্দ। বাসন্ত ফলের বদলে কাঁঠালপাতা খেলায় ব্যবহার করে। পাতাটি ঢেউ এ ডুবে গেলে বালকরা ডুব দিয়ে ধরে পাতাটি হাত দিয়ে ধরে উপরে তুলে ধরে। যে ডুব দিয়ে ধরে আনবে, সেই খেলায় জিতে যায়। এই খেলাটির আঞ্চলিক নাম 'কাড়াকাড়ি খেলা'। এ খেলায় হৈ-হুল্লুড় ও পানি খেলার সময় ছেলেরা ছড়া বলে :

তই তই তই
বগা মাইয়া খইত থই।
বগা মারব উড়া
যে ধরব এর হরি বুড়া।

(বক মেরে বাঁশের পত্রে রাখা হবে, যদি বগটি উড়ে যাবে এবং যে ছেলে তই তই খেলা ফল বা পাতা ধরবে তার শাশুড়ি বুড়ি হবে।)

www.pathagar.com

১৭. লাই লাই খেলা

এই খেলাটিও পানিতে খেলতে হয়। ছেলে ও মেয়েরা পৃথক হয়ে গোসলকালে পুকুরে খেলে থাকে। গ্রীষ্মকালের গরমে লাই খেলা বেশি হয়। সমবয়সিরা পুকুরে নেমে একজন বুক পানিতে দাঁড়িয়ে এক হাতে পানি তুলে অন্য সবাইকে দেখিয়ে বলে :

আমার হাতে কি ?
জলই।
এক ডুবে তলি
যদি খুঁইজ্জা ধর
পারলে তুমরা মার।

এই ছড়া বলে ছেলেটি ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকে। অন্য ছেলেরা ডুব দিয়ে থাকে ধরতে চেষ্টা করে। দূরে গিয়ে ছেলেটি উঠে সবার গতিবিধি দেখে আবার অন্যদিকে ডুব দিয়ে চেষ্টা করে তার প্রারম্ভিক স্থান অথবা পুকুরের কিনারায় উঠে দাঁড়াতে যে স্থানে বুক পানি থাকে। নিরাপদে এরূপ স্থানে দাড়াতে পারলে এবং 'আঙ্গা আঙ্গা আমি রাঙ্গা' বলে জয়ী হয়। এই খেলাটিতে ডুব দিয়ে সাতার ও দীর্ঘ শ্বাস রাখার প্রয়োজন হয়। এ খেলাটিকে আবার এ জেলারই অন্যত্র ডুব সাতার উভয়ই ব্যবহারে খেলতে দেখা যায়। যে যাকে ছুতে পারে সে ডুব দিয়েই হউক আর সাতার দিয়েই হউক।

১৮. ষাঁড়ের লড়াই

কৃষি প্রধান আমাদের বাংলাদেশে কৃষক সকাল বিকাল গরু নিয়ে মাঠে ফসল চাষ করে, তাই পল্লীবাসীর জীবনে গবাদি পশুপালন অত্যাবশ্যক। সাধারণ ভাবে 'বাঙালির কাছে কৃষি সম্পদের পরেই গো-সম্পদের স্থান'। হবিগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় বলে, 'যার নাই গরু, এ হকলতার হুরো'। অর্থাৎ যার গৃহপালিত গরু নেই সে সবচেয়ে ছোট (গরিব) লোক। তাই বাড়ি বাড়ি গরু ছিল। ছিল অন্তত কালের একজোড়া বলদ ও একটি দুধের গাভী। উচ্চ গৃহস্তের চিল গরুর পাল। রাখাল মাঠে গরু চরাত বটে, তবে ষাঁড়টিকে গোয়াল ঘরে বেঁধে যত্ন করে পালতে হয়। সৌখিন গৃহস্থের ইচ্ছা ষাঁড় ফলায়ে লড়াই করার। এ লক্ষে ষাঁড়টিকে পৃথকভাবে রেখে যত্ন করে বড় করা হয়েছে। শিং দুটিকে ধারালো (চোকা) করে দেয়াসহ শরীরের সময় সময় তৈল, লোশন মাখানো হয়েছে। ষাঁড়টি এখন লড়াইয়ের জন্য হুকায়। এই রূপ রিষ্ট-পুষ্ট, তেজী ষাঁড় লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত।

হবিগঞ্জের উপজেলা প্রশাসন কোনো এক বিশেষ দিবস উপলক্ষে অথবা গ্রামবাসীর আয়োজনে স্কুল মাঠে অথবা উন্মুক্ত মাঠে বছরে দুএকবার ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন করে থাকে। লড়াইয়ের স্থান ও তারিখ মাইকে ঘোষণা করা হয়। তারিখ মতো ষাড় মালিকরা নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে মাঠে হাজির হয়। নানা রঙের বড় বড় ষাঁড় লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের জন্যে মালিকরা তাদের ষাঁড়কে লাল, নীল, হলুদ গায়ে, গলায় ফুলের মালা ও নুপুরের মালা গলায় দিয়ে সাজিয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ইচ্ছুক মালিকরা ষাঁড় নিয়ে মাঠে আসে। শুরু হয় ষাঁড়ের লড়াই। মাঝ মাঠে ষাঁড় দুটিকে ছেড়ে দিলে একটি

www.pathagar.com

অপরটিকে মাথা দিয়ে আঘাত করে শিং এর মাধ্যমে আহত করতে চায়। সকল শক্তি প্রয়োগ করে একে অপরকে হারাতে চায়। ষাঁড়কে কেন্দ্র করে মাঠের দর্শকরাও দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। সমর্থিত ষাঁড় লড়াইয়ে অগ্রসর হলে সংশ্লিষ্ট দর্শকরাও আনন্দে মেতে উঠে। বেশ কিছুক্ষণ ষাঁড়ের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। সে সাথে দর্শকরাও আনন্দ উল্লাসে ফেটে উঠে। লড়াইয়ে একটি ষাঁড় পরাজিত হয়ে দৌড়ে পালায়। জয়ী ষাঁড়ের দল ও মালিক পুরস্কার নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরে।

ষাড়ের লড়াই

তথ্য

১. বাংলার লোক সংস্কৃতি- ওয়াকিল আহমদ/ বাংলা একাডেমী (১৯৭৪) পৃ. ৪৩৬।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী দল

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের একটি জেলা হবিগঞ্জ। হবিগঞ্জের বিভিন্ন লোকপেশাজীবি দল রয়েছে। এরা বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে।

কাঠ মিস্ত্রি

কাঠের কাজের শ্রমকর্মীদের আঞ্চলিক ভাষায় কাঠমেস্তরি বলা হয়। হিন্দু জাতিতে সূত্রধর বংশজাত। কৃষকে লাঙ্গল, মই, জোয়াল, ঘর, দরজা, জানালা, আসবাবপত্র, নৌকা, চেয়ার, টেবিল, টুল, পিঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় কাঠের জিনসপত্র তৈরি করে। প্রতি গ্রামেই সূত্রধরের বাস রয়েছে। তারা নিজ নিজ এলাকার বাড়িঘরের প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। নতুন ঘর তৈরি, পুরাতন ঘর মেরামত, নতুন আসবাবপত্র তৈরি ও মেরামত সকল কাজেই অত্যন্ত দক্ষতার মাধ্যমে যে সকল কাঠ মিস্ত্রি সম্পাদন করে তাদের কদর বেশি। দূর দূরান্ত গ্রামেও তাদের ডাক পড়ে। এই সকল কাঠ মিস্ত্রিদের অনেকেই ফার্নিচারের দোকান খুলে ব্যবসা করে যাচ্ছে। আবার অনেকেই 'ছোটা' কাজ করে। যে তাকে ডাকে, অথবা যখন যেথায় কাজ পড়ে সেখানেই কাজে ছুটে যায়। গ্রামগঞ্জের কাঠ মিস্ত্রিরাই শহরের দালানের দরজা, জানালা তৈরি করে দেন। সূত্রধর বা এখন সরকার উপাধি লিখে মূল পেশা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যা শিক্ষা নিয়ে সমাজের নানা পদে আসিন হয়ে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করছে। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ বা ব্যাংকার কেউ বা অফিসার পদে আছেন। তাই এই পেশায় আগের মতো লোক পাওয়া যায় না। কিছু কিছু মুসলমান এই কাঠ মিস্ত্রির কাজ শিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

বানিয়াচং উপজেলার প্রায় ৭৫ ভাগ লোকই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। গ্রামে জীবিকার প্রদান উৎস হচ্ছে কৃষি কাজ। অন্যান্য পেশার বাকি ২৫ ভাগ লোকই অন্যান্য পেশার সঙ্গে জড়িত। নিচে বানিয়াচং উপজেলার পেশাজীবীর একটি তালিকা তুলে ধরা হলো। ১৫/০৫/১২ তারিখে তোফয়েল রেজা সোহেল (৩২) [পিতাঃ হাবিবুর রহমান, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচ.এস.সি, পেশাঃ সাংবাদিকতা, গ্রাম: নন্দীপাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ] এর কাছ থেকে উল্লিখিত পেশাজীবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উপজেলায় রয়েছে, চাষি, জেলে, কামার (কর্মকার), কুমার, কাঠ মেস্তরি (সূত্রধর), রাজ মেস্তরি, শান মেশিন ওয়ালা, বর্গাদার, নাপিত (চন্দ/নরসুন্দর), তালুকদার, বিভিন্ন শ্রেণির ব্যাবসায়ী যেমন পরিবহন শ্রমিক, কাজী, শিক্ষক, আইনজীবি, চাকুরী, ধোপা, কুটির শিল্প তৈরির কারিগর, রিক্সাচালক, ব্যাইন্না, দাঁই, মৌলভী, পুরোহিত, ফেরিওয়ালা, গায়েন/বায়েন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই হচ্ছে সবচেয়ে উপরের স্থানে। পূজাপার্বণ থেকে শুরু করে যে কোনো অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়া সম্পন্ন হয় না। বানিয়াচঙের অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। যাত্রাপাশা, আদমখানী, দেশমুখ্যপাড়া, যাতুকর্ণ পাড়া, রঘুচৌধুরী পাড়াসহ প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণদের আবাসস্থল।

বণিক বা বানিয়া

বণিক বা বানিয়াদের প্রদান পেশা হচ্ছে স্বর্ণরৌপ্যের জিনিস তৈরি করা। তাদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় বাইন্না বলা হয়। তারা বানিয়াচঙের মোহরের পাড়া, যাত্রাপাশা, দত্তপাড়া, গ্রামে বাস করে।

সূত্রধর

কাঠ মেস্তরিদেরকে সূত্রধর বলা হয় তাদের প্রদান পেশা হচ্ছে কাঠের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করা। বানিয়াচঙের মোহরেরপাড়া, যাতুকর্ণ পাড়া ও রঘুচৌধুরী পাড়া।

সাহা

বানিয়াচঙের অধিকাংশ পাড়া বা গ্রামেই সাহা সম্প্রদায়ের বাস আছে তারা প্রদানত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত। সাহাদেরকে ব্যবসায়ী হিসাবে গণ্য করা হয়। বানিয়াচঙের রায় পাড়া, যাত্রাপাশা, চৌধুরী পাড়া, দেশমুখ্যপাড়া, কাগাপাশা, দৌলতপুরসহ বিভিন্ন পাড়ায় তাদের আবাস স্থল।

নাথ

পূর্বে বানিয়াচঙে প্রচুর নাথ সম্প্রদায়ের বাস ছিল। বর্তমানে তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাদের পূর্ব পুরুষের প্রদান পেশা ছিল জাল তৈরি করা। বর্তমানে আধুনিকায়নের সাথে সাথে তাদের এই পেশা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন তারা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত হয়ে গেছে। বানিয়াচঙের মোহরের পাড়া, সিকান্দর পুর, আগোয়া, যাত্রাপাশা, চৌধুরীপাড়ায় তাদের আবাস স্থল।

কামার

লৌহ দ্রব্য প্রস্তুত করা এদের লৌকিক পেশা বানিয়াচঙের মোহরের পাড়া, যাত্রাপাশা, গুনই, সুজাতপুর, দৌলতপুর গ্রামে কামার পেশাজীবীদের আবাসস্থল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকেই স্বর্ণরৌপ্যের ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে।

কামার

www.pathagar.com

কুমার

বানিয়াচঙের আচার্যপাড়া যাতুকর্ণপাড়া, আগোয়া, বিথলঙ্গ গ্রামে এদের আবাস স্থল বেশি। এরা মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করে এটাই ওদের প্রদান পেশা।

কুমার

কৈবত বা নমশুদ্র

হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলে শ্রেণিকে কৈবর্ত বলা হয়। এদের প্রদান পেশা হচ্ছে মাছ ধরা। বানিয়াচঙের, বিদ্যাভূষণ পাড়া, বুরুজপাড়া, ধানকুড়া, মাকালকান্দি, বিথলঙ্গ, সুজাতপুর, কাগাপাশা এদের আবাসস্থল।

চামার বা মুচি

হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে এদের স্থান। চামড়া প্রস্তুত, বিক্রয় করা, জুতা সেলাই করা এদের প্রদান পেশা। বানিয়াচঙের যাত্রাপাশা, কালিকাপাড়া, চতুরঙ্গ রায়েরপাড়া, কুতুবখানী, আগোয়া, কাগাপাশাসহ বানিয়াচঙের অধিকাংশ গ্রামেই এদের আবাসস্থল দেখা যায় এদেরকে মুচি বা ঋষি বলা হয়ে থাকে। বানিয়াচঙে আনুমানিক ১২,৫০০ চামার লোক বাস করে।

দাস

বানিয়াচঙে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাস সম্প্রদায়ের বাসই বেশি। দাসের মধ্যে হালুয়া দাস এবং জেলে দাসের সংখ্যাই বেশি। জেলে দাসরা মাছ ধরা পেশার সাথে জড়িত তারা মাছ ধরাকেই তাদের প্রদান পেশা বলে দাবি করে। অন্যদিকে হালুয়া দাসরা অন্যের জমিতে হালচাষ করে। এটাই তাদের প্রদান পেশা। বানিয়াচঙের প্রায় সবকটি গ্রামে বা পাড়ায় দাস সম্প্রদায়ের বাস লক্ষ করা যায়। কবিরপুর, মিঠাপুর, কাটালিয়া, সুনারু, আগোয়া, মাকালকান্দি, কাগাপাশা, গুনই গ্রামে দাস সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ করা যায়। বানিয়াচঙে প্রায় ৩০০০০ হাজার লোক বাস করে।

www.pathagar.com

ধোপা বা শুক্লবৈদ্য

ধোপাদের প্রদান পেশা হচ্ছে কাপড় ধৌত করা এবং ইস্ত্রি করা। ধোপাদের অনেকেই এখন সেলুনের ব্যবসার সাথে জড়িত হচ্ছে। বানিয়াচঙের তিলকরাম নায়েবের পাড়া, বিদ্যাভূষনপাড়া, খাগাউড়া, যাত্রাপাশা এবং আচার্য পাড়ার ধোপাদের আবাসস্থল।

নরসুন্দর

স্থানীয় ভাষায় এদেরকে নাপিত ও শিল বলা হয়। হিন্দুদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জাতক ইত্যাদিতে নাপিত ছাড়া পবিত্রতা লাভ করা যায় না। নাপিতদের প্রদান পেশা হচ্ছে চুল কাটা। পূর্বে নাপিতরা বাড়ি বাড়ি এসে মানুষের চুল কাটত। তবে এখন যুগের সাথে সাথে তারা সেলুনের ব্যবসা করছে। বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষনপাড়া, বানেশ্বর বিশ্বাসের পাড়া, দত্তপাড়া, সুনারু, আগোয়া, যাত্রাপাশা, যাতুকর্ণপাড়া, দেশমুখ্যপাড়ায় নাপিতদের বাস করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

উপজেলার অধিকাংশ এলাকা ভাটি অঞ্চল থাকায় মানুষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে অনেক কষ্ট পোহাতে হতো। এ ক্ষেত্রে তারা কবিরাজ, হেকিম, তন্ত্রমন্ত্রকারীদের কাছেই বেশি যেত। উনপঞ্চাশ বাংলায় ম্যালেরিয়া বা কালা জ্বরে গ্রামের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। তখন গ্রামে ডাক্তারের এতই অভাব ছিল যে মানুষ চিকিৎসাসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

১. ঝাঁড়া

বাতের ব্যথা বা প্যারালাইসিস হলে মন্ত্রের মাধ্যমে ঝাঁড়া দেয়ার প্রচলন ছিল। একটি রোগিকে চেয়ারে বসিয়ে কয়েকজন লোক ঢোল, ডপকি বাজানোর মাধ্যমে কবিরাজ বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র পড়ে, সাথের ব্যক্তিরা উচ্চসুরে দুহার ধরে ঝাঁড়া দিতে থাকে। কোনো কোনো স্থানে কবিরাজ এককভাবে ও ঝাঁড়া দেয়। এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় কবিরাজের হাতে বিভিন্ন রকমের তেল এবং বিভিন্ন প্রজাতির হাড়ের মাধ্যমে ঝাঁড়া দিয়ে থাকেন। এসব রোগের ঝাড়া বিথলঙ্গের আখড়াতে এখনও নিয়মিত হতে দেখা যায়।

৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা

১৫.০৫.১২ তারিখে মোঃ তৈয়ব উল্লা (৫৫) পিতা: রাজাউল্লা, শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাশ, পেশা: কবিরাজ, গরীব হোসেন মহল্লা, বানিয়াচং হবিগঞ্জ-এর কাছ থেকে উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ভেঙে গেলে

দুর্ঘটনা বা আঘাত পেয়ে শরীরের কোনো অঙ্গ ভেঙে গেলে অনেকেই কবিরাজের শরণাপন্ন হতেন। এসব অভিজ্ঞ নামের কবিরাজ বাঁশের চটি দিয়ে কাটি তৈরি করে হাতে বেঁধে চিকিৎসা করতেন। কেউ কেউ ভাল হলেও অনেক সময় জোড়া লাগা স্থান বাঁকা হয়ে যেত বা ক্ষত হয়ে যেত। আবার অনেক সময় ভাঙা স্থান অকেজো হয়ে যেত। যার ফলে বহু লোক দিন দিন পঙ্গু হয়ে যেত। এ চিকিৎসা এখন অনেকটা কমে গেছে। কিছু কিছু এলাকায় এখনও এ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

বেদেদের চিকিৎসা

বেদে বা সাপুড়ে সম্প্রদায়ের লোকেরা শত শত বছর ধরে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র ও লৌকিক চিকিৎসা করে আসছে। তারা নৌকার বহর নিয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরেফিরে জীবিকা নির্বাহের জন্য। দাঁত থেকে পোকা আনা, সিঙা লাগানো, সাপের জরি ইত্যাদি বিক্রি করে থাকে। তাদের বহরে ২০-৪০টি নৌকা ও একজন দলপতির মাধ্যমে তাদের সমাজ নিয়মকানুন মেনে চলাফেরা করে থাকে পুরুষ বেদে গ্রামে গ্রামে

www.pathagar.com

সাপ ধরে, লতাপাতার ঔষধ বিক্রি করে ও সাপের নাচ দেখিয়ে টাকা উপার্জন করে। তারা সাপ দংশনের রোগিকে ঝাড়-ফু দেয় এবং সাপের দংশণ থেকে বেচে থাকার জন্য জরি, কবজ, তাবিজ দিয়ে থাকে।

দাঁত থেকে পোকা বের করা

মহিলা বেদে ছন্দে ছন্দে ডাক তুলে বাড়ি বাড়ি যায় এবং দাঁত থেকে পোকার বিষ নামায়। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে দাঁতে পোকার জন্য দাঁত গর্ত হয়েছে ও ব্যথার সৃষ্টি হয়। তারা গর্ত স্থানে একটু তুলা লাগিয়ে বড় বড় পোকা বের করে এনে রোগিদের দেখিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। পোকা আনার জন্য গ্রামের বৃদ্ধা ও দূর্বা ঘাস, কাঁচা হলুদ ও বিভিন্ন গাছের শিকর একত্র করে পোকা বের করে থাকে।

সিঙা লাগানো

বাতের ব্যথার জন্য বেদেরা সিঙা লাগায়। গ্রামের অধিকাংশ অশিক্ষিত গরীব নিরীহ মহিলারা বেদে-বেদেনী ও সাপুড়ের রোগি। তারা বিশ্বাস করে শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে ব্যথার স্থানে রক্ত আটকে আছে বলেই ব্যথা করে। তাই এই সুযোগে বেদেরা দূষিত রক্তের স্থানে চামড়ার উপর বোতল ভাঙার টুকরো দিয়ে চামড়া কেটে সেই কথিত চামড়ার স্থানে গরুর সিংয়ের খুল দিয়ে মুখ চুষন করে দূষিত রক্ত বের করে দেয়া এই পদ্বতিকে সিঙা লাগানো বলে। এই চিকিৎসা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বেদেনীরাই করে আসছে।

এ ছাড়াও বেদেনীরা মাথায় টুকরি নিয়ে চুড়ি, চিরুণী, আয়না, মেয়েদের আকর্ষণীয় ও মনোহরী দ্রব্য বিক্রি করে থাকে। অনেক সময় বেদে পুরুষরা নৌকায় রান্নার আয়োজনও করে থাকে। ইদানিং কয়েকটি পরিবার বানিয়াচং বড়বাজারের পূর্ব দিকে ও তিন নং ইউপি অফিসের সন্নিকটে তাবু বানিয়ে বসবাস করছে।

ব্যথা ও অজ্ঞানে

শারীরিক ব্যথা বা কোনো কারণে অজ্ঞান হলে বিভিন্ন মন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক, তাবিজ, পানি পড়া শিরনি প্রদান বা মানত করার প্রচলন ছিল যা এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। অসুস্থ হলে মাজারে গরু, বাছুর, খাসি, মোরগ ইত্যাদি মানত করার প্রচলন ছিল। দোয়া দুরদ পড়ে ফুঁ দিলে কিংবা কবিরাজ এনে বিভিন্ন তদবির করালে পেটের অসুখ এবং জ্বিন ভূতের আছর ভাল হয়ে যায় বলে মনে করা হতো। জ্বিন ভূতের আছরে তেলপড়া দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম সাহেবদের বেশি ডাকা হতো। অসুস্থ হলে বাচ্চাদের গলায় কায়তন পরিয়ে দেওয়া হতো। ভূতপেরত যাতে আছর না করতে পারে সে জন্য তাবিজ কবজ প্রদান করা হতো। এক্ষেত্রে শরিফখানি গ্রামের কারী তাহের উদ্দিন, মিয়াখানীর রঙিলা হুজুর, বড়বাজারের হাফিজ আওলাদ মিয়ার নাম ডাক ছিল, যশ ও খ্যাতি ছিল।

হার্ট এ্যাটাক বা প্যারালাইসিস

এ রোগে মানুষের চলাফেরার অক্ষমতা দেখা দিলে তন্ত্রমন্ত্র ঝাঁড় ফুঁ দেয়ার রেওয়াজ প্রচলন ছিল। রোগিকে একটি চেয়ারে বসিয়ে রেখে উচ্চ সুরে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র বলে

www.pathagar.com

ঢাক ঢোল বাজিয়ে অশ্লীল ভাষায় নানারকম বাক্য উচ্চারণ করে চিকিৎসা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। পর পর কয়েক দিন তারা এভাবে ঝাড় ফুঁ দিত। একজন কবিরাজের সাথে কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী থাকে। তারা গানের তালে তালে নেচে কবিরাজ ২-৩ দিন এরকম ঝাঁড় ফুঁক দিয়ে থাকে।

শিশুদের চিকিৎসা

ছোট শিশুদেরকে জ্বিন পরী দেও-দানব, ভূত-পেত্নি যাতে কুনজর না দিতে পারে সে জন্য শিশুদের বিছানায় চামড়ার জুতা, গরুর হাড়, কাজল এবং তুষের ধোয়া, জাল ইত্যাদি রাখা হয়ে থাকে।

কলেরা ও বসন্তের চিকিৎসা

কলেরা ও বসন্ত রোগ একসময় মহামারী আকারে দেখা দিত। এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে শত শত মানুষ মারা যেত। কলেরা রোগকে বলা বা আপদ মনে করা হতো। বসন্তকে শিতলা বলা হতো। কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে আগুন দেওয়া হতো এবং পানি পড়া দেওয়া হতো। এসব রোগকে দেও-দানবের আক্রমণ বলে মনে করা হতো। গ্রামের সাহসী কিছু লোকদের এনে তাদেরকে লাঠি দিয়ে সারা গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হতো। তারা শিক দিয়ে তৈরি এক ধরনের বিশেষ লাঠি দিয়ে সারা রাতব্যাপী গ্রাম ঘুরে ঘুরে মানুষ যাতে ভয় না পায় সে জন্য তারা ইয়াআলী, ইয়াআলী বলে সারা রাত চিৎকার করে বেড়াত। এছাড়াও তারা বলত আল্লির আতে (হাতে) জুলফিকার ফাতেমার আতে তীর যেদিকে আইসছ (আসছে) গো বালা (রোগ) সেইদিকে ফির (যা)। এসব রোগের তাবিজ, কবজ ও পানিপড়া দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এছাড়া ও গ্রামে গ্রামে দল বেঁধে নিম্নের ছড়াগুলো বলার প্রচলন ছিল।

১. আল্লাহু আকবার (২)
কলিমার ভিতর দম ভর
দমে দমে কলিমা
লা ইলাহা ইল্লাহু।

২। আল্লাহু আল্লাহু
ডাকি বার বার
আল্লাহ তুমি
এ বিপদে কর পাড়।

৩। আল্লাহু আল্লাহু
ডাকি বারে বার
পানা চাই দিদার চাই
তুমি কর পাড়।

৪। ইয়া আল্লাহ (২)
তুমি রহমানু রাহিম

www.pathagar.com

সংকটে পড়িয়াছি সায়রে ভাসিয়াছি
আল্লাহ তুমি কর পাড়।

মচকে গেলে

দেহের কোনো অংশ মচকে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ চুন, হলুদ একত্র করে মিশিয়ে গরম করে আঘাতের স্থানে বা চোটের জায়গায় দুই থেকে তিনদিন লাগানোর জন্য বলা হতো। এক্ষেত্রে আখন গাছের পাতা গরম করে দিলে ও ভাল কাজ হতো বলে জানা যায়।

জ্বর ও সর্দি

জ্বরের জন্য চিরুতার পানি তুলসী ও বেল পাতা খাওয়ার জন্য বলা হতো। সর্দিকাশিতে বাশক পাতা তুলসী পাতা খাওয়ার জন্য দেয়া হতো।

চর্ম রোগ

চর্ম রোগে বা চুলকানির জন্য নিম, চিরতা, হলুদ, ঘৃত কুমারী পর পর কয়েক দিন খেলে উপকার পাওয়া যেত।

কেটে গেলে

কেটে গেলে দূর্বা ঘাস বেটে ক্ষত স্থানে বেধে দেয়া হতো। অনেকে আবার ভাল করে বেঁধে বেশি বেশি ঠাণ্ডা সেক দিত।

অর্শ রোগ বা গেজ

অর্শ রোগকে অনেকে গেজ বা ভগন্দর হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এ রোগে পরিমাণ মতো তেঁতুলের কচি পাতা লজ্জাবতী গাছের মূল খেলে উপকার পাওয়া যায়।

প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া

প্রস্রাবে জ্বালা পোড়ার জন্য পরিমাণ মতো কাঁচা আমলকী ও কাঁচা হলুদের রস মধু দিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণ রোগ

শুট, মরিচ, সোহাগার খৈ একসাথে পরিমাণ মতো কয়েক দিন খেলে পেটের অসুখ বা অজীর্ণ রোগ কমে যায়।

বাত ব্যথা

বাত ব্যথার জন্য রসুন, যামিনী, হিঙ্গুল, ত্রিকোট, জিরক, সৈন্ধব গুড়ো করে তিল তেল দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। অনেকেই এ ব্যাথার জন্য সিঙা লাগাতেন। বেদে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সিঙা লাগিয়ে থাকেন।

উপল্লিখিত এসব হেকেমি বা কবিরাজি চিকিৎসায় যিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন আঃ হাই আখনজি। তিনি ১৮২২ সালে বড়বাজারে হেকিমি চিকিৎসালয় চালু করে নিজে মিকচার বানিয়ে বিক্রি করতেন। মৃত্যুর পর তার ছেলে ইছাম উদ্দিন

www.pathagar.com

আখনজি পিতার পদাঙ্কন অনুসরণ করেন। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে সালেহ উদ্দিন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণ করে চলেছেন। এছাড়াও কবিরাজি ও হেকিমি চিকিৎসায় যাদের নাম পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে ডাঃ সৈয়দ গোলাম রহিম ময়না মিয়া (মিরমহল্লা), জগবন্ধু চক্রবর্তী, অধর চক্রবর্তী সেনপাড়া, হেম কিশোর আচার্যি, হিরণ কিশোর আচার্যি আচায্যি, পাড়া, নলীনি কুমার দেব মোহরেরপাড়া উল্লেখযোগ্য।

এসব কবিরাজি চিকিৎসায় মেয়েদের মধ্যেও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন হবিবুন নেসা, (স্বামী আঃ গফুর, কালিকা পাড়া) তিনি হাজার হাজার নারীপুরুষের বিভিন্ন বিপদ আপদে গাছগাছরা দিয়ে এবং কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তদবির চিকিৎসা করেছেন। তার চিকিৎসার মধ্যে ছিল শরীরে বা মুখের পর্দা, ব্যথা, গর্ভবতী মায়ের বিভিন্ন সমস্যা, চোখে কিছু পড়ে গেলে সমস্যা, মাছের কাটা গলায় আটকে গেলে ইত্যাদি।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

তন্ত্রমন্ত্র

তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে কাজে সফলতা পাওয়া যায় এই বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অনেক শিক্ষিত মানুষও তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে সফলতা পাওয়ার জন্য কাজ করতে দেখা গেছে। পূর্বে গ্রামে শিক্ষার হার ছিল কম, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এতই বেশি ছিল যে যার কারণে মানুষ তন্ত্রমন্ত্রকারীর শরণাপন্ন হতো। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পেরেছে তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে প্রতারিত হতে হয়।

১. হিরালি বা ফিরালি

২০.০৯.১১ তারিখ পাঠানটুলা গ্রামের কোহিনুর খানের সাথে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তার কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কোহিনুর খান একজন শিক্ষক, বেতার ও বিটিভির কণ্ঠশিল্পী। বয়স: প্রায় ৩৫, গ্রাম: পাঠানটুলা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তার কাছ থেকে প্রথমে হিরালি সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার পর এ নিয়ে মুরুব্বিদের সাথে আলাপ আলোচনা করলে তারা কোহিনুর খানের দেয়া তথ্যের সাথে একমত পোষণ করেন। বুরো ফসল শিলা বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তন্ত্র মন্ত্রের মাধ্যমে এক ধরনের বিশেষ তদবির করা হতো যা হিরালি নামে পরিচিত। শিলা বৃষ্টিকে আঞ্চলিক ভাষায় হিল বলা হয়। এই হিল শব্দের ক্রমবিবর্তনই হিরালি হতে পারে। বরো ফসল বিভিন্ন দুর্যোগ, শিলা পাথর, শিলাবৃষ্টি থেকে কৃষকরা এক ধরনের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হলে তারা বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করে বড় একটি মাঠে তাবিজজাতীয় ও লোহার রড পুঁতে দিতেন। আবার ঘরের চালে উঠে ও বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র পড়তেন এবং বলতেন খালি কলস নিয়ে পুকুর থেকে পানি তোলা যাবে না।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উল্লেখিত নিয়ম প্রচলন ছিল। তবে তারা এ সময় পূজা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কালা রংয়ের পাঠা বলি দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে হিরালিরা এই তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে শিলা পাথরকে দূরে সরাতে পারে। তাই কৃষকেরা ফসল ঘরে তোলার সময় সামান্য একটি অংশ পারিশ্রমিক

www.pathagar.com

হিসেবে তাদের দিয়ে দিতেন। ফসল রক্ষার এসব তন্ত্রমন্ত্র এখন প্রায় অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাড়ি বান্ধা, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ও মানুষকে বশে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রমন্ত্র করা হতো। উল্লিখিত এসব বিষয়ে ২.১০.১১ তারিখে তথ্য প্রদান করেন সৈয়দ আলী (৬৫)। পেশাঃ কৃষি, পিতাঃ মৃত আব্দুল জলিল, মোহরের পাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

২. বাড়ি বান্ধা

বাড়িতে বিপদ আপদ জ্বিন, ভূতের আছর যাতে না লাগে সে জন্যনিরীহ ও সরল প্রকৃতির লোকেরা এক ধরনের তন্ত্রমন্ত্রকারীদেরকে বাড়িতে এনে বিভিন্ন তদবির করাতেন। এ সুযোগে তন্ত্রমন্ত্রকারীরা বাড়িতে এসে চার কোনায় চারটি লোহার শিক গেড়ে দিতেন এবং ঘরের দরজার উপরে রাখার জন্য তাবিজ দিয়ে যেতেন। এতে করে তারা অনেক পয়সা রুজগার করতেন। এসব বাড়িবান্দা এখন অনেকটা উঠে গেছে।

৩. কোনো কিছু হারিয়ে গেলে

কোনো কিছু হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে ফেরত পাওয়া যায় এই ধারনা নিয়ে কিছু সরল প্রকৃতির মানুষ, মৌলভিদের কাছে গিয়ে কিছু সিরনি দিয়ে তদবির করতেন। এক্ষেত্রে তারা মাটিতে দাগ দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্র বলে বা বিভিন্ন তান্ত্রিক কলাকৌশলের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে পয়সা হাতিয়ে নিতেন। এখনও কোনো কোনো এলাকায় এসব কাজ করা হয়ে থাকে। তারা শনি, মঙ্গলবারকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জ্বিন এনে এ কাজটি করা হয় বলে সরল প্রকৃতির মানুষকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে থাকেন। অনেকে আবার ছোট শিশুদের ও তুলা রাশি লোকদের মাধ্যম অবলম্বন করে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র করে থাকেন।

৪. বশে আনা

কোনো ব্যক্তিকে বশে আনা বা পক্ষে আনার জন্য বশিকরণ মন্ত্র পড়ে দেয়া হতো। যাকে বলা হয় যাদু মন্ত্র, এই মন্ত্রের সাহায্যে অসাধ্যকে সাধন করা যায় বলে এর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হতো। শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির কারণে এসব এখন আর দেখা যায় না।

ভূত ছাড়ানো, বাটি চালান, গুপ্ত মাল পাওয়া, আশা পূরণ, ঝাড়া দেয়া, মালা পড়া, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন মোঃ তৈয়ব আলী, পেশা কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, গ্রামঃ গরীব হোসেন, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

৫. ভুত ছাড়ানো মন্ত্র

কোনো ব্যথা, অজ্ঞান হওয়া, বা নতুন বিবাহিত ছেলেমেয়েদের, যে কোনো অসুবিধা হলে অনেকেই কবিরাজের শরণাপন্ন হতেন। তারা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে ভূতের দাবি দিয়ে বা সরিষা তেলের মাধ্যমে সলিতা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বা ঝাড়ু ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিয়ে আসতেন বলে সাধারণ মানুষকে বোঝাতেন। এটাও অনেকটা এখন উঠে গেছে।

www.pathagar.com

৬. বাটি চালান

কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ফেরত পাওয়ার জন্য তন্ত্রমন্ত্র করে বাটি চালান দেওয়া হতো। তন্ত্রমন্ত্রকারী একজন তুলা রাশি এনে একটি বাটি দিয়ে তাতে তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে বাটিকে চালান দিতেন। বাটি যেদিকে যাবে তুলা রাশি ও সেদিকে যেত। যে বাড়িতে গিয়ে বাটি স্থির থাকত চোরও ঐ বাড়ির বলে ধরে নেওয়া হতো। এতে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো।

৭. গুপ্ত মাল পাওয়া

তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে একটি পিতলের বাটি এনে লাল সালু শালো দিয়ে প্যাঁচিয়ে বাড়ি বা ঘরে রেখে দিলে গুপ্ত মাল পাওয়া যাবে বলে মানুষকে ধারনা দেওয়া হতো। এতে করে অনেক সরল মানুষ প্রতারিত হয়েছেন।

৮. আশাপূরণ

একটি অন্ধকার ঘরে জ্বিন এনে কোনো রোগ শোক থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য বা কোনো কাজে সফলতা পাওয়ার জন্য জ্বিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রমন্ত্র করে মানুষকে ধোকা দেওয়া হতো। এছাড়া ও বাণ মারা, বন্ধন মন্ত্র, চালান, সাপের খিলি প্রভৃতি তন্ত্রমন্ত্র এখানে প্রচলিত আছে। লোক সমাজে কেও কারও ক্ষতি করতে চাইলে বাণ মেরে ক্ষতি করত বলে জানা যায়।

৯. মালা পরা

জন্ডিসকে আঞ্চলিক ভাষায় হলমি বলে। হলমি হলে মালা পরা, ভরণ, চুন পরা, তেল পরা, দেয়ার রেওয়াজ গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। পুরুষ কবিরাজের পাশাপাশি মহিলা কবিরাজও এ কাজ করে থাকেন।

১০. চাল পরা

কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে চালপরা দেয়ার নিয়ম ছিল। গ্রামে এখনও এর প্রচলন আছে। কোনো কিছু চুরি হলে সন্দেহকারী ব্যক্তিকে চাল পরা খাওয়ানো হতো। এতে সন্দেহকারী ব্যক্তি চচার হলে সে ঐ চাল খেতে পারবে না। মুখে চালের গুড়া উঠবে না এতে করে অনেক সময় মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়।

এছাড়ায় যেকোনো সমস্যায় পড়লে সাধারণ মানুষ কবিরাজের শরণাপন্ন হতেন। তখন চালাকচতুর কবিরাজেরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তন্ত্রমন্ত্র করতে দেখা যেত।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশ। বহু যুগ পূর্বেই এই ধাঁধার ব্যবহার আমাদের পল্লী গ্রামের লোকমুখে বিভিন্ন সংস্কার, পার্বণ, নানা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে ধাঁধার ব্যবহার হয়ে আসছে। লোকমুখেই এর সৃষ্টি এবং প্রচার। ধাঁধার মধ্যে রয়েছে গ্রামের সাধারণ লোকের প্রতিভার স্বাক্ষর, উপস্থিত বুদ্ধি আর ঘুছালো ছন্দোবদ্ধতার স্বাক্ষর। বিষয়ভিত্তিক ধাঁধার গাঁথাতে গ্রামের নারী-পুরুষ সমানভাবেই পটু। গৃহস্থালী বিষয় ও বিয়ের অনুষ্ঠানে নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে ধাঁধা রয়েছে। তাই উভয় মহলেই ধাঁধা প্রচলন দেখতে পাই। যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ছোট বা দীর্ঘ ধাঁধা মুখে মুখে তারা তৈরি করে ফেলে। এতে জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধির অনুশীলনে হাস্যরস সৃষ্টি হয়। একে অপরকে ধাঁধার প্রশ্নে আটকে দেয়। ধাঁধায় হার-জিত হয়, হয় হাসিঠাট্টা। ধাঁ ধাঁ মূলত প্রশ্ন উত্তর দেয়াকে 'ভাঙাইতে পারা' বোঝায়।

হবিগঞ্জের ধাঁধাগুলো আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টি। ধাঁধার সমমান 'পঁই' এর আঞ্চলিক নাম 'ছিলক'। লোকে বলে থাকে, 'আমি একটা ছিলক কইমু, ভাঙাইতে পারলে টেকা দিমু' অর্থাৎ আমার ধাঁধার উত্তর দিলে টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। এখানে টাকার কথা বলা হলেও টাকা আদান-প্রদান হয় না। সকলেই এখানে একটু আনন্দ উপভোগ করে। এই রহস্যাবৃত ও প্রশ্নবোধক ধাঁধার সমার্থক শব্দ 'হেঁয়ালি'। আমাদের সমাজ ও গ্রামীণ জীবনের ধাঁধার গুরুত্ব প্রচলন বেশি। গ্রামীণ মানুষের স্মৃতিতে এর লালন ও সংরক্ষণ রয়েছে।

বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গিতে হবিগঞ্জবাসী তাদের জীবনারণে ধাঁধার ব্যবহার আজও অব্যাহত রেখেছেন।

হবিগঞ্জের প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা

১. অত বড় জানুউর লা ছিলে মাথা কুটে
কমরে পাড়া দিলে কেক্ কইরা উটে।
উত্তর : ঢেঁকি।

২. অতবড় বেটাটা লোহার তামুক খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে চায়।
উত্তর : কুড়াল

৩. অত বড় ডুবালা কৈএ বুটবুট করে
এমন মাইর পুত নাই, নাইম্যা গোসল করে।
উত্তর : ভাত রান্না কালে হাড়িতে বলক।

৪. হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ফিরে
তার লাগি হা হুতাশে দেশে দেশে ঘুরে।
উত্তর : টাকা

www.pathagar.com

৫. আল্লাহর বিল গড়গড়াইয়া গাতা
বত্রিশটা কলাগাছ, একটা পাতা।
উত্তর : জিহ্বা।

৬. আগা থুরপুর গুড়ি মোইট্টা
শিবে ডিম পাড়ে গাছের আগাত উইট্যা।
উত্তর : সুপারি গাছ।

৭. আমি একটা ছিলক জানি
পুটকিত ধইর‍্যা টাইন্যা আনি।
উত্তর : বেগুণ

৮. আল্লাহর কি কুদরত
লাঠির ভিতর শরবত।
উত্তর : ইক্ষু।

৯. আন্দারই ঘরে বান্দর নাচে
ই বান্দরের কি আকল আছে ?
উত্তর : পাখা

১০. হাঁট পানিত ঘাটু নাচে
না'করলে আরও নাচে।
উত্তর : ভাতের বলক।

১১. আইলে দিয়া যায়, উঁকি মাইর‍্যা চায়।
কে দেখে, তার বাপ নি আয়।
উত্তর : সুঁচ।

১২. আছাড় দিলে ভাঙে না, টিপের ভর লয় না।
উত্তর : ভাত

১৩. আসমান থেকে পড়ল ফল
ফলের ভিতর মিটা জল।
উত্তর : নারিকেল

১৪. আগের বাড়িত আগুন লাগছে
মাইঝের বাড়ি ডাইক্যা কয়
পিছের বাড়ির পানি বয়।
উত্তর : হুক্কা।

১৫. আগা ডুগডুগ পাতার চাষ
ফুল নাই কলি নাই ধরে বারমাস।
উত্তর : পান।

www.pathagar.com

১৬. আছিল খাড়া করলাম কাইত
হারাইয়া দিয়া ঘুমাইয়া রইলাম হারা রাইত।
উত্তর : দুয়ার বেন্ধা।

১৭. আগা লগলগ গুড়ি তুঙ্গা
ই ছিলক যে না ভাঙাইতে পারব
সে বাবনের পুঙা।
উত্তর : জিহ্বা

১৮. আজব দেশের উনি
এক বেটির তিন বুনি।
উত্তর : উন্দাল (উনান)

১৯. আসমান কালা জমিন ধলা
তার ভিতর গুল্লি ভরা।
উত্তর : পেঁপে।

২০. ইখ্যান থাইক্যা মারলাম লাঠি
লাঠি গেল বাইন্যার হাঁটি।
উত্তর : পথ/টর্চলাইট।

২১. ইখ্যান থাইক্যা মারলাম তীর
তীরে করে ভিড় ভিড়।
উত্তর : পোনা মাছের ঝাঁক।

২২. ইখানে আছে হিখ্যানেও আছে
হাত নাই, পাও নাই মাথা আছে।
উত্তর : লোহা

২৩. উঠতে ঝনঝন, পড়তে ধান্ধা
আন্দাইর করতে লেজ থাকে বান্দা।
উত্তর : উড়ানো জাল।

২৪. উপরে মাটি, মধ্যে মাটি
মাঝখানে লাল বেটি।
উত্তর : হলুদ।

২৫. উঃ উঃ দুখ পাই
দুখ পাইলে খোয়াইলাই।
খুলিছ না, থাউকদে
আস্তে আস্তে যাউকেদে।
উত্তর : হাতের চুরি পরানো।

২৬. উইর‍্যা আইল পঙ্খি
ছয় ঠ্যাং লইয়া

www.pathagar.com

চাইর ঠ্যাং দিয়া বয়
দুই ঠ্যাংকে মাথা ধয়।
উত্তর : মাছি।

২৭. উৎ করে ঘোত করে
তলে দিয়া মুত পরে।
উত্তর : আঁখ মাড়াই

২৮. একগাছে দুই মাথা
হুন রে ভাই পর্বতের কথা।
উত্তর : নৌকা

২৯. এক বেটির পুন্দ দাঁড়ি
হে নি আছে, তোমার বাড়ি।
উত্তর : পেঁয়াজ।

৩০. এক বেটা সাউদ
হকল গতরে দাউদ।
উত্তর : আনারস।

৩১. এই দেখলাম এই নাই
কি কইমু রাজার ঠাই।
উত্তর : বিদ্যুৎ

৩২. এক মাথায় এক হাত
জাত থাইক্যা করে বেজাত।
উত্তর : হাতুড়ি

৩৩. এক থাক, দুই থাক, তিন থাক জোড়া
কৃষ্ণ বাজায় বাঁশি, মুখখানা পোড়া।
উত্তর : হুক্কা।

৩৪. একটুখানি পুলা, কত দুধ ভাত খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ লাইগ্যা যায়।
উত্তর : কুড়াল।

৩৫. এক বেটা উনি, পিঠে দিয়া বুনি।
দেখছনি ভাই উনারে আইট্যা যাইতে বইয়া নিতে তাহারে।
উত্তর : খড়ম।

৩৬. একটু খানি পুষ্কুরিণী জলে টলমল করে
একটুখানি কুটা পড়লে সর্বনাম করে।
উত্তর : চক্ষু।

৩৭. কান্দার উপর কান্দা লাল কাপড় দিয়া বান্দা।
উত্তর : কলার থোড়।

www.pathagar.com

৩৮. কান্দির উপর কান্দি
ই ছিলক না ভাঙাইতে পারলে, হক্কলের বান্দি।
উত্তর : কলার ছড়ি।

৩৯. কালা মুরগি ডিম পাড়ে
গনতে গনতে বুড়া লাগে।
উত্তর : আকাশের তারা।

৪০. কোনো ফলের বীজ নাই, কও দেখি ধাঁধা
ই ছিলক না ভাঙাইলে তুমি একটা গাধা।
উত্তর : নারিকেল।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

এই নিবন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রবচন স্থান পেয়েছে সেগুলো হবিগঞ্জ জেলায় বহুল প্রচলিত। তাই বলে এসব প্রবাদ প্রবচন কোনটি যে অন্য জেলায় বা বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলায় প্রচলিত নেই, এমনটি নয়। প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহারে অর্থগত ও কারণগত দিকে এক হলেও আঞ্চলিক ভাষাগত উচ্চারণে তফাত বিদ্যমান।

তফাত রয়েছে আটটি উপজেলার এই হবিগঞ্জ জেলায়ও। এর নবীগঞ্জ, মাধবপুর, লাখাই ও বানিয়াচং উপজেলায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথ্য ভাষার উচ্চারণে তফাত রয়েছে। নবীগঞ্জ উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সিলেটী ভাষার একটি সাদৃশ্য রয়েছে। তেমনি মাধবপুর উপজেলার ভাষার সঙে পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাষার মিল রয়েছে। লাখাই-বানিয়াচং উপজেলার কিছু কিছু ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙে কিশোরগঞ্জ জেলার ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা বলতে মূলত স্বরধ্বনি বা কণ্ঠধ্বনি, শব্দ প্রয়োগ-উচ্চারণ ও বাক্যরীতিই বোঝায়। অঞ্চলভেদে বাক্য গঠন ও অর্থ প্রকাশে তেমন মৌলিক তফাত না থাকলেও কণ্ঠধ্বনি, উচ্চারণে পরিবর্তন রয়েছে। তাতে অঞ্চলভেদে প্রবাদের ক্ষেত্রে চিন্তায় ও রচনায় নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তথাপি কিছু কিছু প্রবাদ রয়েছে যেগুলো সব অঞ্চলেই ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হয়ে আসছে। এগুলোতে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না যেমন

"অদৃষ্টের লিখন যায় না খণ্ডন, আমি শ্যাম রাখি না কুল রাখি, চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" ইত্যাদি। স্বাভাবিক কথাবার্তায় প্রচলিত এসব প্রবাদগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র উচ্চারণে যৎসামান্য তফাত অঞ্চলভেদে থেকে যায়।

সারাদেশের ন্যায় হবিগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় সকল প্রবাদ প্রবচন জীবন-জীবিকা সমাজকর্ম পরিচালনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মুখে মুখে রচিত হয়েছে। আর সেটি করেছেন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা থেকে সুন্দর সুন্দর উপমা ও মনের কথা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে। প্রতিটি প্রবাদেই লুকিয়ে রয়েছে নীতিবাক্য, ইশারা-ইঙ্গিত, উপমা-উপদেশ, হাস্যরসসহ গভীর জীবনসত্তের উক্তি। এগুলোর যথাযথ ব্যবহারে বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ও জোড়ালো করে তুলেছে।

শিক্ষিত পণ্ডিত বলতে আমরা যাঁদের বুঝি তাদের দ্বারা প্রবাদগুলো সৃষ্টি হয় নি। প্রবাদ-প্রবচনগুলো সৃষ্টি, প্রচার ও সংরক্ষণ গ্রাম বাংলার ঐ সকল সাধারণ মানুষেরাই করেছেন। প্রতিনিয়ত তাদের প্রাত্যহিক কাজে যথাসময়ে সঠিক বিষয়ে আলাপ আলোচনায় প্রবাদ প্রবচনগুলো যথাযথ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লোকমুখই এগুলোর ঠিকানা। লোকমুখেই ঘুরে বেড়ায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। উচ্চারিত হয় নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায়। মুখে মুখে রচিত, মুখে মুখে এর প্রচার ও স্থিতি বলেই প্রবাদ-

www.pathagar.com

প্রবচন মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। মানব সমাজের মঙ্গল সাধনার ইচ্ছা থেকেই এসব প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি। তবে হবিগঞ্জের আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে কিছু লিখতে গেলে হবিগঞ্জে ব্যবহৃত কিছু আঞ্চলিক শব্দাবলী সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

মাতৃজবান প্রায় এক হলেও ব্যক্তি-জ্ঞান বিবেচনা ও পরিবেশগত প্রভাবে শব্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগ হয়ে থাকে। গ্রাম-গঞ্জের জনসাধারণের জবানে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারিত হয় এমনি কিছু শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা 'হ' কে 'অ', 'ম' কে 'হ', 'স/শ' কে 'হ', 'চ' কে 'ছ' বা 'স' উচ্চারণ করেন যেমন, হয়েছে > অইছে, এমনি > অমনি, শেষে > হেষে, সমান > হমান, সতীন > হতীন, সকলে > হকলে, শালা-শালী > হালাহালী ইত্যাদি। আবার, দেখা যায় কিছু কিছু বর্ণ বা শব্দকে অতিব্যাঞ্জনে উচ্চারণে উচ্চারিত করা হয় যেমন হাত > হাত্তি, ছাতা > ছাত্তি, মাঝ > মাঞ্জা, চাউল > ছাউল। এতে করে দেখা যায়, শব্দের প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণতার বদলে মহাপ্রাণতায় উচ্চারিত হয়। আবার, মহাপ্রান বর্ণও অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ বর্ণে উচ্চারিত হয় যেমন ভাল > বাল, ভাত > বাত, ঘাস > গাস ইত্যাদি।

হবিগঞ্জের শব্দভাণ্ডারে আঞ্চলিক শব্দ উচ্চারণের এরূপ স্বকীয়তাকে বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন হবিগঞ্জের লেখক মোঃ সিরাজ হক (হবিগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন। পৃষ্ঠা- ২৮)।

কবে, কখন, কজন ব্যক্তি প্রবাদ-প্রবচনের প্রথম জন্ম দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল এ তথ্য নির্ণয় করা আজো সম্ভব হয়নি। তবে এসব অজানা লোকদের চিন্তা চেতনার সার্থক অবদানই প্রবাদ প্রবচনগুলো আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, প্রবাদ প্রবচনের উৎসস্থল মানুষের মৌখিক ভাষা।

প্রবাদের সংজ্ঞা নিরূপণে জানা যায়, " 'প্র' অর্থ বিশিষ্ট এবং 'বাদ' অর্থ কথা অর্থাৎ 'প্রবাদ' অর্থ বিশিষ্ট বা তাৎপর্যপূর্ণ কথা। অতএব প্রবাদের অর্থ হলো লোক পরম্পরাগত বিশেষ উক্তি বা কথন।" (প্রবাদ-প্রবচন : মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রফেসর'স প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ০১) এতদ্বভিন্ন বিভিন্ন মনীসী প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

এই প্রবাদ-প্রবচন লোক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। জীবন-জগত ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের বাস্তব সত্য প্রকাশের জোড়ালো উক্ত যা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অল্প কথায় এত বেশি অর্থ বহনের ক্ষমতা প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় নেই। তাই, প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার। লোকজ্ঞানে প্রবাদ-প্রবচনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লোকবিজ্ঞানীদের ধারনা, "একটি দেশের জ্ঞান, মেধা তার প্রবাদেই ফুটে উঠে" (ড. আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও লোকঐতিহ্য, পৃষ্ঠা, ১০৫)।

হবিগঞ্জের আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশ কিছু প্রবাদ 'অশ্লীল' বলে মনে হয়। কিন্তু মূলত প্রবাদগুলো অশ্লীল নয়। এইগুলো অর্থগত ব্যাখ্যা করলে সমাজে এর ব্যবহার অনুপোযুক্ত হবে না। শুনলে অবশ্য সাহিত্যমোদীদের নিকট

www.pathagar.com

শোভনীয় নয়, বরং অশ্লীল বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় সমাজের মধ্যে 'শ্লীল' কিংবা 'অশ্লীল' বলে কিছু নেই। তাদের নিকট সকলের মূল্যই সমান। (মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সিলেটি প্রবাদ-প্রবচন, পৃষ্ঠা, ২৬)

দেশের সকল অঞ্চলেই এরূপ অশ্লীল প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। অশ্লীল প্রবাদ প্রবচন বিষয়ে সংগ্রাহক গবেষক মোঃ হানিফ পাঠান বলেন, "অধিকাংশ প্রবাদ নিরক্ষর সমাজের মুখ নিসৃত বলিয়া এইগুলিতে নিরেট বাস্তবতা, উলঙ্গ সরলতা ও ব্যাঞ্জনাময় রসিকতা লক্ষিত হয়। শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিকগণের রচনায় এরূপ সুলভ নহে। কারণ, তাঁহাদের রচনা শিক্ষিতদের জন্য হয় বলিয়া শিল্পগুণ সম্মত থাকে।" তাঁর এই 'নলতল ভাইস্যা' মতো খোড়াযুক্তি মনে হলেও শেষাবধি তিনি বলেন, "প্রবাদকারগণ ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের জন্য প্রবাদ রচনা করেন না। অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে তাঁহাদের মুখে আপনি বাহির হইয়া পড়ে বলিয়া কোন রুচির ধার তাঁহারা ধারেন না। এইজন্য প্রবাদগুলি নিরাবরণ শিশু সৌন্দর্যের অধিকারী।" (মোঃ হানিফ পাঠান, বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা, ভূ-২)

'বড়লোকের ফূর্তি-ফার্তি, ছোটলোকের বদমাশী'- এই প্রবাদটি দ্বারা সমাজের বড়-ছোট, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কার্যক্রমের সামাজিক তফাত স্পষ্টত বোঝা গেলেও 'রাজায় কইন পুঙ্গির ভাই, আনন্দের সীমা নাই' এই আনন্দেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সন্তুষ্ট। মাঠ পর্যায়ে প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহে জানা যায়, এসব কথিত 'অশ্লীল' প্রবাদ প্রবচনগুলো বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। শুনলে শ্রুতিকটূ হলে সরাসরি অর্থ বোঝাতে সক্ষম এবং সাথে সাথে এ ক্রিয়া কার্যকর। আদিমতার প্রতি মানুষের একটি আজন্ম আকর্ষণের প্রমাণ পল্লী অঞ্চলের এই সকল প্রবাদ-প্রবচন বহন করে আসছে।

হবিগঞ্জে অশ্লীল প্রবাদ-প্রবচন যে কটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

(১) 'নিজের ফাঁদে বুই নাই, পরের ফাদে বুই' (অপরের বদনাম খোজা)

(২) 'নুন তিতা, মরিচ ঝাল, মিয়া আমার চেটের বাল' (দম্ভ প্রকাশ)

(৩) 'পরার পুত, কুত্তার মুত' (অন্যের ধন আমার কিছু না)

(৪) 'ফাদের ডাকও ঠের পায় না, দিনের ডাকও ঠের পায় না' (বোধ-জ্ঞানহীন)

(৫) 'পুটকি পাতলা মাইনষে সমাজে দেয় বুসনাষে' (দুষ্ট লোকেরা সমাজ নষ্ট করে)

(৬) 'বালিগ হইলে কুত্তায় ঠ্যাং তুইল্যা মুতে' (যোগ্যতার লক্ষণ)

(৭) 'বাপে না গুতে চুঙ্গা ভইরা মুতে' (জীবনে যা করে নাই এমন আশা)

(৮) 'বাল ছিড়বার ভাগ নাই, ফতা বালা উইঠ্যা বওয়া' (ক্ষমতা নেই, তবু দাপট দেখানো)

(৯) 'বাবনায় মন্ত্র পড়ে, পাঠার পেলে হুনে' (অহেতুক ধারণা)

(১০) 'যার ফুন্দে দিয়া বাঁশ যায়, আইক্যায় আইক্যায় ঠের পায়' (বিপদে পড়লেই দুঃখ বুঝা যায়)

(১১) 'কার পুটকি কে মারে ধুমায় অন্ধকার' (হ-য-ব-র-ল অবস্থা)

www.pathagar.com

এসব প্রবাদ-প্রবচন বাক্যগুলো কেবল কি রসিকতার সৃষ্টি করল; নাকি নীতিগর্ভ অর্থ প্রদানে আমাদেরকে নৈতিক শিক্ষামূলক একটি প্রচ্ছন্ন উপদেশ প্রদান করল; এটি বিবেচ্য হওয়া উচিত। অশ্লীল বলে এসব প্রবাদ প্রবচনের অবজ্ঞা করা সঠিক নয়। এই সকল প্রবাদ জনমনে বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম বিধায় তার অশ্লীলতার ভেতরে শোভনভাবকে খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। আর তাই এসকল প্রবাদ-প্রবচন পল্লী গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে হিতকর পরামর্শ ও যথাযথ উপদেশ প্রদানে আজো সক্ষম রয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনগুলো হবিগঞ্জের আঞ্চলিক নাম 'ডাকের কথা'। লোকেরা সম্বোধন করে বলে, 'ডাকের কথা বাদ যায় না।' এবং 'ডাকের বাপে কোনদিন গাইল খাইছে না।' কেউ কেউ আবার 'ছিলক' বলে থাকেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মহিলারা কথায় কথায় ছিলক বলতে ভালোবাসেন। প্রত্যুত্তরে ছিলক বললেই জয়ী বা জ্ঞানী বা বুদ্ধিমতি হওয়া যায় এরূপ একটি ধারনা তাদের রয়েছে। এ ধারনা মূলত সত্য যে, প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি, প্রচার ও প্রকাশ লোকজ্ঞানেরই বহি:প্রকাশ। জ্ঞানব্যতীত এরূপ প্রবাদ-প্রবচন বলা বা বোঝা সম্ভব নয়।

প্রবাদ প্রবচন সংক্ষিপ্তাকারে হলেও পূর্ণ অর্থ বোঝাতে সক্ষম। ব্যবহারকালে ছোট বাক্য, বড় বাক্য আবার কাব্যের মতো দুই বা ততধিক পংক্তিতে প্রবাদ রয়েছে যেমন

'চাচা আপন জান বাঁচা।' এর অর্থ নিজেকে রক্ষা করা। তার সমর্থনে বলা যায়, 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম'। এগুলো সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-প্রবচনভুক্ত।

'বেশি পুতে বংশ নাশ, বেশি খাইয়া জীবননাশ'। এখানে দুটি প্রবাদকে এক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। বংশ ও জীবন দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর বিপরীতে বলা যায়, 'এক পুতের আশা, গাঙের পাড়ে বাসা।' 'নিত থুরা খায়, রসাতলে যায়।' এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যের প্রতি তাগিদ রয়েছে নতুবা ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রবাদ-প্রবচনের অর্থগত দিক পরস্পরবিরোধী হলেও উভয়ের মূলেই সমাজসিদ্ধ প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ।

'কাউয়ার বাসায় কোকিলের ছাও,
জাত আনমান করে রাও।'
এবং
'আগে গেলে বাঘে খায়,
পিছে গেলে সোনা পায়।'

এই প্রবাদ পংক্তি দুটিতে কাব্যের মতো ছন্দের মিল রয়েছে। প্রথমটিতে জন্মগত অভ্যাস পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। অনুরূপ, 'রং যায় না ধুইলে, স্বভাব যায় না মইলে'। এখানেও স্বভাব ত্যাগ করার দুঃসাধ্য বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদটিতে আগপিছ ভেবে চলার জন্য জনহিতকর পরামর্শ রয়েছে।

কাব্য ছন্দে দুটি পংক্তি থেকে বেশি পংক্তির প্রবাদ প্রবচনের প্রচলনও হবিগঞ্জে রয়েছে যেমন

www.pathagar.com

'যখন থাকে দুই পাও, যেমনি খুশি তেমনি যাও।
যখন অয় চাইর পাও, খানি খোরাক দিয়া যাও।
যখন অয় ছয় পাও, বাবা তুমি কই যাও?'

এখানে সংসার জীবনের বাস্তব একটি চিত্র কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, যা প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

বাস্তবতার নিরীখে অভিজ্ঞতার নির্যাসরূপে এইরূপ অসংখ্য প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি যা দৈনন্দিন কাজকর্মে আসরে অনুষ্ঠানে সালিশে বিচারে প্রয়োগ করা হয়। এই সকল প্রবাদ-প্রবচন কিন্তু তারা ইচ্ছে করে অথবা পূর্ব থেকে শিখে বা স্মরণে রেখে প্রয়োগ করেন না। কথা বলতে বলতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োজনীয় প্রবাদগুলো তাঁদের মুখ থেকে আপনিতেই বের হয়ে আসে। এসব প্রবাদ-প্রবচন লোকহিতকর বলেই সমাজের লোক শিক্ষকের কাজ করে যাচ্ছে। তাই বলা চলে মানব সমাজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছায় প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি। আর তাই লোকমনে জ্ঞান প্রচারে অনবদ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। হবিগঞ্জে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনের সংখ্যা অসংখ্য। এর মধ্যে নিজস্ব স্থান, ঘটনায় রচিত কিছু প্রবাদ প্রবচন নিম্নে দেয়া গেল :

১. হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ কোনাকুনি পথ, হাইর কপালে ভাগ নাই দেওরে দিলা নত।

২. গাউর নাম আগনা, মশায় খাইন মাগনা।

৩. পরগনা তরপ, ঘরে ঘরে হরফ।

৪. বানিয়াচঙের কচু, তরফের মুলা, আনাজের মাইঝে খুবই ভালা।

৫. হিসাব নাই কিতাব নাই গাজীগঞ্জের বাজার।

৬. রিচি গাইয়া বীচি লা, গাছ আনমান গোটা লা।

৭. হিয়ালা মক্রমপুর, টেকাটেকা কইন্যার জোর।

৮. এশিয়ার মধ্যে বড় গ্রাম, বানিয়াচুঙের আঠারো গ্রাম।

৯. ঘোড়া ফাদলে কামাইব না, বালিখাল যাইতে অইবো।

১০. ছয় কুড়ি চকিদার, একশ দশ মল্লার (মহল্লা) গ্রাম, কিংবদন্তির বানিয়াচং গ্রাম।

হবিগঞ্জে প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক কিছু প্রবাদ প্রবচন নিম্নে আলোচনা করা গেল।

ক. 'মা' শব্দের কতিপয় প্রবাদ-প্রবচন :

১. মা নাই যার দুনিয়া আন্ধাইর (অন্ধকার)।

২. মা আনমান ঝি, দুধ আনমান ঘি।

৩. মা মরলে বাপ তালই।

৪. মা বইন হক্কলেরই (সবার) আছে।

৫. মা আনমান ঝি, বাপ আনমান (অনুসারে) পুত।

৬. মা থইয়া ঝি গিত্যাইন (সর্দার), ই সংসারের ভাগ্যে ছাটিবাইন (কঠিন অবস্থা)।

৭. মা ভালা তো ঝি ভালা, বাপ বালা তো পুত।

www.pathagar.com

৮. মা দেইখ্যা ঝি, বাপ দেইখ্যা পুত।
৯. মা-ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নাই হিখানে।
১০. মা'র ফাটে না, মাউগের (পুত্রবধু) ফাটে।
১১. মা'র দুধ মুখে দিয়া বার করা।
১২. মায়ে চায় মুখের ফাই, আর বউয়ে চায় বোচকার (থলে) ফাই।
১৩. মা থাইক্যা মাসীর দরদ।

খ. 'চোর' শব্দ বিশিষ্ট কতিপয় প্রবাদ-প্রবচন :
১. চোরের উপর বাটফারি।
২. চোরের মাউগের (স্ত্রীর) বড় গলা।
৩. চোরের মনে পুলিশ পুলিশ/চোরের মনে ধুকধুকি।
৪. চোরে চিনে না পীর-সাগরেদ।
৫. চোরের মা'র বড় গলা।
৬. চোরে নাউ সাউধের (সাধুর) নিশান।
৭. চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।
৮. চোরে নেয় গরু, সর্বখানে ঘাস।
৯. চোরের নজর বোচকার ফাই।
১০. চোরে আড়াই ঘর থইয়া চুরি করে।
১১. চোরের বাড়িত দলান অয় না।
১২. চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে।
১৩. চোরের মনে খিরা ক্ষেত, হাতদি দেখে ইটা (মাটির ঢিলা) ক্ষেত।
১৪. চোরের পুন ডাকাইতে মারে।
১৫. চুরিত ফুরিত (উন্নতি) নাই।

গ. 'ভাল-মন্দ' (ভালা-বুজা) বিশিষ্ট কতগুলো প্রবাদ-প্রবচন :
১. বাপ ভালা তো বেটা ভালা, মা ভালাতো ঝি।
২. গাই ভালা তো বাছুর ভালা, দুধ ভালা তো ঘি।
৩. এই ভালা, ঐ বুরা (খারাপ), হে (সে ব্যক্তি) শয়তানের গোড়া।
৪. খাছলতেই (অভ্যাস) ভালা, খাচলতেই বুরা।
৫. ভালা ভালা মাধবের হালা।
৬. ভালা মাইনষের ভাল কথা, নেউ গা বেটা দুচাইর আটা। (দুচারটি ভাল কথা গ্রহণ করা)
৭. ভালা মাইষের পাও ধুয়ানিও ভালা। (কমিনের মুখ ধোয়ানী ভালা না।)
৮. ভালার সঙ্গে থাকলে খায় বাটার পান, বুরার (খারাপ) সঙ্গে থাকলে যায় কাঁটা কান।
৯. ভালা আছিল ঘর, ছাইয়া নষ্ট কর।

www.pathagar.com

১০. ভালা কামের ভালা ফল, কুকামে রসাতল।
১১. ভালা মানুষ কেউর গায় লেখা থাকে না।
১২. ভালা করল আল্লায়, বুরা করল বান্দায়।
১৩. ভালা মাউগ জামাই ছাড়ে না, ভালা ক্ষেত কিরানে ছাড়ে না।
১৪. শেষ ভালা যার, সব ভালা তার।
১৫. আপ ভালা তো জগত ভালা।

ঘ. 'কথা' শব্দ বিশিষ্ট প্রবাদ-প্রবচন :

১. কেউ ভাতের মরা, কেউ কথার মরা।
২. হাজার কথার বিয়া, তিন কথায় শেষ।
৩. উচিত কথা হুনতে তিতা।
৪. যদি উচিত কথা কই, ছিক্কা ছিউড়া (ছিড়ে) ভাইঙা পড়ে দই।
৫. আম কাঠাল দুই মাস, কথা থাকে বারো মাস।
৬. কথার ঘা হুকায় না, ফিকলের (বর্শার) ঘাঁ হুকায়।
৭. কথায় আছে শতেক বাণী, যদি কথা কইতে জানি।
৮. কথায় কথা বাড়ে, মইখনে বাড়ে ঘি।
৯. কথা বার্তায় সুপারিশ মাঠা নেছ তো ছলা (বস্তা) আনিছ।
১০. কথার নাম মধুর বাণী, যদি কথা কইতে জানি।
১১. কুকথা বাতাসে উড়ায়।
১২. কানে কানে কথা কয়, কান্নাউর (বেহায়া) বউ, মনে মনে কথা কয় মন্নাউর (বেয়াক্কল) বউ।
১৩. কথা দেওয়া, শপথ নেওয়া।
১৪. মুখের কথা জবান, মনের কথায় প্রমাণ।
১৫. গাছের শত্রু লতা, মাইনষের শত্রু কথা।
১৬. কথায় চিড়া ভিজে না।

প্রবাদ-প্রবচনে জোড়া শব্দের ব্যবহার :

ক.

১. থুরা থুরা খায়, কালের লাগাল পায়
২. গরম গরম খায়, মুখ পোড়া যায়।
৩. ডুবে ডুবে পানি খায়, যার যির ইচ্ছায় খায়।
৪. জল জল বৃষ্টির জল, বল বল বাহুর বল।
৫. একুল ওকুল দুকুল হারা।
৬. মনে মনে মনকলা খাইলে পেট ভরে না।
৭. যার যার হাতে হকলোই সাড়ে তিন হাত।

www.pathagar.com

৮. চোরে চোরে মামাত ভাই।

খ. 'যত তত'

১. যত কয় তত নয়।
২. যত বড় মুখ না তত বড় কথা।
৩. যত পায়, তত চায়।
৪. যত বংশ, তত অংশ।
৫. যত গুড়, তত মিঠা।
৬. যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।
৭. যত বড় মাথা তত বড় ব্যথা।
৮. যত হাসি তত কান্না।
৯. যত গর্জে তত বর্ষে না।
১০. যত ছল তত থল।
১১. যত ঘর তত দ্বার।
১২. যত মতো তত পথ।
১৩. যত সয়, তত বয়।
১৪. যত স্বর্গ, তত নরক।
১৫. যথা ধর্ম, তথা জয়।

গ. 'যার তার'

১. যার মাথা তার ব্যথা।
২. যার ঘরে ভাত, তার ঘরে জাত।
৩. যার লাগি অত, তারে পাইলাম পথ।
৪. যার দিলে কালি, তার কপালে ছালি।
৫. যার বিয়া তাঁর মনে নাই, পাড়া পড়শির ঘুম নাই।
৬. যার নাই, তাঁর লাগি শাদি বাড়িতও নাই।
৭. যার মাল, তাঁর যাকাত।
৮. যার খাই নুন, তার গাই গুণ।
৯. যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।
১০. যার লাঠি তার মাটি।

ঘ. মেনা > মেদা (মেনা = বাহ্যিকভাবে নিরীহ, ভেতরে খুবই সজাগ)

মেনা শব্দ বিশিষ্ট কতিপয় প্রবাদ-প্রবচন

১. মেনা বিলাই হর খাইবার যম।
২. মেনা গাই চেনাইবার যম।
৩. মেনা মানুষ হাওরের ডাকাইত।

www.pathagar.com

৪. মেনা গাই মেন মেনাইয়া চায়, হাজার টেকার মরিচ খাইয়া আরো খাইত চায়।
৫. মেনা ঈমানদার থাইক্যা, খাড়া বেঈমান ভালা।
৬. মেনা মোল্লা কাম থইয়া শিন্নি ঢোকাই?
৭. মেনা গাই এনা (শিং) মারে, গাইটের গরু কানা করে (পৃথক করে)।
৮. মেনা গাইর জুদা বাতান।
৯. মেনা গাই গু খাইবার যম।
১০. মেন্দা মুইখ্যা (মেনা মুখো) জামাই, কি আর করবা কামাই।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস

'বিশ্বাসে পাবে রে ঈশ্বর, তর্কে বহুদূর'। স্রষ্টার উপর মৌলিক বিশ্বাসেই মানুষ তার ধর্মকে সত্য বলে জানে। পৃথিবী, দিন-রাত, মৃত্যু দেখেই নিজস্ব যুক্তির মধ্যেই তার মনে বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। মানুষ তার জীবনকে ভালোবাসে। জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য ধর্মের শাসন মেনে চলতে চেষ্টা করে। জীবনে কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে চায় না। তাই পীড়িত, বিঘ্নিত বা লজ্জিত জীবন, বিড়ম্বনার লক্ষণ দেখলেই ধর্মে বিশ্বাসের কারণে হেতু যাদু, মন্ত্রতন্ত্র, মাদুলী, তাবিজ, কবচ, তাগা প্রভৃতি বস্তু বা ঔষধি গুণের ওপর আস্থাশীল হয়। মনের গভীরে স্থান পাওয়া বিশ্বাসই এর কারণ। আদিম মানবজাতির কাছে যাদু ছিল ধর্মের অঙ্গ[১]। তখন থেকেই যাদুমন্ত্রের বিশ্বাস মনে স্থান পেয়েছে। বাঙালির সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসে যাদুবিদ্যা ও প্রেততন্ত্রের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে[২]।

মানুষের সুখশান্তি বিধানের উদ্দেশে সমাজ পেশাদার ওঁঝা, বৈদ্য, সাধু সন্ন্যাসী, বেদে বেদেনী ইত্যাদি ব্যক্তির পরিচয় লাভ করেছে। তারা যাদুবিদ্যা ও মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনতে বা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে থাকে। যাদুর কোনো আধ্যাত্মিক দিক নেই, ব্যবহারিক দিকে কৌশল রয়েছে, আর কৌশল প্রয়োগ হয় মন্ত্রের সাহায্যে। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়, এ তার দৃঢ় বিশ্বাসে। আর তখনই যাদুমন্ত্র গুণের ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটায়। অনুরূপ তাকে কবিরাজ, পুরোহিত, পীর ফকির ব্যক্তির ও পরিচয় ঘটেছে। পেশাদার অপেশাদার এসব ব্যক্তি দোয়া দুরুদ পড়ে রোগিকে ফুঁক দেয়, গাছগাছালির লতাপাতার দ্বারা চিকিৎসা করে, তাবিজ, কবচ, পানিপড়া, তেলপড়া, ধূলাপড়া, চালপড়া চিকিৎসা দেয়। এসব অটিটটি, ফুঁ ফা'র ফলপ্রাপ্তির অভিজ্ঞায় লোকবিশ্বাস সৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিরা কেবল পরিচিতি লাভ করেনি বরং লোক সমাজে তারা স্বীকৃতিও পেয়েছে।

এই লোক বিশ্বাস আমাদের লোক মনে স্থান পেয়ে আচারআচরণের দ্বারা জাতঅজাতসারে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে যদিও, তবুও অশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক বাহক। এই বিশ্বাসগুলো অমূলক, অহেতুক, অকারণে হলেও লোকমনের অন্ধ বিশ্বাসেও নিশ্বাস মুক্তিতে এই আচরণগুলো কুসংস্কারে এ পরিণত হয়েছে।

১। ওয়াকিল আহম্মদ, বাংলার লোক সাহিত্য (বা/এ-১৯৭৪) পৃ. ৩৪৬।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে লোক বিশ্বাস এবং লোকসংস্কারের একই রূপ নিয়েছে মূলত ঐহিক সুখ চিন্তায় ঐহিক লোক বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে আচারআচরণে এবং কর্ম-ক্রিয়ায় তা প্রদর্শন করে এবং লোক সংস্কারে তা পালন করে। লোক সংস্কারের

www.pathagar.com

উৎপত্তির মূলে জনসমষ্টির ধর্মবোধ বা শাস্ত্র নিদর্শন। তাই সেকালের সংস্কারগুলো আজো চালু রয়েছে আমাদের মধ্যে যেমন সাজ জালানোর সময় কাদা বা অশ্রুপাত অমঙ্গলকর, নারীর বাম বা ডান চোখের নাচন যাত শুভাশুভ, নারীকে ভূতে বা জ্বিনে পাওয়া চাষ করার মূহুতে লাঙ্গল জোয়াল যাদু প্রতীক চিহ্ন এঁকে দিত নারীরা। গৃহ দ্বারে বসানো হতো মঙ্গল ঘট, সকল মঙ্গল ঘটে আম্রসার থাকত। অভিপ্রেত অতিথিকে বরণ করবার জন্য গৃহদ্বারে ঝুলিয়ে রাখা হতো ফুলের মালাও।[১]

১. অশুভ দৃষ্টি বা নজর লাগা : অশুভ দৃষ্টি বা নজর লাগানোর মতো সমাজে কিছু লোক রয়েছে। তাদের অশুভ দৃষ্টিতে ফল-ফসলার মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই অশুভ দৃষ্টির প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য হিন্দু মুসলমানেরা একটি কাল হাড়ির গায়ে সাদা রং মাখিয়ে ক্রস, দুটি চক্ষু এঁকে বা অন্য কোনো চিহ্ন এঁকে বাঁশের খুটির মাথায় লটকিয়ে দেয়। এই কুনজর লাগার ভয়ে জননী তার শিশুর ললাটে এঁকে দেন কাল কালির টিপ। এগুলো লোক বিশ্বাস থেকে লোক সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

২. কসকা-টোটকা : একটি ভারী জিনিস উত্তোলনকালে এক ব্যক্তির কোমরে ব্যথা হলো, সে আর সুস্থমনে হাঁটতে বা বসতে পারছেনা। ব্যক্তিটি তখন গ্রামের একজন ফকিরের বা দরবেশের কাছে গিয়ে কসকা-টোটকার ফুঁক্ নেয়। তৈলপড়া নেয়। ঐ ফকির তার কোমরে টিপ দিয়ে ধরে কাঁচি দিয়ে মাটিতে চারটি ফোঁটা অঙ্কন করে এর মধ্যে ক্রস চিহ্ন দিয়ে ফোঁটাগুলোকে কেটে দেয় এবং বলে ভালো হয়ে যাবে। তেল দিলাম মালিশ কর। এ বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা নয়। এটিও লোক বিশ্বাসে হয়ে থাকে। এ কুসংস্কার চিকিৎসা গ্রামগঞ্জে এখনও আছে।

৩. ভুত : গ্রামগঞ্জে 'ভূত' বলে এক অশরীরি আত্মার প্রচলন আছে। এর অবস্থান গ্রামের বন, জঙ্গল, অতি পুরাতন গাছে, ভাঙ্গা মন্দির, কবরস্থান বা শ্মাশান অর্থাৎ নিজন স্থানে, যে স্থানটিতে ভূতের পরিবেশ বিরাজ করে। এই স্থানে লোক সাধারণত কম যাতায়াত করে, যাতায়াত কালে ঘা শিউরে উঠে তখন 'ভূত' এর ধরা থেকে বাঁচার জন্য তাৎক্ষণিক নিজ বুকে থুঁ থুঁ দেয়, কেউ কেউ হাততালি দেয়, কেউ ধর্মীয় নানান সুরা মনে মনে পাঠ করে। রাতে চলার পথে আগুনের লোক্কা নেয়। এতে ভূতের প্রভাব থেকে বাঁচা যায়। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা আতুর ঘরের সামনে গরুর মাথা ঝুলিয়ে রাখে। এতে ভূত প্রেতের কবল থেকে তারা রক্ষা পায়। এরকম লোক বিশ্বাস গ্রামে প্রচলিত আছে।

৪. যাত্রা নাস্তি : কথায় আছে 'পা বাড়ালেই উঠোন সমুদ্র'। পথে বাধাবিঘ্ন অনেক। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ঘটনা, দৈব দুর্বিপাক, অসুখ বিসুখ ইত্যাদি হঠাৎ করে উপস্থিত হতে পারে। তাই মানুষ যাত্রাকালে শুভাশুভ বিচার এবং এ সম্পৃক্ত আচার পালন করে। সোম ও শনিবার পূর্বদিকে যেতেন। যাত্রাকালে হোচট থেকে যাত্রা নাস্তি। শনি মঙ্গল বার যাত্রা নাস্তি। শূন্য কলসিকাঁধে রমনি, বা শূন্য কলস দেখে যাত্রা করে অথবা বন্ধ্যা রমণি

www.pathagar.com

কিংবা আটকুরে লোক দেখে কোথাও যাত্রাকালে মঙ্গলবাচক নয় বলে অসংখ্য দৃষ্টান্ত গ্রামগঞ্জে যাত্রা নাস্তি বলে গণ্য আছে।

৫. পিছুডাক : সাধারণত পিছু ডাক অশুভ সূচক; কিন্তু মায়ের পিছু ডাক শুভ। তাই মাকে তার সন্তানের যাত্রাকালে পিছু ডাক দিতে শুনা যায়। এ ডাক সন্তানকে গৃহে ফিরিয়ে আনে বলে সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

৬. কাক, পেঁচার ডাকে কুলক্ষণ : মা লক্ষীর বাহন পেঁচা রাতে যখন বাড়ির পাশের গাছে অথবা ঘরের চালে বসে ডাকতে থাকে তখন গৃহের মানুষ এক অজানা আতঙ্কে ভোগতে থাকেন। অনুরূপ রাতে কাকের ডাককেও অমঙ্গল মনে করেন তারা। এই পাখিগুলোর ডাক কেবল দুঃসংবাদই নয়, মৃত্যুর পূর্ব ঘোষণা বলে মানা হয়। তাই ডাক শুনা মাত্রই ঢিল ছুঁড়ে পেঁচা-কাককে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

৭. ঝাড়-ফুঁক : গ্রামগঞ্জে এখনও ঝাড়ফুঁকের লৌকিক চিকিৎসা বিদ্যমান। বাত জাতীয় রোগের দেহের অঙ্গবিশেষ অবশ বা নিস্তেজ বোধ হলে, অথবা অঙ্গে ঘা বা অন্য কোনো ব্যাধি হলে রোগিকে উপশমের জন্যে ঝাড়, ফুঁক দেয়া হয়। গ্রামে এক শ্রেণির ওঝা, কবিরাজ রোগিকে নানা লৌকিক আচার পালনের মাধ্যমে ঝাড় ফুঁক দিয়ে থাকে। কেউ পশুর হাড় হাতে নিয়ে, কেউ বিভিন্ন গাছের ডাল পাতায়, কেউ উদ্ভিদের মূল, কেউ তৈল, কেউবা নানা ফলমূল পাতার মিশ্রণে লেপন তৈরী করে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে থাকে। ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসাকালে কোনো রোগিকে আরাম, আবার কোনো রোগীকে কষ্ট দেয়া হয়। ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র আছে। মন্ত্র দ্বারা অপদেবতাকে তাড়ালে অসুখদূরীভুত হয়; এ লোক বিশ্বাস আছে।

৮. টিকটিকির ডাক : আমাদের ঘরে টিকটিকি রয়েছে, দেয়ালে, ছাদে, চালে বিচরণ করে পোকামাকড় খেয়ে থাকে। আমরা যখন কোনো বিষয়ে কথা বলি তখন যদি টিকটিকি ডেকে উঠে, তখন 'ঠিক ঠিক' কথার সত্যতার বুঝে আঙ্গুল দিয়ে টুকনি দিয়ে সায় দিই। আমাদের বিশ্বাস টিকটিকি আমাদের যুক্তি, পরামর্শ, সিদ্ধান্তের প্রতি 'টিকটিক' শব্দ করে সমর্থন দিয়েছে। এ লোক বিশ্বাস রয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'খনার জীব কেটে বরাহ লুকিয়ে রেখেছিলেন টিকটিকি তাই খেয়ে ফেলে। সেই থেকে সে দৈবজ্ঞ হয়ে গেছে।"[২]

খনা = বিখ্যাত নারী জ্যোতিষী

বরাহ = বিষ্ণুর অবতার বিশেষ

দৈবজ্ঞ = দৈব লেখক

৯. লোক সংস্কারে বালিশ : মাথা রাখার বালিশে বসতে নেই। বসলে পাঁছায় ফোঁড়া ও ঘাড়ে ব্যথা হয় বলে লোক সংস্কার রয়েছে। যদি লোকের ঘাড় ব্যথা করে তবে তাকে মাথার বালিশ রোদে গরম করে শুয়ে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এতে উপশম হবে বলে লোক বিশ্বাস রয়েছে।

www.pathagar.com

১০. লোক সংস্কারে মেয়েদের মাথার চুল : চুল নারীর সৌন্দর্যের অংশ। তাই 'কেশবতী নারী'র গুণাগুণ বর্ণিত আছে আমাদের লোক সাহিত্যে। মেয়েরা মাথার চুল আচঁড়ানোকালে সাবধানতা অবলম্বন করে, যাতে মাথার চুল এধিক সেদিক না পড়ে। তাদের মাথার চুল দিয়ে যাদু টোনা হওয়ার একটি লোক সংস্কার সমাজে রয়েছে। তাই মেয়েরা চিরুণীতে আটকানো চুল ভাল করে উঠিয়ে নিয়ে জড়ো করে দুবার মুখের থু থু দিয়ে কোথাও গুঁজে রাখে অথবা মাটিতে পুঁতে রাখে। এখনও গ্রামাঞ্চলে এ লোক সংস্কার মেয়েরা মেনে চলে।

তথ্যসূত্র

১. দুই হাজার বছর আগের গ্রামীণ সমাজ: আহম্মদ শরীফ, পৃ. ৫৮।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

লোক শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল হল লোকপ্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে আমাদের লোক সামাজের চাষাবাদে সাফল্য এনেছে। কৃষি নির্ভর গ্রাম গঞ্জের লোক মানষে লোক প্রযুক্তির ব্যবহারে বৈপণ্ডবিক পরিবর্তন হয়। চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সেচ পদ্ধতি, কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ এই সব ক্ষেত্রেই কৃষি সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই লোক প্রযুক্তি ব্যবহার শুর করেছে গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ। ধীরে ধীরে গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার জন্য লাঙ্গলেফাল ব্যবহার, মাটিগুলিকে মশ্রিণ ও সমতল করার জন্য মই তৈরি, বড় বড় মাটির চাক গুলিকে ভাঙ্গার জন্য মুগুর। সেচ দেয়ার জন্য খুন ও হেওত তৈরি। ধান রাখার জন্য ঢাইল তৈরি। মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি বিভিন্ন পদ্ধতির যন্ত্র আবিষ্কার। মিত্র শিল্প তৈরিতে পদ্ধতি ইত্যাদিতে লোকপ্রযুক্তির উদ্ভাবন কার্য ক্রিয়াশীল। ধান ভাঙ্গানোর ঢেঁকি তৈরি ও প্রক্রিয়া লোক প্রযুক্তিরই দক্ষ কাজ।

১. মাছ ধরার জাল

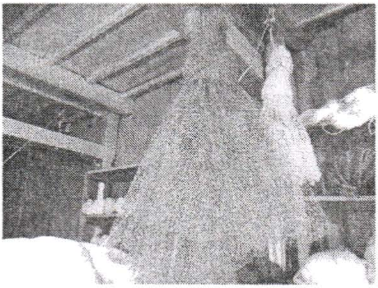

মাছ ধরার উড়ানো জাল

২. মাছ ধরার যন্ত্র

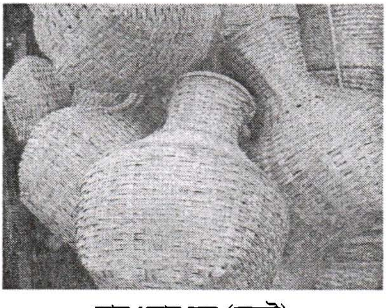

মাছ ধরার যন্ত্র (কলই)

www.pathagar.com

৩. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ
৪. কাপড় বোনার তাঁত
৫. জাঁতি বা ছরতা
৬. হুঁকা

হুক্কা

৭. ঢেঁকি

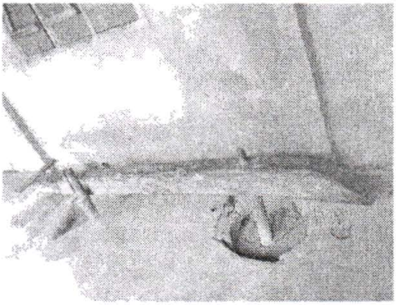

ধান ভাঙ্গার ঢেঁকি

৮. লাঙল
৯. কামারের হাপর

১০. ধান মাড়াই কল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি